গল্পগুচ্ছ

(চতুর্থ ভাগ)

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রকাশক

কলিকাতা—ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস্

৭৩।১ সুকীয়া ষ্ট্রীট

এলাহাবাদ—ইণ্ডিয়ান্ প্রেস।

প্যারাগন প্রেস

২১৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট

কলিকাতা।

শ্রীগোপালচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৩১৫

সূচী।

বিষয়			পৃষ্ঠা।
দিদি	...	...	১
তারাপ্রসন্নের কীর্ত্তি	...	...	২০
দুর্ব্বুদ্ধি	...	...	৩৩
আপদ	...	...	৪১
সম্পাদক	...	...	৬১
নিশীথে	...	...	৬৯
জয় পরাজয়	...	...	৯১
প্রতিহিংসা	...	...	১০৮
ঠাকুর্দ্দা	..	..	১২[illegible]
স্বর্ণমৃগ	...	...	১৫০
প্রতিবেশিনী	...	...	১৭০
অনধিকার প্রবেশ	...	...	১৭৮
ত্যাগ	...	..	১৮৫

দিদি।

পল্লীবাসিনী কোন এক হতভাগিনীর অন্যায়কারী অত্যাচারী স্বামীর দুষ্কৃতি সকল সবিস্তারে বর্ণন পূর্ব্বক প্রতিবেশিনী তারা অত্যন্ত সংক্ষেপে নিজের রায় প্রকাশ করিয়া কহিল, এমন স্বামীর মুখে আগুন।

শুনিয়া জয়গোপাল বাবুর স্ত্রী শশি অত্যন্ত পীড়া অনুভব করিলেন ; —স্বামী জাতির মুখে চুরটের আগুন ছাড়া অন্য কোন প্রকার আগুন কোন অবস্থাতেই কামনা করা স্ত্রীজাতিকে শোভা পায় না।

অতএব এ সম্বন্ধে তিনি কিঞ্চিৎ সঙ্কোচ প্রকাশ করাতে কঠিন-হৃদয় তারা দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত কহিল, এমন স্বামী থাকার চেয়ে সাতজন্ম বিধবা হওয়া ভাল। এই বলিয়া সে সভাভঙ্গ করিয়া চলিয়া গেল।

শশি মনে করিল, স্বামীর এমন কোন অপরাধ কল্পনা করিতে পারি না, যাহাতে তাঁহার প্রতি মনের ভাব এত কঠিন হইয়া উঠিতে পারে। এই কথা মনের মধ্যে আলোচনা করিতে করিতেই তাহার কোমল হৃদয়ের সমস্ত প্রীতিরস তাহার প্রবাসী স্বামীর অভিমুখে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল ; শয্যাতলে তাহার স্বামী যে অংশে শয়ন করিত সেই অংশের উপর বাহু প্রসারণ করিয়া

পড়িয়া শূন্য বালিশকে চুম্বন করিল, বালিশের মধ্যে স্বামীর মাথার আঘ্রাণ অনুভব করিল এবং দ্বার রুদ্ধ করিয়া কাঠের বাক্স হইতে স্বামীর একখানি বহুকালের লুপ্তপ্রায় ফোটোগ্রাফ এবং হাতের লেখা চিঠিগুলি বাহির করিয়া বসিল। সেদিনকার নিস্তব্ধ মধ্যাহ্ন এইরূপে নিভৃত কক্ষে, নির্জ্জন চিন্তায় পুরাতন স্মৃতিতে এবং বিষাদের অশ্রুজলে কাটিয়া গেল।

শশিকলা এবং জয়গোপালের যে নবদাম্পত্য তাহা নহে। বাল্যকালে বিবাহ হইয়াছিল ইতিমধ্যে সন্তানাদিও হইয়াছে। উভয়ে বহুকাল একত্র অবস্থান করিয়া নিতান্ত সহজ সাধারণ ভাবেই দিন কাটিয়াছে; কোন পক্ষেই অপরিমিত প্রেমোচ্ছ্বাসের কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই। প্রায় ষোল বৎসর একাদিক্রমে অবিচ্ছেদে যাপন করিয়া হঠাৎ কর্ম্মবশে তাহার স্বামী বিদেশে চলিয়া যাওয়ার পর শশির মনে একটা প্রবল প্রেমাবেগ জাগ্রত হইয়া উঠিল। বিরহের দ্বারা বন্ধনে যতই টান পড়িল কোমল হৃদয়ে প্রেমের ফাঁশ ততই শক্ত করিয়া আঁটিয়া ধরিল; ঢিলা অবস্থায় যাহার অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারে নাই এখন তাহার বেদনা টন্‌টন্ করিতে লাগিল।

তাই আজ এতদিন পরে এত বয়সে ছেলের মা হইয়া শশি বসন্তমধ্যাহ্নে নির্জ্জন ঘরে বিরহশয্যায় উন্মেষিতযৌবনা নববধূর সুখস্বপ্ন দেখিতে লাগিল। যে প্রেম অজ্ঞাতভাবে জীবনের সম্মুখ দিয়া প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে, সহসা আজ তাহারই কলগীতিশব্দে জাগ্রত হইয়া মনে মনে তাহারই উজান বাহিয়া দুই

তীরে বহুদূরে অনেক সোনার পুরী অনেক কুঞ্জবন দেখিতে লাগিল;—কিন্তু সেই অতীত সুখসম্ভাবনার মধ্যে এখন আর পদার্পণ করিবার স্থান নাই। মনে করিতে লাগিল এইবার যখন স্বামীকে নিকটে পাইব, তখন জীবনকে নীরস এবং বসন্তকে নিষ্ফল হইতে দিব না। কতদিন কতবার তুচ্ছতর্কে সামান্য কলহে স্বামীর প্রতি সে উপদ্রব করিয়াছে আজ অনুতপ্তচিত্তে একান্ত মনে সঙ্কল্প করিল আর কখনই সে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিবে না, স্বামীর ইচ্ছায় বাধা দিবে না, স্বামীর আদেশ পালন করিবে, প্রীতিপূর্ণ নম্রহৃদয়ে নীরবে স্বামীর ভালমন্দ সমস্ত আচরণ সহ্য করিবে; কারণ, স্বামী সর্ব্বস্ব, স্বামী প্রিয়তম, স্বামী দেবতা। অনেক দিন পর্য্যন্ত শশিকলা তাহার পিতামাতার একমাত্র আদরের কন্যা ছিল। সেই জন্য, জয়গোপাল যদিও সামান্য চাকুরি করিত, তবু ভবিষ্যতের জন্য তাহার কিছুমাত্র ভাবনা ছিল না। পল্লীগ্রামে রাজভোগে থাকিবার পক্ষে তাহার শ্বশুরের যথেষ্ট সম্পত্তি ছিল।

এমন সময় নিতান্ত অকালে প্রায় বৃদ্ধবয়সে শশিকলার পিতা কালীপ্রসন্নের একটি পুত্রসন্তান জন্মিল। সত্য কথা বলিতে কি, পিতামাতার এইরূপ অনপেক্ষিত অসঙ্গত অন্যায় আচরণে শশি মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল; জয়গোপালও সবিশেষ প্রীতি-লাভ করে নাই।

অধিক বয়সের ছেলেটির প্রতি পিতামাতার স্নেহ অত্যন্ত ঘনীভূত হইয়া উঠিল। এই নবাগত, ক্ষুদ্রকায়, স্তন্যপিপাসু,

নিদ্রাতুর শ্যালকটি অজ্ঞাতসারে দুই দুর্ব্বল হস্তের অতি ক্ষুদ্র বদ্ধমুষ্টির মধ্যে জয়গোপালের সমস্ত আশা ভরসা যখন অপহরণ করিয়া বসিল, তখন সে আসামের চা-বাগানে এক চাকরি লইল।

নিকটবর্ত্তী স্থানে চাকুরির সন্ধান করিতে সকলেই তাহাকে পীড়াপীড়ি করিয়াছিল—কিন্তু সর্ব্বসাধারণের উপর রাগ করিয়াই হউক, অথবা চা-বাগানে দ্রুত বাড়িয়া উঠিবার কোন উপায় জানিয়াই হউক, জয়গোপাল কাহারও কথায় কর্ণপাত করিল না; শশিকে সন্তানসহ তাহার বাপের বাড়ি রাখিয়া সে আসামে চলিয়া গেল। বিবাহিত জীবনে স্বামী স্ত্রীর এই প্রথম বিচ্ছেদ।

এই ঘটনায় শিশু ভ্রাতাটির প্রতি শশিকলার ভারি রাগ হইল। যে মনের আক্ষেপ মুখ ফুটিয়া বলিবার জো নাই, তাহারই আক্রোশটা সব চেয়ে বেশি হয়। ক্ষুদ্র ব্যক্তিটি আরামে স্তনপান করিতে ও চক্ষু মুদিয়া নিদ্রা দিতে লাগিল এবং তাহার বড় ভগিনীটি দুধ গরম, ভাত ঠাণ্ডা, ছেলের ইস্কুলে যাওয়ার দেরি প্রভৃতি নানা উপলক্ষে নিশিদিন মান অভিমান করিয়া অস্থির হইল এবং অস্থির করিয়া তুলিল।

অল্পদিনের মধ্যেই ছেলেটির মার মৃত্যু হইল; মরিবার পূর্ব্বে জননী তাঁহার কন্যার হাতে শিশুপুত্রটিকে সমর্পণ করিয়া দিয়া গেলেন।

তখন অনতিবিলম্বেই সেই মাতৃহীন ছেলেটি অনায়াসেই তাহার দিদির হৃদয় অধিকার করিয়া লইল। হুহুঙ্কার শব্দ পূর্ব্বক

সে যখন তাঁহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া পরম আগ্রহের সহিত দন্তহীন ক্ষুদ্র মুখের মধ্যে তাঁহার মুখ চক্ষু নাসিকা সমস্তটা গ্রাস করিবার চেষ্টা করিত, ক্ষুদ্র মুষ্টিমধ্যে তাঁহার কেশগুচ্ছ লইয়া কিছুতেই দখল ছাড়িতে চাহিত না, সূর্য্যোদয় হইবার পূর্ব্বেই জাগিয়া উঠিয়া গড়াইয়া তাঁহার গায়ের কাছে আসিয়া কোমল স্পর্শে তাঁহাকে পুলকিত করিয়া মহাকলরব আরম্ভ করিয়া দিত; —যখন ক্রমে সে তাঁহাকে জিজি এবং জিজিমা বলিয়া ডাকিতে লাগিল, এবং কাজকর্ম্ম ও অবসরের সময় নিষিদ্ধ কার্য্য করিয়া, নিষিদ্ধ খাদ্য খাইয়া, নিষিদ্ধ স্থানে গমনপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি বিধিমত উপদ্রব আরম্ভ করিয়া দিল, তখন শশি আর থাকিতে পারিলেন না। এই স্বেচ্ছাচারী ক্ষুদ্র অত্যাচারীর নিকটে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া দিলেন। ছেলেটির মা ছিল না বলিয়া তাহার প্রতি তাঁহার আধিপত্য ঢের বেশি হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ছেলেটির নাম হইল নীলমণি। তাহার বয়স যখন দুই বৎসর তখন তাহার পিতার কঠিন পীড়া হইল। অতি শীঘ্র চলিয়া আসিবার জন্য জয়গোপালের নিকট পত্র গেল। জয়গোপাল যখন বহু চেষ্টায় ছুটি লইয়া আসিয়া পৌঁছিল তখন কালীপ্রসন্নের মৃত্যুকাল উপস্থিত।

মৃত্যুর পূর্ব্বে কালীপ্রসন্ন, নাবালক ছেলেটির তত্ত্বাবধানের

ভার জয়গোপালের প্রতি অর্পণ করিয়া তাঁহার বিষয়ের সিকি অংশ কন্যার নামে লিখিয়া দিলেন।

সুতরাং বিষয়-রক্ষার জন্য জয়গোপালকে কাজ ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া আসিতে হইল।

অনেক দিনের পরে স্বামীস্ত্রীর পুনর্ম্মিলন হইল। একটা জড়পদার্থ ভাঙ্গিয়া গেলে আবার ঠিক তাহার খাঁজে খাঁজে মিলাইয়া দেওয়া যায়। কিন্তু দুটি মানুষকে যেখানে বিচ্ছিন্ন করা হয়, দীর্ঘ বিচ্ছেদের পরে আর ঠিক সেখানে রেখায় রেখায় মেলে না।—কারণ, মন জিনিষটা সজীব পদার্থ; নিমিষে তাহার পরিণতি এবং পরিবর্ত্তন।

শশির পক্ষে এই নূতন মিলনে নূতন ভাবের সঞ্চার হইল। সে যেন তাহার স্বামীকে ফিরিয়া বিবাহ করিল। পুরাতন দাম্পত্যের মধ্যে চিরাভ্যাস বশত যে এক অসাড়তা জন্মিয়া গিয়াছিল, বিরহের আকর্ষণে তাহা অপসৃত হইয়া সে তাহার স্বামীকে যেন পূর্ব্বাপেক্ষা সম্পূর্ণতর ভাবে প্রাপ্ত হইল,—মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, যেমন দিনই আসুক্, যতদিনই যাক্, স্বামীর প্রতি এই দীপ্ত প্রেমের উজ্জ্বলতাকে কখনই ম্লান হইতে দিব না।

নূতন মিলনে জয়গোপালের মনের অবস্থাটা অন্যরূপ। পূর্ব্বে যখন উভয়ে অবিচ্ছেদে একত্র ছিল যখন স্ত্রীর সহিত তাহার সমস্ত স্বার্থের এবং বিচিত্র অভ্যাসের ঐক্যবন্ধন ছিল, স্ত্রী তখন জীবনের একটি নিত্য সত্য হইয়াছিল,—তাহাকে বাদ দিতে

গেলে দৈনিক অভ্যাসজালের মধ্যে সহসা অনেকখানি ফাঁক পড়িত। এইজন্য বিদেশে গিয়া জয়গোপাল প্রথম প্রথম অগাধ জলের মধ্যে পড়িয়াছিল। কিন্তু ক্রমে তাহার সেই অভ্যাস-বিচ্ছেদের মধ্যে নূতন অভ্যাসের তালি লাগিয়া গেল।

কেবল তাহাই নহে। পূর্ব্বে নিতান্ত নিশ্চেষ্ট নিশ্চিন্তভাবে তাহার দিন কাটিয়া যাইত। মাঝে দুই বৎসর, অবস্থা-উন্নতি—চেষ্টা তাহার মনে এমন প্রবলভাবে জাগিয়া উঠিয়াছিল যে, তাহার মনের সম্মুখে আর কিছুই ছিল না। এই নূতন নেশার তীব্রতার তুলনায় তাহার পূর্ব্বজীবন বস্তুহীন ছায়ার মত দেখাইতে লাগিল। স্ত্রীলোকের প্রকৃতিতে প্রধান পরিবর্ত্তন ঘটায় প্রেম, এবং পুরুষের ঘটায় দুশ্চেষ্টা।

জয়গোপাল দুই বৎসর পরে আসিয়া অবিকল তাহার পূর্ব্ব স্ত্রীটিকে ফিরিয়া পাইল না। তাহার স্ত্রীর জীবনে শিশু শ্যালকটি একটা নূতন পরিসর বৃদ্ধি করিয়াছে। এই অংশটি তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ অপরিচিত,—এই অংশে স্ত্রীর সহিত তাহার কোন যোগ নাই। স্ত্রী তাহাকে আপনার এই শিশুস্নেহের ভাগ দিবার অনেক চেষ্টা করিত—কিন্তু ঠিক কৃতকার্য্য হইত কি না, বলিতে পারি না।

শশি নীলমণিকে কোলে করিয়া আনিয়া হাস্যমুখে তাহার স্বামীর সম্মুখে ধরিত—নীলমণি প্রাণপণে শশির গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার কাঁধে মুখ লুকাইত, কোন প্রকার কুটুম্বিতার খাতির মানিত না। শশির ইচ্ছা, তাহার এই ক্ষুদ্র ভ্রাতাটির

যত প্রকার মন ভুলাইবার বিদ্যা আয়ত্ত আছে, সবগুলি জয়-গোপালের নিকট প্রকাশ হয়; কিন্তু জয়গোপালও সে জন্য বিশেষ আগ্রহ অনুভব করিত না এবং শিশুটিও বিশেষ উৎসাহ দেখাইত না। জয়গোপাল কিছুতেই বুঝিতে পারিত না এই কৃশকায় বৃহৎমস্তক গম্ভীরমুখ শ্যামবর্ণ ছেলেটার মধ্যে এমন কি আছে যে জন্য তাহার প্রতি এতটা স্নেহের অপব্যয় করা হইতেছে।

ভালবাসার ভাবগতিক মেয়েরা খুব চট্ করিয়া বোঝে। শশি অবিলম্বেই বুঝিল জয়গোপাল নীলমণির প্রতি বিশেষ অনুরক্ত নহে। তখন ভাইটিকে সে বিশেষ সাবধানে আড়াল করিয়া রাখিত—স্বামীর স্নেহহীন বিরাগদৃষ্টি হইতে তাহাকে তফাতে রাখিতে চেষ্টা করিত। এইরূপে ছেলেটি তাহার গোপন যত্নের ধন, তাহার একলার স্নেহের সামগ্রী হইয়া উঠিল। সকলেই জানেন, স্নেহ যত গোপনের, যত নির্জ্জনের হয় ততই প্রবল হইতে থাকে।

নীলমণি কাঁদিলে জয়গোপাল অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিত—এই জন্য শশি তাহাকে তাড়াতাড়ি বুকের মধ্যে চাপিয়া সমস্ত প্রাণ দিয়া বুক দিয়া, তাহার কান্না থামাইবার চেষ্টা করিত,—বিশেষত নীলমণির কান্নায় যদি রাত্রে তাহার স্বামীর ঘুমের ব্যাঘাত হইত, এবং স্বামী এই ক্রন্দনপরায়ণ ছেলেটার প্রতি অত্যন্ত হিংস্রভাবে ঘৃণা প্রকাশ পূর্ব্বক জর্জ্জরচিত্তে গর্জ্জন করিয়া উঠিত, তখন শশি যেন অপরাধিনীর মত সঙ্কুচিত শশব্যস্ত হইয়া পড়িত, তৎক্ষণাৎ তাহাকে কোলে করিয়া দূরে লইয়া গিয়া

একান্ত সানুনয় স্নেহের স্বরে সোনা আমার, ধন আমার, মাণিক আমার বলিয়া ঘুম পাড়াইতে থাকিত।

ছেলেতে ছেলেতে নানা উপলক্ষে ঝগড়া বিবাদ হইয়াই থাকে। পূর্ব্বে এরূপ স্থলে শশি নিজের ছেলেদের দণ্ড দিয়া ভাইয়ের পক্ষ অবলম্বন করিত, কারণ, তাহার মা ছিল না। এখন বিচারকের সঙ্গে সঙ্গে দণ্ডবিধির পরিবর্ত্তন হইল। এখন সর্ব্বদাই নিরপরাধে এবং অবিচারে নীলমণিকে কঠিন দণ্ড ভোগ করিতে হইত। সেই অন্যায় শশির বক্ষে শেলের মত বাজিত; তাই সে দণ্ডিত ভ্রাতাকে ঘরে লইয়া গিয়া তাহাকে মিষ্ট দিয়া খেলেনা দিয়া আদর করিয়া চুমো খাইয়া শিশুর আহত হৃদয়ে যথাসাধ্য সান্ত্বনা বিধান করিবার চেষ্টা করিত।

ফলতঃ দেখা গেল, শশি নীলমণিকে যতই ভালবাসে জয়-গোপাল নীলমণির প্রতি ততই বিরক্ত হয়; আবার জয়গোপাল নীলমণির প্রতি যতই বিরাগ প্রকাশ করে, শশি তাহাকে ততই স্নেহসুধায় অভিষিক্ত করিয়া দিতে থাকে।

জয়গোপাল লোকটা কখনও তাহার স্ত্রীর প্রতি কোনরূপ কঠোর ব্যবহার করে না এবং শশি নীরবে নম্রভাবে প্রীতির সহিত তাহার স্বামীর সেবা করিয়া থাকে, কেবল এই নীল-মণিকে লইয়া ভিতরে ভিতরে উভয়ে উভয়কে অহরহ আঘাত দিতে লাগিল।

এইরূপ নীরব দ্বন্দ্বের গোপন আঘাত প্রতিঘাত প্রকাশ্য বিবাদের অপেক্ষা ঢের বেশি দুঃসহ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নীলমণির সমস্ত শরীরের মধ্যে মাথাটাই সর্ব্বপ্রধান ছিল। দেখিলে মনে হইত বিধাতা যেন একটা সরু কাঠির মধ্যে ফুঁ দিয়া তাহার ডগার উপরে একটা বড় বুদ্বুদ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ডাক্তাররাও মাঝে মাঝে আশঙ্কা প্রকাশ করিত ছেলেটি এইরূপ বুদ্বুদের মতই ক্ষণভঙ্গুর ক্ষণস্থায়ী হইবে। অনেক দিন পর্য্যন্ত সে কথা কহিতে এবং চলিতে শেখে নাই। তাহার বিষণ্ণ গম্ভীর মুখ দেখিয়া বোধ হইত, তাহার পিতামাতা তাঁহাদের অধিক বয়সের সমস্ত চিন্তাভার এই ক্ষুদ্র শিশুর মাথার উপরে চাপাইয়া দিয়া গেছেন।

দিদির যত্নে ও সেবায় নীলমণি তাহার বিপদের কাল উত্তীর্ণ হইয়া ছয় বৎসরে পা দিল।

কার্ত্তিক মাসে ভাইফোঁটার দিনে নূতন জামা, চাদর এবং একখানি লালপেড়ে ধুতি পরাইয়া বাবু সাজাইয়া নীলমণিকে শশি ভাইফোঁটা দিতেছেন এমন সময়ে পূর্ব্বোক্ত স্পষ্টভাষিণী প্রতিবেশিনী তারা আসিয়া কথায় কথায় শশির সহিত ঝগড়া বাধাইয়া দিল।

সে কহিল, গোপনে ভাইয়ের সর্ব্বনাশ করিয়া ঘটা করিয়া ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দিবার কোন ফল নাই।

শুনিয়া শশি বিস্ময়ে ক্রোধে বেদনায় বজ্রাহত হইল। অবশেষে শুনিতে পাইল, তাহারা স্বামিস্ত্রীতে পরামর্শ করিয়া নাবালক নীলমণির সম্পত্তি খাজনার দায়ে নিলাম করাইয়া তাহার স্বামীর পিস্তুতো ভাইয়ের নামে বেনামী করিয়া কিনিতেছে।

শুনিয়া শশি অভিশাপ দিল, যাহারা এতবড় মিথ্যা কথা রটনা করিতে পারে তাহাদের মুখে কুষ্ঠ হউক্।

এই বলিয়া সরোদনে স্বামীর নিকট উপস্থিত হইয়া জনশ্রুতির কথা তাহাকে জানাইল।

জয়গোপাল কহিল আজকালকার দিনে কাহাকেও বিশ্বাস করিবার জো নাই। উপেন্ আমার আপন পিস্তুতো ভাই, তাহার উপরে বিষয়ের ভার দিয়া আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ছিলাম —সে কখন্ গোপনে খাজনা বাকি ফেলিয়া মহল হাসিল্পুর নিজে কিনিয়া লইয়াছে আমি জানিতেও পারি নাই।

শশি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, নালিশ করিবে না?

জয়গোপাল কহিল, ভাইয়ের নামে নালিশ করি কি করিয়া? এবং নালিশ করিয়াও ত কোন ফল নাই, কেবল অর্থ নষ্ট।

স্বামীর কথা বিশ্বাস করা শশির পরম কর্ত্তব্য, কিন্তু কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না। তখন এই সুখের সংসার, এই প্রেমের গার্হস্থ্য সহসা তাহার নিকট অত্যন্ত বিকট বীভৎস আকার ধারণ করিয়া দেখা দিল। যে সংসারকে আপনার পরম আশ্রয় বলিয়া মনে হইত—হঠাৎ দেখিল সে একটা নিষ্ঠুর স্বার্থের ফাঁদ—তাহাদের দুটি ভাইবোনকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ধরিয়াছে। সে একা স্ত্রীলোক, অসহায় নীলমণিকে কেমন করিয়া রক্ষা করিবে ভাবিয়া কূল কিনারা পাইল না। যতই চিন্তা করিতে লাগিল, ততই ভয়ে এবং ঘৃণায় বিপন্ন বালক ভ্রাতাটির প্রতি অপরিসীম স্নেহে তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া

উঠিল। তাহার মনে হইতে লাগিল সে যদি উপায় জানিত তবে লাট্সাহেবের নিকট নিবেদন করিয়া, এমন কি, মহারাণীর নিকট পত্র লিখিয়া তাহার ভাইয়ের সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারিত। মহারাণী কখনই নীলমণির বার্ষিক সাত শ আটান্ন টাকার মুনফার হাসিলপুর মহল বিক্রয় হইতে দিতেন না।

এইরূপে শশি যখন একেবারে মহারাণীর নিকট দরবার করিয়া তাহার পিস্তুতো দেবরকে সম্পূর্ণ জব্দ করিয়া দিবার উপায় চিন্তা করিতেছে তখন হঠাৎ নীলমণির জ্বর আসিয়া আক্ষেপসহকারে মূর্চ্ছা হইতে লাগিল।

জয়গোপাল এক গ্রাম্য নেটিভ ডাক্তারকে ডাকিল। শশি ভাল ডাক্তারের জন্য অনুরোধ করাতে জয়গোপাল বলিল, কেন মতিলাল মন্দ ডাক্তার কি!

শশি তখন তাঁহার পায়ে পড়িল, মাথার দিব্য দিল; জয়-গোপাল বলিল, আচ্ছা সহর হইতে ডাক্তার ডাকিতে পাঠাইতেছি।

শশি নীলমণিকে কোলে করিয়া বুকে করিয়া পড়িয়া রহিল। নীলমণিও তাহাকে এক দণ্ড চোখের আড়াল হইতে দেয় না; পাছে ফাঁকি দিয়া পালায় এই ভয়ে তাহাকে জড়াইয়া থাকে; এমন কি, ঘুমাইয়া পড়িলেও আঁচলটি ছাড়ে না।

সমস্ত দিন এমনি ভাবে কাটিলে সন্ধ্যার পর জয়গোপাল আসিয়া বলিল— সহরে ডাক্তার বাবুকে পাওয়া গেল না, তিনি দূরে কোথায় রোগী দেখিতে গিয়াছেন। ইহাও বলিল, মকদ্দমা উপলক্ষে আমাকে আজই অন্যত্র যাইতে হইতেছে; আমি মতি-

শালকে বলিয়া গেলাম সে নিয়মিত আসিয়া রোগী দেখিয়া যাইবে।

রাত্রে নীলমণি ঘুমের ঘোরে প্রলাপ বকিল। প্রাতঃকালেই শশি কিছুমাত্র বিচার না করিয়া রোগী ভ্রাতাকে লইয়া নৌকা চড়িয়া একবারে সহরে গিয়া ডাক্তারের বাড়ি উপস্থিত হইল। ডাক্তার বাড়িতে আছেন—সহর ছাড়িয়া কোথাও যান নাই। ভদ্র স্ত্রীলোক দেখিয়া তিনি তাড়াতাড়ি বাসা ঠিক করিয়া একটি প্রাচীনা বিধবার তত্ত্বাবধানে শশিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিলেন এবং ছেলেটির চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন।

পরদিনই জয়গোপাল আসিয়া উপস্থিত। ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া স্ত্রীকে তৎক্ষণাৎ তাহার সহিত ফিরিতে অনুমতি করিল।

স্ত্রী কহিল, আমাকে যদি কাটিয়া ফেল তবু আমি এখন ফিরিব না। তোমরা আমার নীলমণিকে মারিয়া ফেলিতে চাও, উহার মা নাই বাপ নাই, আমি ছাড়া উহার আর কেহ নাই—আমি উহাকে রক্ষা করিব।

জয়গোপাল রাগিয়া কহিল, তবে এইখানেই থাক, তুমি আর আমার ঘরে ফিরিয়ো না।

শশি তখন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়া কহিল, ঘর তোমার কি! আমার ভাইয়েরই ত ঘর!

জয়গোপাল কহিল—আচ্ছা সে দেখা যাইবে!

পাড়ার লোকে এই ঘটনায় কিছুদিন খুব আন্দোলন করিতে লাগিল। প্রতিবেশিনী তারা কহিল, স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করিতে

হয় ঘরে বসিয়া কর না বাপু। ঘর ছাড়িয়া যাইবার আবশ্যক কি! হাজার হৌক্ স্বামী ত বটে।

সঙ্গে যাহা টাকা ছিল সমস্ত খরচ করিয়া গহনাপত্র বেচিয়া শশি তাহার ভাইকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিল। তখন সে খবর পাইল, দ্বারিগ্রামে তাহাদের যে বড় জোৎ ছিল, যে জোতের উপরে তাহাদের বাড়ি, নানারূপে যাহার আয় প্রায় বার্ষিক দেড় হাজার টাকা হইবে সেই জোৎটি জমিদারের সহিত যোগ করিয়া জয়গোপাল নিজের নামে খারিজ করিয়া লইয়াছে। এখন বিষয়টি সমস্তই তাহাদের—তাহার ভাইয়ের নহে।

ব্যামো হইতে সারিয়া উঠিয়া নীলমণি করুণস্বরে বলিতে লাগিল, দিদি, বাড়ি চল। সেখানে তাহার সঙ্গী ভাগিনেয়দের জন্য তাহার মন কেমন করিতেছে। তাই বারম্বার বলিল, দিদি আমাদের সেই ঘরে চল না, দিদি! শুনিয়া দিদি কাঁদিতে লাগিল। আমাদের ঘর আর কোথায়!

কিন্তু কেবল কাঁদিয়া কোন ফল নাই, তখন পৃথিবীতে দিদি ছাড়া তাহার ভাইয়ের আর কেহ ছিল না। ইহা ভাবিয়া চোখের জল মুছিয়া শশি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ তারিণী বাবুর অন্তঃপুরে গিয়া তাঁহার স্ত্রীকে ধরিল।

ডেপুটি বাবু জয়গোপালকে চিনিতেন। ভদ্রঘরের স্ত্রী ঘরের বাহির হইয়া বিষয় সম্পত্তি লইয়া স্বামীর সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে চাহে ইহাতে শশির প্রতি তিনি বিশেষ বিরক্ত হইলেন। তাহাকে ভুলাইয়া রাখিয়া তৎক্ষণাৎ জয়গোপালকে পত্র লিখি-

লেন। জয়গোপাল শ্যালকসহ তাহার স্ত্রীকে বলপূর্ব্বক নৌকায় তুলিয়া বাড়ি লইয়া গিয়া উপস্থিত করিল।

স্বামী স্ত্রীতে, দ্বিতীয় বিচ্ছেদের পর, পুনশ্চ এই দ্বিতীয় বার মিলন হইল! প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ!

অনেক দিন পরে ঘরে ফিরিয়া পুরাতন সহচরদিগকে পাইয়া নীলমণি বড় আনন্দে খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার সেই নিশ্চিন্ত আনন্দ দেখিয়া অন্তরে অন্তরে শশির হৃদয় বিদীর্ণ হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

শীতকালে ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব মফঃস্বল পর্য্যবেক্ষণে বাহির হইয়া শীকার সন্ধানে গ্রামের মধ্যে তাঁবু ফেলিয়াছেন। গ্রামের পথে সাহেবের সঙ্গে নীলমণির সাক্ষাৎ হয়। অন্য বালকেরা তাঁহাকে দেখিয়া চাণক্য শ্লোকের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক নখী দন্তী শৃঙ্গী প্রভৃতির সহিত সাহেবকেও যোগ করিয়া যথেষ্ট দূরে সরিয়া গেল। কিন্তু সুগম্ভীর প্রকৃতি নীলমণি অটল কৌতুহলের সহিত প্রশান্তভাবে সাহেবকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিল।

সাহেব সকৌতুকে কাছে আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি পাঠশালায় পড়?—

বালক নীরবে মাথা নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কোন পুস্তক পড়িয়া থাক?

নীলমণি পুস্তক শব্দের অর্থ না বুঝিয়া নিস্তব্ধভাবে ম্যাজি-ষ্ট্রেটের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ম্যাজিষ্টর সাহেবের সহিত এই পরিচয়ের কথা নীলমণি অত্যন্ত উৎসাহের সহিত তাহার দিদির নিকট বর্ণনা করিল।

মধ্যাহ্নে চাপকান প্যাণ্ট্লুন পাগ্ড়ি পরিয়া জয়গোপাল ম্যাজিষ্ট্রেট্‌কে সেলাম করিতে গিয়াছে। অর্থী প্রত্যর্থী চাপ্-রাশী কন্‌ষ্টেবলে চারিদিক লোকারণ্য। সাহেব গরমের ভয়ে তাম্বুর বাহিরে খোলা ছায়ায় ক্যাম্পটেবিল পাতিয়া বসিয়াছেন এবং জয়গোপালকে চৌকিতে বসাইয়া তাহাকে স্থানীয় অবস্থা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। জয়গোপাল তাহার গ্রামবাসী সর্ব্ব-সাধারণের সমক্ষে এই গৌরবের আসন অধিকার করিয়া মনে মনে স্ফীত হইতেছিল, এবং মনে করিতেছিল এই সময়ে চক্রবর্ত্তীরা এবং নন্দীরা কেহ আসিয়া দেখিয়া যায় ত বেশ হয়!

এমন সময় নীলমণিকে সঙ্গে করিয়া অবগুণ্ঠনাবৃত একটি স্ত্রীলোক একেবারে ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কহিল, সাহেব, তোমার হাতে আমার এই অনাথ ভাইটিকে সমর্পণ করিলাম, তুমি ইহাকে রক্ষা কর!

সাহেব তাঁহার সেই পূর্ব্বপরিচিত বৃহৎমস্তক গম্ভীরপ্রকৃতি বালকটিকে দেখিয়া এবং স্ত্রীলোকটিকে ভদ্রস্ত্রীলোক বলিয়া অনু-মান করিয়া তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন—কহিলেন, আপনি তাঁবুতে প্রবেশ করুন।

স্ত্রীলোকটি কহিল, আমার যাহা বলিবার আছে আমি এই-খানেই বলিব।

জয়গোপাল বিবর্ণমুখে ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। কৌতূহলী গ্রামের লোকেরা পরম কৌতুক অনুভব করিয়া চারিদিকে ঘেঁষিয়া আসিবার উপক্রম করিল। সাহেব বেত উঁচাইবামাত্র সকলে দৌড় দিল।

তখন শশি তাহার ভ্রাতার হাত ধরিয়া সেই পিতৃমাতৃহীন বালকের সমস্ত ইতিহাস আদ্যোপান্ত বলিয়া গেল। জয়গোপাল মধ্যে মধ্যে বাধা দিবার উপক্রম করাতে ম্যাজিষ্ট্রেট্ রক্তবর্ণ মুখে গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন—চুপ্ রও! এবং বেত্রাগ্র দ্বারা চৌকি ছাড়িয়া সম্মুখে দাঁড়াইতে নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন।

জয়গোপাল মনে মনে শশির প্রতি গর্জ্জন করিতে করিতে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নীলমণি দিদির অত্যন্ত কাছে ঘেঁষিয়া অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিল।

শশির কথা শেষ হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট্ জয়গোপালকে গুটিকতক প্রশ্ন করিলেন এবং তাহার উত্তর শুনিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শশিকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন—বাছা, এ মকর্দ্দমা যদিও আমার কাছে উঠিতে পারে না তথাপি তুমি নিশ্চিন্ত থাক—এ সম্বন্ধে যাহা কর্ত্তব্য আমি করিব। তুমি তোমার ভাইটিকে লইয়া নির্ভয়ে বাড়ি ফিরিয়া যাইতে পার!

শশি কহিল—সাহেব, যতদিন নিজের বাড়ি ও না ফিরিয়া

পায় ততদিন আমার ভাইকে বাড়ি লইয়া যাইতে আমি সাহস করি না। এখন নীলমণিকে তুমি নিজের কাছে না রাখিলে ইহাকে কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না।

সাহেব কহিলেন, তুমি কোথায় যাইবে।

শশি কহিল, আমি আমার স্বামীর ঘরে ফিরিয়া যাইব, আমার কোন ভাবনা নাই।

সাহেব ঈষৎ হাসিয়া অগত্যা এই গলায় মাতুলি পরা কৃশ-কায় শ্যামবর্ণ গম্ভীর প্রশান্ত মৃদুস্বভাব বাঙ্গালীর ছেলেটিকে সঙ্গে লইতে রাজি হইলেন।

তখন শশি বিদায় লইবার সময় বালক তাহার আঁচল চাপিয়া ধরিল। সাহেব কহিলেন, বাবা তোমার কোন ভয় নেই— এস!

ঘোম্‌টার মধ্য হইতে অবিরল অশ্রু মোচন করিতে করিতে শশি কহিল—লক্ষ্মী ভাই, যা ভাই—আবার তোর দিদির সঙ্গে দেখা হবে!

এই বলিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার মাথায় পিঠে হাত বুলাইয়া কোন মতে আপন অঞ্চল ছাড়াইয়া তাড়াতাড়ি সে চলিয়া গেল; অমনি সাহেব নীলমণিকে বাম হস্তের দ্বারা বেষ্টন করিয়া ধরিলেন, সে দিদিগো দিদি করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল;—শশি একবার ফিরিয়া চাহিয়া দূর হইতে প্রসারিত দক্ষিণ হস্তে তাহার প্রতি নীরবে সান্ত্বনা প্রেরণ করিয়া বিদীর্ণ হৃদয়ে চলিয়া গেল।

আবার সেই বহুকালের চিরপরিচিত পুরাতন ঘরে স্বামী স্ত্রীর মিলন হইল। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ!

কিন্তু এ মিলন অধিক দিন স্থায়ী হইল না। কারণ, ইহার অনতিকাল পরেই একদিন প্রাতঃকালে গ্রামবাসিগণ সংবাদ পাইল যে, রাত্রে শশি ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইয়া মরিয়াছে—এবং রাত্রেই তাহার দাহক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেছে।

কেহ এ সম্বন্ধে কোন কথা বলিল না। কেবল সেই প্রতি-বেশিনী তারা মাঝে মাঝে গর্জ্জন করিয়া উঠিতে চাহিত, সকলে চুপ্ চুপ্ করিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দিত।

বিদায়কালে শশি ভাইকে কথা দিয়া গিয়াছিল আবার দেখা হইবে—সে কথা কোন্‌খানে রক্ষা হইয়াছে জানি না।

তারাপ্রসন্নের কীর্ত্তি।

লেখক জাতির প্রকৃতি অনুসারে তারাপ্রসন্ন কিছু লাজুক এবং মুখচোরা ছিলেন। লোকের কাছে বাহির হইতে গেলে তাঁহার সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইত। ঘরে বসিয়া কলম চালাইয়া তাঁহার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ, পিঠ একটু কুঁজা, সংসারের অভিজ্ঞতা অতি অল্প। লৌকিকতার বাঁধি বোল সকল সহজে তাঁহার মুখে আসিত না, এই জন্য গৃহদুর্গের বাহিরে তিনি আপনাকে কিছুতেই নিরাপদ জ্ঞান করিতেন না।

লোকেও তাঁহাকে কি একটা অজ্‌বুগ রকমের মনে করিত এবং লোকেরও দোষ দেওয়া যায় না। মনে কর, প্রথম পরিচয়ে একটি পরম ভদ্রলোক উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে তারাপ্রসন্নকে বলিলেন—"মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হয়ে যে কি পর্য্যন্ত আনন্দলাভ করা গেল তা এক মুখে বল্‌তে পারিনে"—তারাপ্রসন্ন নিরুত্তর হইয়া নিজের দক্ষিণ করতল বিশেষ মনোযোগপূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। হঠাৎ সে নীরবতার অর্থ এইরূপ মনে হয় "তা, তোমার আনন্দ হয়েছে সেটা খুব সম্ভব বটে, কিন্তু আমার যে আনন্দ হয়েছে এমন মিথ্যা কথাটা কি করে মুখে উচ্চারণ ক'রব তাই ভাবচি।"

মধ্যাহ্নভোজে নিমন্ত্রণ করিয়া লক্ষপতি গৃহস্বামী যখন

সায়াহ্নের প্রাক্কালে পরিবেশন করিতে আরম্ভ করেন—এবং মধ্যে মধ্যে বিনীত কাকুতি সহকারে ভোজ্য সামগ্রীর অকিঞ্চিৎ-করত্ব সম্বন্ধে তারাপ্রসন্নকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিতে থাকেন, "এ কিছুই না! অতি যৎসামান্য! দরিদ্রের ক্ষুদ্ কুঁড়া, বিদুরের আয়োজন! মহাশয়কে কেবলি কষ্ট দেওয়া", তারাপ্রসন্ন চুপ করিয়া থাকেন—যেন কথাটা এমনি প্রামাণিক যে তাহার আর উত্তর সম্ভবে না।

মধ্যে মধ্যে এমনও হয় কোন সুশীল ব্যক্তি যখন তারপ্রসন্নকে সংবাদ দেন যে, তাঁহার মত অগাধপাণ্ডিত্য বর্ত্তমান কালে দুর্লভ, এবং সরস্বতী নিজের পদ্মাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক তারাপ্রসন্নের কণ্ঠাগ্রে বাসস্থান গ্রহণ করিয়াছেন, তখন তারাপ্রসন্ন তাহার তিলমাত্র প্রতিবাদ করেন না যেন সত্য সত্যই সরস্বতা তাঁহার কণ্ঠরোধ করিয়া বসিয়া আছেন। তারাপ্রসন্নের এইটে জানা উচিত যে, মুখের সামনে যাহারা প্রশংসা করে এবং পরের কাছে যাহারা আত্মনিন্দায় প্রবৃত্ত হয়, তাহারা অন্যের নিকট হইতে প্রতিবাদ প্রত্যাশা করিয়াই অনেকটা অসঙ্কোচে অত্যুক্তি করিয়া থাকে—অপর পক্ষ আগাগোড়া সমস্ত কথাটা যদি অম্লান-বদনে গ্রহণ করে তবে বক্তা আপনাকে প্রতারিত জ্ঞান করিয়া বিষম ক্ষুব্ধ হয়। এইরূপ স্থলে লোকে নিজের কথা মিথ্যা প্রতিপন্ন হইলে দুঃখিত হয় না।

ঘরের লোকের কাছে তারাপ্রসন্নের ভাব অন্যরূপ; এমন কি তাঁহার নিজের স্ত্রী দাক্ষায়ণীও তাঁহার সহিত কথায় আঁটিয়া

উঠিতে পারেন না। গৃহিণী কথায় কথায় বলেন—"নেও নেও, আমি হার মান্‌লুম! আমার এখন অন্য কাজ আছে।" বাগ্‌যুদ্ধে কে আত্মমুখে পরাজয় স্বীকার করাইতে পারে এমত ক্ষমতা এবং এমন সৌভাগ্য কয়জন স্বামীর আছে?

তারাপ্রসন্নের দিন বেশ কাটিয়া যাইতেছে। দাক্ষায়ণীর দৃঢ় বিশ্বাস, বিদ্যাবুদ্ধি ক্ষমতায় তাঁহার স্বামীর সমতুল্য কেহ নাই এবং সে কথা তিনি প্রকাশ করিয়া বলিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না—শুনিয়া তারাপ্রসন্ন বলিতেন "তোমার একটি বই স্বামী নাই, তুলনা কাহার সহিত করিবে?" শুনিয়া দাক্ষায়ণী ভারি রাগ করিতেন।

দাক্ষায়ণীর কেবল একটা এই মনস্তাপ ছিল যে, তাঁহার স্বামীর অসাধারণ ক্ষমতা বাহিরে প্রকাশ হয় না—স্বামীর সে সম্বন্ধে কিছুমাত্র চেষ্টা নাই। তারাপ্রসন্ন যাহা লিখিতেন তাহা ছাপাইতেন না।

অনুরোধ করিয়া দাক্ষায়ণী মাঝে মাঝে স্বামীর লেখা শুনিতেন—যতই না বুঝিতেন ততই আশ্চর্য্য হইয়া যাইতেন; মনে কর, তিনি কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীদাসের মহাভারত, কবিকঙ্কণ-চণ্ডী পড়িয়াছেন এবং কথকতাও শুনিয়াছেন। সে সমস্তই জলের মত বুঝা যায়—এমন কি নিরক্ষর লোকেও অনায়াসে বুঝিতে পারে, কিন্তু তাঁহার স্বামীর মত এমন সম্পূর্ণ দুর্ব্বোধ হইবার আশ্চর্য্য ক্ষমতা তিনি ইতিপূর্ব্বে কোথাও দেখেন নাই।

তিঁনি মনে মনে কল্পনা করিতেন এই বই যখন ছাপা হইবে এবং কেহ এক অক্ষর বুঝিতে পারিবে না, তখন দেশসুদ্ধ লোক বিস্ময়ে কিরূপ অভিভূত হইয়া যাইবে। সহস্রবার করিয়া স্বামীকে বলিতেন—"এ সব লেখা ছাপাও!"

স্বামী বলিতেন—"বই ছাপান সম্বন্ধে ভগবান্ মনু স্বয়ং বলে গেছেন 'প্রবৃত্তিরেষা ভূতানং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা'।"

তারাপ্রসন্নের চারিটি সন্তান, চারই কন্যা। দাক্ষায়ণী মনে করিতেন সেটা গর্ভধারিণীরই অক্ষমতা। এই জন্য তিনি আপনাকে প্রতিভাসম্পন্ন স্বামীর অত্যন্ত অযোগ্য স্ত্রী মনে করিতেন। যে স্বামী কথায় কথায় এমন সকল দুরূহ গ্রন্থ রচনা করেন, তাঁহার স্ত্রীর গর্ভে কন্যা বই আর সন্তান হয় না, স্ত্রীর পক্ষে এমন অপটুতার পরিচয় আর কি দিব!

প্রথম কন্যাটি যখন পিতার বক্ষের কাছ পর্য্যন্ত বাড়িয়া উঠিল তখন তারাপ্রসন্নের নিশ্চিন্তভাব ঘুচিয়া গেল। তখন তাঁহার স্মরণ হইল একে একে চারিটি কন্যারই বিবাহ দিতে হইবে, এবং সে জন্য বিস্তর অর্থের প্রয়োজন। গৃহিণী অত্যন্ত নিশ্চিন্ত মুখে বলিলেন, "তুমি যদি একবার একটুখানি মন দাও তাহা হইলে ভাবনা কিছুই নাই।"

তারাপ্রসন্ন কিঞ্চিৎ ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "সত্য না কি! আচ্ছা, বল দেখি কি করিতে হইবে।"

দাক্ষায়ণী সংশয়শূন্য নিরুদ্বিগ্নভাবে বলিলেন, "কলিকাতায় চল—তোমার বইগুলা ছাপাও—পাঁচজন লোকে তোমাকে

জামুক—তার পরে দেখ দেখি, টাকা আপনি আসে কি না!”

স্ত্রীর আশ্বাসে তারাপ্রসন্নও ক্রমে আশ্বাস লাভ করিতে লাগিলেন—এবং মনে প্রত্যয় হইল, তিনি ইস্তক নাগাদ্ বসিয়া বসিয়া যতই লিখিয়াছেন তাহাতে পাড়াশুদ্ধ লোকের কন্যাদায় মোচন হইয়া যায়।

এখন, কলিকাতায় যাইবার সময় ভারি গোল পড়িয়া গেল। দাক্ষায়ণী তাঁহার নিরুপায় নিঃসহায় সযত্নপালিত স্বামীটিকে কিছুতেই একলা ছাড়িয়া দিতে পারেন না। তাঁহাকে খাওয়াইয়া পরাইয়া নিত্য নৈমিত্তিক কর্ত্তব্য স্মরণ করাইয়া সংসারের বিবিধ উপদ্রব হইতে কে রক্ষা করিবে?

কিন্তু অনভিজ্ঞ স্বামীও অপরিচিত বিদেশে স্ত্রী কন্যা সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে অত্যন্ত ভীত ও অসম্মত। অবশেষে দাক্ষায়ণী পাড়ার একটি চতুর লোককে স্বামীর নিত্য অভ্যাস সম্বন্ধে সহস্র উপদেশ দিয়া আপনার পদে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। এবং স্বামীকে অনেক মাথার দিব্য ও অনেক মাদুলি তাগায় আচ্ছন্ন করিয়া বিদেশে রওনা করিয়া দিলেন। এবং ঘরে আছাড় খাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

কলিকাতায় আসিয়া তারাপ্রসন্ন তাঁহার চতুর সঙ্গীর সাহায্যে ‘বেদান্ত-প্রভাকর’ প্রকাশ করিলেন। দাক্ষায়ণীর গহনা বন্ধক রাখিয়া যে টাকা ক’টি পাইয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশই খরচ হইয়া গেল।

বিক্রয়ের জন্য বহির দোকানে এবং সমালোচনার জন্য দেশের ছোট বড় সমস্ত সম্পাদকের নিকট বেদান্ত-প্রভাকর পাঠাইয়া দিলেন। ডাকযোগে গৃহিণীকেও একখানা বহি রেজেষ্টারি করিয়া পাঠাইলেন। আশঙ্কা ছিল, পাছে ডাকওয়ালারা পথের মধ্যে হইতে চুরি করিয়া লয়।

গৃহিণী যে দিন ছাপার বইয়ের উপরের পৃষ্ঠায় ছাপার অক্ষরে তাঁহার স্বামীর নাম দেখিলেন, সে দিন পাড়ার সকল মেয়েকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইলেন। যেখানে সকলে আসিয়া বসিবার কথা, সেইখানে বইটা ফেলিয়া রাখিলেন।

সকলে আসিয়া বসিলে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "ওমা, বইটা ওখানে কে ফেলে রেখেছে! অন্নদা বইটা দাওনা, ভাই, তুলে রাখি।" উহাদের মধ্যে অন্নদা পড়িতে জানে। বইটা কুলঙ্গির উপর তুলিয়া রাখিলেন।

মুহূর্ত্ত পরেই একটা জিনিষ পারিতে গিয়া ফেলিয়া দিলেন— তার পরে নিজের বড় মেয়েকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "শশি, বাবার বই পড়তে ইচ্ছে হয়েচে বুঝি? তা নে না মা, পড়না! তাতে লজ্জা কি!" বাবার বহির প্রতি শশির কিছুমাত্র আগ্রহ ছিল না।

কিছুক্ষণ পরেই তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন "ছি মা, বাবার বই অমন করে নষ্ট করতে নেই, তোমার কমলা দিদির হাতে দাও, উনি ঐ আলমারির মাথায় তুলে রাখ্‌বেন।"

বহির যদি কিছুমাত্র চেতনা থাকিত, তাহা হইলে সেই একদিনের উৎপীড়নে বেদান্তের প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ হইত।

একে একে কাগজে সমালোচনা বাহির হইতে লাগিল। গৃহিণী যাহা ঠাহরাইয়াছিলেন, তাহা অনেকটা সত্য হইয়া দাঁড়াইল। গ্রন্থের এক অক্ষর বুঝিতে না পারিয়া দেশশুদ্ধ সমালোচক একেবারে বিহ্বল হইয়া উঠিল। সকলেই এক-বাক্যে কহিল, এমন সারবান্ গ্রন্থ ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই।

যে সকল সমালোচক রেনল্ডসের লণ্ডনরহস্যের বাঙ্গালা অনুবাদ ছাড়া আর কোন বই স্পর্শ করিতে পারে না, তাহারা অত্যন্ত উৎসাহের সহিত লিখিল—দেশের ঝুড়ি ঝুড়ি নাটক নবেলের পরিবর্ত্তে যদি এমন দুই এক খানি গ্রন্থ মধ্যে মধ্যে বাহির হয়, তবে বঙ্গসাহিত্য বাস্তবিকই পাঠ্য হয়।

যে ব্যক্তি পুরুষানুক্রমে বেদান্তের নাম কখনও শুনে নাই সেই কেবল লিখিল—তারাপ্রসন্ন বাবুর সহিত সকল স্থানে আমাদের মতের মিল হয় নাই—স্থানাভাববশতঃ এস্থলে তাহার উল্লেখ করিলাম না। কিন্তু মোটের উপরে গ্রন্থকারের সহিত আমাদের মতের অনেক ঐক্যই লক্ষিত হয়। কথাটা যদি সত্য হইত, তাহা হইলে মোটের উপর গ্রন্থখানি পুড়াইয়া ফেলা উচিত ছিল।

দেশের যেখানে যত লাইব্রেরী ছিল এবং ছিল না তাহার সম্পাদকগণ মুদ্রার পরিবর্ত্তে মুদ্রাঙ্কিত পত্রে তারাপ্রসন্নের গ্রন্থ

ভিক্ষা চাহিয়া পাঠাইলেন। অনেকেই লিখিল—আপনার এই চিন্তাশীল গ্রন্থে দেশের একটি মহৎ অভাব দূর হইয়াছে। চিন্তাশীল গ্রন্থ কাহাকে বলে তারাপ্রসন্ন ঠিক বুঝিতে পারিলেন না, কিন্তু পুলকিতচিত্তে ঘর হইতে মাশুল দিয়া প্রত্যেক লাইব্রেরীতে "বেদান্ত-প্রভাকর" পাঠাইয়া দিলেন।

এইরূপে অজস্র স্তুতিবাক্যে তারাপ্রসন্ন যখন অতিমাত্র উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছেন, এমন সময়ে পত্র পাইলেন দাক্ষায়ণীর পঞ্চম সন্তান সম্ভাবনা অতি নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। তখন রক্ষকটিকে সঙ্গে করিয়া অর্থসংগ্রহের জন্য দোকানে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

সকল দোকানদার একবাক্যে বলিল, একখানি বইও বিক্রয় হয় নাই, কেবল এক জায়গায় শুনিলেন, মফস্বল হইতে কে একজন তাঁহার এক বই চাহিয়া পাঠাইয়াছিল, এবং তাহাকে ভ্যালুপেবেলে পাঠানও হইয়াছিল কিন্তু বই ফেরত আসিয়াছে কেহ গ্রহণ করে নাই। দোকানদারকে তাহার মাশুল দণ্ড দিতে হইয়াছে এই জন্য সে বিষম আক্রোশে গ্রন্থকারের সমস্ত বহি তখনই তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিতে উদ্যত হইল।

গ্রন্থকার বাসায় ফিরিয়া আসিয়া অনেক ভাবিলেন কিন্তু কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। তাঁহার চিন্তাশীল গ্রন্থ সম্বন্ধে যতই চিন্তা করিলেন, ততই অধিকতর উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতে লাগিলেন। অবশেষে যে কয়েকটি টাকা অবশিষ্ট ছিল তাহাই অবলম্বন করিয়া অবিলম্বে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

তারাপ্রসন্ন গৃহিণীর নিকট আসিয়া অত্যন্ত আড়ম্বরের সহিত প্রফুল্লতা প্রকাশ করিলেন। দাক্ষায়ণী শুভসংবাদের জন্য সহাস্য মুখে প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন।

তখন তারাপ্রসন্ন একখানি "গৌড় বার্ত্তাবহ" আনিয়া গৃহিণীর ক্রোড়ে ফেলিয়া দিলেন। পাঠ করিয়া তিনি মনে মনে সম্পাদকের অক্ষয় ধনপুত্র কামনা করিলেন। এবং তাঁহার মুখে মানসিক পুষ্প চন্দন অর্ঘ্য উপহার দিলেন। পাঠ সমাপন করিয়া আবার স্বামীর মুখের দিকে চাহিলেন।

স্বামী তখন "নবপ্রভাত" আনিয়া খুলিয়া দিলেন। পাঠ করিয়া আনন্দবিহ্বলা দাক্ষায়ণী আবার স্বামীর মুখের প্রতি প্রত্যাশাপূর্ণ স্নিগ্ধনেত্র উত্থাপিত করিলেন।

তখন তারাপ্রসন্ন একখণ্ড "যুগান্তর" বাহির করিলেন। তাহার পর? তাহার পর "ভারত-ভাগ্যচক্র।" তাহার পর? তাহার পর "শুভজাগরণ।" তাহার পর "অরুণালোক।" তাহার পর "সংবাদ তরঙ্গভঙ্গ।" তাহার পর "আশা" "আগমনী" "উচ্ছ্বাস" "পুষ্পমঞ্জরী" "সহচরী" "সীতা গেজেঠ" "অহল্যা লাইব্রেরী প্রকাশিকা" "ললিত সমাচার" "কোটাল" "বিশ্ববিচারক" "লাবণ্য-লতিকা।" হাসিতে হাসিতে গৃহিণীর আনন্দাশ্রু পড়িতে লাগিল।

চোখ মুছিয়া আর একবার স্বামীর কীর্ত্তিরশ্মি-সমুজ্জল মুখের দিকে চাহিলেন—স্বামী বলিলেন, "এখনো অনেক কাগজ বাকি আছে।"

দাক্ষায়ণী বলিলেন, "সে বিকালে দেখিব, এখন অন্য খবর কি বল?"

তারাপ্রসন্ন বলিলেন "এবার কলিকাতায় গিয়া শুনিয়া আসিলাম লাট সাহেবের মেম এক খানা বই বাহির করিয়াছে কিন্তু তাহাতে "বেদান্ত প্রভাকরের" কোন উল্লেখ করে নাই।"

দাক্ষায়ণী বলিলেন "আহা ওসব কথা নয়—আর কি আন্‌লে বল না।"

তারাপ্রসন্ন বলিলেন "কতকগুলা চিঠি আছে।"

তখন দাক্ষায়ণী স্পষ্ট করিয়া বলিলেন "টাকা কত আন্‌লে?" তারাপ্রসন্ন বলিলেন, "বিধুভূষণের কাছে পাঁচটাকা হাওলাত করে এনেছি।"

অবশেষে দাক্ষায়ণী যখন সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিলেন, তখন পৃথিবীর সাধুতা সম্বন্ধে তাঁহার সমস্ত বিশ্বাস বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল। নিশ্চয় দোকানদারেরা তাঁহার স্বামীকে ঠকাইয়াছে, এবং বাঙ্গলা দেশের সমস্ত ক্রেতা ষড়যন্ত্র করিয়া দোকানদারদের ঠকাইয়াছে।

অবশেষে সহসা মনে হইল যাহাকে নিজের প্রতিনিধি করিয়া স্বামীর সহিত পাঠাইয়াছিলেন সেই বিধুভূষণ দোকানদারদের সহিত তলে তলে যোগ দিয়াছে—এবং যত বেলা যাইতে লাগিল ততই তিনি পরিষ্কার বুঝিতে পারিলেন—ও পাড়ার বিশ্বম্ভর চাটুয্যে তাঁহার স্বামীর পরম শত্রু, নিশ্চয়ই এ সমস্ত তাঁহারই চক্রান্তে ঘটিয়াছে। তাই বটে, যে দিন তাঁহার স্বামী কলি-

কাতায় যাত্রা করেন, তাহার দুই দিন পরেই বিশ্বম্ভরকে বটতলায় দাঁড়াইয়া কানাই পালের সহিত কথা কহিতে দেখা গিয়াছিল—কিন্তু বিশ্বম্ভর মাঝে মাঝে প্রায়ই কানাই পালের সহিত কথাবার্ত্তা কয় না কি, এইজন্য তখন কিছু মনে হয় নাই - এখন সমস্ত জলের মত বুঝা যাইতেছে।

এদিকে দাক্ষায়ণীর সাংসারিক দুর্ভাবনা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। যখন অর্থসংগ্রহের এই একমাত্র সহজ উপায় নিষ্ফল হইল তখন আপনার কন্যা প্রসবের অপরাধ তাঁহাকে চতুর্গুণ দগ্ধ করিতে লাগিল। বিশ্বম্ভর, বিধুভূষণ, অথবা বাঙ্গলাদেশের অধিবাসীদিগকে এই অপরাধের জন্য দায়িক করিতে পারিলেন না—সমস্তই একলা নিজের স্কন্ধে তুলিয়া লইতে হইল—কেবল যে মেয়েরা জন্মিয়াছে এবং জন্মিবে তাহাদিগকেও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অংশ দিলেন। অহোরাত্রি মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার মনে আর শান্তি রহিল না।

অসন্নপ্রসবকালে দাক্ষায়ণীর শারীরিক অবস্থা এমন হইল যে, সকলের বিশেষ আশঙ্কার কারণ হইয়া দাঁড়াইল। নিরুপায় তারাপ্রসন্ন পাগলের মত হইয়া বিশ্বম্ভরের কাছে গিয়া বলিল—"দাদা, আমার এই খান পঞ্চাশেক বই বাঁধা রাখিয়া যদি কিছু টাকা দাও ত আমি :সহর হইতে ভাল দাই আনাই।"

বিশ্বম্ভর বলিল—"ভাই, সেজন্য ভাবনা নাই, টাকা যাহা লাগে আমি দিব, তুমি বই লইয়া যাও।" এই বলিয়া কানাই

পালের সহিত অনেক বলা কহা করিয়া কিঞ্চিৎ টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিল এবং বিধুভূষণ স্বয়ং গিয়া নিজে হইতে পাথেয় দিয়া কলিকাতা হইতে ধাত্রী আনিল।

দাক্ষায়ণী কি মনে করিয়া স্বামীকে ঘরে ডাকাইয়া আনিলেন এবং মাথার দিব্য দিয়া বলিলেন—যখনি তোমার সেই বেদনার উপক্রম হইবে স্বপ্নলব্ধ ঔষধটা খাইতে ভুলিও না। আর সেই সন্ন্যাসীর মাদুলিটা কখনই খুলিয়া রাখিও না। আর এমন ছোট খাট সহস্র বিষয়ে স্বামীর দুটি হাতে ধরিয়া অঙ্গীকার করাইয়া লইলেন। আর বলিলেন, বিধুভূষণের উপর কিছুই বিশ্বাস নাই, সেই তাঁহার স্বামীর সর্ব্বনাশ করিয়াছে। নতুবা ঔষধি, মাদুলি এবং মাথার দিব্য সমেত তাঁহার সমস্ত স্বামীটিকে তাহার হস্তে দিয়া যাইতেন।

তার পরে মহাদেবের মত তাঁহার বিশ্বাসপ্রবণ ভোলানাথ স্বামীটিকে পৃথিবীর নির্ম্মল কুটিল-বুদ্ধি চক্রান্তকারিদের সম্বন্ধে বারবার সতর্ক করিয়া দিলেন। অবশেষে চুপি চুপি বলিলেন, "দেখ আমার যে মেয়েটি হইবে, সে যদি বাঁচে তাহার নাম রাখিও 'বেদান্ত-প্রভা', তার পরে তাহাকে শুধু প্রভা বলিয়া ডাকিলেই হইবে।

এই বলিয়া স্বামীর পায়ের ধুলা মাথায় লইলেন। মনে মনে কহিলেন "কেবল কন্যা জন্ম দিবার জন্যই স্বামীর ঘরে আসিয়াছিলাম। এবার বোধ হয় সে আপদ ঘুচিল।"

ধাত্রী যখন বলিল—"মা একবার দেখ, মেয়েটি কি সুন্দর

হয়েছে।” মা একবার চাহিয়া নেত্র নিমীলন করিলেন, মৃদুস্বরে বলিলেন “বেদান্ত-প্রভা।” তার পরে ইহসংসারে আর একটি কথা বলিবারও অবসর পাইলেন না।

— ———

দুর্ব্বুদ্ধি।

ভিটা ছাড়িতে হইল। কেমন করিয়া তাহা খোলসা করিয়া বলিব না—আভাস দিব মাত্র।

আমি পাড়াগেঁয়ে নেটিভ ডাক্তার, পুলিসের থানার সম্মুখে আমার বাড়ি। যমরাজের সহিত আমার যে পরিমাণ আনুগত্য ছিল দারোগা বাবুদের সহিত তাহা অপেক্ষা কম ছিল না—সুতরাং নর এবং নারায়ণের দ্বারা মানুষের যত বিবিধ রকমের পীড়া ঘটিতে পারে তাহা আমার সুগোচর ছিল। যেমন মণির দ্বারা বলয়ের এবং বলয় দ্বারা মণির শোভা বৃদ্ধি হয় তেমনি আমার মধ্যস্থতায় দারোগার এবং দারোগার মধ্যস্থতায় আমার উত্তরোত্তর আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটিতেছিল।

এই সকল ঘনিষ্ঠ কারণে হাল নিয়মের কৃতবিদ্য দারোগা ললিত চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে আমার একটু বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। তাঁহার একটি অরক্ষণীয়া আত্মীয়া কন্যার সহিত বিবাহের জন্য মাঝে মাঝে অনুরোধ করিয়া আমাকেও প্রায় তিনি অরক্ষণীয় করিয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু শশি আমার একমাত্র কন্যা, মাতৃহীনা, তাহাকে বিমাতার হাতে সমর্পণ করিতে পারিলাম না। বর্ষে বর্ষে নূতন পঞ্জিকার মতে বিবাহের কত শুভ লগ্নই ব্যর্থ হইল। আমার চথের সম্মুখে কত যোগ্য এবং অযোগ্য পাত্র চতুর্দ্দোলায়

চড়িল, আমি কেবল বরযাত্রীর দলে বাহির বাড়িতে মিষ্টান্ন খাইয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম।

শশির বয়স বারো হইয়া প্রায় তেরোয় পড়ে। কিছু সুবিধামত টাকার যোগাড় করিতে পারিলেই মেয়েটিকে একটি বিশিষ্ট বড় ঘরে বিবাহ দিতে পারিব এমন আশা পাইয়াছি। সেই কর্ম্মটি শেষ করিতে পারিলে অবিলম্বে আর একটি শুভ কর্ম্মের আয়োজনে মনোনিবেশ করিতে পারিব।

সেই অত্যাবশ্যক টাকাটার কথা ধ্যান করিতেছিলাম, এমন সময় তুলসী পাড়ার হরিনাথ মজুমদার আসিয়া আমার পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া পড়িল। কথাটা এই, তাহার বিধবা কন্যা রাত্রে হঠাৎ মারা গিয়াছে; শত্রুপক্ষ গর্ভপাতের অপবাদ দিয়া দারোগার কাছে বেনামা পত্র লিখিয়াছে। এক্ষণে পুলিস তাহার মৃতদেহ লইয়া টানাটানি করিতে উদ্যত।

সদ্য কন্যাশোকের উপর এতবড় অপমানের আঘাত তাহার পক্ষে অসহ্য হইয়াছে। আমি ডাক্তারও বটে, দারোগার বন্ধুও বটে, কোন মতে উদ্ধার করিতে হইবে।

লক্ষ্মী যখন ইচ্ছা করেন তখন এমনি করিয়াই কখনো সদর কখনো খিড়কি দরজা দিয়া অনাহূত আসিয়া উপস্থিত হন। আমি ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম ব্যাপারটা বড় গুরুতর, দুটো একটা কল্পিত উদাহরণ প্রয়োগ করিলাম—কম্পমান বৃদ্ধ হরিনাথ শিশুর মত কাঁদিতে লাগিল।

বিস্তারিত বলা বাহুল্য—কন্যার অন্ত্যেষ্টি সৎকারের সুযোগ করিতে হরিনাথ ফতুর হইয়া গেল।

আমার কন্যা শশি করুণ স্বরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—বাবা, ঐ বুড়ো তোমার পায়ে ধরিয়া কেন অমন করিয়া কাঁদিতে ছিল? আমি তাহাকে ধমক দিয়া বলিলাম—যা, যা, তোর এত খবরে দরকার কি?

এইবার সৎপাত্রে কন্যাদানের পথ সুপ্রশস্ত হইল। বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল। একমাত্র কন্যার বিবাহ, ভোজের আয়োজন প্রচুর করিলাম। বাড়িতে গৃহিণী নাই, প্রতিবেশীরা দয়া করিয়া আমাকে সাহায্য করিতে আসিল। সর্ব্বস্বান্ত কৃতজ্ঞ হরিনাথ দিনরাত্রি খাটিতে লাগিল।

গায়ে হলুদের দিনে রাত তিনটার সময় হঠাৎ শশিকে ওলাউঠায় ধরিল। রোগ উত্তরোত্তর কঠিন হইয়া উঠিতে লাগিল। অনেক চেষ্টার পর নিষ্ফল ঔষধের শিশিগুলা ভূতলে ফেলিয়া ছুটিয়া গিয়া হরিনাথের পা জড়াইয়া ধরিলাম। কহিলাম,—মাপ কর দাদা, এই পাষণ্ডকে মাপ কর। আমার একমাত্র কন্যা, আমার আর কেহ নাই।

হরিনাথ শশব্যস্ত হইয়া কহিল,—ডাক্তার বাবু, করেন কি করেন কি! আপনার কাছে আমি চিরঋণী—আমার পায়ে হাত দিবেন না!

আমি কহিলাম, নিরপরাধে আমি তোমার সর্ব্বনাশ করিয়াছি, সেই পাপে আমার কন্যা মরিতেছে।

এই বলিয়া সর্ব্বলোকের সমক্ষে আমি চীৎকার করিয়া বলিলাম, ওগো আমি এই বৃদ্ধের সর্ব্বনাশ করিয়াছি, আমি তাহার দণ্ড লইতেছি, ভগবান্ আমার শশিকে রক্ষা করুন্!

বলিয়া হরিনাথের চটিজুতা খুলিয়া নিজের মাথায় মারিতে লাগিলাম; বৃদ্ধ ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া আমার হাত হইতে জুতা কাড়িয়া লইল।

পর দিন দশটা বেলায় গায়ে হলুদের হরিদ্রা চিহ্ন লইয়া শশি ইহসংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিল।

তাহার পর দিনেই দারোগা বাবু কহিলেন—ওহে, আর কেন এইবার বিবাহ করিয়া ফেল! দেখা শুনার ত একজন লোক চাই?

মানুষের মর্ম্মান্তিক দুঃখশোকের প্রতি এরূপ নিষ্ঠুর অশ্রদ্ধা সয়তানকেও শোভা পায় না। কিন্তু নানা ঘটনায় দারোগার কাছে এমন মনুষত্বের পরিচয় দিয়াছিলাম যে, কোন কথা বলিবার মুখ ছিল না। দারোগার বন্ধুত্ব সেই দিন যেন আমাকে চাবুক মারিয়া অপমান করিল!

হৃদয় যতই ব্যথিত থাক্ কর্ম্মচক্র চলিতেই থাকে! আগেকার মতই ক্ষুধার আহার, পরিধানের বস্ত্র, এমন কি, চুলার কাষ্ঠ এবং জুতার ফিতা পর্যান্ত পরিপূর্ণ উদ্যমে নিয়মিত সংগ্রহ করিয়া ফিরিতে হয়।

কাজের অবকাশে যখন একলা ঘরে আসিয়া বসিয়া থাকি তখন মাঝে মাঝে কানে সেই করুণকণ্ঠের প্রশ্ন বাজিতে থাকে,

"বাবা ঐ বুড়ো তোমার পায়ে ধরিয়া কেন অমন করিয়া কাঁদিতেছিল?"—দরিদ্র হরিনাথের জীর্ণ ঘর নিজের ব্যয়ে ছাইয়া দিলাম, আমার দুগ্ধবতী গাভীটি তাহাকে দান করিলাম, তাহার বন্দকি জোত জমা মহাজনের হাত হইতে উদ্ধার করিয়া দিলাম।

কিছুদিন সদ্যশোকের দুঃসহ বেদনায় নির্জ্জন সন্ধ্যায় এবং অনিদ্র রাত্রে কেবলি মনে হইত, আমার কোমলহৃদয়া মেয়েটি সংসারলীলা শেষ করিয়াও তাহার বাপের নিষ্ঠুর দুষ্কর্ম্মে পরলোকে কোন মতেই শান্তি পাইতেছে না, সে যেন ব্যথিত হইয়া কেবলি আমাকে প্রশ্ন করিয়া ফিরিতেছে, বাবা, কেন এমন করিলে?

কিছুদিন এমনি হইয়াছিল গরীবের চিকিৎসা করিয়া টাকার জন্য তাগিদ্ করিতে পারিতাম না। কোন ছোট মেয়ের ব্যামো হইলে মনে হইত আমার শশিই যেন পল্লীর সমস্ত রুগ্না বালিকার মধ্যে রোগ ভোগ করিতেছে।

তখন পূরা বর্ষায় পল্লী ভাসিয়া গেছে। ধানের ক্ষেত এবং গৃহের অঙ্গন-পার্শ্ব দিয়া নৌকায় করিয়া ফিরিতে হয়। ভোর রাত্রি হইতে বৃষ্টি সুরু হইয়াছে, এখনো বিরাম নাই।

জমিদারের কাছারি বাড়ি হইতে আমার ডাক পড়িয়াছে। বাবুদের পান্সির মাঝি সামান্য বিলম্বটুকু সহ্য করিতে না পারিয়া উদ্ধত হইয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছে।

ইতিপূর্ব্বে এরূপ দুর্য্যোগে যখন আমাকে বাহির হইতে হইত তখন একটি লোক ছিল যে আমার পুরাতন ছাতাটি খুলিয়া

দেখিত তাহাতে কোথাও ছিদ্র আছে কি না, এবং একটি ব্যগ্র-কণ্ঠ বাদলার হাওয়া ও বৃষ্টির ছাঁট হইতে সযত্নে আত্মরক্ষা করিবার জন্য আমাকে বারম্বার সতর্ক করিয়া দিত। আজ শূন্য নীরব গৃহ হইতে নিজের ছাতা নিজে সন্ধান করিয়া লইয়া বাহির হইবার সময় তাহার সেই স্নেহমুখখানি স্মরণ করিয়া একটুখানি বিলম্ব হইতেছিল। তাহার রুদ্ধ শয়ন ঘরটার দিকে তাকাইয়া ভাবিতেছিলাম, যে লোক পরের দুঃখকে কিছুই মনে করে না, তাহার সুখের জন্য ভগবান ঘরের মধ্যে এত স্নেহের আয়োজন কেন রাখিবেন? এই ভাবিতে ভাবিতে সেই শূন্য ঘরটার দরজার কাছে আসিয়া বুকের মধ্যে হু হু করিতে লাগিল! বাহিরে বড়লোকের ভৃত্যের তর্জ্জন স্বর শুনিয়া তাড়াতাড়ি শোক সম্বরণ করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

নৌকায় উঠিবার সময় দেখি থানার ঘাটে ডোঙ্গা বাঁধা—একজন চাষা কৌপীন পরিয়া বৃষ্টিতে ভিজিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কিরে?" উত্তরে শুনিলাম, গত রাত্রে তাহার কন্যাকে সাপে কাটিয়াছে, থানায় রিপোর্ট করিবার জন্য হতভাগ্য তাহাকে দূর গ্রাম হইতে বাহিয়া আনিয়াছে। দেখিলাম সে তাহার নিজের একমাত্র গাত্রবস্ত্র খুলিয়া মৃত দেহ ঢাকিয়া রাখিয়াছে। জমিদারী কাছারীর অসহিষ্ণু মাঝি নৌকা ছাড়িয়া দিল।

বেলা একটার সময় বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া দেখি তখনো সেই লোকটা বুকের কাছে হাত পা গুটাইয়া বসিয়া বসিয়া ভিজিতেছে

দারোগা বাবুর দর্শন মেলে নাই। আমি তাহাকে আমার রন্ধন অন্নের এক অংশ পাঠাইয়া দিলাম। সে তাহা ছুঁইল না।

তাড়াতাড়ি আহার সারিয়া কাছারির রোগীর তাগিদে পুনর্ব্বার বাহির হইলাম। সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিয়া দেখি তখনো লোকটা একেবারে অভিভূতের মত বসিয়া আছে। কথা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিতে পারে না, মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে। এখন তাহার কাছে, এই নদী, ঐ গ্রাম, ঐ থানা, এই মেঘাচ্ছন্ন আর্দ্র পঙ্কিল পৃথিবীটা স্বপ্নের মত। বারম্বার প্রশ্নের দ্বারা জানিলাম, একবার একজন কন্‌ষ্টেবল্‌ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল ট্যাঁকে কিছু আছে কি না। সে উত্তর করিয়াছিল, সে নিতান্তই গরীব, তাহার কিছু নাই। কনষ্টেবল বলিয়া গেছে, থাক বেটা তবে এখন বসিয়া থাক্‌।

এমন দৃশ্য পূর্ব্বেও অনেক বার দেখিয়াছি কখনো কিছুই মনে হয় নাই। আজ কোন মতেই সহ্য করিতে পারিলাম না। আমার শশির করুণা-গদ্‌গদ অব্যক্ত কণ্ঠ সমস্ত বাদ্‌লার আকাশ জুড়িয়া বাজিয়া উঠিল। ঐ কন্যাহারা বাক্যহীন চাষার অপরিমেয় দুঃখ আমার বুকের পাঁজর গুলাকে যেন ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল।

দারোগা বাবু বেতের মোড়ায় বসিয়া আরামে গুড়গুড়ি টানিতেছিলেন, তাঁহার কন্যাদায়গ্রস্ত আত্মীয় মেসোটি আমার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই সম্প্রতি দেশ হইতে আসিয়াছেন; তিনি মাছুরের উপর বসিয়া গল্প করিতেছিলেন। আমি একদমে

ঝড়ের বেগে সেখানে উপস্থিত হইলাম। চীৎকার করিয়া বলিলাম, আপনারা মানুষ না পিশাচ? বলিয়া আমার সমস্ত দিনের উপার্জ্জনের টাকা ছনাৎ করিয়া তাহার সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া কহিলাম—টাকা চান্ ত এই নিন্, যখন মরিবেন সঙ্গে লইয়া যাইবেন, এখন এই লোকটাকে ছুটি দিন, ও কন্যার সৎকার করিয়া আসুক!

বহু উৎপীড়িতের অশ্রু-সেচনে দারোগার সহিত ডাক্তারের যে প্রণয় বাড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা এই ঝড়ে ভূমিসাৎ হইয়া গেল।

অনতিকাল পরে দারোগার পায়ে ধরিয়াছি, তাঁহার মহদাশয়তার উল্লেখ করিয়া অনেক স্তুতি এবং নিজের বুদ্ধিভ্রংশতা লইয়া অনেক আত্মধিক্কার প্রয়োগ করিয়াছি, কিন্তু শেষটা ভিটা ছাড়িতে হইল।

আপদ।

সন্ধ্যার দিকে ঝড় ক্রমশ প্রবল হইতে লাগিল। বৃষ্টির ঝাপট, বজ্রের শব্দ, এবং বিদ্যুতের ঝিক্‌মিকিতে আকাশে যেন সুরাসুরের যুদ্ধ বাধিয়া গেল। কালো কালো মেঘগুলি মহাপ্রলয়ের জয়পতাকার মত দিগ্বিদিকে উড়িতে আরম্ভ করিল, গঙ্গার এপারে ওপারে বিদ্রোহী ঢেউগুলো কলশব্দে নৃত্য জুড়িয়া দিল, এবং বাগানের বড় বড় গাছগুলো সমস্ত শাখা ঝট্ পট্ করিয়া হা হুতাশ সহকারে দক্ষিণে বামে লুটোপুটি করিতে লাগিল।

তখন চন্দননগরের বাগানবাড়িতে একটি দীপালোকিত রুদ্ধ কক্ষে খাটের সম্মুখবর্ত্তী নীচের বিছানায় বসিয়া স্ত্রীপুরুষে কথা-বার্ত্তা চলিতেছিল।

শরৎ বাবু বলিতেছিলেন, "আর কিছু দিন থাকিলেই তোমার শরীর সম্পূর্ণ সারিয়া উঠিবে, তখন "অমরা দেশে ফিরিতে পারিব।"

কিরণময়ী বলিতেছিলেন, "আমার শরীর সম্পূর্ণ সারিয়া উঠিয়াছে, এখন দেশে ফিরিলে কোন ক্ষতি হইবে না।"

বিবাহিত ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন, কথাটা যত সংক্ষেপে রিপোর্ট্ করিলাম তত সংক্ষেপে শেষ হয় নাই। বিষয়টি বিশেষ দুরূহ নয়, তথাপি বাদ প্রতিবাদ কিছুতেই মীমাংসার দিকে

অগ্রসর হইতেছিল না; কর্ণহীন নৌকার মত ক্রমাগতই ঘুর খাইয়া মরিতেছিল; অবশেষে অশ্রুতরঙ্গে ডুবি হইবার সম্ভাবনা দেখা দিল।

শরৎ কহিলেন, "ডাক্তার বলিতেছে আর কিছুদিন থাকিয়া গেলে ভাল হয়।"

কিরণ কহিলেন, "তোমার ডাক্তার ত সব জানে!"

শরৎ কহিলেন, "জান ত, এই সময়ে দেশে নানাপ্রকার ব্যামোর প্রাদুর্ভাব হয়, অতএব আর মাস দুয়েক কাটাইয়া গেলেই ভাল হয়।"

কিরণ কহিলেন, "এখানে এখন বুঝি কোথাও কাহারো কোন ব্যামো হয় নাই!"

পূর্ব্ব ইতিহাসটা এই। কিরণকে তাহার ঘরের এবং পাড়ার সকলেই ভালবাসে, এমন কি শাশুড়ি পর্য্যন্ত। সেই কিরণের যখন কঠিন পীড়া হইল তখন সকলেই চিন্তিত হইয়া উঠিল—এবং ডাক্তার যখন বায়ুপরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করিল, তখন গৃহ এবং কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া প্রবাসে যাইতে তাহার স্বামী এবং শাশুড়ি কোন আপত্তি করিলেন না। যদিও গ্রামের বিবেচক প্রাজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই, বায়ুপরিবর্ত্তনে আরোগ্যের আশা করা এবং স্ত্রীর জন্য এতটা হুলস্থূল করিয়া তোলা নব্য স্ত্রৈণতার একটা নির্লজ্জ আতিশয্য বলিয়া স্থির করিলেন এবং প্রশ্ন করিলেন, ইতিপূর্ব্বে কি কাহারও স্ত্রীর কঠিন পীড়া হয় নাই, শরৎ যেখানে যাওয়া স্থির করিয়াছেন সেখানে কি মানুষরা অমর, এবং এমন কোন

দেশ আছে কি যেখানে অদৃষ্টের লিপি সফল হয় নাই—তথাপি শরৎ এবং তাঁহার মা সে সকল কথায় কর্ণপাত করিলেন না; তখন গ্রামের সমস্ত সমবেত বিজ্ঞতার অপেক্ষা তাঁহাদের হৃদয়-লক্ষ্মী কিরণের প্রাণটুকু তাঁহাদের নিকট গুরুতর বোধ হইল। প্রিয়ব্যক্তির বিপদে মানুষের এরূপ মোহ ঘটিয়া থাকে।

শরৎ চন্দননগরের বাগানে আসিয়া বাস করিতেছেন, এবং কিরণও রোগমুক্ত হইয়াছেন, কেবল শরীর এখনও সম্পূর্ণ সবল হয় নাই। তাঁহার মুখে চক্ষে একটি সকরুণ কৃশতা অঙ্কিত হইয়া আছে, যাহা দেখিলে হৃৎকম্পসহ মনে উদয় হয়, আহা, বড় রক্ষা পাইয়াছে!

কিন্তু কিরণের স্বভাবটা সঙ্গপ্রিয়, আমোদপ্রিয়। এখানে একলা আর ভাল লাগিতেছে না; তাহার ঘরের কাজ নাই, পাড়ার সঙ্গিনী নাই; কেবল সমস্ত দিন আপনার রুগ্ন শরীরটাকে লইয়া নাড়াচাড়া করিতে মন যায় না। ঘণ্টায় ঘণ্টায় দাগ মাপিয়া ঔষধ খাও, তাপ দাও, পথ্য পালন কর, ইহাতে বিরক্তি ধরিয়া গিয়াছে; আজ ঝড়ের সন্ধ্যাবেলায় রুদ্ধগৃহে স্বামী স্ত্রীতে তাহাই লইয়া আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল।

কিরণ যতক্ষণ উত্তর দিতেছিল ততক্ষণ উভয় পক্ষে সমকক্ষ-ভাবে দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলিতেছিল, কিন্তু অবশেষে কিরণ যখন নিরুত্তর হইয়া বিনা প্রতিবাদে শরতের দিক হইতে ঈষৎ বিমুখ হইয়া ঘাড় বাঁকাইয়া বসিল, তখন দুর্ব্বল নিরুপায় পুরুষটির আর কোন অস্ত্র রহিল না। পরাভব স্বীকার করিবার উপক্রম করিতেছে,

এমন সময়ে বাহির হইতে বেহারা উচ্চৈঃস্বরে কি একটা নিবেদন করিল।

শরৎ উঠিয়া দ্বার খুলিয়া শুনিলেন, নৌকা ডুবি হইয়া একটি ব্রাহ্মণ বালক সাঁতার দিয়া তাঁহাদের বাগানে আসিয়া উঠিয়াছে।

শুনিয়া কিরণের মান অভিমান দূর হইয়া গেল, তৎক্ষণাৎ আলনা হইতে শুষ্ক বস্ত্র বাহির করিয়া দিলেন, এবং শীঘ্র এক বাটি দুধ গরম করিয়া ব্রাহ্মণের ছেলেকে অন্তঃপুরে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

ছেলেটির লম্বা চুল, বড় বড় চোখ, গোঁফের রেখা এখনো উঠে নাই। কিরণ তাহাকে নিজে থাকিয়া ভোজন করাইয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

শুনিলেন সে যাত্রার দলের ছোকরা ; তাহার নাম নীলকান্ত। তাহারা নিকটবর্ত্তী সিংহ বাবুদের বাড়ি যাত্রার জন্য আহূত হইয়াছিল ; ইতিমধ্যে নৌকা ডুবি হইয়া তাহাদের দলের লোকের কি গতি হইল কে জানে ; সে ভাল সাঁতার জানিত, কোন মতে প্রাণরক্ষা করিয়াছে।

ছেলেটি এইখানেই রহিয়া গেল। আর একটু হইলেই সে মারা পড়িত. এই মনে করিয়া তাহার প্রতি কিরণের অত্যন্ত দয়ার উদ্রেক হইল।

শরৎ মনে করিলেন, হইল ভাল, কিরণ একটা নূতন কাজ হাতে পাইলেন, এখন কিছুকাল এইভাবেই কাটিয়া যাইবে। ব্রাহ্মণ বালকের কল্যাণে পুণ্যসঞ্চয়ের প্রত্যাশায়

শাশুড়িও প্রসন্নতা লাভ করিলেন। এবং অধিকারী মহাশয় ও যমরাজের হাত হইতে সহসা এই ধনী পরিবারের হাতে বদ্‌লি হইয়া নীলকান্ত বিশেষ আরাম বোধ করিল।

কিন্তু অনতিবিলম্বে শরৎ এবং তাঁহার মাতার মত পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। তাঁহারা ভাবিলেন, আর আবশ্যক নাই, এখন এই ছেলেটাকে বিদায় করিতে পারিলে আপদ যায়।

নীলকান্ত গোপনে শরতের গুড়গুড়িতে ফড়্ ফড়্ শব্দে তামাক টানিতে আরম্ভ করিল। বৃষ্টির দিনে অম্লানবদনে তাঁহার সখের সিল্কের ছাতাটি মাথায় দিয়া নববন্ধুসঞ্চয়চেষ্টায় পল্লীতে পর্য্যটন করিতে লাগিল। কোথাকার একটা মলিন গ্রাম্য কুক্কুরকে আদর দিয়া এমনি স্পর্দ্ধিত করিয়া তুলিল যে, সে অনাহূত শরতের সুসজ্জিত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নির্ম্মল জাজিমের উপর পদপল্লবচতুষ্টয়ের ধূলিরেখায় আপন শুভাগমন-সংবাদ স্থায়িভাবে মুদ্রিত করিয়া আসিতে লাগিল। নীলকান্তের চতুর্দ্দিকে দেখিতে দেখিতে একটি সুবৃহৎ ভক্তশিশুসম্প্রদায় গঠিত হইয়া উঠিল, এবং সে বৎসর গ্রামের আম্রকাননে কচি আম পাকিয়া উঠিবার অবসর পাইল না।

কিরণ এই ছেলেটিকে বড় বেশি আদর দিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। শরৎ এবং শরতের মা সে বিষয়ে তাঁহাকে অনেক নিষেধ করিতেন, কিন্তু তিনি তাহা মানিতেন না। শরতের পুরাতন জামা মোজা এবং নূতন ধূতি চাদর জুতা পরাইয়া তিনি তাহাকে বাবু সাজাইয়া তুলিলেন। মাঝে মাঝে যখন তখন

তাহাকে ডাকিয়া লইয়া তাঁহার স্নেহ এবং কৌতুক উভয়ই চরিতার্থ হইত। কিরণ সহাস্যমুখে পানের বাটা পাশে রাখিয়া খাটের উপর বসিতেন, দাসী তাঁহার ভিজে এলোচুল চিরিয়া চিরিয়া ঘষিয়া ঘষিয়া শুকাইয়া দিত এবং নীলকান্ত নীচে দাঁড়াইয়া হাত নাড়িয়া নলদময়ন্তীর পালা অভিনয় করিত—এইরূপে দীর্ঘ মধ্যাহ্ন অত্যন্ত শীঘ্র কাটিয়া যাইত। কিরণ শরৎকে তাঁহার সহিত একাসনে দর্শকশ্রেণীভুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু শরৎ অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন এবং শরতের সম্মুখে নীলকান্তের সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি পাইত না। শ্বাশুড়ি এক একদিন ঠাকুর-দেবতার নাম শুনিবার আশায় আকৃষ্ট হইয়া আসিতেন কিন্তু অবিলম্বে তাঁহার চিরাভ্যস্ত মধ্যাহ্নকালীন নিদ্রাবেশ ভক্তিকে অভিভূত এবং তাঁহাকে শয্যাশায়ী করিয়া দিত।

শরতের কাছ হইতে কানমলা চড়টা চাপড়টা নীলকান্তের অদৃষ্টে প্রায়ই জুটিত; কিন্তু তদপেক্ষা কঠিনতর শাসনপ্রণালীতে আজন্ম অভ্যস্ত থাকাতে সেটা তাহার নিকট অপমান বা বেদনা-জনক বোধ হইত না। নীলকান্তের দৃঢ় ধারণা ছিল যে পৃথিবীর জল স্থল বিভাগের ন্যায় মানবজন্মটা আহার এবং প্রহারে বিভক্ত; প্রহারের অংশটাই অধিক।

নীলকান্তের ঠিক কত বয়স নির্ণয় করিয়া বলা কঠিন; যদি চোদ্দ পনেরো হয়, তবে বয়সের অপেক্ষা মুখ অনেক পাকিয়াছে বলিতে হইবে; যদি সতেরো আঠোরো হয়, তবে বয়সের অনুরূপ পাক ধরে নাই। হয় সে অকাল পক্ক, নয় সে অকাল-অপক্ক।

আসল কথা এই, সে অতি অল্প বয়সেই যাত্রার দলে ঢুকিয়া রাধিকা, দময়ন্তী, সীতা এবং বিদ্যার সখী সাজিত। অধিকারীর আবশ্যকমত বিধাতার বরে খানিক দূর পর্য্যন্ত বাড়িয়া তাহার বাড় থামিয়া গেল। তাহাকে সকলে ছোটই দেখিত, আপনাকেও সে ছোটই জ্ঞান করিত, বয়সের উপযুক্ত সন্মান সে কাহারও কাছে পাইত না। এই সকল স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক কারণ প্রভাবে সতেরো বৎসর বয়সের সময় তাহাকে অনতিপক্ক, সতেরোর অপেক্ষা অতিপরিপক্ক চোদ্দর মত দেখাইত। গোঁফের রেখা না উঠাতে এই ভ্রম আরো দৃঢ়মূল হইয়াছিল। তামাকের ধোঁয়া লাগিয়াই হোক বা বয়সানুচিত ভাষা প্রয়োগবশতই হোক, নীলকান্তের ঠোঁটের কাছটা কিছু বেশি পাকা বোধ হইত, কিন্তু তাহার বৃহৎ তারাবিশিষ্ট দুইটি চক্ষের মধ্যে একটা সারল্য এবং তারুণ্য ছিল। অনুমান করি, নীলকান্তের ভিতরটা স্বভাবতঃ কাঁচা, কিন্তু যাত্রার দলের তা' লাগিয়া উপরিভাগে পক্কতার লক্ষণ দেখা দিয়াছে।

শরৎ বাবুর আশ্রয়ে চন্দননগরের বাগানে বাস করিতে করিতে নীলকান্তের উপর স্বভাবের নিয়ম অব্যাহতভাবে আপন কাজ করিতে লাগিল। সে এতদিন যে একটা বয়ঃসন্ধিস্থলে অস্বাভাবিকভাবে দীর্ঘকাল থামিয়া ছিল, এখানে আসিয়া সেটা কখন এক সময় নিঃশব্দে পার হইয়া গেল। তাহার সতেরো আঠারো বৎসরের বয়ঃক্রম বেশ সম্পূর্ণভাবে পরিণত হইয়া উঠিল।

তাহার সে পরিবর্ত্তন বাহির হইতে কাহারও চোখে পড়িল না, কিন্তু তাহার প্রথম লক্ষণ এই, যে, যখন কিরণ নীলকান্তের প্রতি বালকযোগ্য ব্যবহার করিতেন সে মনে মনে লজ্জিত এবং ব্যথিত হইত। একদিন আমোদপ্রিয় কিরণ তাহাকে স্ত্রীবেশে সখী সাজিবার কথা বলিয়াছিলেন, সে কথাটা অকস্মাৎ তাহার বড়ই কষ্টদায়ক লাগিল অথচ তাহার উপযুক্ত কারণ খুঁজিয়া পাইল না। আজকাল তাহাকে যাত্রার অনুকরণ করিতে ডাকিলে সে অদৃশ্য হইয়া যাইত। সে যে একটা লক্ষ্মীছাড়া যাত্রার দলের ছোকরার অপেক্ষা অধিক কিছু নয় এ কথা কিছুতে তাহার মনে লইত না।

এমন কি, সে বাড়ির সরকারের নিকট কিছু কিছু করিয়া লেখাপড়া করিবার সংকল্প করিল। কিন্তু বৌঠাকরুণের স্নেহ-ভাজন বলিয়া নীলকান্তকে সরকার দুই চক্ষে দেখিতে পারিত না—এবং মনের একাগ্রতা রক্ষা করিয়া পড়াশুনো কোন কালে অভ্যাস না থাকাতে অক্ষরগুলো তাহার চোখের সাম্‌নে দিয়া ভাসিয়া যাইত। গঙ্গার ধারে চাঁপাতলায় গাছের গুঁড়িতে ঠেসান দিয়া কোলের উপর বই খুলিয়া সে দীর্ঘকাল বসিয়া থাকিত; জল ছল ছল করিত, নৌকা ভাসিয়া যাইত, শাখার উপরে চঞ্চল অন্যমনস্ক পাখী কিচ্‌মিচ্‌ শব্দে স্বগত উক্তি প্রকাশ করিত, নীলকান্ত বইয়ের পাতায় চক্ষু রাখিয়া কি ভাবিত সেই জানে অথবা সেও জানে না। একটা কথা হইতে কিছুতেই আর একটা কথায় গিয়া পৌঁছিতে পারিত না, অথচ বই

পড়িতেছি মনে করিয়া তাহার ভারি একটা আত্মগৌরব উপস্থিত হইত। সাম্নে দিয়া যখন একটা নৌকা যাইত তখন সে আরও অধিক আড়ম্বরের সহিত বইখানা তুলিয়া লইয়া বিড় বিড় করিয়া পড়ার ভাণ করিত ; দর্শক চলিয়া গেলে সে আর পড়ার উৎসাহ রক্ষা করিতে পারিত না।

পূর্ব্বে সে অভ্যস্ত গানগুলো যন্ত্রের মত যথানিয়মে গাহিয়া যাইত, এখন সেই গানের সুরগুলো তাহার মনে এক অপূর্ব্ব চাঞ্চল্য সঞ্চার করে। গানের কথা অতি যৎসামান্য, তুচ্ছ অনুপ্রাসে পরিপূর্ণ, তাহার অর্থও নীলকান্তের নিকট সম্যক্ বোধগম্য নহে, কিন্তু যখন সে গাহিত—

'ওরে রাজহংস, জন্মি দ্বিজবংশে,
এমন নৃশংস কেন হলি রে,—
বল্ কি জন্যে, এ অরণ্যে,
রাজকন্যার প্রাণসংশয় করিলি রে,—

তখন সে যেন সহসা লোকান্তরে জন্মান্তরে উপনীত হইত— তখন চারিদিকের অভ্যস্ত জগৎটা এবং তাহার তুচ্ছ জীবনটা গানে তর্জ্জমা হইয়া নূতন চেহারা ধারণ করিত। রাজহংস এবং রাজকন্যার কথা হইতে তাহার মনে এক অপরূপ ছবির আভাস জাগিয়া উঠিত, সে আপনাকে কি মনে করিত স্পষ্ট করিয়া বলা যায় না, কিন্তু যাত্রার দলের পিতৃমাতৃহীন ছোকরা বলিয়া ভুলিয়া যাইত। নিতান্ত অকিঞ্চনের ঘরের হতভাগ্য মলিন শিশু যখন সন্ধ্যাশয্যায় শুইয়া, রাজপুত্র, রাজকন্যা এবং সাত রাজার ধন

মাণিকের কথা শোনে, তখন সেই ক্ষীণ দীপালোকিত জীর্ণ গৃহকোণের অন্ধকারে তাহার মনটা সমস্ত দারিদ্র্য ও হীনতার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া এক সর্ব্বসম্ভব রূপকথার রাজ্যে একটা নূতন রূপ, উজ্জ্বল বেশ এবং অপ্রতিহত ক্ষমতা ধারণ করে; সেইরূপ গানের সুরের মধ্যে এই যাত্রার দলের ছেলেটি আপনাকে এবং আপনার জগৎটিকে একটি নবীন আকারে সৃজন করিয়া তুলিত; জলের ধ্বনি, পাতার শব্দ, পাখীর ডাক, এবং যে লক্ষ্মী এই লক্ষ্মীছাড়াকে আশ্রয় দিয়াছেন, তাঁহার সহাস্য স্নেহমুখচ্ছবি, তাঁহার কল্যাণমণ্ডিত বলয়বেষ্টিত বাহু দুইখানি এবং দুর্লভ সুন্দর পুষ্পদল-কোমল রক্তিম চরণযুগল কি এক মায়ামন্ত্রবলে রাগিণীর মধ্যে রূপান্তরিত হইয়া যাইত। আবার এক সময় এই গীতি-মরীচিকা কোথায় অপসারিত হইত, যাত্রার দলের নীলকান্ত ঝাঁক্‌ড়া চুল লইয়া প্রকাশ পাইত, আমবাগানের অধ্যক্ষ প্রতিবেশীর অভিযোগক্রমে শরৎ আসিয়া তাহার গালে ঠাস্ ঠাস্ করিয়া চড় কসাইয়া দিতেন, এবং বালক ভক্তমণ্ডলীর অধিনায়ক হইয়া নীলকান্ত জলে স্থলে এবং তরুশাখাগ্রে নব নব উপদ্রব সৃজন করিতে বাহির হইত।

ইতিমধ্যে শরতের ভাই সতীশ কলিকাতা কলেজের ছুটিতে বাগানে আসিয়া আশ্রয় লইল। কিরণ ভারি খুসি হইলেন, তাঁহার হাতে আর একটি কাজ জুটিল; উপবেশনে আহারে আচ্ছাদনে সমবয়স্ক ঠাকুরপোর প্রতি পরিহাসপাশ বিস্তার করিতে লাগিলেন। কখনও হাতে সিঁদুর মাখিয়া তাহার চোখ টিপিয়া

ধরেন, কথনো তাহার জামার পিঠে বাঁদর লিখিয়া রাখেন, কখনো ঝনাৎ করিয়া বাহির হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া সুললিত উচ্চহাস্যে পলায়ন করেন। সতীশও ছাড়িবার পাত্র নহে; সে তাঁহার :চাবি :চুরি করিয়া, তাঁহার পানের মধ্যে লঙ্কা পূরিয়া, অলক্ষিতে খাটের খুরার সহিত তাঁহার আঁচল বাঁধিয়া প্রতিশোধ তুলিতে থাকে। এইরূপে উভয়ে সমস্ত দিন তর্জ্জন ধাবন হাস্য, এমন কি, মাঝে মাঝে কলহ ক্রন্দন, সাধাসাধি এবং পুনরায় শান্তিস্থাপন চলিতে লাগিল।

নীলকান্তকে কি ভূতে পাইল কে জানে! সে কি উপলক্ষ করিয়া কাহার সহিত বিবাদ করিবে ভাবিয়া পায় না, অথচ তাহার মন তীব্র তিক্তরসে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সে তাহার ভক্ত বালকগুলিকে অন্যায়রূপে কাঁদাইতে লাগিল, তাহার সেই পোষা দিশী কুকুরটাকে অকারণে লাথি মারিয়া কেঁই কেঁই শব্দে নভোমণ্ডল ধ্বনিত করিয়া তুলিল, এমন কি, পথে ভ্রমণের সময় সবেগে ছড়ি মারিয়া আগাছাগুলার শাখাচ্ছেদন করিয়া চলিতে লাগিল।

যাহারা ভাল খাইতে পারে, তাহাদিগকে সম্মুখে বসিয়া খাওয়াইতে কিরণ অত্যন্ত ভালবাসেন। ভাল খাইবার ক্ষমতাটা নালকান্তের ছিল, সুখাদ্য দ্রব্য পুনঃ পুনঃ খাইবার অনুরোধ তাহার নিকট কদাচ ব্যর্থ হইত না। এই জন্য কিরণ প্রায় তাহাকে ডাকিয়া লইয়া নিজে থাকিয়া খাওয়াইতেন, এবং এই ব্রাহ্মণ বালকের তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার দেখিয়া তিনি বিশেষ সুখ

অনুভব করিতেন। সতীশ আসার পরে অনবসরবশতঃ নীলকান্তের আহারস্থলে প্রায় মাঝে মাঝে কিরণকে অনুপস্থিত থাকিতে হইত; পূর্ব্বে এরূপ ঘটনায় তাহার ভোজনের কিছুমাত্র ব্যাঘাত হইত না; সে সর্ব্বশেষে দুধের বাটি ধুইয়া তাহার জলশুদ্ধ খাইয়া তবে উঠিত,—কিন্তু আজকাল কিরণ নিজে ডাকিয়া না খাওয়াইলে তাহার বক্ষ ব্যথিত, তাহার মুখ বিস্বাদ হইয়া উঠিত, না খাইয়া উঠিয়া পড়িত; বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে দাসীকে বলিয়া যাইত, আমার ক্ষুধা নাই। মনে করিত, কিরণ সংবাদ পাইয়া এখনি অনুতপ্তচিত্তে তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইবেন, এবং খাইবার জন্য বারম্বার অনুরোধ করিবেন, সে তথাপি কিছুতেই সে অনুরোধ পালন করিবে না, বলিবে,—আমার ক্ষুধা নাই। কিন্তু কিরণকে কেহ সংবাদও দেয় না, কিরণ তাহাকে ডাকিয়াও পাঠান না; খাবার যাহা থাকে দাসী খাইয়া ফেলে। তখন সে আপন শয়নগৃহের প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া অন্ধকার বিছানার উপর পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া ফাঁপিয়া ফাঁপিয়া মুখের উপর সবলে বালিশ চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিতে থাকে; কিন্তু কি তাহার নালিশ, কাহার উপরে তাহার দাবী, কে তাহাকে সান্ত্বনা করিতে আসিবে! যখন কেহই আসে না, তখন স্নেহময়ী বিশ্বধাত্রী নিদ্রা আসিয়া ধীরে ধীরে কোমল করস্পর্শে এই মাতৃহীন ব্যথিত বালকের অভিমান শান্ত করিয়া দেন।

নীলকান্তের দৃঢ় ধারণা হইল সতীশ কিরণের কাছে তাহার নামে সর্ব্বদাই লাগায়; যে দিন কিরণ কোন কারণে গম্ভীর

হইয়া থাকিতেন সে দিন নীলকান্ত মনে করিত, সতীশের চক্রান্তে কিরণ তাহারই উপর রাগ করিয়া আছেন।

এখন হইতে নীলকান্ত একমনে তীব্র আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সর্ব্বদাই দেবতার নিকট প্রার্থনা করে, আর জন্মে আমি যেন সতীশ হই, এবং সতীশ যেন আমি হয়। সে জানিত ব্রাহ্মণের একান্ত মনের অভিশাপ কখন নিষ্ফল হয় না, এই জন্য সে মনে মনে সতীশকে ব্রহ্মতেজে দগ্ধ করিতে গিয়া নিজে দগ্ধ হইতে থাকিত, এবং উপরের তলা হইতে সতীশ ও তাহার বৌঠাকুরাণীর উচ্ছ্বসিত উচ্চহাস্যমিশ্রিত পরিহাসকলরব শুনিতে পাইত।

নীলকান্ত স্পষ্টতঃ সতীশের কোনরূপ শত্রুতা করিতে সাহস করিত না, কিন্তু সুযোগমত তাহার ছোটখাট অসুবিধা ঘটাইয়া প্রীতিলাভ করিত। ঘাটের সোপানে সাবান রাখিয়া সতীশ যখন গঙ্গায় নামিয়া ডুব দিতে আরম্ভ করিত, তখন নীলকান্ত ফস্ করিয়া আসিয়া সাবান চুরি করিয়া লইত—সতীশ যথাকালে সাবানের সন্ধানে আসিয়া দেখিত, সাবান নাই। একদিন নাহিতে নাহিতে হঠাৎ দেখিল তাহার বিশেষ সখের চিকণের কাজ করা জামাটি গঙ্গার জলে ভাসিয়া যাইতেছে, ভাবিল হাওয়ায় উড়িয়া গেছে, কিন্তু হাওয়াটা কোন্‌দিক্ হইতে বহিল তাহা কেহ জানে না।

একদিন সতীশকে আমোদ দিবার জন্য কিরণ নীলকান্তকে ডাকিয়া তাহাকে যাত্রার গান গাহিতে বলিলেন—নীলকান্ত নিরুত্তর হইয়া রহিল। কিরণ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন

তোর আবার কি হলরে? নীলকান্ত তাহার জবাব দিল না। কিরণ পুনশ্চ বলিলেন, সেই গানটা গা না!—সে আমি ভুলে গেছি বলিয়া নীলকান্ত চলিয়া গেল।

অবশেষে কিরণের দেশে ফিরিবার সময় হইল। সকলেই প্রস্তুত হইতে লাগিল;—সতীশও সঙ্গে যাইবে। কিন্তু নীলকান্তকে কেহ কোন কথাই বলে না। সে সঙ্গে যাইবে কি থাকিবে সে প্রশ্নমাত্র কাহারও মনে উদয় হয় না।

কিরণ নীলকান্তকে সঙ্গে লইবার প্রস্তাব করিলেন। তাহাতে শ্বাশুড়ি স্বামী এবং দেবর সকলেই একবাক্যে আপত্তি করিয়া উঠিলেন, কিরণও তাঁহার সংকল্প ত্যাগ করিলেন। অবশেষে যাত্রার দুই দিন আগে ব্রাহ্মণ বালককে ডাকিয়া কিরণ তাহাকে স্নেহবাক্যে স্বদেশে যাইতে উপদেশ করিলেন।

সে উপরি উপরি কয় দিন অবহেলার পর মিষ্টবাক্য শুনিতে পাইয়া আর থাকিতে পারিল না, একেবারে কাঁদিয়া উঠিল। কিরণেরও চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল;—যাহাকে চিরকাল কাছে রাখা যাইবে না, তাহাকে কিছুদিন আদর দিয়া তাহার মায়া বসিতে দেওয়া ভাল হয় নাই বলিয়া কিরণের মনে বড় অনুতাপ উপস্থিত হইল।

সতীশ কাছে উপস্থিত ছিল, সে অতবড় ছেলের কান্না দেখিয়া ভারি বিরক্ত হইয়া উঠিল—আরে মোলো! কথা নাই বার্ত্তা নাই, একেবারে কাঁদিয়াই অস্থির!—

কিরণ এই কঠোর উক্তির জন্য সতীশকে ভৎ‍সনা করিলেন;

সতীশ কহিল, "তুমি বোঝ না বৌদিদি, তুমি সকলকেই বড় বেশি বিশ্বাস কর; কোথাকার কে তার ঠিক নাই, এখানে আসিয়া দিব্য রাজার হালে আছে। আবার পুনর্মূষিক হইবার আশঙ্কায় আজ মায়া-কান্না জুড়িয়াছে—ও বেশ জানে যে দু ফোঁটা চখের জল ফেলিলেই তুমি গলিয়া যাইবে।"

নীলকান্ত তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল;—কিন্তু তাহার মনটা সতীশের কাল্পনিক মূর্ত্তিকে ছুরি হইয়া কাটিতে লাগিল, ছুঁচ হইয়া বিঁধিতে লাগিল, আগুন হইয়া জ্বালাইতে লাগিল, কিন্তু প্রকৃত সতীশের গায়ে একটি চিহ্নমাত্র বসিল না, কেবল তাহারই মর্ম্মস্থল হইতে রক্তপাত হইতে লাগিল।

কলিকাতা হইতে সতীশ একটা সৌখীন দোয়াতদান কিনিয়া আনিয়াছিল, তাহাতে দুই পাশে দুই ঝিনুকের নৌকার উপর দোয়াত বসান, এবং মাঝে একটা জর্ম্মন্ রৌপ্যের হাঁস উন্মুক্ত চঞ্চুপুটে কলম লইয়া পাখা মেলিয়া বসিয়া আছে, সেটির প্রতি সতীশের অত্যন্ত যত্ন ছিল; প্রায় সে মাঝে মাঝে সিল্কের রুমাল দিয়া অতি সযত্নে সেটি ঝাড়পোঁচ করিত। কিরণ প্রায়ই পরিহাস করিয়া সেই রৌপ্যহংসের চঞ্চু-অগ্রভাগে অঙ্গুলির আঘাত করিয়া বলিতেন, "ওরে রাজহংস, জন্মি দ্বিজবংশে এমন নৃশংস কেন হলি রে"—এবং ইহাই উপলক্ষ করিয়া দেবরে তাঁহাতে হাস্যকৌতুকের বাগ্‌যুদ্ধ চলিত।

স্বদেশযাত্রার আগের দিন সকালবেলায় সে জিনিষটা খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। কিরণ হাসিয়া কহিলেন,

"ঠাকুরপো, তোমার রাজহংস তোমার দময়ন্তীর 'অন্বেষণে উড়িয়াছে।"

কিন্তু সতীশ অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিল! নীলকান্তই যে সেটা চুরি করিয়াছে সে বিষয়ে তাহার সন্দেহ মাত্র রহিল না—গতকল্য সন্ধ্যার সময় তাহাকে সতীশের ঘরের কাছে ঘুর ঘুর করিতে দেখিয়াছে এমন সাক্ষীও পাওয়া গেল।

সতীশের সম্মুখে অপরাধী আনীত হইল। সেখানে কিরণও উপস্থিত ছিলেন। সতীশ একেবারেই তাহাকে বলিয়া উঠিলেন, "তুই আমার দোয়াত চুরি করে' কোথায় রেখেছিস্, এনে দে!"

নীলকান্ত নানা অপরাধে এবং বিনা অপরাধেও শরতের কাছে অনেক মার খাইয়াছে, এবং বরাবর প্রফুল্লচিত্তে তাহা বহন করিয়াছে। কিন্তু কিরণের সম্মুখে যখন তাহার নামে দোয়াৎ চুরির অপবাদ আসিল, তখন তার বড় বড় দুই চোখ আগুনের মত জ্বলিতে লাগিল; তাহার বুকের কাছটা ফুলিয়া কণ্ঠের কাছে ঠেলিয়া উঠিল; সতীশ আর একটা কথা বলিলেই সে তাহার দুই হাতের দশ নখ লইয়া ক্রুদ্ধ বিড়ালশাবকের মত সতীশের উপর গিয়া পড়িত।

তখন কিরণ তাহাকে পাশের ঘরে ডাকিয়া লইয়া মৃদুমিষ্ট স্বরে বলিলেন—"নীলু, যদি সেই দোয়াৎটা নিয়ে থাকিস্, আমাকে আস্তে আস্তে দিয়ে যা, তোকে কেউ কিছু বল্‌বে না!"

নীলকান্তের চোখ ফাটিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল, অবশেষে সে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল।

কিরণ বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "নীলকান্ত কখনই চুরি করে নি।"

শরৎ এবং সতীশ উভয়েই বলিতে লাগিলেন, "নিশ্চয়, নীলকান্ত ছাড়া আর কেহই চুরি করে নি।"

কিরণ সবলে বলিলেন, "কখনই না।"

শরৎ নীলকান্তকে ডাকিয়া সওয়াল করিতে ইচ্ছা করিলেন, কিরণ বলিলেন, "না, উহাকে এই চুরি সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিবে না।"

সতীশ কহিলেন, "উহার ঘর এবং বাক্স খুঁজিয়া দেখা উচিত।"

কিরণ বলিলেন, "তাহা যদি কর, তাহা হইলে তোমার সঙ্গে আমার জন্মশোধ আড়ি হইবে। নির্দ্দোষীর প্রতি কোনরূপ সন্দেহ প্রকাশ করিতে পাইবে না।"

বলিতে বলিতে তাঁহার চোখের পাতা দুই ফোঁটা জলে ভিজিয়া উঠিল। তাহার পর সেই দুটি করুণ চক্ষুর অশ্রুজলের দোহাই মানিয়া নীলকান্তের প্রতি আর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হইল না!

নিরীহ আশ্রিত বালকের প্রতি এইরূপ অত্যাচারে কিরণের মনে অত্যন্ত দয়ার সঞ্চার হইল। তিনি ভাল দুই জোড়া ফরাসডাঙ্গার ধুতি চাদর, দুইটি জামা, এক জোড়া নূতন জুতা এবং একখানি দশ টাকার নোট লইয়া সন্ধ্যাবেলায় নীলকান্তের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, নীলকান্তকে

না বলিয়া সেই স্নেহ-উপহারগুলি আস্তে আস্তে তাহার বাক্সর মধ্যে রাখিয়া আসিবেন। টিনের বাক্সটিও তাঁহার দত্ত।

আঁচল হইতে চাবির গোছা লইয়া নিঃশব্দে সেই বাক্স খুলিলেন। কিন্তু তাঁহার উপহারগুলি ধরাইতে পারিলেন না। বাক্সর মধ্যে লাঠাই, কঞ্চি, কাঁচা আম কাটিবার জন্য ঘষা ঝিনুক, ভাঙ্গা গ্লাসের তলা প্রভৃতি জাতীয় পদার্থ স্তূপাকারে রক্ষিত।

কিরণ ভাবিলেন, বাক্সটি ভাল করিয়া গুছাইয়া তাহার মধ্যে সকল জিনিষ ধরাইতে পারিবেন। সেই উদ্দেশে বাক্সটি খালি করিতে লাগিলেন। প্রথমে লাঠাই, লাঠিম, ছুরি, ছড়ি প্রভৃতি বাহির হইতে লাগিল—তাহার পরে খান কয়েক ময়লা এবং কাচা কাপড় বাহির হইল, তাহার পরে সকলের নীচে হঠাৎ সতীশের সেই বহুযত্নের রাজহংসশোভিত দোয়াতদানটি বাহির হইয়া আসিল।

কিরণ আশ্চর্য্য হইয়া আরক্তিমমুখে অনেকক্ষণ সেটি হাতে করিয়া লইয়া ভাবিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে কখন্ নীলকান্ত পশ্চাৎ হইতে ঘরে প্রবেশ করিল তিনি তাহা জানিতেও পারিলেন না। নীলকান্ত সমস্তই দেখিল, মনে করিল স্বয়ং চোরের মত তাহার চুরি ধরিতে আসিয়াছেন, এবং তাহার চুরিও ধরা পড়িয়াছে। সে যে সামান্য চোরের মত লোভে পড়িয়া চুরি করে নাই, সে যে কেবল প্রতিহিংসাসাধনের

জন্য এ কাজ করিয়াছে, সে যে ঐ জিনিষটা গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিবে বলিয়াই ঠিক করিয়াছিল, কেবল এক মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতাবশতঃ ফেলিয়া না দিয়া নিজের বাক্সের মধ্যে পুরিয়াছে, সে সকল কথা সে কেমন করিয়া বুঝাইবে! সে চোর নয়, সে চোর নয়! তবে সে কি? কেমন করিয়া বলিবে সে কি! সে চুরি করিয়াছে কিন্তু সে চোর নহে; কিরণ যে তাহাকে চোর বলিয়া সন্দেহ করিয়াছেন এ নিষ্ঠুর অন্যায় সে কিছুতেই বুঝাইতে পারিবে না, বহন করিতেও পারিবে না।

কিরণ একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সেই দোয়াতদানটা বাক্সর ভিতরে রাখিলেন। চোরের মত তাহার উপরে ময়লা কাপড় চাপা দিলেন, তাহার উপর বালকের লাঠাই, লাঠি, লাঠিম, ঝিনুক. কাঁচের টুকরা প্রভৃতি সমস্তই রাখিলেন, এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার উপহারগুলি ও দশ টাকার নোটটি সাজাইয়া রাখিলেন।

কিন্তু পরের দিন সেই ব্রাহ্মণ বালকের কোন উদ্দেশ পাওয়া গেল না। গ্রামের লোকেরা বলিল, তাহাকে দেখে নাই; পুলিস বলিল, তাহার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। তখন শরৎ বলিল, এইবার নীলকণ্ঠের বাক্সটা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক্।

কিরণ জেদ্ করিয়া বলিলেন, সে কিছুতেই হইবে না।

বলিয়া বাক্সটি আপন ঘরে আনাইয়া দোয়াৎটি বাহির করিয়া গোপনে গঙ্গার জলে ফেলিয়া আসিলেন।

শরৎ সপরিবারে দেশে চলিয়া গেল; বাগান একদিন শূন্য হইয়া গেল; কেবল নীলকান্তের সেই পোষা গ্রাম্য কুকুরটা আহার ত্যাগ করিয়া নদীর ধারে ধারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া খুঁজিয়া খুঁজিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিল।

সম্পাদক।

আমার স্ত্রী বর্ত্তমানে প্রভা সম্বন্ধে আমার কোন চিন্তা ছিল না। তখন প্রভা অপেক্ষা প্রভার মাতাকে লইয়া কিছু অধিক ব্যস্ত ছিলাম।

তখন কেবল প্রভার খেলাটুকু হাসিটুকু দেখিয়া তাহার আধ আধ কথা শুনিয়া এবং আদরটুকু লইয়াই তৃপ্ত থাকিতাম; যতক্ষণ ভাল লাগিত নাড়াচাড়া করিতাম, কান্না আরম্ভ করিলেই তাহার মার কোলে সমর্পণ করিয়া সত্বর অব্যাহতি লইতাম। তাহাকে যে বহু চিন্তা ও চেষ্টায় মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে, এ কথা আমার মনে আসে নাই।

অবশেষে অকালে আমার স্ত্রীর মৃত্যু হইলে এক দিন মায়ের কোল হইতে খসিয়া মেয়েটি আমার কোলের কাছে আসিয়া পড়িল, তাহাকে বুকে টানিয়া লইলাম।

কিন্তু মাতৃহীনা দুহিতাকে দ্বিগুণ স্নেহে পালন করা আমার কর্ত্তব্য এটা আমি বেশি চিন্তা করিয়াছিলাম, না, পত্নীহীন পিতাকে পরম যত্নে রক্ষা করা তাহার কর্ত্তব্য এইটে সে বেশি অনুভব করিয়াছিল, আমি ঠিক বুঝিতে পারি না; কিন্তু ছয় বৎসর বয়স হইতেই সে গিন্নিপনা আরম্ভ করিয়াছিল। বেশ দেখা গেল, ঐটুকু মেয়ে তাহার বাবার একমাত্র অভিভাবক হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

আমি মনে মনে হাসিয়া তাহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিলাম। দেখিলাম, যতই আমি অকর্ম্মণ্য অসহায় হই ততই তাহার লাগে ভাল ; দেখিলাম, আমি নিজে কাপড়টা ছাতাটা পাড়িয়া লইলে সে এমন ভাব ধারণ করে, যেন তাহার অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হইতেছে। বাবার মত এত বড় পুতুল সে ইতিপূর্ব্বে কখনো পায় নাই, এইজন্য বাবাকে খাওয়াইয়া পরাইয়া বিছানায় শুয়াইয়া সে সমস্ত দিন বড় আনন্দে আছে। কেবল ধারাপাত এবং পদ্য-পাঠ প্রথম ভাগ অধ্যাপনের সময় আমার পিতৃত্বকে কিঞ্চিৎ সচেতন করিয়া তুলিতে হইত।

কিন্তু মাঝে মাঝে ভাবনা হইত মেয়েটিকে সৎপাত্রে বিবাহ দিতে হইলে অনেক অর্থের আবশ্যক—আমার এত টাকা কোথায় ? মেয়েকে ত সাধ্যমত লেখাপড়া শিখাইতেছি কিন্তু একটা পরিপূর্ণ মূর্খের হাতে পড়িলে তাহার কি দশা হইবে ?

উপার্জ্জনে মন দেওয়া গেল। গবর্ণমেণ্ট আফিসে চাকরি করিবার বয়স গেছে, অন্য আপিসে প্রবেশ করিবারও ক্ষমতা নাই। অনেক ভাবিয়া বই লিখিতে লাগিলাম।

বাঁশের নল ফুটা করিলে তাহাতে তেল রাখা যায় না, জল রাখা যায় না, তাহার ধারণশক্তি মূলেই থাকে না ; তাহাতে সংসারের কোন কাজই হয় না, কিন্তু ফুঁ দিলে বিনা খরচে বাঁশি বাজে ভাল। আমি স্থির জানিতাম সংসারের কোন কাজেই যে হতভাগ্যের বুদ্ধি খেলে না, সে নিশ্চয়ই ভাল বই লিখিবে।

সেই সাহসে একখান প্রহসন লিখিলাম, লোকে ভাল বলিল এবং রঙ্গভূমিতে অভিনয় হইয়া গেল।

সহসা যশের আস্বাদ পাইয়া এম্‌নি বিপদ হইল, প্রহসন আর কিছুতেই ছাড়িতে পারি না। সমস্ত দিন ব্যাকুল চিন্তান্বিত মুখে প্রহসন লিখিতে লাগিলাম।

প্রভা আসিয়া আদর করিয়া স্নেহসহাস্যে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, নাইতে যাবে না?"

আমি হুঙ্কার দিয়া উঠিলাম, "এখন যা, এখন যা, এখন বিরক্ত করিস্‌নে!"

বালিকার মুখখানি বোধ করি একটি ফুংকারে নির্ব্বাপিত প্রদীপের মত অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল; কখন্ সে অভিমান-বিস্ফারিত হৃদয়ে নীরবে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, আমি জানিতেও পারি নাই।

দাসীকে তাড়াইয়া দিই, চাকরকে মারিতে যাই, ভিক্ষুক সুর করিয়া ভিক্ষা করিতে আসিলে তাহাকে লাঠি লইয়া তাড়া করি। পথপার্শ্বেই আমার ঘর হওয়াতে যখন কোন নিরীহ পান্থ জানালার বাহির হইতে আমাকে পথ জিজ্ঞাসা করে, আমি তাহাকে জাহান্নম নামক একটা অস্থানে যাইতে অনুরোধ করি। হায়, কেহই বুঝিত না, আমি খুব একটা মজার প্রহসন লিখিতেছি!

কিন্তু যতটা মজা এবং যতটা যশ হইতেছিল সে পরিমাণে টাকা কিছুই হয় নাই। তখন টাকার কথা মনেও ছিল না।

এদিকে প্রভার যোগ্য পাত্রগুলি অন্য ভদ্রলোকদের কন্যাদায় মোচন করিবার জন্য গোকুলে বাড়িতে লাগিল, আমার তাহাতে খেয়াল ছিল না।

পেটের জ্বালা না ধরিলে চৈতন্য হইত না, কিন্তু এমন সময় একটা সুযোগ জুটিয়া গেল। জাহিরগ্রামের এক জমিদার একখানি কাগজ বাহির করিয়া আমাকে তাহার বেতনভোগী সম্পাদক হইবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছেন। কাজটা স্বীকার করিলাম।

দিনকতক এম্‌নি প্রতাপের সহিত লিখিতে লাগিলাম যে, পথে বাহির হইলে লোকে আমাকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইত এবং আপনাকে মধ্যাহ্নতপনের মত দুর্নিরীক্ষ্য বলিয়া বোধ হইত।

জাহিরগ্রামের পার্শ্বে আহিরগ্রাম। দুই গ্রামের জমিদারে ভারি দলাদলি। পূর্ব্বে কথায় কথায় লাঠালাঠি হইত। এখন উভয় পক্ষে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট মুচ্‌লেকা দিয়া লাঠি বন্ধ করিয়াছে এবং কৃষ্ণের জীব আমাকে পূর্ব্ববর্ত্তী খুনী লাঠিয়ালদের স্থানে নিযুক্ত করিয়াছে। সকলেই বলিতেছে আমি পদমর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছি।

আমার লেখার জ্বালায় আহিরগ্রাম আর মাথা তুলিতে পারে না। তাহাদের জাতিকুল পূর্ব্বপুরুষের ইতিহাস সমস্ত আদ্যোপান্ত মসীলিপ্ত করিয়া দিয়াছি।

এই সময়টা ছিলাম ভাল। বেশ মোটাসোটা হইয়া উঠিলাম।

মুখ সর্ব্বদা প্রসন্ন হাস্যময় ছিল। আহিরগ্রামের পিতৃপুরুষদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এক একটা মর্ম্মান্তিক বাক্যশেল ছাড়িতাম; আর সমস্ত জাহিরগ্রাম হাসিতে হাসিতে পাকা ফুটির মত বিদীর্ণ হইয়া যাইত। বড় আনন্দে ছিলাম।

অবশেষে আহিরগ্রামও একখানা কাগজ বাহির করিল। সে কোন কথা ঢাকিয়া বলিত না। এম্‌নি উৎসাহের সহিত অবিমিশ্র প্রচলিত ভাষায় গাল পাড়িত যে, ছাপার অক্ষরগুলা পর্য্যন্ত যেন চক্ষের সমক্ষে চীৎকার করিতে থাকিত। এই জন্য দুই গ্রামের লোকেই তাহার কথা খুব স্পষ্ট বুঝিতে পারিত।

কিন্তু আমি চিরাভ্যাসবশত এম্‌নি মজা করিয়া এত কূট-কৌশল সহকারে বিপক্ষদিগকে আক্রমণ করিতাম যে, শত্রু মিত্র কেহই বুঝিতে পারিত না আমার কথার মর্ম্মটা কি।

তাহার ফল হইল এই, জিৎ হইলেও সকলে মনে করিত আমার হার হইল। দায়ে পড়িয়া সুরুচি সম্বন্ধে একটি উপদেশ লিখিলাম। দেখিলাম ভারি ভুল করিয়াছি; কারণ, যথার্থ ভাল জিনিষকে যেমন বিদ্রূপ করিবার সুবিধা, এমন উপহাস্য বিষয়কে নহে। হনুবংশীয়েরা মনুবংশীয়দের যেমন সহজে বিদ্রূপ করিতে পারে, মনুবংশীয়েরা হনুবংশীয়দিগকে তদ্রূপ করিয়া কখন তেমন কৃতকার্য্য হইতে পারে না। সুতরাং সুরুচিকে তাহারা দন্তোন্মীলন করিয়া দেশছাড়া করিল।

আমার প্রভু আমার প্রতি আর তেমন সমাদর প্রকাশ

করেন না। সভাস্থলেও আমার কোন সম্মান নাই। পথে বাহির হইলে লোকে গায়ে পড়িয়া আলাপ করিতে আসে না। এমন কি, আমাকে দেখিয়া কেহ কেহ হাসিতে আরম্ভ করিয়াছে।

ইতিমধ্যে আমার প্রহসনগুলার কথাও লোকে সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছে। হঠাৎ বোধ হইল, আমি যেন একটা দেশালায়ের কাঠি; মিনিটখানেক জ্বলিয়া একেবারে শেষ পর্য্যন্ত পুড়িয়া গিয়াছি।

মন এমনি নিরুৎসাহ হইয়া গেল মাথা খুঁড়িয়া মরিলে এক লাইন লেখা বাহির হয় না। মনে হইতে লাগিল বাঁচিয়া কোন সুখ নাই।

প্রভা আমাকে এখন ভয় করে। বিনা আহ্বানে সহসা কাছে আসিতে সাহস করে না। সে বুঝিতে পারিয়াছে, মজার কথা লিখিতে পারে এমন বাবার চেয়ে মাটির পুতুল ঢের ভাল সঙ্গী।

একদিন দেখা গেল আমাদের আহিরগ্রামপ্রকাশ জমিদারকে ছাড়িয়া আমাকে লইয়া পড়িয়াছে। গোটাকতক অত্যন্ত কুৎসিত কথা লিখিয়াছে। আমার পরিচিত বন্ধুবান্ধবেরা একে একে সকলেই সেই কাগজখানা লইয়া হাসিতে হাসিতে আমাকে শুনাইয়া গেল। কেহ কেহ বলিল, ইহার বিষয়টা যেমনই হোক, ভাষার বাহাদুরী আছে! অর্থাৎ গালি যে দিয়াছে তাহা ভাষা দেখিলেই পরিষ্কার বুঝা যায়। সমস্ত দিন ধরিয়া বিশ জনের কাছে ঐ এক কথা শুনিলাম।

আমার বাসার সম্মুখে একটু বাগানের মত ছিল। সন্ধ্যা-বেলায় নিতান্ত পীড়িতচিত্তে সেইখানে একাকী বেড়াইতে-ছিলাম। পাখীরা নীড়ে ফিরিয়া আসিয়া যখন কলরব বন্ধ করিয়া স্বচ্ছন্দে সন্ধ্যার শান্তির মধ্যে আত্মসমর্পণ করিল, তখন বেশ বুঝিতে পারিলাম পাখীদের মধ্যে রসিক লেখকের দল নাই, এবং সুরুচি লইয়া তর্ক হয় না।

মনের মধ্যে কেবলি ভাবিতেছি কি উত্তর দেওয়া যায়। ভদ্রতার একটা বিশেষ অসুবিধা এই যে, সকল স্থানের লোকে তাহাকে বুঝিতে পারে না। অভদ্রতার ভাষা অপেক্ষাকৃত পরিচিত, তাই ভাবিতেছিলাম সেই রকম ভাবের একটা মুখের মত জবাব লিখিতে হইবে। কিছুতেই হার মানিতে পারিব না।

এমন সময়ে সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে একটি পরিচিত ক্ষুদ্র কণ্ঠের স্বর শুনিতে পাইলাম, এবং তাহার পরেই আমার করতলে একটি কোমল উষ্ণ স্পর্শ অনুভব করিলাম। এত উদ্বেজিত অন্যমনস্ক ছিলাম যে, সেই মুহূর্ত্তে সেই স্বর ও সেই স্পর্শ জানিয়াও জানিতে পারিলাম না।

কিন্তু এক মুহূর্ত্ত পরেই সেই স্বর ধীরে ধীরে আমার কর্ণে জাগ্রত, সেই সুধাস্পর্শ আমার করতলে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। বালিকা একবার আস্তে আস্তে কাছে আসিয়া মৃদুস্বরে ডাকিয়া-ছিল, "বাবা!" কোন উত্তর না পাইয়া আমার দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া ধরিয়া একবার আপনার কোমল কপোলে বুলাইয়া আবার ধীরে ধীরে গৃহে ফিরিয়া যাইতেছে।

বহুদিন প্রভা আমাকে এমন করিয়া ডাকে নাই এবং স্বেচ্ছাক্রমে আসিয়া আমাকে এতটুকু আদর করে নাই। তাই আজ সেই স্নেহস্পর্শে আমার হৃদয় সহসা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ পরে ঘরে ফিরিয়া গিয়া দেখিলাম প্রভা বিছানায় শুইয়া আছে। শরীর ক্লিষ্টচ্ছবি, নয়ন ঈষৎ নিমিলিত; দিনশেষের ঝরিয়া-পড়া ফুলের মত পড়িয়া আছে।

মাথায় হাত দিয়া দেখি অত্যন্ত উষ্ণ; উত্তপ্ত নিশ্বাস পড়িতেছে; কপালের শিরা দপ্ দপ্ করিতেছে।

বুঝিতে পারিলাম, বালিকা আসন্ন রোগের তাপে কাতর হইয়া পিপাসিত হৃদয়ে একবার পিতার স্নেহ, পিতার আদর লইতে গিয়াছিল, পিতা তখন জাহিরপ্রকাশের জন্য খুব একটা কড়া জবাব কল্পনা করিতেছিল।

পাশে আসিয়া বসিলাম। বালিকা কোন কথা না বলিয়া তাহার দুই জ্বরতপ্ত করতলের মধ্যে আমার হস্ত টানিয়া লইয়া তাহার উপরে কপোল রাখিয়া চুপ করিয়া শুইয়া রহিল।

জাহিরগ্রাম এবং আহিরগ্রামের যত কাগজ ছিল সমস্ত পুড়াইয়া ফেলিলাম। কোন জবাব লেখা হইল না। হার মানিয়া এত সুখ কখনো হয় নাই।

বালিকার যখন মাতা মরিয়াছিল তখন তাহাকে কোলে টানিয়া লইয়াছিলাম, আজ তাহার বিমাতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিয়া আবার তাহাকে বুকে তুলিয়া লইয়া ঘরে চলিয়া গেলাম।

নিশীথে।

"ডাক্তার! ডাক্তার!"

জ্বালাতন করিল! এই অর্দ্ধেক রাত্রে—

চোখ মেলিয়া দেখি আমাদের জমিদার দক্ষিণাচরণ বাবু। ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া পিঠভাঙ্গা চৌকিটা টানিয়া আনিয়া তাঁহাকে বসিতে দিলাম এবং উদ্বিগ্নভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম। ঘড়িতে দেখি তখন রাত্রি আড়াইটা।

দক্ষিণাচরণ বাবু বিবর্ণমুখে বিস্ফারিত নেত্রে কহিলেন, "আজ রাত্রে আবার সেইরূপ উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে,—তোমার ঔষধ কোন কাজে লাগিল না।"

আমি কিঞ্চিৎ সসঙ্কোচে বলিলাম, "আপনি বোধ করি মদের মাত্রা আবার বাড়াইয়াছেন।"

দক্ষিণা বাবু অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কহিলেন,—"ওটা তোমার ভারি ভ্রম। মদ নহে; আদ্যোপান্ত বিবরণ না শুনিলে তুমি আসল কারণটা অনুমান করিতে পারিবে না।"

কুলুঙ্গির মধ্যে ক্ষুদ্র টিনের ডিবায় ম্লানভাবে কেরোসিন্ জ্বলিতেছিল, আমি তাহা উস্কাইয়া দিলাম; একটুখানি আলো জাগিয়া উঠিল এবং অনেকখানি ধোঁয়া বাহির হইতে লাগিল। কোঁচাখানা গায়ের উপর টানিয়া একখানা খবরের

কাগজ-পাতা প্যাক্ বাক্সের উপর বসিলাম। দক্ষিণা বাবু বলিতে লাগিলেন।—

"আমার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর মত এমন গৃহিণী অতি দুর্লভ ছিল। কিন্তু আমার তখন বয়স বেশি ছিল না; সহজেই রসাধিক্য ছিল, তাহার উপর আবার কাব্যশাস্ত্রটা ভাল করিয়া অধ্যয়ন করিয়াছিলাম, তাই অবিমিশ্র গৃহিণীপণায় মন উঠিত না। কালিদাসের সেই শ্লোকটা প্রায় মনে উদয় হইত,—

গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ
প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।

কিন্তু আমার গৃহিণীর কাছে ললিত কলাবিধির কোন উপদেশ খাটিত না এবং সখীভাবে প্রণয়সম্ভাষণ করিতে গেলে তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। গঙ্গার স্রোতে যেমন ইন্দ্রের ঐরাবত নাকাল হইয়াছিল, তেমনি তাঁহার হাসির মুখে বড় বড় কাব্যের টুকরা এবং ভাল ভাল আদরের সম্ভাষণ মুহূর্ত্তের মধ্যে অপদস্থ হইয়া ভাসিয়া যাইত। তাঁহার হাসিবার আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল।

তাহার পর, আজ বছর চারেক হইল আমাকে সাংঘাতিক রোগে ধরিল। ওষ্ঠব্রণ হইয়া জ্বরবিকার হইয়া মরিবার দাখিল হইলাম। বাঁচিবার আশা ছিল না। একদিন এমন হইল যে, ডাক্তারে জবাব দিয়া গেল। এমন সময় আমার এক আত্মীয় কোথা হইতে এক ব্রহ্মচারী আনিয়া উপস্থিত করিল;—সে গব্য ঘৃতের সহিত একটা শিকড় বাটিয়া আমাকে খাওয়াইয়া

দিল। ঔষধের গুণেই হউক বা অদৃষ্টক্রমেই হউক সে যাত্রা বাঁচিয়া গেলাম।

রোগের সময় আমার স্ত্রী অহর্নিশি এক মুহূর্ত্তের জন্য বিশ্রাম করেন নাই। সেই ক'টা দিন একটি অবলা স্ত্রীলোক, মানুষের সামান্য শক্তি লইয়া, প্রাণপণ ব্যাকুলতার সহিত, দ্বারে সমাগত যমদূতগুলার সঙ্গে অনবরত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার সমস্ত প্রেম, সমস্ত হৃদয়, সমস্ত যত্ন দিয়া আমার এই অযোগ্য প্রাণটাকে যেন বক্ষের শিশুর মত দুই হস্তে ঝাঁপিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছিলেন। আহার ছিল না, নিদ্রা ছিল না, জগতের আর কোন কিছুর প্রতিই দৃষ্টি ছিল না।

যম তখন পরাহত ব্যাঘ্রের ন্যায় আমাকে তাঁহার কবল হইতে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু যাইবার সময় আমার স্ত্রীকে একটা প্রবল থাবা মারিয়া গেলেন।

আমার স্ত্রী তখন গর্ভবতী ছিলেন, অনতিকাল পরে এক মৃত সন্তান প্রসব করিলেন। তাহার পর হইতেই তাঁহার নানা-প্রকার জটিল ব্যামোর সূত্রপাত হইল। তখন আমি তাঁহার সেবা আরম্ভ করিয়া দিলাম। তাহাতে তিনি বিব্রত হইয়া উঠিলেন। বলিতে লাগিলেন—আঃ, কর কি! লোকে বলিবে কি! অমন করিয়া দিন রাত্রি তুমি আমার ঘরে যাতায়াত করিয়ো না!

যেন নিজে পাখা খাইতেছি এইরূপ ভাণ করিয়া রাত্রে যদি তাঁহাকে তাঁহার জ্বরের সময় পাখা করিতে যাইতামত ভারি একটা কাড়াকাড়ি ব্যাপার পড়িয়া যাইত; কোন দিন যদি

তাঁহার শুশ্রূষা উপলক্ষে আমার আহারের নিয়মিত সময় দশ মিনিট উত্তীর্ণ হইয়া যাইত তবে সেও নানাপ্রকার অনুনয় অনুরোধ অনুযোগের কারণ হইয়া দাঁড়াইত। স্বল্পমাত্র সেবা করিতে গেলে হিতে বিপরীত হইয়া উঠিত। তিনি বলিতেন, পুরুষ মানুষের অতটা বাড়াবাড়ি ভাল নয়।

আমাদের সেই বরানগরের বাড়িটি বোধ করি তুমি দেখিয়াছ। বাড়ির সাম্‌নেই বাগান, এবং বাগানের সম্মুখেই গঙ্গা বহিতেছে। আমাদের শোবার ঘরের নীচেই দক্ষিণের দিকে খানিকটা জমি মেহেদির বেড়া দিয়া ঘিরিয়া আমার স্ত্রী নিজের মনের মত একটুক্‌রা বাগান বানাইয়াছিলেন। সমস্ত বাগানটির মধ্যে সেই খণ্ডটিই অত্যন্ত সাদাসিধা এবং নিতান্ত দিশী। অর্থাৎ তাহার মধ্যে গন্ধের অপেক্ষা বর্ণের বাহার, ফুলের অপেক্ষা পাতার বৈচিত্র্য ছিল না—এবং টবের মধ্যে অকিঞ্চিৎকর উদ্ভিজ্জের পার্শ্বে কাঠি অবলম্বন করিয়া কাগজে নির্ম্মিত লাটিন নামের জয়ধ্বজা উড়িত না। বেল, জুঁই, গোলাপ, গন্ধরাজ, করবী এবং রজনীগন্ধারই প্রাদুর্ভাব কিছু বেশি। প্রকাণ্ড একটা বকুল গাছের তলা সাদা মার্ব্বল পাথর দিয়া বাঁধানো ছিল। সুস্থ অবস্থায় তিনি নিজে দাঁড়াইয়া দুইবেলা তাহা ধুইয়া সাফ করাইয়া রাখিতেন। গ্রীষ্মকালে কাজের অবকাশে সন্ধ্যার সময় সেই তাঁহার বসিবার স্থান ছিল। সেখান হইতে গঙ্গা দেখা যাইত কিন্তু গঙ্গা হইতে কুঠির পান্সীর বাবুরা তাঁহাকে দেখিতে পাইত না।

অনেক দিন শয্যাগত থাকিয়া একদিন চৈত্রের শুক্লপক্ষ সন্ধ্যায় তিনি কহিলেন, ঘরে বদ্ধ থাকিয়া আমার প্রাণ কেমন করিতেছে; আজ একবার আমার সেই বাগানে গিয়া বসিব।

আমি তাঁহাকে বহু যত্নে ধরিয়া ধীরে ধীরে সেই বকুলতলের প্রস্তর-বেদিকায় লইয়া গিয়া শয়ন করাইয়া দিলাম। আমারই জানুর উপরে তাঁহার মাথাটি তুলিয়া রাখিতে পারিতাম কিন্তু জানি সেটাকে তিনি অদ্ভুত আচরণ বলিয়া গণ্য করিবেন, তাই একটি বালিশ আনিয়া তাঁহার মাথার তলায় রাখিলাম।

দুটি একটি করিয়া প্রস্ফুট বকুল ফুল ঝরিতে লাগিল এবং শাখান্তরাল হইতে ছায়াঙ্কিত জ্যোৎস্না তাঁহার শীর্ণ মুখের উপর আসিয়া পড়িল। চারিদিক শান্ত নিস্তব্ধ; সেই ঘনগন্ধ পূর্ণ ছায়ান্ধকারে একপার্শ্বে নীরবে বসিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আমার চোখে জল আসিল।

আমি ধীরে ধীরে কাছের গোড়ায় আসিয়া দুই হস্তে তাঁহার একটি উত্তপ্ত শীর্ণ হাত তুলিয়া লইলাম। তিনি তাহাতে কোন আপত্তি করিলেন না। কিছুক্ষণ এইরূপ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া আমার হৃদয় কেমন উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, আমি বলিয়া উঠিলাম—তোমার ভালবাসা আমি কোন কালে ভুলিব না!

তখনি বুঝিলাম, কথাটা বলিবার কোন আবশ্যক ছিল না। আমার স্ত্রী হাসিয়া উঠিলেন। সে হাসিতে লজ্জা ছিল, সুখ ছিল এবং কিঞ্চিৎ অবিশ্বাস ছিল—এবং উহার মধ্যে অনেকটা পরিমাণে পরিহাসের তীব্রতাও ছিল। প্রতিবাদস্বরূপে একটি

কথামাত্র না বলিয়া কেবল তাঁহার সেই হাসির দ্বারা জানাইলেন, কোন কালে ভুলিবে না, ইহা কখনও সম্ভব নহে, এবং আমি প্রত্যাশাও করি না।

এই সুমিষ্ট সুতীক্ষ্ণ হাসির ভয়েই আমি কখন আমার স্ত্রীর সঙ্গে রীতিমত প্রেমালাপ করিতে সাহস করি নাই। অসাক্ষাতে যে সকল কথা মনে উদয় হইত, তাঁহার সম্মুখে গেলেই সে গুলাকে নিতান্ত বাজে কথা বলিয়া বোধ হইত। ছাপার অক্ষরে যে সব কথা পড়িলে দুই চক্ষু বাহিয়া দর দর ধারায় জল পড়িতে থাকে সেইগুলা মুখে বলিতে গেলে কেন যে হাস্যের উদ্রেক করে এ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিলাম না।

বাদ প্রতিবাদ কথায় চলে, কিন্তু হাসির উপরে তর্ক চলে না, কাজেই চুপ করিয়া যাইতে হইল। জ্যোৎস্না উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল, একটা কোকিল ক্রমাগতই কুহু কুহু ডাকিয়া অস্থির হইয়া গেল। আমি বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম এমন জ্যোৎস্না রাত্রেও কি পিকবধূ বধির হইয়া আছে ?

বহু চিকিৎসায় আমার স্ত্রীর রোগ-উপশমের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। ডাক্তার বলিল, একবার বায়ু পরিবর্ত্তন করিয়া দেখিলে ভাল হয়। আমি স্ত্রীকে লইয়া এলাহাবাদে গেলাম।”

এইখানে দক্ষিণাবাবু হঠাৎ থমকিয়া চুপ করিলেন। সন্দিগ্ধভাবে আমার মুখের দিকে চাহিলেন, তাহার পর দুই হাতের মধ্যে মাথা রাখিয়া ভাবিতে লাগিলেন। আমিও চুপ করিয়া রহিলাম। কুলুঙ্গিতে কেরোসিন্ মিট্‌মিট্ করিয়া জ্বলিতে

লাগিল এবং নিস্তব্ধ ঘরে মশার ভন্‌ভন্‌ শব্দ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। হঠাৎ মৌন ভঙ্গ করিয়া দক্ষিণাবাবু বলিতে আরম্ভ করিলেন—

"সেখানে হারাণ ডাক্তার আমার স্ত্রীকে চিকিৎসা করিতে লাগিলেন।

অবশেষে অনেক কাল একভাবে কাটাইয়া ডাক্তারও বলিলেন, আমিও বুঝিলাম এবং আমার স্ত্রীও বুঝিলেন যে, তাঁহার ব্যামো সারিবার নহে। তাঁহাকে চিররুগ্ন হইয়াই কাটাইতে হইবে।

তখন একদিন আমার স্ত্রী আমাকে বলিলেন,—যখন ব্যামোও সারিবে না এবং শীঘ্র আমার মরিবার আশাও নাই, তখন আর কতদিন এই জীবন্মৃতকে লইয়া কাটাইবে? তুমি আর একটা বিবাহ কর।

এটা যেন কেবল একটা সুযুক্তি এবং সদ্বিবেচনার কথা—ইহার মধ্যে যে, ভারি একটা মহত্ত্ব বীরত্ব বা অসামান্য কিছু আছে, এমন ভাব তাঁহার লেশমাত্র ছিল না।

এইবার আমার হাসিবার পালা ছিল। কিন্তু আমার কি তেমন করিয়া হাসিবার ক্ষমতা আছে? আমি উপন্যাসের প্রধান নায়কের ন্যায় গম্ভীর সমুচ্চভাবে বলিতে লাগিলাম—যতদিন এই দেহে জীবন আছে—

তিনি বাধা দিয়া কহিলেন—নাও! নাও! আর বলিতে হইবে না! তোমার কথা শুনিয়া আমি আর বাঁচি না!

আমি পরাজয় স্বীকার না করিয়া বলিলাম—এ জীবনে আর কাহাকেও ভালবাসিতে পারিব না।

শুনিয়া আমার স্ত্রী ভারি হাসিয়া উঠিলেন। তখন আমাকে ক্ষান্ত হইতে হইল।

জানিনা, তখন নিজের কাছেও কখনও স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছি কি না, কিন্তু এখন বুঝিতে পারিতেছি এই আরোগ্য-আশাহীন সেবাকার্য্যে আমি মনে মনে পরিশ্রান্ত হইয়া গিয়াছিলাম। এ কার্য্যে যে ভঙ্গ দিব, এমন কল্পনাও আমার মনে ছিল না; অথচ চিরজীবন এই চিররুগ্নকে লইয়া যাপন করিতে হইবে এ কল্পনাও আমার নিকট পীড়াজনক হইয়াছিল। হায়! প্রথম যৌবনকালে যখন সম্মুখে তাকাইয়াছিলাম তখন প্রেমের কুহকে, সুখের আশ্বাসে, সৌন্দর্য্যের মরীচিকায় সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবন প্রফুল্ল দেখাইতেছিল। আজ হইতে শেষ পর্য্যন্ত কেবলই আশাহীন সুদীর্ঘ সতৃষ্ণ মরুভূমি।

আমার সেবার মধ্যে সেই আন্তরিক শ্রান্তি নিশ্চয় তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন! তখন জানিতাম না কিন্তু এখন সন্দেহমাত্র নাই যে, তিনি আমাকে যুক্তঅক্ষরহীন প্রথমভাগ শিশুশিক্ষার মত অতি সহজে বুঝিতেন। সেই জন্য, যখন উপন্যাসের নায়ক সাজিয়া গম্ভীরভাবে তাঁহার নিকট কবিত্ব ফলাইতে যাইতাম তিনি এমন সুগভীর স্নেহ অথচ অনিবার্য্য কৌতুকের সহিত হাসিয়া উঠিতেন। আমার নিজের অগোচর অন্তরের কথাও অন্তর্য্যামীর ন্যায় তিনি সমস্তই জানিতেন, এ কথা মনে করিলে আজও লজ্জায় মরিয়া যাইতে ইচ্ছা করে।

হারাণ ডাক্তার আমাদের স্বজাতীয়। তাঁহার বাড়িতে

আমার প্রায়ই নিমন্ত্রণ থাকিত। কিছুদিন যাতায়াতের পর ডাক্তার তাঁহার মেয়েটির সঙ্গে আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন। মেয়েটি অবিবাহিত—তাহার বয়স পনেরো হইবে। ডাক্তার বলেন তিনি মনের মত পাত্র পান নাই বলিয়া বিবাহ দেন নাই। কিন্তু বাহিরের লোকের কাছে গুজব শুনিতাম মেয়েটির কুলের দোষ ছিল।

কিন্তু আর কোন দোষ ছিল না। যেমন সুরূপ তেমনি সুশিক্ষা। সেই জন্য মাঝে মাঝে এক এক দিন তাঁহার সহিত নানা কথার আলোচনা করিতে করিতে আমার বাড়ি ফিরিতে রাত হইত, আমার স্ত্রীকে ঔষধ খাওয়াইবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইত। তিনি জানিতেন, আমি হারাণ ডাক্তারের বাড়ি গিয়াছি কিন্তু বিলম্বের কারণ একদিনও আমাকে জিজ্ঞাসাও করেন নাই।

মরুভূমির মধ্যে আর একবার মরীচিকা দেখিতে লাগিলাম। তৃষ্ণা যখন বুক পর্য্যন্ত, তখন সামনে কুলপরিপূর্ণ স্বচ্ছ জল ছল-ছল ঢলঢল করিতে লাগিল। তখন মনকে প্রাণপণে টানিয়া আর ফিরাইতে পারিলাম না।

রোগীর ঘর আমার কাছে দ্বিগুণ নিরানন্দ হইয়া উঠিল। এখন প্রায়ই শুশ্রূষা করিবার এবং ঔষধ খাওয়াইবার নিয়ম ভঙ্গ হইতে লাগিল।

হারাণ ডাক্তার আমাকে প্রায় মাঝে মাঝে বলিতেন, যাহাদের রোগ আরোগ্য হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, তাহাদের পক্ষে মৃত্যুই ভাল। কারণ, বাঁচিয়া তাহাদের নিজেরও সুখ

নাই, অন্যেরও অসুখ। কথাটা সাধারণভাবে বলিতে দোষ নাই, তথাপি আমার স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া এমন প্রসঙ্গ উত্থাপন করা উচিত হয় নাই। কিন্তু মানুষের জীবনমৃত্যু সম্বন্ধে ডাক্তারদের মন এমন অসার যে, তাহারা ঠিক আমাদের মনের অবস্থা বুঝিতে পারে না।

হঠাৎ একদিন পাশের ঘর হইতে শুনিতে পাইলাম, আমার স্ত্রী হারাণ বাবুকে বলিতেছেন,—ডাক্তার, কতকগুলা মিথ্যা ওষুধ গিলাইয়া ডাক্তারখানার দেনা বাড়াইতেছ কেন? আমার প্রাণটাই যখন একটা ব্যামো, তখন এমন একটা ওষুধ দাও যাহাতে শীঘ্র এই প্রাণটা যায়।

ডাক্তার বলিলেন, ছি, এমন কথা বলিবেন না।

কথাটা শুনিয়া হঠাৎ আমার বক্ষে বড় আঘাত লাগিল। ডাক্তার চলিয়া গেলে আমার স্ত্রীর ঘরে গিয়া তাঁহার শয্যাপ্রান্তে বসিলাম, তাঁহার কপালে ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলাম। তিনি কহিলেন, এ ঘর বড় গরম তুমি বাহিরে যাও। তোমার বেড়াইতে যাইবার সময় হইয়াছে। খানিকটা না বেড়াইয়া আসিলে রাত্রে ক্ষুধা হইবে না।

বেড়াইতে যাওয়ার অর্থ ডাক্তারের বাড়ি যাওয়া। আমিই তাঁহাকে বুঝাইয়াছিলাম, ক্ষুধাসঞ্চারের পক্ষে খানিকটা বেড়াইয়া আসা বিশেষ আবশ্যক। এখন নিশ্চয় বলিতে পারি, তিনি প্রতিদিনই আমার এই ছলনাটুকু বুঝিতেন। আমি নির্ব্বোধ, মনে করিতাম তিনি নির্ব্বোধ।”

এই বলিয়া দক্ষিণা বাবু অনেক ক্ষণ করতলে মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। অবশেষে কহিলেন, "আমাকে একগ্লাস জল আনিয়া দাও।" জল খাইয়া বলিতে লাগিলেন ;—

"একদিন ডাক্তার বাবুর কন্যা মনোরমা আমার স্ত্রীকে দেখিতে আসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। জানি না, কি কারণে তাঁহার সে প্রস্তাব আমার ভাল লাগিল না। কিন্তু প্রতিবাদ করিবার কোন হেতু ছিল না। তিনি একদিন সন্ধ্যাবেলায় আমাদের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সে দিন আমার স্ত্রীর বেদনা অন্য দিনের অপেক্ষা কিছু বাড়িয়া উঠিয়াছিল। যে দিন তাঁহার ব্যথা বাড়ে সে দিন তিনি অত্যন্ত স্থির নিস্তব্ধ হইয়া থাকেন ; কেবল মাঝে মাঝে মুষ্টি-বদ্ধ হইতে থাকে এবং মুখ নীল হইয়া আসে, তাহাতেই তাঁহার যন্ত্রণা বুঝা যায়। ঘরে কোন সাড়া ছিল না, আমি শয্যা-প্রান্তে চুপ করিয়া বসিয়াছিলাম ; সে দিন আমাকে বেড়াইতে যাইতে অনুরোধ করেন, এমন সামর্থ্য তাঁহার ছিল না, কিম্বা হয় ত বড় কষ্টের সময় আমি কাছে থাকি এমন ইচ্ছা তাঁহার মনে মনে ছিল। চোখে লাগিবে বলিয়া কেরোসিনের আলোটা দ্বারের পার্শ্বে ছিল। ঘর অন্ধকার এবং নিস্তব্ধ। কেবল এক একবার যন্ত্রণার কিঞ্চিৎ উপশমে আমার স্ত্রীর গভীর দীর্ঘনিশ্বাস শুনা যাইতেছিল।

এমন সময়ে মনোরমা ঘরের প্রবেশদ্বারে দাঁড়াইলেন। বিপরীত দিক্ হইতে কেরোসিনের আলো আসিয়া তাঁহার মুখের উপর

পড়িল। আলো-আঁধারে লাগিয়া তিনি কিছুক্ষণ ঘরে কিছুই দেখিতে না পাইয়া দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া ইতস্তত করিতে লাগিলেন।

আমার স্ত্রী চমকিয়া আমার হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—ও কে?—তাঁহার সেই দুর্ব্বল অবস্থায় হঠাৎ অচেনা লোক দেখিয়া ভয় পাইয়া আমাকে দুই তিন বার অস্ফুটস্বরে প্রশ্ন করিলেন, ও কে? ও কে গো?

আমার কেমন দুর্ব্বুদ্ধি হইল আমি প্রথমেই বলিয়া ফেলিলাম, আমি চিনি না! বলিবামাত্রই কে যেন আমাকে কশাঘাত করিল। পরের মুহূর্ত্তেই বলিলাম—ওঃ, আমাদের ডাক্তার বাবুর কন্যা!

স্ত্রী একবার আমার মুখের দিকে চাহিলেন;—আমি তাঁহার মুখের দিকে চাহিতে পারিলাম না। পরক্ষণেই তিনি ক্ষীণস্বরে অভ্যাগতকে বলিলেন, আপনি আসুন।—আমাকে বলিলেন, আলোটা ধর!

মনোরমা ঘরে আসিয়া বসিলেন। তাঁহার সহিত রোগিণীর অল্পস্বর আলাপ চলিতে লাগিল। এমন সময় ডাক্তার বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তিনি তাঁহার ডাক্তারখানা হইতে দুই শিশি ওষুধ সঙ্গে আনিয়াছিলেন। সেই দুটি শিশি বাহির করিয়া আমার স্ত্রীকে বলিলেন—এই নীল শিশিটা মালিশ করিবার, আর এইটি খাইবার। দেখিবেন, দুইটাতে মিলাইবেন না, এ ওষুধটা ভারি বিষ।

আমাকেও একবার সতর্ক করিয়া দিয়া ঔষধ দুটি শয্যাপার্শ্ববর্ত্তী টেবিলে রাখিয়া দিলেন। বিদায় লইবার সময় ডাক্তার তাঁহার কন্যাকে ডাকিলেন।

মনোরমা কহিলেন—বাবা, আমি থাকি না কেন। সঙ্গে স্ত্রীলোক কেহ নাই, ইঁহাকে সেবা করিবে কে?

আমার স্ত্রী ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, না, না, আপনি কষ্ট করিবেন না। পুরাণো ঝি আছে সে আমাকে মায়ের মত যত্ন করে।

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন—উনি মা'লক্ষ্মী, চিরকাল পরের সেবা করিয়া আসিয়াছেন, অন্যের সেবা সহিতে পারেন না।

কন্যাকে লইয়া ডাক্তার গমনের উদ্যোগ করিতেছে এমন সময় আমার স্ত্রী বলিলেন,—ডাক্তার বাবু, ইনি বদ্ধঘরে অনেকক্ষণ বসিয়া আছেন, ইঁহাকে একবার বাহিরে বেড়াইয়া লইয়া আসিতে পারেন?

ডাক্তার বাবু আমাকে কহিলেন,—আসুন না, আপনাকে নদীর ধার হইয়া একবার বেড়াইয়া আনি।—

আমি ঈষৎ আপত্তি দেখাইয়া অনতিবিলম্বে সম্মত হইলাম। ডাক্তার বাবু যাইবার সময় দুই শিশি ঔষধ সম্বন্ধে আবার আমার স্ত্রীকে সতর্ক করিয়া দিলেন।

সে দিন ডাক্তারের বাড়িতেই আহার করিলাম। ফিরিয়া আসিতে রাত হইল। আসিয়া দেখি, আমার স্ত্রী ছট্‌ফট্ করি-

তেছেন। অনুতাপে বিদ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তোঁমার কি ব্যথা বাড়িয়াছে ?—

তিনি উত্তর করিতে পারিলেন না, নীরবে আমার মুখের দিকে চাহিলেন। তখন তাঁহার কণ্ঠ রোধ হইয়াছে।

আমি তৎক্ষণাৎ সেই রাত্রেই ডাক্তারকে ডাকাইয়া আনিলাম।

ডাক্তার প্রথমটা আসিয়া অনেক ক্ষণ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। অবশেষে জিজ্ঞাসা করিলেন,—সেই ব্যথাটা কি বাড়িয়া উঠিয়াছে ? ঔষধটা একবার মালিশ করিলে হয় না ?

বলিয়া শিশিটা টেবিল হইতে লইয়া দেখিলেন, সেটা খালি।

আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি ভুল করিয়া এই ওষুধটা খাইয়াছেন ?—আমার স্ত্রী ঘাড় নাড়িয়া নীরবে জানাইলেন—হাঁ।

ডাক্তার তৎক্ষণাৎ গাড়ি করিয়া তাঁহার বাড়ি হইতে পাম্প আনিতে ছুটিলেন। আমি অর্দ্ধমূর্চ্ছিতের ন্যায় আমার স্ত্রীর বিছানার উপর গিয়া পড়িলাম।

তখন, মাতা তাহার পীড়িত শিশুকে যেমন করিয়া সান্ত্বনা করে তেমনি করিয়া তিনি আমার মাথা তাঁহার বক্ষের কাছে টানিয়া লইয়া দুই হস্তের স্পর্শে আমাকে তাঁহার মনের কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। কেবল তাঁহার সেই করুণ স্পর্শের দ্বারাই আমাকে বারম্বার করিয়া বলিতে লাগিলেন—শোক করিয়ো না, ভালই হইয়াছে—তুমি সুখী হইবে, এবং সেই মনে করিয়া আমি সুখে মরিলাম।

ডাক্তার যখন ফিরিলেন, তখন জীবনের সঙ্গে সঙ্গে আমার স্ত্রীর সকল যন্ত্রণার অবসান হইয়াছে।

—দক্ষিণাচরণ আর একবার জল খাইয়া বলিলেন, উঃ বড় গরম! বলিয়া দ্রুত বাহির হইয়া বার কয়েক বারান্দায় পায়চারি করিয়া আসিয়া বসিলেন। বেশ বোঝা গেল তিনি বলিতে চাহেন না কিন্তু আমি যেন যাদু করিয়া তাঁহার নিকট হইতে কথা কাড়িয়া লইতেছি। আবার আরম্ভ করিলেন --

মনোরমাকে বিবাহ করিয়া দেশে ফিরিলাম।

মনোরমা তাহার পিতার সম্মতিক্রমে আমাকে বিবাহ করিল। কিন্তু আমি যখন তাহাকে আদরের কথা বলিতাম, প্রেমালাপ করিয়া তাহার হৃদয় অধিকার করিবার চেষ্টা করিতাম, সে হাসিত না, গম্ভীর হইয়া থাকিত। তাহার মনের কোথায় কোনখানে কি খট্‌কা লাগিয়া গিয়াছিল আমি কেমন করিয়া বুঝিব?

এই সময় আমার মদ খাইবার নেশা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল।

একদিন প্রথম শরতের সন্ধ্যায় মনোরমাকে লইয়া আমাদের বরানগরের বাগানে বেড়াইতেছি। ছম্‌ছমে অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। পাখীদের বাসায় ডানা ঝাড়িবার শব্দটুকুও নাই। কেবল বেড়াইবার পথের দুই ধারে ঘন ছায়াবৃত ঝাউগাছ বাতাসে সশব্দে কাঁপিতেছিল।

শ্রান্তি বোধ করিতেই মনোরমা সেই বকুলতলার শুভ্র পাথরের বেদীর উপর আসিয়া নিজের দুই বাহুর উপর মাথা রাখিয়া শয়ন করিল। আমিও কাছে আসিয়া বসিলাম।

সেখানে অন্ধকার আরও ঘনীভূত,—যতটুকু আকাশ দেখা যাইতেছে একেবারে তারায় আচ্ছন্ন ; তরুতলের ঝিল্লিধ্বনি যেন *অনন্তগগনবক্ষচ্যুত নিঃশব্দতার নিম্নপ্রান্তে একটি শব্দের সরু পাড়* বুনিয়া দিতেছে।

সেদিনও বৈকালে আমি কিছু মদ খাইয়াছিলাম, মনটা বেশ একটু তরলাবস্থায় ছিল। অন্ধকার যখন চোখে সহিয়া আসিল তখন বনচ্ছায়াতলে পাণ্ডুবর্ণে অঙ্কিত সেই শিথিলঅঞ্চল শ্রান্তকায় রমণীর আবছায়া মূর্ত্তিটি আমার মনে এক অনিবার্য্য আবেগের সঞ্চার করিল। মনে হইল, ও যেন একটি ছায়া, ওকে যেন কিছুতেই দুই বাহু দিয়া ধরিতে পারিব না।

এমন সময় অন্ধকার ঝাউগাছের শিখরদেশে যেন আগুন ধরিয়া উঠিল ; তাহার পরে কৃষ্ণপক্ষের জীর্ণপ্রান্ত হলুদবর্ণ চাঁদ ধীরে ধীরে গাছের মাথার উপরকার আকাশে আরোহণ করিল ;—শাদা পাথরের উপর শাদা সাড়িপরা সেই শ্রান্তশয়ান রমণীর মুখের উপর জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িল। আমি আর থাকিতে পারিলাম না। কাছে আসিয়া দুই হাতে তাহার হাতটি তুলিয়া ধরিয়া কহিলাম, মনোরমা, তুমি আমাকে বিশ্বাস কর না, কিন্তু তোমাকে আমি ভালবাসি, তোমাকে আমি কোনকালে ভুলিতে পারিব না।

কথাটা বলিবামাত্র চমকিয়া উঠিলাম ; মনে পড়িল ঠিক এই কথাটা আর এক দিন আর কাহাকেও বলিয়াছি! এবং সেই মুহূর্ত্তেই বকুল গাছের শাখার উপর দিয়া ঝাউগাছের মাথার

উপর দিয়া, কৃষ্ণপক্ষের পীতবর্ণ ভাঙ্গা চাঁদের নীচে দিয়া গঙ্গার পূর্ব্ব পার হইতে গঙ্গার সুদূর পশ্চিম পার পর্য্যন্ত হাহা—হাহা হাহা—করিয়া অতি দ্রুতবেগে একটা হাসি বহিয়া গেল! সেটা মর্ম্মভেদী হাসি, কি অভ্রভেদী হাহাকার, বলিতে পারি না। আমি তদ্দণ্ডেই পাথরের বেদীর উপর হইতে মূর্চ্ছিত হইয়া নীচে পড়িয়া গেলাম।

মূর্চ্ছাভঙ্গে দেখিলাম আমার ঘরে বিছানায় শুইয়া আছি। স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার হঠাৎ এমন হইল কেন?—আমি কাঁপিয়া উঠিয়া বলিলাম,—শুনিতে পাও নাই সমস্ত আকাশ ভরিয়া হাহা করিয়া একটা হাসি বাহিয়া গেল?

স্ত্রী হাসিয়া কহিলেন—সে বুঝি হাসি? সার বাঁধিয়া দীর্ঘ এক ঝাঁক পাখী উড়িয়া গেল তাহাদেরই পাখার শব্দ শুনিয়াছিলাম। তুমি অল্পেই ভয় পাও?—

দিনের বেলায় স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, পাখীর ঝাঁক উড়িবার শব্দই বটে, এই সময়ে উত্তর দেশ হইতে হংসশ্রেণী নদীর চরে চরিবার জন্য আসিতেছে। কিন্তু সন্ধ্যা হইলে সে বিশ্বাস রাখিতে পারিতাম না। তখন মনে হইত চারিদিকে সমস্ত অন্ধকার ভরিয়া ঘন হাসি জমা হইয়া রহিয়াছে, সামান্য একটা উপলক্ষে হঠাৎ আকাশ ভরিয়া অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া ধ্বনিত হইয়া উঠিবে। অবশেষে এমন হইল, সন্ধ্যার পর মনোরমার সহিত একটা কথা বলিতে আমার সাহস হইত না।

তখন আমাদের বরানগরের বাড়ি ছাড়িয়া মনোরমাকে লইয়া

বোটে করিয়া বাহির হইলাম। অগ্রহায়ণ মাসে নদীর বাতাসে সমস্ত ভয় চলিয়া গেল। কয়দিন বড় সুখে ছিলাম। চারিদিকের সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া মনোরমাও যেন তাহার হৃদয়ের রুদ্ধদ্বার অনেক দিন পরে ধীরে ধীরে আমার নিকট খুলিতে লাগিল।

গঙ্গা ছাড়াইয়া,খড়ে' ছাড়াইয়া, অবশেষে পদ্মায় আসিয়া পৌঁছিলাম। ভয়ঙ্করী পদ্মা তখন হেমন্তের বিবরলীন ভুজঙ্গিনীর মত কৃশ নির্জ্জীবভাবে সুদীর্ঘ শীতনিদ্রায় নিবিষ্ট ছিল। উত্তর পারে জনশূন্য তৃণশূন্য দিগন্তপ্রসারিত বালির চর ধূ ধূ করিতেছে --- এবং দক্ষিণের উচ্চ পাড়ের উপর গ্রামের আমবাগানগুলি এই রাক্ষসীনদীর নিতান্ত মুখের কাছে যোড়হস্তে দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছে ;—পদ্মা ঘুমের ঘোরে এক একবার পাশ ফিরিতেছে এবং বিদীর্ণ তটভূমি ঝুপ্ ঝাপ্ করিয়া ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।

এইখানে বেড়াইবার সুবিধা দেখিয়া বোট বাঁধিলাম।

একদিন আমরা দুই জনে বেড়াইতে বেড়াইতে বহুদূর চলিয়া গেলাম। সূর্য্যাস্তের স্বর্ণচ্ছায়া মিলাইয়া যাইতেই শুক্লপক্ষের নির্ম্মল চন্দ্রালোক দেখিতে দেখিতে ফুটিয়া উঠিল। সেই অন্তহীন শুভ্র বালির চরের উপর যখন অজস্র অবারিত উদ্ভাসিত জ্যোৎস্না একেবারে আকাশের সীমান্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়া গেল— তখন মনে হইল যেন জনশূন্য চন্দ্রালোকের অসীম স্বপ্নরাজ্যের কেবল আমরা দুই জনে ভ্রমণ করিতেছি। একটি লাল শাল মনোরমার মাথার উপর হইতে নামিয়া তাহার মুখখানি বেষ্টন করিয়া তাহার শরীরটি আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। নিস্তব্ধতা

যখন নিবিড় হইয়া আসিল, কেবল একটি সীমাহীন দিশাহীন শুভ্রতা এবং শূন্যতা ছাড়া যখন আর কিছুই রহিল না, তখন মনোরমা ধীরে ধীরে হাতটি বাহির করিয়া আমার হাত চাপিয়া ধরিল; অত্যন্ত কাছে আসিয়া সে যেন তাহার সমস্ত শরীর মন, জীবন, যৌবন আমার উপর বিন্যস্ত করিয়া নিতান্ত নির্ভর করিয়া দাঁড়াইল। পুলকিত উদ্বেলিত হৃদয়ে মনে করিলাম, ঘরের মধ্যে কি যথেষ্ট ভালবাসা যায়? এইরূপ অনাবৃত অবারিত অনন্ত আকাশ নহিলে কি দুটি মানুষকে কোথায় ধরে? তখন মনে হইল, আমাদের ঘর নাই, দ্বার নাই, কোথাও ফিরিবার নাই, এমনি করিয়া হাতে হাতে ধরিয়া গম্যহীন পথে, উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণে চন্দ্রালোকিত শূন্যতার উপর দিয়া অবারিত ভাবে চলিয়া যাইবে।

এইরূপে চলিতে চলিতে এক জায়গায় আসিয়া দেখিলাম সেই বালুকারাশির মাঝখানে অদূরে একটি জলাশয়ের মত হইয়াছে—পদ্মা সরিয়া যাওয়ার পর সেই খানে জল বাধিয়া আছে।

সেই মরুবালুকাবেষ্টিত নিস্তরঙ্গ নিসুপ্ত নিশ্চল জলটুকুর উপরে একটি সুদীর্ঘ জ্যোৎস্নার রেখা মূর্চ্ছিতভাবে পড়িয়া আছে। সেই জায়গাটাতে আসিয়া আমরা দুইজনে দাঁড়াইলাম—মনোরমা কি ভাবিয়া আমার মুখের দিকে চাহিল; তাহার মাথার উপর হইতে শালটা হঠাৎ খসিয়া পড়িল। আমি তাহার সেই জ্যোৎস্না-বিকশিত মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া চুম্বন করিলাম।

এই সময় সেই জনমানবশূন্য নিঃশব্দ মরুভূমির মধ্যে গম্ভীর-স্বরে কে তিনবার বলিয়া উঠিল—ও কে ? ও কে ? ও কে ?

আমি চমকিয়া উঠিলাম, আমার স্ত্রীও কাঁপিয়া উঠিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই আমরা দুই জনেই বুঝিলাম, এই শব্দ মানুষিক নহে, অমানুষিকও নহে—চর-বিহারী জলচর পাখীর ডাক। হঠাৎ এতরাত্রে তাহাদের নিরাপদ নিভৃত নিবাসের কাছে লোকসমাগম দেখিয়া চকিত হইয়া উঠিয়াছে।

সেই ভয়ের চমক খাইয়া আমরা দুই জনেই তাড়াতাড়ি বোটে ফিরিলাম। রাত্রে বিছানায় আসিয়া শুইলাম; শ্রান্তশরীরে মনোরমা অবিলম্বে ঘুমাইয়া পড়িল।

তখন অন্ধকারে কে একজন আমার মশারির কাছে দাঁড়াইয়া সুষুপ্ত মনোরমার দিকে একটি মাত্র দীর্ঘ শীর্ণ অস্থিসার অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া যেন আমার কানে কানে অত্যন্ত চুপি চুপি অস্ফুটকণ্ঠে কেবলি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল—ও কে ? ও কে ? ও কে গো ?—

তাড়াতাড়ি উঠিয়া দেশালাই জ্বালাইয়া বাতি ধরিলাম। সেই মুহূর্ত্তেই মিলাইয়া গিয়া, আমার মশারি কাঁপাইয়া, বোট দুলাইয়া আমার সমস্ত ঘর্ম্মাক্ত শরীরের রক্ত হিম করিয়া দিয়া হাহা—হাহা—হাহা করিয়া একটা হাসি অন্ধকার রাত্রির ভিতর দিয়া বহিয়া চলিয়া গেল। পদ্মা পার হইল, পদ্মার চর পার হইল, তাহার পরবর্ত্তী সমস্ত সুপ্ত দেশ, গ্রাম, নগর পার হইয়া গেল—যেন তাহা চিরকাল ধরিয়া দেশদেশান্তর লোকলোকান্তর পার

হইয়া ক্রমশ ক্ষীণ, ক্ষীণতর, ক্ষীণতম হইয়া অসীম সুদূরে চলিয়া যাইতেছে,—ক্রমে যেন তাহা জন্মমৃত্যুর দেশ ছাড়াইয়া গেল—ক্রমে তাহা যেন সূচির অগ্রভাগের ন্যায় ক্ষীণতম হইয়া আসিল—এত ক্ষীণ শব্দ কখন শুনি নাই, কল্পনা করি নাই—আমার মাথার মধ্যে যেন অনন্ত আকাশ রহিয়াছে এবং সেই শব্দ যতই দূরে যাইতেছে, কিছুতেই আমার মস্তিষ্কের সীমা ছাড়াইতে পারিতেছে না; অবশেষে যখন একান্ত অসহ্য হইয়া আসিল, তখন ভাবিলাম, আলো নিবাইয়া না দিলে ঘুমাইতে পারিব না। যেমন আলো নিবাইয়া শুইলাম, অমনি আমার মশারির পাশে, আমার কানের কাছে অন্ধকারে আবার সেই অবরুদ্ধ স্বর বলিয়া উঠিল—ও কে ও কে, ও কে ও কে গো। আমার বুকের রক্তের ঠিক সমান তালে ক্রমাগতই ধ্বনিত হইতে লাগিল—ও কে, ও কে, ও কে গো! ও কে, ও কে, ও কে গো! সেই গভীর রাত্রে নিস্তব্ধ বোটের মধ্যে আমার গোলাকার ঘড়িটাও সজীব হইয়া উঠিয়া তাহার ঘণ্টার কাঁটা মনোরমার দিকে প্রসারিত করিয়া শেল্‌ফের উপর হইতে তালে তালে বলিতে লাগিল, ও কে, ও কে, ও কে গো! ও কে, ও কে, ও কে গো!

বলিতে বলিতে দক্ষিণাবাবু পাংশুবর্ণ হইয়া আসিলেন, তাঁহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল। আমি তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া কহিলাম একটু জল খান। এমন সময় হঠাৎ আমার কেরাসিনের শিখাটা দপ্‌দপ্ করিতে করিতে নিবিয়া গেল। হঠাৎ দেখিতে পাইলাম, বাহিরে আলো হইয়াছে। কাক ডাকিয়া উঠিল।

দোয়েল শিশ্ দিতে লাগিল। আমার বাড়ির সম্মুখবর্ত্তী পথে একটা মহিষের গাড়ির কঁ্যাচ্ কঁ্যাচ্ শব্দ জাগিয়া উঠিল। তখন দক্ষিণাবাবুর মুখের ভাব একেবারে বদল হইয়া গেল। ভয়ের কিছুমাত্র চিহ্ন রহিল না। রাত্রির কুহকে, কাল্পনিক শঙ্কার মত্ততার আমার কাছে যে এত কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন সে জন্য যেন অত্যন্ত লজ্জিত এবং আমার উপর আন্তরিক ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। শিষ্টসম্ভাষনমাত্র না করিয়া অকস্মাৎ উঠিয়া দ্রুতবেগে চলিয়া গেলেন।

সেই দিনই অর্দ্ধরাত্রে আবার আমার দ্বারে আসিয়া ঘা পড়িল—ডাক্তার! ডাক্তার!

জয় পরাজয়।

রাজকন্যার নাম অপরাজিতা। উদয়নারায়ণের সভাকবি শেখর তাঁহাকে কখনও চক্ষেও দেখেন নাই। কিন্তু যে দিন কোন নূতন কাব্য রচনা করিয়া সভাতলে বসিয়া রাজাকে শুনাইতেন, সেদিন কণ্ঠস্বর ঠিক এতটা উচ্চ করিয়া পড়িতেন, যাহাতে তাহা সেই সমুচ্চ গৃহের উপরিতলের বাতায়নবর্ত্তিনী অদৃশ্য শ্রোত্রীগণের কর্ণপথে প্রবেশ করিতে পারে। যেন তিনি কোন এক অগম্য নক্ষত্রলোকের উদ্দেশে আপনার সঙ্গীতোচ্ছ্বাস প্রেরণ করিতেন, যেখানে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে তাঁহার জীবনের একটি অপরিচিত শুভগ্রহ অদৃশ্য মহিমায় বিরাজ করিতেছেন।

কখন ছায়ার মতন দেখিতে পাইতেন, কখন নূপুরশিঞ্জনের মতন শুনা যাইত; বসিয়া বসিয়া মনে মনে ভাবিতেন, সে কেমন দুইখানি চরণ যাহাতে সেই সোনার নূপুর বাধা থাকিয়া তালে তালে গান গাহিতেছে! সেই দুইখানি রক্তিম শুভ্র কোমল চরণতল প্রতি পদক্ষেপে কি সৌভাগ্য কি অনুগ্রহ কি করুণার মত করিয়া পৃথিবীকে স্পর্শ করে। মনের মধ্যে সেই চরণ দুটি প্রতিষ্ঠা করিয়া কবি অবসরকালে সেইখানে আসিয়া লুটাইয়া পড়িত এবং সেই নূপুরশিঞ্জনের সুরে আপনার গান বাঁধিত।

কিন্তু যে ছায়া দেখিয়াছিল, সে কাহার ছায়া কাহার নূপুর এমন তর্ক এমন সংশয় তাহার ভক্তহৃদয়ে কখন উদয় হয় নাই।

রাজকন্যার দাসী মঞ্জরী যখন ঘাটে যাইত, শেখরের ঘরের সম্মুখ দিয়া তাহার পথ ছিল। আসিতে যাইতে কবির সঙ্গে তাহার দুটা কথা না হইয়া যাইত না। তেমন নির্জ্জন দেখিলে সে সকালে সন্ধ্যায় শেখরের ঘরের মধ্যে গিয়াও বসিত। যতবার সে ঘাটে যাইত, ততবার যে তাহার আবশ্যক ছিল, এমনও হইত না, যদি বা আবশ্যক ছিল এমন হয়, কিন্তু ঘাটে যাইবার সময় উহারই মধ্যে একটু বিশেষ যত্ন করিয়া একটা রঙীন্ কাপড় এবং কানে দুইটা আম্রমুকুল পরিবার কোন উচিত কারণ পাওয়া যাইত না।

লোকে হাসাহাসি কানাকানি করিত। লোকের কোন অপরাধ ছিল না। মঞ্জরীকে দেখিলে শেখর বিশেষ আনন্দলাভ করিতেন। তাহা গোপন করিতেও তাঁহার তেমন প্রয়াস ছিল না।

তাহার নাম ছিল মঞ্জরী; বিবেচনা করিয়া দেখিলে সাধারণ লোকের পক্ষে সেই নামই যথেষ্ট ছিল, কিন্তু শেখর আবার আরও একটু কবিত্ব করিয়া তাহাকে বসন্তমঞ্জরী বলিতেন। লোকে শুনিয়া বলিত, আ সর্ব্বনাশ!

আবার কবির বসন্ত-বর্ণনার মধ্যে—"মঞ্জুল বঞ্জুল মঞ্জরী" এমনতর অনুপ্রাসও মাঝে মাঝে পাওয়া যাইত। এমন কি, জনরব রাজার কানেও উঠিয়াছিল।

রাজা তাঁহার কবির এইরূপ রসাধিক্যের পরিচয় পাইয়া বড়ই আমোদ বোধ করিতেন—তাহা লইয়া কৌতুক করিতেন, শেখরও তাহাতে যোগ দিতেন।

রাজা হাসিয়া প্রশ্ন করিতেন, "ভ্রমর কি কেবল বসন্তের রাজসভায় গান গায়"—

কবি উত্তর দিতেন, "না, পুষ্পমঞ্জরীর মধুও খাইয়া থাকে।"

এমনি করিয়া সকলেই হাসিত, আমোদ করিত; বোধ করি অন্তঃপুরে রাজকন্যা অপরাজিতাও মঞ্জরীকে লইয়া মাঝে মাঝে উপহাস করিয়া থাকিবেন। মঞ্জরী তাহাতে অসন্তুষ্ট হইত না।

এমনি করিয়া সত্যে মিথ্যায় মিশাইয়া মানুষের জীবন এক-রকম করিয়া কাটিয়া যায়—খানিকটা বিধাতা গড়েন, খানিকটা আপনি গড়ে, খানিকটা পাঁচজনে গড়িয়া দেয়; জীবনটা একটা পাঁচমিশালি রকমের জোড়াতাড়া; প্রকৃত এবং অপ্রকৃত, কাল্পনিক এবং বাস্তবিক।

কেবল কবি যে গানগুলি গাহিতেন তাহাই সত্য এবং সম্পূর্ণ। গানের বিষয় সেই রাধা এবং কৃষ্ণ—সেই চিরন্তন নর এবং চিরন্তন নারী, সেই অনাদি দুঃখ এবং অনন্ত সুখ। সেই গানেই তাঁহার যথার্থ নিজের কথা ছিল—এবং সেই গানের যাথার্থ্য অমরাপুরের রাজা হইতে দীনদুঃখী প্রজা পর্য্যন্ত সকলেই আপনার হৃদয়ে হৃদয়ে পরীক্ষা করিয়াছিল। তাঁহার গান সকলেরই মুখে। জ্যোৎস্না উঠিলেই, একটু দক্ষিণা বাতাসের আভাস দিলেই অমনি দেশের চতুর্দ্দিকে কত কানন, কত পথ,

কত নৌকা, কত বাতায়ন, কত প্রাঙ্গণ হইতে তাঁহার রচিত গান উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত—তাঁহার খ্যাতির আর সীমা ছিল না।

এই ভাবে অনেক দিন কাটিয়া গেল। কবি কবিতা লিখিতেন, রাজা শুনিতেন, রাজসভার লোক বাহবা দিত, মঞ্জরী ঘাটে আসিত, এবং অন্তঃপুরের বাতায়ন হইতে কখন কখন একটা ছায়া পড়িত, কখন কখন একটা নূপুর শুনা যাইত।

২

এমন সময়ে দাক্ষিণাত্য হইতে দিগ্বিজয়ী কবি শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত ছন্দে রাজার স্তবগান করিয়া রাজসভায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি স্বদেশ হইতে বাহির হইয়া পথিমধ্যে সমস্ত রাজকবিদিগকে পরাস্ত করিয়া অবশেষে অমরাপুরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

রাজা পরম সমাদরের সহিত কহিলেন "এহি, এহি!"

কবি পুণ্ডরীক দম্ভভরে কহিলেন "যুদ্ধং দেহি।"

রাজার মান রাখিতে হইবে—যুদ্ধ দিতে হইবে, কিন্তু কাব্যযুদ্ধ যে কিরূপ হইতে পারে শেখরের সে সম্বন্ধে ভালরূপ ধারণা ছিল না। তিনি অত্যন্ত চিন্তিত ও শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। রাত্রে নিদ্রা হইল না। যশস্বী পুণ্ডরীকের দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, সুতীক্ষ্ণ বক্রনাসা এবং দর্পোদ্ধত উন্নত মস্তক দিগ্বিদিকে অঙ্কিত দেখিতে লাগিলেন।

প্রাতঃকালে কম্পিতহৃদয় কবি রণক্ষেত্রে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। প্রত্যূষ হইতে সভাতল লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গেছে,

কলরবের সীমা নাই; নগরে আর সমস্ত কাজকর্ম্ম একেবারে বন্ধ।

কবি শেখর বহুকষ্টে মুখে সহাস্য প্রফুল্লতার আয়োজন করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী কবি পুণ্ডরীককে নমস্কার করিলেন—পুণ্ডরীক প্রচণ্ড অবহেলাভরে নিতান্ত ইঙ্গিতমাত্রে নমস্কার ফিরাইয়া দিলেন এবং নিজের অনুবর্ত্তী ভক্তবৃন্দের দিকে চাহিয়া হাসিলেন।

শেখর একবার অন্তঃপুরের জালায়নের দিকে কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন, বুঝিতে পারিলেন সেখান হইতে আজ শত শত কৌতূহলপূর্ণ কৃষ্ণতারকার ব্যগ্রদৃষ্টি এই জনতার উপরে অজস্র নিপতিত হইতেছে। একবার একাগ্রভাবে চিত্তকে সেই উৰ্দ্ধলোকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া আপনার জয়লক্ষ্মীকে বন্দনা করিয়া আসিলেন, মনে মনে কহিলেন, "আমার যদি আজ জয় হয় তবে, হে দেবি, হে অপরাজিতা, তাহাতে তোমারি নামের সার্থকতা হইবে।"

তূরী ভেরী বাজিয়া উঠিল। জয়ধ্বনি করিয়া সমাগত সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল। শুক্লবসন রাজা উদয় নারায়ণ শরৎ-প্রভাতের শুভ্র মেঘরাশির ন্যায় ধীরগমনে সভায় প্রবেশ করিলেন এবং সিংহাসনে উঠিয়া বসিলেন।

পুণ্ডরীক উঠিয়া সিংহাসনের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বৃহৎ সভা স্তব্ধ হইয়া গেল।

বক্ষ বিস্ফারিত করিয়া গ্রীবা ঈষৎ ঊৰ্দ্ধে হেলাইয়া বিরাটমূর্ত্তি পুণ্ডরীক গম্ভীরস্বরে উদয়নারায়ণের স্তব পাঠ করিতে আরম্ভ

করিলেন। কণ্ঠস্বর ঘরে ধরে না—বৃহৎ সভাগৃহের চারিদিকের ভিত্তিতে স্তম্ভে ছাদে সমুদ্রের তরঙ্গের মত গম্ভীর মন্দ্রে আঘাত প্রতিঘাত করিতে লাগিল, এবং কেবল সেই ধ্বনির বেগে সমস্ত জনমণ্ডলীর বক্ষকবাট থর্ থর্ করিয়া স্পন্দিত হইয়া উঠিল। কত কৌশল, কত কারুকার্য্য, উদয়নারায়ণ নামের কতরূপ ব্যাখ্যা রাজার নামাক্ষরের কতদিক হইতে কতপ্রকার বিন্যাস, কত ছন্দ, কত যমক!

পুণ্ডরীক যখন শেষ করিয়া বসিলেন, কিছুক্ষণের জন্য নিস্তব্ধ সভাগৃহ তাঁহার কণ্ঠের প্রতিধ্বনি ও সহস্র হৃদয়ের নির্ব্বাক্ বিস্ময়-রাশিতে গম্ গম্ করিতে লাগিল। বহুদূর দেশ হইতে আগত পণ্ডিতগণ দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া উচ্ছ্বসিত স্বরে সাধু সাধু করিয়া উঠিলেন।

তখন সিংহাসন হইতে রাজা শেখরের মুখের দিকে চাহিলেন। শেখরও ভক্তি প্রণয় অভিমান এবং একপ্রকার সকরুণ সঙ্কোচপূর্ণ দৃষ্টি রাজার দিকে প্রেরণ করিল এবং ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। রাম যখন লোকরঞ্জনার্থে দ্বিতীয় বার অগ্নিপরীক্ষা করিতে চাহিয়া-ছিলেন তখন সীতা যেন এইরূপ ভাবে চাহিয়া এমনি করিয়া করিয়া তাঁহার স্বামীর সিংহাসনের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলেন।

কবির দৃষ্টি নীরবে রাজাকে জানাইলেন—"আমি তোমারই! তুমি যদি বিশ্বসমক্ষে আমাকে দাঁড় করাইয়া পরীক্ষা করিতে চাও ত কর। কিন্তু—" তাহার পরে নয়ন নত করিলেন।

পুণ্ডরীক সিংহের মত দাঁড়াইয়াছিল, শেখর চারিদিকে ব্যাধ-

বেষ্টিত হরিণের মত দাঁড়াইল। তরুণ যুবক, রমণীর ন্যায় লজ্জা এবং স্নেহ-কোমল মুখ, পাণ্ডুবর্ণ কপোল, শরীরাংশ নিতান্ত স্বল্প, দেখিলে মনে হয় ভাবের স্পর্শমাত্রেই সমস্ত দেহ যেন, বীণার তারের মত কাঁপিয়া বাজিয়া উঠিবে।

শেখর মুখ না তুলিয়া প্রথমে অতি মৃদুস্বরে আরম্ভ করিলেন। প্রথম একটা শ্লোক বোধ হয় কেহ ভাল করিয়া শুনিতে পাইল না। তাহার পরে ক্রমে ক্রমে মুখ তুলিলেন—যেখানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন সেখান হইতে যেন সমস্ত জনতা এবং রাজসভার পাষাণ-প্রাচীর বিগলিত হইয়া বহুদূরবর্ত্তী অতীতের মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া গেল। সুমিষ্ট পরিষ্কার কণ্ঠস্বর কাঁপিতে কাঁপিতে উজ্জ্বল অগ্নিশিখার ন্যায় ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল। প্রথমে রাজার চন্দ্র-বংশীয় আদিপুরুষের কথা আরম্ভ করিলেন। ক্রমে ক্রমে কত যুদ্ধ বিগ্রহ শৌর্য্য বীর্য্য যজ্ঞ দান কত মহদনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া তাঁহার রাজকাহিনীকে বর্ত্তমান কালের মধ্যে উপনীত করিলেন। অবশেষে সেই দূরস্মৃতিবদ্ধ দৃষ্টিকে ফিরাইয়া আনিয়া রাজার মুখের উপর স্থাপিত করিলেন এবং রাজ্যের সমস্ত প্রজাহৃদয়ের একটা বৃহৎ অব্যক্ত প্রীতিকে ভাষায় ছন্দে মূর্ত্তিমান্ করিয়া সভার মাঝখানে দাঁড় করাইয়া দিলেন—যেন দূর দূরান্তর হইতে শত সহস্র প্রজার হৃদয়স্রোত ছুটিয়া আসিয়া রাজপিতামহদিগের এই অতি পুরাতন প্রাসাদকে মহাসঙ্গীতে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল—ইহার, প্রত্যেক ইষ্টককে যেন তাহারা স্পর্শ করিল, আলিঙ্গন করিল, চুম্বন করিল, ঊর্দ্ধে অন্তঃপুরের বাতায়ন সম্মুখে উত্থিত

হইয়া রাজলক্ষ্মী-স্বরূপা প্রাসাদলক্ষ্মীদের চরণতলে সেহ্লাদ ভক্তিভরে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল, এবং সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া রাজাকে এবং রাজার সিংহাসনকে মহামহোল্লাসে শত শতবার প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। অবশেষে বলিলেন ; মহারাজ, বাক্যতে হার মানিতে পারি কিন্তু ভক্তিতে কে হারাইবে! এই বলিয়া কম্পিতদেহে বসিয়া পড়িলেন। তখন অশ্রুজলে অভিষিক্ত প্রজাগণ জয় জয় রবে আকাশ কাঁপাইতে লাগিল।

সাধারণ জনমণ্ডলীর এই উন্মত্ততাকে ধিক্কারপূর্ণ হাস্যের দ্বারা অবজ্ঞা করিয়া পুণ্ডরীক আবার উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দৃপ্তগর্জ্জনে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাক্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কে ? সকলে এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া গেল।

তখন তিনি নানা ছন্দে অদ্ভুত পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া বেদ বেদান্ত আগম নিগম হইতে প্রমাণ করিতে লাগিলেন—বিশ্বের মধ্যে বাক্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বাক্যই সত্য, বাক্যই ব্রহ্ম। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বাক্যের বশ—অতএব বাক্য তাঁহাদের অপেক্ষা বড়। ব্রহ্মা চারিমুখে বাক্যকে শেষ করিতে পারিতেছেন না—পঞ্চানন পাঁচমুখে বাক্যের অন্ত না পাইয়া অবশেষে নীরবে ধ্যানপরায়ণ হইয়া বাক্য খুঁজিতেছেন।

এম্‌নি করিয়া পাণ্ডিত্যের উপর পাণ্ডিত্য এবং শাস্ত্রের উপর শাস্ত্র চাপাইয়া বাক্যের জন্য একটা অভ্রভেদী সিংহাসন নির্ম্মাণ করিয়া বাক্যকে মর্ত্ত্যলোক এবং সুরলোকের মস্তকের উপর

বসাইয়া দিলেন এবং পুনর্ব্বার বজ্রনিনাদে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাক্যের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কে ?

দর্পভরে চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিলেন ; যখন কেহ কোন উত্তর দিল না তখন ধীরে ধীরে আসন গ্রহণ করিলেন। পণ্ডিতগণ সাধু সাধু ধন্য ধন্য করিতে লাগিল—রাজা বিস্মিত হইয়া রহিলেন এবং কবি শেখর এই বিপুল পাণ্ডিত্যের নিকটে আপনাকে ক্ষুদ্র মনে করিলেন। আজিকার মত সভা ভঙ্গ হইল।

৩

পরদিন শেখর আসিয়া গান আরম্ভ করিয়া দিলেন ;—বৃন্দাবনে প্রথমে বাঁশি বাজিয়াছে, তখন গোপিনীরা জানে না, কে বাজাইল—জানে না, কোথায় বাজিতেছে। একবার মনে হইল, দক্ষিণ পবনে বাজিতেছে, একবার মনে হইল উত্তরে গিরি-গোবর্দ্ধনের শিখর হইতে ধ্বনি আসিতেছে, মনে হইল, উদয়াচলের উপরে দাঁড়াইয়া কে মিলনের জন্য আহ্বান করিতেছে ; মনে হইল অস্তাচলের প্রান্তে বসিয়া কে বিরহশোকে কাঁদিতেছে ; মনে হইল যমুনার প্রত্যেক তরঙ্গ হইতে বাঁশি বাজিয়া উঠিল, মনে হইল আকাশের প্রত্যেক তারা যেন সেই বাঁশির ছিদ্র—অবশেষে কুঞ্জে কুঞ্জে, পথে ঘাটে, ফুলে ফলে, জলে স্থলে, উচ্চে নীচে, অন্তরে বাহিরে বাঁশি সর্ব্বত্র হইতে বাজিতে লাগিল—বাঁশি কি বলিতেছে তাহা কেহ বুঝিতে পারিল না, এবং বাঁশির উত্তরে হৃদয় কি বলিতে চাহে তাহাও কেহ স্থির করিতে পারিল না ; কেবল দুটি চক্ষু ভরিয়া অশ্রুজল জাগিয়া উঠিল, এবং

একটি আলোক-সুন্দর শ্যামস্নিগ্ধ মরণের আকাঙ্ক্ষায় সমস্ত প্রাণ যেন উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল।

সভা ভুলিয়া, রাজা ভুলিয়া, আত্মপক্ষ প্রতিপক্ষ ভুলিয়া, যশ অপযশ, জয় পরাজয়, উত্তর প্রত্যুত্তর, সমস্ত ভুলিয়া শেখর আপনার নির্জ্জন হৃদয়কুঞ্জের মধ্যে যেন একলা দাঁড়াইয়া এই বাঁশির গান গাহিয়া গেলেন। কেবল মনে ছিল একটি জ্যোতির্ম্ময়ী মানসী মূর্ত্তি, কেবল কানে বাজিতেছিল দুটি কমলচরণের নূপুরধ্বনি। কবি যখন গান শেষ করিয়া হতজ্ঞানের মত বসিয়া পড়িলেন, তখন একটি অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যে একটি বৃহৎ ব্যাপ্ত বিরহব্যাকুলতায় সভাগৃহ পরিপূর্ণ হইয়া রহিল, কেহ সাধুবাদ দিতে পারিল না।

এই ভাবের প্রবলতার কিঞ্চিৎ উপশম হইলে পুণ্ডরীক সিংহাসন সম্মুখে উঠিলেন। প্রশ্ন করিলেন— রাধাই বা কে, কৃষ্ণই বা কে?—বলিয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং শিষ্যদের প্রতি চাহিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, "রাধাই বা কে, কৃষ্ণই বা কে?" বলিয়া অসামান্য পাণ্ডিত্য বিস্তার করিয়া আপনিই তাহার উত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন।

বলিলেন রাধা প্রণব, ওঁকার, কৃষ্ণ ধ্যান যোগ এবং বৃন্দাবন দুই ভ্রূর মধ্যবর্ত্তী বিন্দু। ইড়া, সুষুম্না, পিঙ্গলা, নাভিপদ্ম, হৃৎপদ্ম, ব্রহ্মরন্ধ্র, সমস্ত আনিয়া ফেলিলেন। রা অর্থেই বা কি, ধা অর্থেই বা কি, কৃষ্ণ শব্দের ক হইতে মূর্দ্ধন্য ণ পর্য্যন্ত প্রত্যেক অক্ষরের কত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হইতে পারে তাহার একে

একে মীমাংসা করিলেন। একবার বুঝাইলেন কৃষ্ণ যজ্ঞ, রাধিকা অগ্নি, একবার বুঝাইলেন কৃষ্ণ বেদ এবং রাধিকা ষড়দর্শন, তাহার পরে বুঝাইলেন কৃষ্ণ শিক্ষা এবং রাধিকা দীক্ষা। রাধিকা তর্ক, কৃষ্ণ মীমাংসা; রাধিকা উত্তর প্রত্যুত্তর, কৃষ্ণ জয়লাভ।

এই বলিয়া রাজার দিকে পণ্ডিতের দিকে এবং অবশেষে তীব্র হাস্যে শেখরের দিকে চাহিয়া পুণ্ডরীক বসিলেন।

রাজা পুণ্ডরীকের আশ্চর্য্য ক্ষমতায় মুগ্ধ হইয়া গেলেন, পণ্ডিতদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না, এবং কৃষ্ণ রাধার নব নব ব্যাখ্যায় বাঁশির গান, যমুনার কল্লোল, প্রেমের মোহ একেবারে দূর হইয়া গেল; যেন পৃথিবীর উপর হইতে কে এক জন বসন্তের সবুজ রংটুকু মুছিয়া লইয়া আগাগোড়া পবিত্র গোময় লেপন করিয়া গেল। শেখর আপনার এতদিনকার সমস্ত গান বৃথা বোধ করিতে লাগিলেন, ইহার পরে তাঁহার আর গান গাহিবার সামর্থ্য রহিল না। সেদিন সভা ভঙ্গ হইল।

৪

পরদিন পুণ্ডরীক ব্যস্ত এবং সমস্ত, দ্বিব্যস্ত এবং দ্বিসমস্তক, বৃত্ত, তার্ক্ষ্য সৌত্র, চক্র, পদ্ম, কাকপদ, আদ্যুত্তর মধ্যোত্তর, অন্তোত্তর, বাক্যোত্তর, বচনগুপ্ত, মাত্রাচ্যুতক, চ্যুতদত্তাক্ষর, অর্থগূঢ়, স্তুতিনিন্দা, অপহ্নুতি, শুদ্ধাপভ্রংশ, শাব্দী, কালসার, প্রহেলিকা প্রভৃতি অদ্ভুত শব্দচাতুরী দেখাইয়া দিলেন। শুনিয়া সভাশুদ্ধ লোক বিস্ময় রাখিতে স্থান পাইল না।

শেখর যে সকল পদ রচনা করিতেন তাহা নিতান্ত সরল

—তাহা সুখে দুঃখে উৎসবে আনন্দে সর্ব্বসাধারণে ব্যবহার করিত—আজ তাহারা স্পষ্ট বুঝিতে পারিল তাহাতে কোন গুণপনা নাই, যেন তাহা ইচ্ছা করিলেই তাহারাও রচনা করিতে পারিত, কেবল অনভ্যাস অনিচ্ছা অনবসর ইত্যাদি কারণেই পারে না—নহিলে কথাগুলো বিশেষ নূতন নহে, দুরূহও নহে তাহাতে পৃথিবীর লোকের নূতন একটা শিক্ষাও হয় না, সুবিধাও হয় না—কিন্তু আজ যাহা শুনিল তাহা অদ্ভুত ব্যাপার; কাল যাহা শুনিয়াছিল তাহাতেও বিস্তর চিন্তা এবং শিক্ষায় বিষয় ছিল। পুণ্ডরীকের পাণ্ডিত্য ও নৈপুণ্যের নিকট তাহাদের আপনার কবিটিকে নিতান্ত বালক ও সামান্য লোক বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

মৎস্যপুচ্ছের তাড়নায় জলের মধ্যে যে গূঢ় আন্দোলন চলিতে থাকে, সরোবরের পদ্ম যেমন তাহার প্রত্যেক আঘাত অনুভব করিতে পারে, শেখর তেমনি তাঁহার চতুর্দ্দিকবর্ত্তী সভাস্থ জনের মনের ভাব হৃদয়ের মধ্যে বুঝিতে পারিলেন।

আজ শেষ দিন। আজ জয় পরাজয় নির্ণয় হইবে। রাজা তাঁহার কবির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তাহার অর্থ এই, আজ নিরুত্তর হইয়া থাকিলে চলিবে না—তোমার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে।

শেখর প্রান্তভাগে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কেবল এই ক'টি কথা বলিলেন—"বীণাপাণি শ্বেতভুজা, তুমি যদি তোমার কমলবন শূন্য করিয়া আজ মল্লভূমিতে আসিয়া দাঁড়াইলে তবে তোমার

চরণাসক্ত যে ভক্তগণ অমৃতপিপাসী, তাহাদের কি গতি হইবে?” মুখ ঈষৎ উপরে তুলিয়া করুণ স্বরে বলিলেন, যেন শ্বেতভূজা বীণাপাণি নতনয়নে রাজান্তঃপুরে বাতায়ন সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন।

তখন পুণ্ডরীক উঠিয়া সশব্দে হাস্য করিলেন—এবং “শেখর” শব্দের শেষ দুই অক্ষর গ্রহণ করিয়া অনর্গল শ্লোক রচনা করিয়া গেলেন। বলিলেন পদ্মবনের সহিত খরের কি সম্পর্ক? এবং সঙ্গীতে বিস্তর চর্চ্চাসত্ত্বেও উক্ত প্রাণী কিরূপ ফললাভ করিয়াছে? আর সরস্বতীর অধিষ্ঠান ত পুণ্ডরীকেই; মহারাজের অধিকারে তিনি কি অপরাধ করিয়াছিলেন, যে, এদেশে তাঁহাকে খর-বাহন করিয়া অপমান করা যাইতেছে?

পণ্ডিতেরা এই প্রত্যুত্তরে উচ্চস্বরে হাসিতে লাগিলেন। সভাসদেরাও তাহাতে যোগ দিল—তাঁহাদের দেখা-দেখি সভাশুদ্ধ সমস্ত লোক—যাহারা বুঝিল এবং না বুঝিল—সকলেই হাসিতে লাগিল।

ইহার উপযুক্ত প্রত্যুত্তরের প্রত্যাশায় রাজা তাঁহার কবিসখাকে বারবার অঙ্কুশের ন্যায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টির দ্বারা তাড়না করিতে লাগিলেন। কিন্তু শেখর তাহার প্রতি কিছুমাত্র মনোযোগ না করিয়া অটলভাবে বসিয়া রহিলেন।

তখন রাজা শেখরের প্রতি মনে মনে অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া সিংহাসন হইতে নামিয়া আসিলেন—এবং নিজের কণ্ঠ হইতে মুক্তার মালা খুলিয়া পুণ্ডরীকের গলায় পরাইয়া দিলেন—সভাস্থ

সকলেই ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। অন্তঃপুর হইতে এককালে অনেকগুলি বলয় কঙ্কন নূপুরের শব্দ শুনা গেল—তাহাই শুনিয়া শেখর আসন ছাড়িয়া উঠিলেন এবং ধীরে ধীরে সভাগৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

৫

কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীর রাত্রি। ঘন অন্ধকার। ফুলের গন্ধ বহিয়া দক্ষিণের বাতাস উদার বিশ্ববন্ধুর ন্যায় মুক্ত বাতায়ন দিয়া নগরের ঘরে ঘরে প্রবেশ করিতেছে।

ঘরের কাষ্ঠমঞ্চ হইতে শেখর আপনার পুঁথিগুলি পাড়িয়া সম্মুখে স্তূপাকার করিয়া রাখিয়াছেন। তাহার মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া নিজের রচিত গ্রন্থগুলি পৃথক্ করিয়া রাখিলেন। অনেকদিনকার অনেক লেখা। তাহার মধ্যে অনেকগুলি রচনা তিনি নিজেই প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সেগুলি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া এখানে ওখানে পড়িয়া দেখিতে লাগিলেন। আজ তাঁহার কাছে ইহা সমস্তই অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইল।

নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, সমস্ত জীবনের এই কি সঞ্চয়! কতকগুলা কথা এবং ছন্দ এবং মিল! ইহার মধ্যে যে কোন সৌন্দর্য্য, মানবের কোন চির আনন্দ, কোন বিশ্বসঙ্গীতের প্রতিধ্বনি, তাঁহার হৃদয়ের কোন গভীর আত্ম প্রকাশ নিবদ্ধ হইয়া আছে আজ তিনি তাহা দেখিতে পাইলেন না। রোগীর মুখে যেমন কোন খাদ্যই রুচে না, তেমনি আজ তাঁহার হাতের

কাছে যাহা কিছু আসিল সমস্তই ঠেলিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলেন। রাজার মৈত্রী, লোকের খ্যাতি, হৃদয়ের দুরাশা, কল্পনার কুহক—আজ অন্ধকার রাত্রে সমস্তই শূন্য বিড়ম্বনা বলিয়া ঠেকিতে লাগিল।

তখন একটি করিয়া তাঁহার পুঁথি ছিঁড়িয়া সম্মুখের জ্বলন্ত অগ্নিভাণ্ডে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। হঠাৎ একটা উপহাসের কথা মনে উদয় হইল। হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"বড় বড় রাজারা অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া থাকেন—আজ আমার এ কাব্যমেধ যজ্ঞ!" কিন্তু তখনি মনে উদয় হইল, তুলনাটি ঠিক হয় নাই। অশ্বমেধের অশ্ব যখন সর্ব্বত্র বিজয়ী হইয়া আসে তখনি অশ্বমেধ হয়—আমার কবিত্ব যে দিন পরাজিত হইয়াছে আমি সেই দিন কাব্যমেধ করিতে বসিয়াছে—আরো বহুদিন পূর্ব্বে করিলেই ভাল হইত।

একে একে নিজের সকল গ্রন্থগুলিই অগ্নিতে সমর্পণ করিলেন। আগুন ধূধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলে কবি সবেগে দুই শূন্য হস্ত শূন্যে নিক্ষেপ করিতে করিতে বলিলেন—"তোমাকে দিলাম, তোমাকে দিলাম, তোমাকে দিলাম—হে সুন্দরি অগ্নিশিখা, তোমাকেই দিলাম। এতদিন তোমাকেই সমস্ত আহুতি দিয়া আসিতেছিলাম, আজ একেবারে শেষ করিয়া দিলাম। বহুদিন তুমি আমার হৃদয়ের মধ্যে জ্বলিতেছিলে, হে মোহিনী বহ্নিরূপিণি! যদি সোনা হইতাম ত উজ্জ্বল হইয়া উঠিতাম—কিন্তু আমি তুচ্ছ তৃণ, দেবি, তাই আজ ভস্ম হইয়া গিয়াছি।"

রাত্রি অনেক হইল। শেখর তাঁহার ঘরের সমস্ত বাতায়ন খুলিয়া দিলেন। তিনি যে যে ফুল ভালবাসিতেন সন্ধ্যাবেলা বাগান হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। সবগুলি শাদা ফুল, যুঁই, বেল এবং গন্ধরাজ। তাহারই মুঠা মুঠা লইয়া নির্ম্মল বিছানার উপর ছড়াইয়া দিলেন। ঘরের চারিদিকে প্রদীপ জ্বালাইলেন।

তাহার পর মধুর সঙ্গে একটি উদ্ভিদের বিষরস মিশাইয়া নিশ্চিন্তমুখে পান করিলেন—এবং ধীরে ধীরে আপনার শয্যায় গিয়া শয়ন করিলেন। শরীর অবশ এবং নেত্র মুদ্রিত হইয়া আসিল।

নূপুর বাজিল। দক্ষিণের বাতাসের সঙ্গে কেশগুচ্ছের একটা সুগন্ধ ঘরে প্রবেশ করিল।

কবি নিমীলিত নেত্রে কহিলেন, "দেবি, ভক্তের প্রতি দয়া করিলে কি? এতদিন পরে আজ কি দেখা দিতে আসিলে?"

একটি সুমধুর কণ্ঠে উত্তর শুনিলেন, "কবি, আসিয়াছি।"

শেখর চমকিয়া উঠিয়া চক্ষু মেলিলেন—দেখিলেন শয্যার সম্মুখে এক অপরূপ রমণীমূর্ত্তি।

মৃত্যু-সমাচ্ছন্ন বাষ্পাকুলনেত্রে স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাইলেন না। মনে হইল তাঁহার হৃদয়ের সেই ছায়াময়ী প্রতিমা অন্তর হইতে বাহির হইয়া মৃত্যুকালে তাঁহার মুখের দিকে স্থিরনেত্রে চাহিয়া আছে।

রমণী কহিলেন, "আমি রাজকন্যা অপরাজিতা।"

কবি প্রাণপণে উঠিয়া বসিলেন।

রাজকন্যা কহিলেন—"রাজা তোমার সুবিচার করেন নাই। তোমারই জয় হইয়াছে, কবি, তাই আমি আজ তোমাকে জয়মাল্য দিতে আসিয়াছি।" বলিয়া অপরাজিতা নিজের কণ্ঠ হইতে স্বহস্তরচিত পুষ্প-মালা খুলিয়া কবির গলায় পরাইয়া দিলেন। মরণাহত কবি শয্যার উপরে পড়িয়া গেলেন।

প্রতিহিংসা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মুকুন্দ বাবুদের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ানের পৌত্রী, বর্ত্তমান ম্যানেজারের স্ত্রী ইন্দ্রাণী অশুভ ক্ষণে বাবুদের বাড়িতে তাঁহাদের দৌহিত্রের বিবাহে বৌ-ভাতের নিমন্ত্রণে উপস্থিত ছিলেন।

তৎপূর্ব্বকার ইতিহাস সংক্ষেপে বলিয়া রাখিলে কথাটা পরিষ্কার হইবে।

এক্ষণে মুকুন্দ বাবুও ভূতপূর্ব্ব, তাঁহার দেওয়ান গৌরীকান্তও ভূতপূর্ব্ব; কালের আহ্বান অনুসারে উভয়ের কেহই স্বস্থানে সশরীরে বর্ত্তমান নাই। কিন্তু যখন ছিলেন তখন উভয়ের মধ্যে বন্ধন অত্যন্ত দৃঢ় ছিল। পিতৃমাতৃহীন গৌরীকান্তের যখন কোন জীবনোপায় ছিল না, তখন মুকুন্দলাল কেবলমাত্র মুখ দেখিয়া তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার উপরে নিজের ক্ষুদ্র বিষয় সম্পত্তি পর্য্যবেক্ষণের ভার দেন। কালে প্রমাণ হইল যে, মুকুন্দলাল ভুল করেন নাই। কীট যেমন করিয়া বল্মীক রচনা করে, স্বর্গকামী যেমন করিয়া পুণ্যসঞ্চয় করে, গৌরিকান্ত তেমনি করিয়া অশ্রান্ত যত্নে তিলে তিলে দিনে দিনে মুকুন্দলালের বিষয় বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। অবশেষে যখন তিনি কৌশলে আশ্চর্য্য

সুলভ মূল্যে তরফ বাঁকাগাড়ি ক্রয় করিয়া মুকুন্দলালের সম্পত্তিভুক্ত করিলেন, তখন হইতে মুকুন্দবাবুরা গণ্যমান্য জমিদার শ্রেণীতে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। প্রভুর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভৃত্যেরও উন্নতি হইল;—অল্পে অল্পে তাঁহার কোঠাবাড়ি, জোতজমা, এবং পূজার্চ্চনা বিস্তার লাভ করিল। এবং যিনি এককালে সামান্য তহশীলদার শ্রেণীর ছিলেন, তিনিও সাধারণের নিকট দেওয়ানজি নামে পরিচিত হইলেন।

ইহাই ভূতপূর্ব্ব কালের ইতিহাস। বর্ত্তমান কালে মুকুন্দ বাবুর একটি পোষ্য পুত্র আছেন, তাঁহার নাম বিনোদবিহারী। এবং গৌরীকান্তের সুশিক্ষিত নাতজামাই অম্বিকাচরণ তাঁহাদের ম্যানেজারের কাজ করিয়া থাকেন। দেওয়ানজি তাঁহার পুত্র রমাকান্তকে বিশ্বাস করিতেন না—সেই জন্য বার্দ্ধক্যবশতঃ নিজে যখন কাজ ছাড়িয়া দিলেন তখন পুত্রকে লঙ্ঘন করিয়া নাত-জামাই অম্বিকাকে আপন কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

কাজকর্ম্ম বেশ চলিতেছে; পূর্ব্বের আমলে যেমন ছিল এখনও সকলি প্রায় তেমনি আছে, কেবল একটা বিষয়ে একটু প্রভেদ ঘটিয়াছে; এখন প্রভু ভৃত্যের সম্পর্ক কেবল কাজকর্ম্মের সম্পর্ক—হৃদয়ের সম্পর্ক নহে। পূর্ব্বকালে টাকা শস্তা ছিল এবং হৃদয়টাও কিছু সুলভ ছিল, এখন সর্ব্বসম্মতিক্রমে হৃদয়ের বাজে খরচটা একপ্রকার রহিত হইয়াছে; নিতান্ত আত্মীয়ের ভাগেই টানাটানি পড়িয়াছে, তা বাহিরের লোক পাইবে কোথা হইতে।

ইতিমধ্যে বাবুদের বাড়িতে দৌহিত্রের বিবাহে বৌ-ভাতের নিমন্ত্রণে দেওয়ানজির পৌত্রী ইন্দ্রাণী গিয়া উপস্থিত হইল।

সংসারটা কৌতূহলী অদৃষ্টপুরুষের রাসায়ণিক পরীক্ষাশালা! এখানে কতকগুলা বিচিত্র-চরিত্র মানুষ একত্র করিয়া তাহাদের সংযোগ বিয়োগে নিয়ত কত চিত্রবিচিত্র অভূতপূর্ব্ব ইতিহাস সৃজিত হইতেছে, তাহার আর সংখ্যা নাই।

এই বৌভাতের নিমন্ত্রণস্থলে, এই আনন্দকার্য্যের মধ্যে দুটি দুই রকমের মানুষের দেখা হইল এবং দেখিতে দেখিতে সংসারের অশ্রান্ত জালবুনানীর মধ্যে একটা নূতন বর্ণের সূত্র উঠিয়া পড়িল এবং একটা নূতন রকমের গ্রন্থি পড়িয়া গেল।

সকলের আহারাদি শেষ হইয়া গেলে ইন্দ্রাণী বৈকালের দিকে কিছু বিলম্বে মনিববাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। বিনোদের স্ত্রী নয়নতারা যখন বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিল, ইন্দ্রাণী গৃহকর্ম্মের ব্যস্ততা, শারীরিক অস্বাস্থ্য প্রভৃতি দুই চারিটা কারণ প্রদর্শন করিল, কিন্তু তাহা কাহারও সন্তোষজনক বোধ হইল না।

প্রকৃত কারণ যদিও ইন্দ্রাণী গোপন করিল তথাপি তাহা বুঝিতে কাহারও বাকি রহিল না। সে কারণটি এই,—মুকুন্দবাবুরা প্রভু, ধনী বটেন কিন্তু কুলমর্য্যাদায় গৌরীকান্ত তাঁহাদের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। ইন্দ্রাণী সে শ্রেষ্ঠতা ভুলিতে পারে না। সেই জন্য মনিবের বাড়ি পাছে খাইতে হয় এই ভয়ে সে যথেষ্ট বিলম্ব করিয়া গিয়াছিল। তাহার অভিসন্ধি বুঝিয়া তাহাকে

খাওয়াইবার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করা হইয়াছিল কিন্তু ইন্দ্রাণী পরাস্ত হইবার মেয়ে নহে, তাহাকে কিছুতেই খাওয়ান গেল না।

একবার মুকুন্দ এবং গৌরীকান্ত বর্ত্তমানের কুলাভিমান লইয়া ইহা অপেক্ষা বৃহত্তর বিপ্লব বাধিয়াছিল। সে ঘটনা এই স্থানে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ইন্দ্রাণী দেখিতে বড় সুন্দর। আমাদের ভাষায় সুন্দরীর সহিত স্থির সৌদামিনীর তুলনা প্রসিদ্ধ আছে। সে তুলনা অধিকাংশ স্থলেই খাটে না, কিন্তু ইন্দ্রাণীকে খাটে। ইন্দ্রাণী যেন আপনার মধ্যে একটা প্রবল বেগ এবং প্রখর জ্বালা একটি সহজ শক্তির দ্বারা অটল গাম্ভীর্য্যপাশে অতি অনায়াসে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। বিদ্যুৎ তাহার মুখে চক্ষে এবং সর্ব্বাঙ্গে নিত্যকাল ধরিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে। এখানে তাহার চপলতা নিষিদ্ধ।

এই সুন্দরী মেয়েটিকে দেখিয়া মুকুন্দ বাবু তাঁহার পোষ্য পুত্রের সহিত ইহার বিবাহ দিবার প্রস্তাব গৌরীকান্তের নিকট উত্থাপিত করিয়াছিলেন। প্রভুভক্তিতে গৌরীকান্ত কাহারও নিকটে ন্যূন ছিলেন না; তিনি প্রভুর জন্য প্রাণ দিতে পারিতেন; এবং তাঁহার অবস্থার যতই উন্নতি হউক এবং কর্ত্তা তাহার প্রতি বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিয়া তাঁহাকে যতই প্রশ্রয় দিন তিনি কখনও ভ্রমেও স্বপ্নে প্রভুর সম্মান বিস্মৃত হন নাই; প্রভুর সম্মুখে, এমন কি, প্রভুর প্রসঙ্গে তিনি যেন সন্নত হইয়া পড়িতেন—কিন্তু এই বিবাহের প্রস্তাবে তিনি কিছুতেই সম্মত হন নাই। প্রভু-ভক্তির দেনা তিনি কড়ায় গণ্ডায় শোধ করিতেন, কুলমর্য্যাদার

পাওনা তিনি ছাড়িবেন কেন! মুকুন্দলালের পুত্রের সহিত তিনি তাঁহার পৌত্রীর বিবাহ দিতে পারেন না।

ভৃত্যের এই কুলগর্ব্ব মুকুন্দলালের ভাল লাগে নাই। তিনি আশা করিয়াছিলেন এই প্রস্তাবের দ্বারা তাঁহার ভক্ত সেবকের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করা হইবে; গৌরীকান্ত যখন কথাটা সে ভাবে লইলেন না তখন মুকুন্দলাল কিছুদিন তাঁহার সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত মনঃকষ্ট দিয়াছিলেন। প্রভুর এই বিমুখভাব গৌরীকান্তের বক্ষে মৃত্যুশেলের ন্যায় বাজিয়াছিল কিন্তু তথাপি তিনি তাঁহার পৌত্রীর সহিত পিতৃ-মাতৃহীন দরিদ্র কুলীনসন্তানের বিবাহ দিয়া তাহাকে ঘরে পালন করিয়া নিজের অর্থে শিক্ষা দান করিতে লাগিলেন।

সেই কুলমদগর্ব্বিত পিতামহের পৌত্রী ইন্দ্রাণী তাহার প্রভু-গৃহে গিয়া আহার করিল না; ইহাতে তাহার প্রভুপত্নী নয়ন-তারার অন্তঃকরণে সুমধুর প্রীতিরস উদ্বেলিত হইয়া উঠে নাই সে কথা বলা বাহুল্য। তখন ইন্দ্রাণীর অনেকগুলি স্পর্দ্ধা নয়নতারার বিদ্বেষকষায়িত কল্পনাচক্ষে প্রকাশ পাইতে লাগিল।

প্রথম, ইন্দ্রাণী অনেক গহনা-পরিয়া অত্যন্ত সুসজ্জিত হইয়া আসিয়াছিল। মনিববাড়িতে এত ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর করিয়া প্রভুদের সহিত সমকক্ষতা দেখাইবার কি আবশ্যক ছিল?

দ্বিতীয়, ইন্দ্রাণীর রূপের গর্ব্ব। ইন্দ্রাণীর রূপটা ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, এবং নিম্নপদস্থ ব্যক্তির এত অধিক রূপ পাওয়া অনাবশ্যক এবং অন্যায় হইতে পারে কিন্তু তাহার গর্ব্বটা

সম্পূর্ণ নয়নতারার কল্পনা। রূপের জন্য কাহাকেও দোষী করা যায় না, এই জন্য নিন্দা করিতে হইলে অগত্যা গর্ব্বের অবতারণা করিতে হয়।

তৃতীয়, ইন্দ্রাণীর দাম্ভিকতা,—চলিত ভাষায় যাহাকে বলে দেমাক্‌। ইন্দ্রাণীর একটি স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য ছিল। অত্যন্ত প্রিয় পরিচিত ব্যক্তি ব্যতীত সে কাহারও সহিত মাখামাখি করিতে পারিত না। তাহা ছাড়া গায়ে পড়িয়া একটা সোরগোল করা, অগ্রসর হইয়া সকল কাজে হস্তক্ষেপ করিতে যাওয়া সেও তাহার স্বভাবসিদ্ধ ছিলনা।

এইরূপ নানাপ্রকার অমূলক ও সমূলক কারণে নয়নতারা ক্রমশঃ উত্তপ্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। এবং অনাবশ্যক সূত্র ধরিয়া ইন্দ্রাণীকে "আমাদের ম্যানেজারের স্ত্রী" "আমাদের দেওয়ানের নাত্‌নী" বলিয়া বারম্বার পরিচিত ও অভিহিত করিতে লাগিল। তাহার একজন প্রিয় মুখরা দাসীকে শিখাইয়া দিল—সে ইন্দ্রাণীর গায়ের উপর পড়িয়া পরম সখীভাবে তাহার গহনাগুলি হাত দিয়া নাড়িয়া নাড়িয়া সমালোচনা করিতে লাগিল, —কণ্ঠী এবং বাজুবন্দের প্রশংসা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ ভাই, এ কি গিল্টিকরা ?"

ইন্দ্রাণী পরম গম্ভীর মুখে কহিল, "না, এ পিতলের!"

নয়নতারা ইন্দ্রাণীকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "ওগো, তুমি ওখানে একলা দাঁড়িয়ে কি করচ, এই খাবারগুলো হাটখোলার পাল্কীতে তুলে দিয়ে এস না।" অদূরে বাড়ির দাসী উপস্থিত ছিল।

ইন্দ্রাণী কেবল মুহূর্ত্তকালের জন্য তাহার বিপুলপক্ষ্মচ্ছায়াগভীর উদার দৃষ্টি মেলিয়া নয়নতারার মুখের দিকে চাহিল এবং পরক্ষণেই নীরবে মিষ্টান্নপূর্ণ সরা, খুরি তুলিয়া লইয়া হাটখোলার পাল্কীর উদ্দেশে নীচে চলিল।

যিনি এই মিষ্টান্ন উপহার প্রাপ্ত হইয়াছেন তিনি শশব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "তুমি কেন ভাই কষ্ট করচ, দাও না ঐ দাসীর হাতে দাও!"

ইন্দ্রাণী তাহাতে সম্মত না হইয়া কহিলেন, "এতে আর কষ্ট কিসের!"

অপরা কহিলেন, "তবে ভাই, আমার হাতে দাও!"

ইন্দ্রাণী কহিলেন, "না, আমিই নিয়ে যাচ্চি!"

বলিয়া, অন্নপূর্ণা যেমন স্নিগ্ধগম্ভীর মুখে সমুচ্চ স্নেহে ভক্তকে স্বহস্তে অন্ন তুলিয়া দিতে পারিতেন, তেমনি অটল স্নিগ্ধভাবে তিনি পাল্কীতে মিষ্টান্ন রাখিয়া আসিলেন—এবং সেই দুই মিনিটকালের সংস্রবে হাটখোলাবাসিনী ধনিগৃহ-বধূ এই অল্পভাষিণী মিতহাসিনী ইন্দ্রাণীর সহিত জন্মের মত প্রাণের সখীত্ব স্থাপনের জন্য উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

এইরূপে নয়নতারা স্ত্রীজনসুলভ নিষ্ঠুর নৈপুণ্যের সহিত যতগুলি অপমানশর বর্ষণ করিল ইন্দ্রাণী তাহার কোনটাকেই গায়ে বিঁধিতে দিল না;—সকলগুলিই তাহার অকলঙ্ক সমুজ্জ্বল সহজ তেজস্বিতার কঠিন বর্ম্মে ঠেকিয়া আপনি ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল। তাহার গম্ভীর অবিচলতা দেখিয়া নয়নতারার

আক্রোশ আরও বাড়িয়া উঠিতে লাগিল এবং ইন্দ্রাণী তাহা বুঝিতে পারিয়া এক সময় অলক্ষ্যে কাহারও নিকট বিদায় না লইয়া বাড়ি চলিয়া আসিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

যাহারা শান্তভাবে সহ্য করে তাহারা গভীরতররূপে আহত হয়; অপমানের আঘাত ইন্দ্রাণী যদিও অসীম অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, তথাপি তাহা তাহার অন্তরে বাজিয়াছিল।

ইন্দ্রাণীর সহিত যেমন বিনোদবিহারীর বিবাহের প্রস্তাব হইয়াছিল তেমনি এক সময় ইন্দ্রাণীর এক দূর সম্পর্কের নিঃস্ব পিস্তুতো ভাই বামাচরণের সহিত নয়নতারার বিবাহের কথা হয়;—সেই বামাচরণ এখন বিনোদের সেরেস্তায় একজন সামান্য কর্ম্মচারী। ইন্দ্রাণীর এখনো মনে পড়ে, বাল্যকালে একদিন নয়নতারার বাপ নয়নকে সঙ্গে করিয়া তাঁহাদের বাড়িতে আসিয়া বামাচরণের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহের জন্য গৌরীকান্তকে বিস্তর অনুনয় বিনয় করিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষে ক্ষুদ্র বালিকা নয়নতারার অসামান্য প্রগল্‌ভতায় গৌরীকান্তের অন্তঃপুরে সকলেই আশ্চর্য্য এবং কৌতুকান্বিত হইয়াছিলেন, এবং তাহার সেই

অকালপক্কতার নিকট মুখচোরা লাজুক ইন্দ্রাণী নিজেকে নিতান্ত অক্ষমা অনভিজ্ঞা জ্ঞান করিয়াছিল। গৌরীকান্ত সেই মেয়েটির অনর্গল কথায় বার্ত্তায় এবং চেহারায় বড়ই খুসী হইয়াছিলেন কিন্তু কুলের যৎকিঞ্চিৎ ত্রুটি থাকায় বামাচরণের সহিত ইহার বিবাহ প্রস্তাবে মত দিলেন না। অবশেষে তাঁহারই পছন্দে এবং তাঁহারই চেষ্টায় অকুলীন বিনোদের সহিত নয়নতারার বিবাহ হয়।

এই সকল কথা মনে করিয়া ইন্দ্রাণী কোন সান্ত্বনা পাইল না, বরং অপমান আরও বেশী করিয়া বাজিতে লাগিল। মহাভারতে বর্ণিত শুক্রাচার্য্যদুহিতা দেবযানী এবং শর্ম্মিষ্ঠার কথা মনে পড়িল। দেবযানী যেমন তাহার প্রভুকন্যা শর্ম্মিষ্ঠার দর্পচূর্ণ করিয়া তাহাকে দাসী করিয়াছিল, ইন্দ্রাণী যদি তেমনি করিতে পারিত তবেই যথোপযুক্ত বিধান হইত। এক সময় ছিল, যখন দৈত্যদের নিকট দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের ন্যায় মুকুন্দ বাবুর পরিবারবর্গের নিকট তাহার পিতামহ গৌরীকান্ত একান্ত আবশ্যক ছিলেন। তখন তিনি যদি ইচ্ছা করিতেন তবে মুকুন্দ বাবুকে হীনতা স্বীকার করাইতে পারিতেন—কিন্তু তিনিই মুকুন্দলালের বিষয়-সম্পত্তিকে উন্নতির চরম সীমায় উত্তীর্ণ করিয়া দিয়া সর্ব্বপ্রকার শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, অতএব আজ আর তাঁহাকে স্মরণ করিয়া প্রভুদের কৃতজ্ঞ হইবার আবশ্যকতা নাই। ইন্দ্রাণী মনে করিল, বাঁকাগাড়ি পরগণা তাহার পিতামহ অনায়াসে নিজের জন্যই কিনিতে পারিতেন, তখন তাঁহার সে ক্ষমতা জন্মিয়াছিল, তাহা

না করিয়া তিনি সেটা মনিবকে কিনিয়া দিলেন—ইহা যে এক-প্রকার দান করা সে কথা কি আজ সেই মনিবের বংশে কেহ মনে করিয়া রাখিয়াছে ? আমাদেরই দত্ত ধনমানের গর্ব্বে তোমরা আমাদিগকে আজ অপমান করিবার অধিকার পাইয়াছ ইহাই মনে করিয়া ইন্দ্রাণীর চিত্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া সে দেখিল তাহার স্বামী প্রভুগৃহের নিমন্ত্রণ ও তাহার পরে জমিদারী কাছারির সমস্ত কাজকর্ম্ম সারিয়া তাঁহার শয়নকক্ষের একটি কেদারা আশ্রয় করিয়া নিভৃতে খবরের কাগজ পাঠ করিতেছেন।

অনেকের ধারণা আছে যে স্বামী স্ত্রীর স্বভাব প্রায়ই একরূপ হইয়া থাকে। তাহার কারণ, দৈবাৎ কোন কোন স্থলে স্বামী-স্ত্রীর স্বভাবের মিল দেখিতে পাইলে সেটা আমাদের নিকট এমন সমুচিত এবং সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় যে, আমরা আশা করি এই নিয়ম বুঝি অধিকাংশ স্থলেই খাটে। যাহা হউক, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে অম্বিকাচরণের সহিত ইন্দ্রাণীর দুই একটা বিশেষ বিষয়ে বাস্তবিক স্বভাবের মিল দেখা যায়। অম্বিকাচরণ তেমন মিশুক্ লোক নহেন। তিনি বাহিরে যান কেবলমাত্র কাজ করিতে। নিজের কাজ সম্পূর্ণ শেষ করিয়া এবং অন্যকে পূরামাত্রায় কাজ করাইয়া লইয়া বাড়ি আসিয়া যেন তিনি অনাত্মীয়তার আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য এক দুর্গম দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করেন। বাহিরে তিনি এবং তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম, ঘরের মধ্যে তিনি এবং তাঁহার ইন্দ্রাণী, ইহাতেই তাঁহার সমস্ত জীবন পর্য্যাপ্ত।

ভূষণের ছটা বিস্তার করিয়া যখন সুসজ্জিতা ইন্দ্রাণী ঘরে প্রবেশ করিলেন, তখন অম্বিকাচরণ তাঁহাকে পরিহাস করিয়া কি একটা কথা বলিবার উপক্রম করিলেন, কিন্তু সহসা ক্ষান্ত হইয়া চিন্তিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার কি হয়েচে ?"

ইন্দ্রাণী তাঁহার সমস্ত চিন্তা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া কহিলেন, "কি আর হবে ? সম্প্রতি আমার স্বামী রত্নের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েচে।"

অম্বিকা খবরের কাগজ ভূমিতলে ফেলিয়া দিয়া কহিলেন—"সে ত আমার অগোচর নেই। তৎপূর্ব্বে ?

ইন্দ্রাণী একে একে গহনা খুলিতে খুলিতে বলিলেন, "তৎ-পূর্ব্বে স্বামিনীর কাছ থেকে সমাদর লাভ হয়েচে।"

অম্বিকা জিজ্ঞাসা করিলেন—"সমাদরটা কি রকমের ?"

ইন্দ্রাণী স্বামীর কাছে আসিয়া তাঁহার কেদারার হাতার উপর বসিয়া তাঁহার গ্রীবা বেষ্টন করিয়া উত্তর করিল, "তোমার কাছ থেকে যে রকমের পাই ঠিক সেই রকমের নয়।"

তাহার পর, ইন্দ্রাণী একে একে সকল কথা বলিয়া গেল। সে মনে করিয়াছিল স্বামীর কাছে এ সকল অপ্রিয় কথার উত্থাপন করিবে না ; কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইল না, এবং ইহার অনুরূপ প্রতিজ্ঞাও ইন্দ্রাণী ইতিপূর্ব্বে কখনও রক্ষা করিতে পারে নাই। বাহিরের লোকের নিকট ইন্দ্রাণী যতই সংযত সমাহিত হইয়া থাকিত, স্বামীর নিকটে সে সেই পরিমাণে আপন প্রকৃতির

সমুদয় স্বাভাবিক বন্ধন মোচন করিয়া ফেলিত—সেখানে লেশমাত্র আত্মগোপন করিতে পারিত না।

অম্বিকাচরণ সমস্ত ঘটনা শুনিয়া মর্ম্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, এখনি আমি কাজে ইস্তফা দিব। তৎক্ষণাৎ তিনি বিনোদ বাবুকে এক কড়া চিঠি লিখিতে উদ্যত হইলেন।

ইন্দ্রাণী তখন চৌকির হাতা হইতে নীচে নামিয়া মাদুরপাতা মেজের উপর স্বামীর পায়ের কাছে বসিয়া তাঁহার কোলের উপর বাহু রাখিয়া বলিল—"এত তাড়াতাড়ি কাজ নেই। চিঠি আজ থাক্। কাল সকালে যা হয় স্থির কোরো।"

অম্বিকা উত্তেজিত হইযা উঠিয়া কহিলেন, "না, আর এক দণ্ড বিলম্ব করা উচিত নয়।"

ইন্দ্রাণী তাহার পিতামহের হৃদয়মৃণালে একটিমাত্র পদ্মের মত ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার অন্তর হইতে সে যেমন স্নেহরস আকর্ষণ করিয়া লইয়াছিল তেমনি পিতামহের চিত্তসঞ্চিত অনেকগুলি ভাব সে অলক্ষ্যে গ্রহণ করিয়াছিল। মুকুন্দলালের পরিবারের প্রতি গৌরীকান্তের যে একটি নিষ্ঠা ও ভক্তি ছিল ইন্দ্রাণী যদিও তাহা সম্পূর্ণ প্রাপ্ত হয় নাই, কিন্তু প্রভুপরিবারের হিতসাধনে জীবন অর্পণ করা যে তাহাদের কর্ত্তব্য, এই ভাবটি তাহার মনে দৃঢ় বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। তাহার সুশিক্ষিত স্বামী ইচ্ছা করিলে ওকালতী করিতে পারিতেন, সম্মানজনক কাজ লইতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহার স্ত্রীর হৃদয়ের দৃঢ় সংস্কার অনুসরণ করিয়া তিনি অনন্যমনে সন্তুষ্টচিত্ত বিনোদের বিষয়-

সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন । ইন্দ্রাণী যদিও অপমানে আহত হইয়াছিল, তথাপি তাহার স্বামী যে বিনোদলালের কাজ ছাড়িয়া দিবে এ তাহার কিছুতেই মনে লইল না।

ইন্দ্রাণী তখন যুক্তির অবতারণা করিয়া মৃদু মিষ্ট স্বরে কহিল,—"বিনোদ বাবুর ত কোন দোষ নেই, তিনি এর কিছুই জানেন না—তাঁর স্ত্রীর উপর রাগ করে তুমি হঠাৎ তাড়াতাড়ি তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করিতে যাবে কেন।

শুনিয়া অম্বিকা বাবু উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন,—নিজের সংকল্প তাঁহার নিকট অত্যন্ত হাস্যকর বলিয়া বোধ হইল। তিনি কহিলেন, "সে একটা কথা বটে! কিন্তু মনিব হোন আর যিনিই হোন্ ওদের ওখানে আর কখন তোমাকে পাঠাচ্চিনে।"

এই অল্প একটু ঝড়েই সেদিনকার মত মেঘ কাটিয়া গেল, গৃহ প্রসন্ন হইয়া উঠিল এবং স্বামীর বিশেষ আদেরে ইন্দ্রাণী বাহিরের সমস্ত অনাদর বিস্মৃত হইয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিনোদবিহারী অম্বিকাচরণের উপর সম্পূর্ণ ভার দিয়া জমিদারীর: কাজ কিছুই দেখিতেন না নিতান্ত-নির্ভর ও অতিনিশ্চয়তা-বশতঃ কোন কোন স্বামী ঘরের স্ত্রীকে যেরূপ অবহেলার চক্ষে দেখিয়া থাকে, নিজের জমিদারীর প্রতিও বিনোদের কতকটা

সেই ভাবের উপেক্ষা ছিল। জমিদারীর আয় এতই নিশ্চিত এতই বাঁধা যে তাহাকে আয় বলিয়া বোধ হয় না—তাহা অভ্যস্ত এবং তাহার কোন আকর্ষণ ছিল না।

বিনোদের ইচ্ছা ছিল, একটা সংক্ষেপ সুড়ঙ্গপথ অবলম্বন করিয়া হঠাৎ এক রাত্রির মধ্যে কুবেরের ভাণ্ডারের মধ্যে প্রবেশ করিবেন। সেই জন্য নানা লোকের পরামর্শে তিনি গোপনে নানা প্রকার আজ্‌গবী ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিতেন। কখনও স্থির হইত দেশের সমস্ত বাব্‌লা গাছ জমা লইয়া গোরুর গাড়ির চাকা তৈরি করিবেন, কখনও পরামর্শ হইত সুন্দর বনের সমস্ত মধুচক্র তিনি আহরণ করিবেন, কখনও লোক পাঠাইয়া পশ্চিম প্রদেশের বনগুলি বন্দোবস্ত করিয়া হরীতকার ব্যবসায় একচেটে করিবার আয়োজন হইত। বিনোদ মনে মনে ইহা বুঝিতেন যে, অন্য লোক শুনিলে হাসিবে, সেই জন্য কাহারও কাছে প্রকাশ করিতে চাহিতেন না। বিশেষতঃ অম্বিকাচরণকে তিনি একটু বিশেষ লজ্জা করিতেন; অম্বিকা পাছে মনে করেন তিনি টাকাগুলো নষ্ট করিতে বসিয়াছেন সেজন্য মনে মনে সঙ্কুচিত ছিলেন। অম্বিকার নিকট তিনি এমনভাবেই থাকিতেন যেন অম্বিকাই জমিদার এবং তিনি কেবল বসিয়া থাকিবার জন্য বার্ষিক কিছু বেতন পাইতেন।

নিমন্ত্রণের পরদিন হইতে নয়নতারা তাঁহার স্বামীর কানে মন্ত্র দিতে লাগিলেন। তুমি ত নিজে কিছুই দেখ না, তোমাকে অম্বিকা হাত তুলিয়া যাহা দেয় তাহাই শিরোধার্য্য করিয়া লও';

এদিকে ভিতরে ভিতরে কি সর্ব্বনাশ হইতেছে তাহা কেহই জানে না। তোমার ম্যানেজারের স্ত্রী যা গয়না পরিয়া আসিয়াছিল, এমন গয়না তোমার ঘরে আসিয়া আমি কখনো চক্ষেও দেখি নাই। এ সব গয়না সে পায় কোথা হইতে এবং এই দেমাকই বা তাহার বাড়িল কিসের জোরে! ইত্যাদি ইত্যাদি গহনার বর্ণনা নয়নতারা অনেকটা অতিরঞ্জিত করিয়া বলিল, এবং ইন্দ্রাণী নিজমুখে তাহার দাসীকে কি সকল কথা বলিয়া গেছে তাহাও সে বহুল পরিমাণে রচনা করিয়া গেল।

বিনোদ দুর্ব্বল প্রকৃতির লোক—একদিকে সে পরের প্রতি নির্ভর করিয়াও থাকিতে পারে না, অপরদিকে যে তাহার কানে যেরূপ সন্দেহ তুলিয়া দেয় সে তাহাই বিশ্বাস করিয়া বসে। ম্যানেজার যে চুরি করিতেছে মুহূর্ত্তকালের মধ্যেই এ বিশ্বাস তাহার দৃঢ় হইল। বিশেষতঃ কাজ সে নিজে দেখে না বলিয়া কল্পনায় সে নানাপ্রকার বিভীষিকা দেখিতে লাগিল—অথচ কেমন করিয়া ম্যানেজারের চুরি ধরিতে হইবে তাহারও রাস্তা সে জানে না। স্পষ্ট করিয়া তাহাকে কিছু বলিতে পারে এমন সাহস নাই—মহা মুস্কিল হইল।

অম্বিকাচরণের একাধিপত্যে কর্ম্মচারিগণ সকলেই ঈর্ষ্যান্বিত ছিল। বিশেষতঃ গৌরীকান্ত তাঁহার যে দূরসম্পর্কীয় ভাগিনেয় বামাচরণকে কাজ দিয়াছিলেন অম্বিকার প্রতি বিদ্বেষ তাহারই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল। কারণ, সম্পর্ক প্রভৃতি অনুসারে সে নিজেকে অম্বিকার সমান জ্ঞান করিত এবং অম্বিকা তাহার

আত্মীয় হইয়াও কেবলমাত্র ঈর্ষ্যাবশতঃই তাহাকে উচ্চপদ দিতেছে না, এ ধারণা তাহার দৃঢ় ছিল। পদ পাইলেই পদের উপযুক্ত যোগ্যতা আপনি যোগায় এই তাহার মত। বিশেষত ম্যানেজারের কাজকে সে অত্যন্ত তুচ্ছজ্ঞান করিত; বলিত, সেকালে রথের উপর যেমন ধ্বজা থাকিত, আজকাল আপিসের কাজে ম্যানেজার সেইরূপ—ঘোড়াবেটা খাটিয়া মরে আর ধ্বজা মহাশয় রথের সঙ্গে সঙ্গে কেবল দর্পভরে দুলিতে থাকেন।

বিনোদ ইতিপূর্ব্বে কাজকর্ম্মের কোন খোঁজখবর লইত না—কেবল যখন ব্যবসা উপলক্ষে হঠাৎ অনেক টাকার প্রয়োজন হইত তখন গোপনে খাজাঞ্চিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিত, এখন তহবিলে কত টাকা আছে? খাজাঞ্চি টাকার পরিমাণ বলিলে কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া সে টাকাটা চাহিয়া ফেলিত—যেন তাহা পরের টাকা। খাজাঞ্চি তাহার নিকট সই লইয়া টাকা দিত তাহার পরে কিছু কাল ধরিয়া অম্বিকা বাবুর নিকট বিনোদ কুণ্ঠিত হইয়া থাকিত। কোন মতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না হইলেই আরাম বোধ করিত।

অম্বিকাচরণ মাঝে মাঝে ইহা লইয়া বিপদে পড়িতেন। কারণ জমিদারের অংশ জমিদারকে দিয়া তহবিলে প্রায় আমানতী সদরখাজনা, অথবা আমলাবর্গের বেতন প্রভৃতি খরচের টাকা জমা থাকিত। সে টাকা অন্যায় ব্যয় হইয়া গেলে বড়ই অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। কিন্তু বিনোদ টাকাটি লইয়া এমনি চোরের মত লুকাইয়া বেড়াইত, যে, তাহাকে এ সম্বন্ধে কোন কথা

বলিবার অবসর পাইয়া যাইত না—পত্র লিখিলেও কোন ফল হইত না—কারণ, লোকটার কেবল চক্ষুলজ্জা ছিল আর কোন লজ্জা ছিল না, এই জন্য সে কেবল সাক্ষাৎকারকে ডরাইত।

ক্রমে যখন বিনোদ বাড়াবাড়ি করিতে লাগিল, তখন অম্বিকাচরণ বিরক্ত হইয়া লোহার সিন্ধুকের চাবি নিজের কাছে রাখিলেন। বিনোদের গোপনে টাকা লওয়া একেবারে বন্ধ হইল। অথচ লোকটা এতই দুর্ব্বলপ্রকৃতি যে, প্রভু হইয়াও স্পষ্ট করিয়া এ সম্বন্ধে কোন প্রকার বল খাটাইতে পারিল না। অম্বিকাচরণের বৃথা চেষ্টা! অলক্ষ্মী যাহার সহায় লোহার সিন্ধুকের চাবি তাহার টাকা আটক করিয়া রাখিতে পারে না। বরং তিতে বিপরীত হইল। কিন্তু সে সকল কথা পরে হইবে।

অম্বিকাচরণের কড়া নিয়মে বিনোদ ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত উত্যক্ত হইয়াছিল। এমন সময় নয়নতারা যখন তাহার মনে সন্দেহ জন্মাইয়া দিল তখন সে কিছু খুসি হইল। গোপনে একে একে নিম্নতন কর্ম্মচারীদিগকে ডাকিয়া সন্ধান লইতে লাগিল। তখন বামাচরণ তাহার প্রধান চর হইয়া উঠিল।

গৌরীকান্তের আমলে দেওয়ানজি বলপূর্ব্বক পার্শ্ববর্ত্তী জ...দারের জমিতে হস্তক্ষেপ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না এমন করিয়া তিনি অনেকের অনেক জমি অপহরণ করিয়াছেন। কিন্তু অম্বিকাচরণ কখনও সে কাজে প্রবৃত্ত হইতেন না। এবং মকদ্দমা বাধিবার উপক্রম হইলে তিনি যথাসাধ্য আপষের চেষ্টা করিতেন। বামাচরণ ইহারই প্রতি প্রভুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। স্পষ্ট বুঝাইয়া

দিল, অম্বিকাচরণ নিশ্চয় অপরপক্ষ হইতে ঘুষ লইয়া মনিবের ক্ষতি করিয়া আপষ করিয়াছে। বামাচরণের নিজেরও বিশ্বাস তাহাই—যাহার হাতে ক্ষমতা আছে সে যে ঘুষ না লইয়া থাকিতে পারে ইহা সে মরিয়া গেলেও বিশ্বাস করিতে পারে না।

এইরূপে গোপনে নানা মুখ হইতে ফুৎকার পাইয়া বিনোদের সন্দেহ শিখা ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল—কিন্তু সে প্রত্যক্ষভাবে কোন উপায় অবলম্বন করিতেই সাহস করিল না। এক চক্ষুলজ্জা, দ্বিতীয়তঃ আশঙ্কা, পাছে সমস্ত অবস্থাভিজ্ঞ অম্বিকাচরণ তাহার কোন অনিষ্ট করে।

অবশেষে নয়নতারা স্বামীর এই কাপুরুষতায় জ্বলিয়া পুড়িয়া বিনোদের অজ্ঞাতসারে একদিন অম্বিকাচরণকে ডাকিয়া পর্দ্দার আড়াল হইতে বলিলেন—"তোমাকে আর রাখা হবে না, তুমি বামাচরণকে সমস্ত হিসেব বুঝিয়ে দিয়ে চলে যাও!"

তাঁহার সম্বন্ধে বিনোদের নিকট আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে সে কথা অম্বিকা পূর্ব্বেই আভাসে জানিতে পারিয়াছিলেন, সেই জন্য নয়নতারার কথায় তিনি তেমন আশ্চর্য্য হন নাই; তৎক্ষণাৎ বিনোদবিহারীর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে কি আপনি কাজ থেকে নিষ্কৃতি দিতে চান?"

বিনোদ শশব্যস্ত হইয়া কহিল, "না, কখনই না।"

অম্বিকাচরণ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার উপর কি আপনার কোন সন্দেহের কারণ ঘটেছে?"

বিনোদ অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া কহিল—"কিছুমাত্র না!" অম্বিকাচরণ নয়নতারার ঘটনা উল্লেখমাত্র না করিয়া আপিসে চলিয়া আসিলেন—বাড়িতে ইন্দ্রাণীকেও কিছু বলিলেন না। এইভাবে কিছুদিন গেল।

এমন সময় অম্বিকাচরণ ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় পড়িলেন। শক্ত ব্যামো নহে, কিন্তু দুর্ব্বলতাবশতঃ অনেকদিন আপিস কামাই করিতে হইল।

সেই সময় সদর খাজনা দেয় এবং অন্যান্য কাজের বড় ভীড়। সেই জন্য একদিন সকালে রোগশয্যা ত্যাগ করিয়া অম্বিকাচরণ হঠাৎ আপিসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সে দিন কেহই তাঁহাকে প্রত্যাশা করে নাই, এবং সকলেই বলিতে লাগিল, আপনি বাড়ি যান, এত কাহিল শরীরে কাজ করিবেন না।

অম্বিকাচরণ নিজের দুর্ব্বলতার প্রসঙ্গ উড়াইয়া দিয়া, ডেস্কে গিয়া বসিলেন। আম্‌লারা সকলেই কিছু যেন অস্থির হইয়া উঠিল এবং হঠাৎ অত্যন্ত অতিরিক্ত মনোযোগের সহিত নিজ নিজ কাজে প্রবৃত্ত হইল।

অম্বিকা ডেস্ক্‌ খুলিয়া দেখেন তাহার মধ্যে তাঁহার একখানি কাগজও নাই। সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ কি'; সকলেই যেন আকাশ হইতে পড়িল, চোরে লইয়াছে, কি, ভূতে লইয়াছে, কেহ ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না।

বামাচরণ কহিল, "আরে মশায়, আপনারা ন্যাকামি রেখে

দিন্! সকলেই জানেন, ওর কাগজপত্র বাবু নিজে তলব করে নিয়ে গেছেন।”

অম্বিকা রুদ্ধ রোষে শ্বেতবর্ণ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ‘কেন?’

বামাচরণ কাগজ লিখিতে লিখিতে বলিল, “সে আমরা কেমন করে বল্‌ব?”

বিনোদ অম্বিকাচরণের অনুপস্থিতি সুযোগে বামাচরণের মন্ত্রণাক্রমে নূতন চাবি তৈয়ার করাইয়া ম্যানেজারের প্রাইভেট্ ডেস্ক খুলিয়া তাঁহার সমস্ত কাগজপত্র পরীক্ষা করিতে লইয়া গিয়াছেন। চতুর বামাচরণ সে কথা গোপন করিল না—অম্বিকা অপমানিত হইয়া কাজে ইস্তফা দেন ইহা তাহার অনভিপ্রেত ছিল না।

অম্বিকাচরণ ডেস্কে চাবি লাগাইয়া কম্পিতদেহে বিনোদের সন্ধানে গেলেন—বিনোদ বলিয়া পাঠাইল তাহার মাথা ধরিয়াছে; সেখান হইতে বাড়ি গিয়া হঠাৎ দুর্ব্বলদেহে বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। ইন্দ্রাণী তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে তাহার সমস্ত হৃদয় দিয়া যেন আবৃত করিয়া ধরিল। ক্রমে ইন্দ্রাণী সকল কথা শুনিল।

স্থির সৌদামিনী আজ স্থির রহিল না—তাহার বক্ষ ফুলিতে লাগিল, বিস্ফারিত মেঘকৃষ্ণ চক্ষুপ্রান্ত হইতে উন্মুক্ত বজ্রশিখা সুতীব্র উগ্রজ্বালা বিক্ষেপ করিতে লাগিল। এমন স্বামীর এমন অপমান! এত বিশ্বাসের এই পুরস্কার!

ইন্দ্রাণীর এই অত্যুগ্র নিঃশব্দ রোষদাহ দেখিয়া অম্বিকার

রাগ থামিয়া গেল—তিনি যেন দেবতার শাসন হইতে পাপীকে
জন্য ইন্দ্রাণীর হাত ধরিয়া বলিলেন—"বিনোদ
ছেলেমানুষ, দুর্ব্বলস্বভাব, পাঁচ জনের কথা শুনে তার মন
বিগ্‌ড়ে গেছে!"

তখন ইন্দ্রাণী দুই হস্তে তাহার স্বামীর গলদেশ বেষ্টন করিয়া তাঁহাকে বক্ষের কাছে টানিয়া লইয়া আবেগের সহিত চাপিয়া ধরিল এবং হঠাৎ তাহার দুই চক্ষুর রোষদীপ্তি ম্লান করিয়া দিয়া ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া অশ্রুজল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। পৃথিবীর সমস্ত অন্যায় হইতে সমস্ত অপমান হইতে দুই বাহুপাশে টানিয়া লইয়া সে যেন তাহার হৃদয়দেবতাকে আপন হৃদয় মন্দিরে তুলিয়া রাখিতে চায়!

স্থির হইল অম্বিকাচরণ এখনি কাজ ছাড়িয়া দিবেন,—আজ আর কেহ তাহাতে কিছুমাত্র প্রতিবাদ করিল না। কিন্তু যখন সন্দিগ্ধ প্রভু নিজেই অম্বিকাকে ছাড়াইতে উদ্যত, তখন কাজ ছাড়িয়া দিয়া তাহার আর কি শাসন হইল? কাজে জবাব দিবার সঙ্কল্প করিয়াই অম্বিকার রাগ থামিয়া গেল, কিন্তু সকল কাজকর্ম্ম সকল আরাম বিশ্রামের মধ্যে ইন্দ্রাণীর রাগ তাহার হৃৎপিণ্ডের মধ্যে জ্বলিতে লাগিল।

পরিশিষ্ট।

এমন সময়ে চাকর আসিয়া খবর দিল বাবুদের বাড়ির খাজাঞ্চি আসিয়াছে। অম্বিকা মনে করিলেন, বিনোদ স্বাভাবিক

চক্ষুলজ্জাবশতঃ খাজাঞ্চির মুখ দিয়া তাঁহাকে কাজ হইতে জবাব দিয়া পাঠাইয়াছেন। সেই জন্য নিজেই একখানি ইস্তফাপত্র লিখিয়া খাজাঞ্চির হস্তে গিয়া দিলেন।

খাজাঞ্চি তৎসম্বন্ধে কোন প্রশ্ন না করিয়া কহিল, সর্ব্বনাশ হইয়াছে! অম্বিকা জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হইয়াছে।

তদুত্তরে শুনিলেন, যখন হইতে অম্বিকাচরণের সতর্কতাবশতঃ খাজাঞ্চিখানা হইতে বিনোদের টাকা লওয়া বন্ধ হইয়াছে, তখন হইতে বিনোদ নানা স্থান হইতে গোপনে বিস্তর টাকা ধার লইতে আরম্ভ করিয়াছিল। একটার পর আর একটা ব্যবসা ফাঁদিয়া সে যতই প্রতারিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছিল ততই তাহার রোখ্ চড়িয়া যাইতেছিল—ততই নূতন নূতন অসম্ভব উপায়ে আপন ক্ষতি নিবারণের চেষ্টা করিয়া অবশেষে আকণ্ঠ ঋণে নিমগ্ন হইয়াছে। অম্বিকাচরণ যখন পীড়িত ছিলেন তখন বিনোদ সেই সুযোগে তহবিল হইতে সমস্ত টাকা উঠাইয়া লইয়াছে। বাঁকাগাড়ি পরগণা অনেককাল হইতেই পার্শ্ববর্ত্তী জমিদারের নিকট রেহেনে আবদ্ধ; সে এ পর্য্যন্ত টাকার জন্য কোন প্রকার তাগাদা না দিয়া অনেক টাকা সুদ জমিতে দিয়াছে, এখন সময় বুঝিয়া হঠাৎ ডিক্রী করিয়া লইতে উদ্যত হইয়াছে। এই ত বিপদ।

শুনিয়া অম্বিকাচরণ কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। অবশেষে কহিলেন, "আজ কিছুই ভেবে উঠতে পারচিনে—কাল এর পরামর্শ করা যাবে।" খাজাঞ্চি যখন বিদায় লইতে উঠিলেন তখন অম্বিকা তাঁহার ইস্তফাপত্র চাহিয়া লইলেন।

অন্তঃপুরে আসিয়া অম্বিকা ইন্দ্রাণীকে সকল কথা বিস্তারিত জানাইয়া কহিলেন—বিনোদের এ অবস্থায় ত আমি কাজ ছেড়ে দিতে পারিনে।

ইন্দ্রাণী অনেকক্ষণ প্রস্তরমূর্ত্তির মত স্থির হইয়া রহিল। অবশেষে অন্তরের সমস্ত বিরোধদ্বন্দ্ব সবলে দলন করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—"না, এখন ছাড়তে পার না।"

তাহার পরে কোথায় টাকা কোথায় টাকা করিয়া সন্ধান পড়িয়া গেল—যথেষ্ট পরিমাণে টাকা আর জুটে না। অন্তঃপুর হইতে গহনাগুলি সংগ্রহ করিবার জন্য অম্বিকা বিনোদকে পরামর্শ দিলেন। ইতিপূর্ব্বে ব্যবসা উপলক্ষে বিনোদ সে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কখন কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এবারে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া, অনেক কাঁদিয়া কাটিয়া, অনেক দীনতা স্বীকার করিয়া গহনাগুলি ভিক্ষা চাহিলেন। নয়নতারা কিছুতেই দিলেন না;—তিনি মনে করিলেন, তাঁহার চারিদিক হইতে সকলি খসিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে; এখন এই গহনাগুলি তাঁহার একমাত্র শেষ অবলম্বনস্থল—এবং ইহা তিনি অন্তিম আগ্রহ সহকারে প্রাণপণে চাপিয়া ধরিলেন।

যখন কোথা হইতেও কোন টাকা পাওয়া গেল না, তখন ইন্দ্রাণীর প্রতিহিংসা-ভ্রূকুটির উপরে একটা তীব্র আনন্দের জ্যোতিঃ পতিত হইল। সে তাহার স্বামীর হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "তোমার যাহা কর্ত্তব্য তাহা ত করিয়াছ এখন তুমি ক্ষান্ত হও, যাহা হইবার তা হউক।"

স্বামীর অবমাননায় উদ্দীপ্ত সতীর রোষানল এখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই, দেখিয়া অম্বিকা মনে মনে হাসিলেন। বিপদের দিনে অসহায় বালকের ন্যায় বিনোদ তাঁহার উপরে এমন একান্ত নির্ভর করিয়াছে যে, তাহার প্রতি তাঁহার দয়ার উদ্রেক হইয়াছে—এখন তাহাকে তিনি কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারেন না। তিনি মনে করিতেছিলেন, তাঁহার নিজের বিষয় আবদ্ধ রাখিয়া টাকা উঠাইবার চেষ্টা করিবেন। কিন্তু ইন্দ্রাণী তাঁহাকে মাথার দিব্য দিয়া বলিল, "ইহাতে আর তুমি হাত দিতে পারিবে না!"

অম্বিকাচরণ বড় ইতস্ততের মধ্যে পড়িয়া ভাবিতে বসিয়া গেলেন। তিনি ইন্দ্রাণীকে আস্তে আস্তে বুঝাইবার যতই চেষ্টা করিতে লাগিলেন ইন্দ্রাণী কিছুতেই তাঁহাকে কথা কহিতে দিল না। অবশেষে অম্বিকা কিছু বিমর্ষ হইয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন।

তখন ইন্দ্রাণী লোহার সিন্দুক খুলিয়া তাহার সমস্ত গহনা একটি বৃহৎ থালায় স্তূপাকার করিল এবং সেই গুরুভার থালাটি বহুকষ্টে দুই হস্তে তুলিয়া ঈষৎ হাসিয়া তাহার স্বামীর পায়ের কাছে রাখিল।

পিতামহের একমাত্র স্নেহের ধন ইন্দ্রাণী পিতামহের নিকট হইতে জন্মাবধি বৎসরে বৎসরে বহুমূল্য অলঙ্কার উপহার পাইয়া আসিয়াছে; মিতাচারী স্বামীরও জীবনের অধিকাংশ সঞ্চয় এই সন্তানহীন রমণীর ভাণ্ডারে অলঙ্কাররূপে রূপান্তরিত হইয়াছে। সেই সমস্ত স্বর্ণ মাণিক্য স্বামীর নিকট উপস্থিত করিয়া ইন্দ্রাণী

কহিল, "আমার এই গহনাগুলি দিয়া আমার পিতামহের দত্ত দান উদ্ধার করিয়া আমি পুনর্ব্বার তাঁহার প্রভুবংশকে দান করিব।"

এই বলিয়া সে সজল চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মস্তক নত করিয়া কল্পনা করিল, তাহার সেই বিরলশুভ্রকেশধারী, শান্তস্নেহ-হাস্যময়, ধী-প্রদীপ্ত উজ্জলগৌরকান্তি বৃদ্ধ পিতামহ এই মুহূর্ত্তে এখানে উপস্থিত আছেন, এবং তাহার নত মস্তকে শীতল স্নেহহস্ত রাখিয়া তাহাকে নীরবে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন।

বাঁকাগাড়ি পরগণা পুনশ্চ ক্রয় হইয়া গেল, তখন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া গতভূষণা ইন্দ্রাণী আবার নয়নতারার অন্তঃপুরে নিমন্ত্রণে গমন করিল ; আর তাহার মনে কোন অপমান বেদনা রহিল না।

ঠাকুর্দ্দা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নয়নজোড়ের জমিদারেরা এককালে বাবু বলিয়া বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন। তখনকার কালের বাবুয়ানার আদর্শ বড় সহজ ছিল না। এখন যেমন রাজা রায়বাহাদুর খেতাব অর্জ্জন করিতে অনেক খানা নাচ ঘোড়দৌড় এবং সেলাম সুপারিশের শ্রাদ্ধ করিতে হয়, তখনও সাধারণের নিকট হইতে বাবু উপাধি লাভ করিতে বিস্তর দুঃসাধ্য তপশ্চরণ করিতে হইত।

আমাদের নয়নজোড়ের বাবুরা পাড় ছিঁড়িয়া ফেলিয়া ঢাকাই কাপড় পরিতেন, কারণ পাড়ের কর্কশতায় তাঁহাদের সুকোমল বাবুয়ানা ব্যথিত হইত। তাঁহারা লক্ষ টাকা দিয়া বিড়ালশাবকের বিবাহ দিতেন এবং কথিত আছে, একবার কোন উৎসব উপলক্ষে রাত্রিতে দিন করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া অসংখ্য দীপ জ্বালাইয়া সূর্য্যকিরণের অনুকরণে তাঁহারা সাঁচ্চা রূপার জরি উপর হইতে বর্ষণ করাইয়াছিলেন।

ইহা হইতেই সকলে বুঝিবেন সেকালে বাবুদের বাবুয়ানা বংশানুক্রমে স্থায়ী হইতে পারিত না। বহু-বর্ত্তিকা-বিশিষ্ট প্রদীপের মত নিজের তৈল নিজে অল্পকালের ধূমধামেই নিঃশেষ করিয়া দিত।

আমাদের কৈলাসচন্দ্র রায় চৌধুরী সেই প্রখ্যাতযশ নয়ন-জোড়ের একটি নির্ব্বাপিত বাবু। ইনি যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তৈল তখন প্রদীপের তলদেশে আসিয়া ঠেকিয়াছিল ;— ইহার পিতার মৃত্যু হইলে পর নয়নজোড়ের বাবুয়ানা গোটাকতক অসাধারণ শ্রাদ্ধশান্তিতে অন্তিম দীপ্তি প্রকাশ করিয়া হঠাৎ নিবিয়া গেল। সমস্ত বিষয় আশয় ঋণের দায়ে বিক্রয় হইল— যে অল্প অবশিষ্ট রহিল তাহাতে পূর্ব্বপুরুষের খ্যাতি রক্ষা করা অসম্ভব।

সেইজন্য নয়নজোড় ত্যাগ করিয়া পুত্রকে সঙ্গে লইয়া কৈলাস বাবু কলিকাতায় অসিয়া বাস করিলেন—পুত্রটিও একটি কন্যামাত্র রাখিয়া এই হতগৌরব সংসার পরিত্যাগ করিয়া পরলোক গমন করিলেন।

আমরা তাঁহার কলিকাতার প্রতিবেশী। আমাদের ইতিহাসটা তাঁহাদের হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত। আমার পিতা নিজের চেষ্টায় ধন উপার্জ্জন করিয়াছিলেন ; তিনি কখনও হাঁটুর নিম্নে কাপড় পরিতেন না, কড়াক্রান্তির হিসাব রাখিতেন, এবং বাবু উপাধি লাভের জন্য তাঁহার লালসা ছিল না। সে জন্য আমি তাঁহার একমাত্র পুত্র তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ আছি। আমি যে লেখা পড়া শিখিয়াছি এবং নিজের প্রাণ ও মান রক্ষার উপযোগী যথেষ্ট অর্থ বিনা চেষ্টায় প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহাই আমি পরম গৌরবের বিষয় বলিয়া জ্ঞান করি—শূন্য ভাণ্ডারে পৈতৃক বাবুয়ানার উজ্জ্বল ইতিহাসের অপেক্ষা লোহার সিন্দুকের মধ্যে পৈতৃক কোম্পানির

কাগজ আমার নিকট অনেক বেশী মূল্যবান্ বলিয়া মনে হয়।

বোধ করি, সেই কারণেই, কৈলাস বাবু তাঁহাদের পূর্ব্ব-গৌরবের ফেল্-করা ব্যাঙ্কের উপর যখন দেদার লম্বাচৌড়া চেক্ চালাইতেন তখন তাহা আমার এত অসহ্য ঠেকিত। আমার মনে হইত, আমার পিতা স্বহস্তে অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন বলিয়া কৈলাসবাবু বুঝি মনে মনে আমাদের প্রতি অবজ্ঞা অনুভব করিতেছেন। আমি রাগ করিতাম এবং ভাবিতাম অবজ্ঞার যোগ্য কে? যে লোক সমস্ত জীবন কঠোর ত্যাগস্বীকার করিয়া, নানা প্রলোভন অতিক্রম করিয়া, লোকমুখের তুচ্ছ খ্যাতি অবহেলা করিয়া, অশ্রান্ত এবং সতর্ক বুদ্ধিকৌশলে সমস্ত প্রতিকূল বাধা প্রতিহত করিয়া একটী একটী রৌপ্যের স্তরে সম্পদের একটি সমুচ্চ পিরামিড্ একাকী স্বহস্তে নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন, তিনি হাঁটুর নীচে কাপড় পরিতেন না বলিয়া যে কম লোক ছিলেন তাহা নয়!

তখন বয়স অল্প ছিল সেই জন্য এইরূপ তর্ক করিতাম রাগ করিতাম—এখন বয়স বেশি হইয়াছে এমন মনে করি, ক্ষতি কি! আমার ত বিপুল বিষয় আছে, আমার কিসের অভাব? যাহার কিছু নাই, সে যদি অহঙ্কার করিয়া সুখী হয়, তাহাতে আমার ত শিকি পয়সার লোকসান নাই, বরং সে বেচারার সান্ত্বনা আছে।

ইহাও দেখা গিয়াছে আমি ব্যতীত আর কেহ কৈলাস বাবুর উপর রাগ করিত না। কারণ এত বড় নিরীহ লোক সচারাচর

দেখা যায় না। ক্রিয়াকর্ম্মে সুখে দুঃখে প্রতিবেশীদের সহিত তাঁহার সম্পূর্ণ যোগ ছিল। ছেলে হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলকেই দেখা হইবামাত্র তিনি হাসিমুখে প্রিয় সম্ভাষণ করিতেন—যেখানে যাহার যে কেহ আছে সকলেরই কুশলসংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া তবে তাঁহার শিষ্টতা বিরাম লাভ করিত। এই জন্য কাহারও সহিত তাঁহার দেখা হইলে একটা সুদীর্ঘ প্রশ্নোত্তরমালার সৃষ্টি হইত; ভাল ত? শশি ভাল আছে? আমাদের বড় বাবু ভাল আছেন? মধুর ছেলেটির জ্বর হয়েছিল শুনেছিলুম সে এখন ভাল আছে ত? হরিচরণ বাবুকে অনেককাল দেখিনি তাঁর অসুখ বিসুখ কিছু হয় নি? তোমাদের রাখালের খবর কি? বাড়ীর এঁয়ারা সকলে ভাল আছেন? ইত্যাদি।

লোকটি ভারি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কাপড় চোপড় অধিক ছিল না, কিন্তু মেরজাইটি চাদরটি জামাটি, এমন কি, বিছানায় পাতিবার একটি পুরাতন র‍্যাপার, বালিশের ওয়াড়, একটি ক্ষুদ্র সতরঞ্চ সমস্ত স্বহস্তে রৌদ্রে দিয়া ঝাড়িয়া দড়িতে খাটাইয়া ভাঁজ করিয়া আলনায় তুলিয়া পরিপাটি করিয়া রাখিতেন। যখনি তাঁহাকে দেখা যাইত তখনি মনে হইত যেন তিনি সুসজ্জিত প্রস্তুত হইয়া আছেন। অল্পস্বল্প সামান্য আস্‌বাবেও তাঁহার ঘরদ্বার সমুজ্জ্বল হইয়া থাকিত। মনে হইত যেন তাঁহার আরও অনেক আছে।

ভৃত্যাভাবে অনেক সময় ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া তিনি নিজের হস্তে অতি পরিপাটি করিয়া ধুতি কোঁচাইতেন এবং

চাদর ও জামার আস্তিন বহুযত্নে ও পরিশ্রমে "গিলে" করিয়া রাখিতেন। তাঁহার বড় বড় জমিদারী বহুমূল্যের বিষয়সম্পত্তি লোপ পাইয়াছে, কিন্তু একটি বহুমূল্য গোলাপপাশ, আতরদান, একটি সোনার রেকাবি, একটি রূপার আল্‌বোলা, একটি বহুমূল্য সাল ও সেকেলে জামাযোড়া ও পাগড়ি দারিদ্র্যের গ্রাস হইতে বহুচেষ্টায় তিনি রক্ষা করিয়াছিলেন। কোন একটা উপলক্ষ উপস্থিত হইলে এইগুলি বাহির হইত এবং নয়নজোড়ের জগদ্বিখ্যাত বাবুদের গৌরব রক্ষা হইত।

এদিকে কৈলাসবাবু মাটির মানুষ হইলেও কথায় যে অহঙ্কার করিতেন সেটা যেন পূর্ব্বপুরুষদের প্রতি কর্ত্তব্য বোধে করিতেন; সকল লোকেই তাহাতে প্রশ্রয় দিত এবং বিশেষ আমোদ বোধ করিত।

পাড়ার লোকে তাঁহাকে ঠাকুর্দ্দামশাই বলিত এবং তাঁহার ওখানে সর্ব্বদা বিস্তর লোক সমাগম হইত; কিন্তু দৈন্যাবস্থায় পাছে তাঁহার তামাকের খরচটা গুরুতর হইয়া উঠে এই জন্য প্রায়ই পাড়ার কেহ না কেহ দুই এক সের তামাক কিনিয়া লইয়া গিয়া তাঁহাকে বলিত, ঠাকুর্দ্দামশায় একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ দেখি, ভাল গয়ার তামাক পাওয়া গেছে।

ঠাকুর্দ্দামশায় দুই এক টান টানিয়া বলিতেন, বেশ ভাই, বেশ তামাক। অমনি সেই উপলক্ষে ষাট পঁয়ষট্টি টাকা ভরির তামাকের গল্প পাড়িতেন; এবং জিজ্ঞাসা করিতেন সে তামাক কাহারও আস্বাদ করিয়া দেখিবার ইচ্ছা আছে কি না?

সকলেই জানিত যে যদি কেহ ইচ্ছা করে তবে নিশ্চয় চাবির সন্ধান পাওয়া যাইবে না অথবা অনেক অন্বেষণের পর প্রকাশ পাইবে যে পুরাতন ভৃত্য গণেশ বেটা কোথায় যে কি রাখে তাহার আর ঠিকানা নাই—গণেশও বিনা প্রতিবাদে সমস্ত অপবাদ স্বীকার করিয়া লইত। এই জন্য সকলেই একবাক্যে বলিত, ঠাকুর্দ্দামশায় কাজ নেই, সে তামাক আমাদের সহ্য হবে না, আমাদের এই ভাল।

শুনিয়া ঠাকুর্দ্দা দ্বিরুক্তি না করিয়া ঈষৎ হাস্য করিতেন। সকলে বিদায় লইবার কালে বৃদ্ধ হঠাৎ বলিয়া উঠিতেন, সে যেন হল, তোমরা কবে আমার এখানে খাবে বল দেখি.ভাই ?

অমনি সকলে বলিত, সে একটা দিন ঠিক করে দেখা যাবে।

ঠাকুর্দ্দা মহাশয় বলিতেন, সেই ভাল, একটু বৃষ্টি পড়ুক, ঠাণ্ডা হোক্, নইলে এ গুরু ভোজনটা কিছু নয়।

যখন বৃষ্টি পড়িত তখন ঠাকুর্দ্দাকে কেহ তাঁহার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া দিত না—বরঞ্চ কথা উঠিলে সকলে বলিত, এই বৃষ্টি বাদলটা না ছাড়িলে সুবিধে হচ্চে না। ক্ষুদ্র বাসাবাড়িতে বাস করাটা তাঁহার পক্ষে ভাল দেখাইতেছে না এবং কষ্টও হইতেছে এ কথা তাঁহার বন্ধুবান্ধব সকলেই তাঁহার সমক্ষে স্বীকার করিত, অথচ কলিকাতায় কিনিবার উপযুক্ত বাড়ি খুঁজিয়া পাওয়া যে কত কঠিন, সে বিষয়েও কাহারও সন্দেহ ছিল না—এমন কি আজ ছয় সাত বৎসর সন্ধান করিয়া ভাড়া লইবার মত একটা বড় বাড়ি পাড়ার কেহ দেখিতে পাইল না—অবশেষে

ঠাকুর্দ্দা মশাই বলিতেন, "তা হোক্ ভাই, তোমাদের কাছাকাছি আছি এই আমার সুখ, নয়নজোড়ে বড় বাড়ি ত প'ড়েই আছে কিন্তু সেখানে কি মন টেকে?"

আমার বিশ্বাস, ঠাকুর্দ্দাও জানিতেন যে, সকলে তাঁহার অবস্থা জানে, এবং যখন তিনি ভূতপূর্ব্ব নয়নজোড়কে বর্ত্তমান বলিয়া ভান করিতেন এবং অন্য সকলেও তাহাতে যোগ দিত তখন তিনি মনে মনে বুঝিতেন যে, পরস্পরের এই ছলনা কেবল পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ্দাবশতঃ।

কিন্তু আমার বিষম বিরক্তি বোধ হইত। অল্প বয়সে পরের নিরীহ গর্ব্বও দমন করিতে ইচ্ছা করে এবং সহস্র গুরুতর অপরাধের তুলনায় নির্ব্বুধিতাই সর্ব্বাপেক্ষা অসহ্য বোধ হয়। কৈলাস বাবু ঠিক নির্ব্বোধ ছিলেন না, কাজে কর্ম্মে তাঁহার সহায়তা এবং পরামর্শ সকলেই প্রার্থনীয় জ্ঞান করিত। কিন্তু নয়নজোড়ের গৌরব প্রকাশ সম্বন্ধে তাঁহার কিছুমাত্র কাণ্ডজ্ঞান ছিল না! সকলে তাঁহাকে ভালবাসিয়া এবং আমোদ করিয়া তাঁহার কোন অসম্ভব কথাতেই প্রতিবাদ করিত না বলিয়া তিনি আপনার কথার পরিমাণ রক্ষা করিতে পারিতেন না। অন্য লোকেও যখন আমোদ করিয়া অথবা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য নয়নজোড়ের কীর্ত্তিকলাপ সম্বন্ধে বিপরীত মাত্রায় অত্যুক্তি প্রয়োগ করিত, তিনি অকাতরে সমস্ত গ্রহণ করিতেন এবং স্বপ্নেও সন্দেহ করিতেন না যে, অন্য কেহ এ সকল কথা লেশ মাত্র অবিশ্বাস করিতে পারে।

আমার এক :এক সময় ইচ্ছা করিত, বৃদ্ধ যে মিথ্যা দুর্গ অবলম্বন করিয়া বাস করিতেছে এবং মনে করিতেছে ইহা চিরস্থায়ী, সেই দুর্গটি দুই তোপে সর্ব্বসমক্ষে উড়াইয়া দিই। একটা পাখীকে সুবিধামত ডালের উপর বসিয়া থাকিতে দেখিলেই শিকারীর ইচ্ছা করে তাহাকে গুলি বসাইয়া দিতে, পাহাড়ের গায়ে একটা প্রস্তর পতনোন্মুখ থাকিতে দেখিলেই বালকের ইচ্ছা করে এক লাথি বারিয়া তাহাকে গড়াইয়া ফেলিতে—যে জিনিষটা প্রতি মুহূর্ত্তে পড়ি-পড়ি করিতেছে অথচ কোন একটা কিছুতে সংলগ্ন হইয়া আছে, তাহাকে ফেলিয়া দিলেই তবে যেন তাহার সম্পূর্ণতা সাধন এবং দর্শকের মনের তৃপ্তিলাভ হয়। কৈলাস বাবুর মিথ্যা এতই সরল, তাহার ভিত্তি এতই দুর্ব্বল, তাহা ঠিক সত্য বন্দুকের লক্ষ্যের সাম্‌নে এমনি বুক ফুলাইয়া নৃত্য করিত যে, তাহাকে মুহূর্ত্তের মধ্যে বিনাশ করিবার জন্য একটি আবেগ উপস্থিত হইত—কেবল নিতান্ত আলস্যবশতঃ এবং সর্ব্বজনসম্মত প্রথার অনুসরণ করিয়া সে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতাম না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

নিজের অতীত মনোভাব বিশ্লেষণ করিয়া যতটা মনে পড়ে তাহাতে বোধ করি, কৈলাস বাবুর প্রতি আমার আন্তরিক

বিদ্বেষের আর একটি গূঢ় কারণ ছিল। তাহা একটু বিবৃত করিয়া বলা আবশ্যক।

আমি বড়মানুষের ছেলে হইয়াও যথাকালে এম্, এ, পাস করিয়াছি, যৌবন সত্ত্বেও কোন প্রকার কুসংসর্গ কুৎসিত আমোদে যোগ দিই নাই, এবং অভিভাবকের মৃত্যুর পরে স্বয়ং কর্ত্তা হইয়াও আমার স্বভাবের কোন প্রকার বিকৃতি উপস্থিত হয় নাই। তাহা ছাড়া চেহারাটা এমন যে, তাহাকে আমি নিজ মুখে সুশ্রী বলিলে অহঙ্কার হইতে পারে কিন্তু মিথ্যাবাদ হয় না।

অতএব বাঙ্গলা দেশে ঘট্‌কালির হাটে আমার দাম যে অত্যন্ত বেশী তাহাতে আর সন্দেহ নাই—এই হাটে আমার সেই দাম আমি পূরা আদায় করিয়া লইব, এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। ধনী পিতার পরম রূপবতী একমাত্র বিদূষী কন্যা আমার কল্পনার আদর্শরূপে বিরাজ করিতেছিল।

দশ হাজার টাকা পণের প্রস্তাব করিয়া দেশ বিদেশ হইতে আমার সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। আমি অবিচলিতচিত্তে নিক্তি ধরিয়া তাহাদের যোগ্যতা ওজন করিয়া লইতেছিলাম, কোনটাই আমার সমযোগ্য বোধ হয় নাই। অবশেষে ভবভূতির ন্যায় আমার ধারণা হইয়াছিল যে,—

কি জানি জন্মিতে পারে মম সমতুল,
অসীম সময় আছে, বসুধা বিপুল।

কিন্তু বর্ত্তমান কালে এবং ক্ষুদ্র বঙ্গদেশে সেই অসম্ভব দুর্লভ পদার্থ জন্মিয়াছে কি না সন্দেহ।

কন্যাদায়গ্রস্তগণ প্রতিনিয়ত নানা ছন্দে আমার স্তবস্তুতি এবং বিবিধোপচারে আমার পূজা করিতে লাগিল। কন্যা পছন্দ হউক্ বা না হউক, এই পূজা আমার মন্দ লাগিল না। ভাল ছেলে বলিয়া কন্যার পিতৃগণের এই পূজা আমার উচিতপ্রাপ্য স্থির করিয়াছিলাম। শাস্ত্রে পড়া যায় দেবতা বর দিন আর না দিন্, যথাবিধি পূজা না পাইলে বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন। নিয়মিত পূজা পাইয়া আমার মনে সেইরূপ অত্যুচ্চ দেবভাব জন্মিয়াছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম, ঠাকুর্দ্দা মশায়ের একটি পৌত্রী ছিল। তাহাকে অনেকবার দেখিয়াছি কিন্তু কখনও রূপবতী বলিয়া ভ্রম হয় নাই। সুতরাং তাহাকে বিবাহ করিবার কল্পনাও আমার মনে উদিত হয় নাই। কিন্তু ইহা ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম যে কৈলাস বাবু, লোকমারফৎ অথবা স্বয়ং, পৌত্রীটিকে অর্ঘ্য দিবার মানসে আমার পূজার বোধন করিতে আসিবেন, কারণ, আমি ভাল ছেলে। কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না।

শুনিতে পাইলাম, আমার কোন বন্ধুকে তিনি বলিয়াছিলেন, নয়নজোড়ের বাবুরা কখনও কোন বিষয়ে অগ্রসর হইয়া কাহারও নিকটে প্রার্থনা করে নাই—কন্যা যদি চিরকুমারী হইয়া থাকে তথাপি সে কুলপ্রথা তিনি ভঙ্গ করিতে পারিবেন না।

শুনিয়া আমার বড় রাগ হইল। সে রাগ অনেক দিন পর্য্যন্ত আমার মনের মধ্যে ছিল—কেবল ভাল ছেলে বলিয়াই চুপচাপ করিয়াছিলাম।

যেমন বজ্রের সঙ্গে বিদ্যুৎ থাকে, তেমনি আমার চরিত্রে

রাগের সঙ্গে সঙ্গে একটা কৌতুকপ্রিয়তা জড়িত ছিল। বৃদ্ধকে শুদ্ধমাত্র নিপীড়ন করা আমার দ্বারা সম্ভব হইত না—কিন্তু একদিন হঠাৎ এমন একটা কৌতুকাবহ প্ল্যান্ মাথায় উদয় হইল, যে, সেটা কাজে খাটাইবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বৃদ্ধকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য নানা লোকে নানা মিথ্যা কথার সৃজন করিত। পাড়ার একজন পেন্সনভোগী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ প্রায় বলিতেন, ঠাকুর্দ্দা, ছোটলাটের সঙ্গে যখনি দেখা হয় তিনি নয়নজোড়ের বাবুদের খবর না নিয়ে ছাড়েন না—সাহেব বলেন, বাঙ্গলাদেশে, বর্দ্ধমানের রাজা এবং নয়নজোড়ের বাবু, এই দুটি মাত্র যথার্থ বনেদী বংশ আছে।

ঠাকুর্দ্দা ভারি খুসি হইতেন এবং ভূতপূর্ব্ব ডেপুটি বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে অন্যান্য কুশলসংবাদের সহিত জিজ্ঞাসা করিতেন—ছোটলাট সাহেব ভাল আছেন? তাঁর মেমসাহেব ভাল আছেন? তাঁর পুত্রকন্যারা সকলেই ভাল আছেন? সাহেবের সহিত শীঘ্র একদিন সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন এমন ইচ্ছাও প্রকাশ করিতেন। কিন্তু ভূতপূর্ব্ব ডেপুটি নিশ্চয় জানিতেন, নয়নজোড়ের বিখ্যাত চৌঘুড়ি প্রস্তুত হইয়া দ্বারে আসিতে আসিতে বিস্তর ছোট লাট এবং বড় লাট বদল হইয়া যাইবে।

আমি একদিন প্রাতঃকালে গিয়া কৈলাস বাবুকে আড়ালে ডাকিয়া লইয়া চুপি চুপি বলিলাম—ঠাকুর্দ্দা, কাল লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের লেভিতে গিয়েছিলুম। তিনি নয়নজোড়ের বাবুদের কথা পাড়াতে আমি বল্লুম নয়নজোড়ের কৈলাস বাবু কলকাতাতেই

আছেন, শুনে, ছোট লাট এতদিন দেখা করতে আসেন নি বলে ভারি দুঃখিত হলেন—বলে দিলেন আজই দুপুর বেলা তিনি গোপনে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আস্‌বেন।

আর কেহ হইলে কথাটার অসম্ভবতা বুঝিতে পারিত এবং আর কাহারও সম্বন্ধে হইলে কৈলাস বাবুও এ কথায় হাস্য করিতেন কিন্তু নিজের সম্বন্ধীয় বলিয়া এ সংবাদ তাঁহার লেশমাত্র অবিশ্বাস্য বোধ হইল না।—শুনিয়া যেমন খুসি হইলেন তেমনি অস্থির হইয়া উঠিলেন—কোথায় বসাইতে হইবে কি করিতে হইবে, কেমন করিয়া অভ্যর্থনা করিবেন—কি উপায়ে নয়নজোড়ের গৌরব রক্ষিত হইবে কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না। তাহা ছাড়া তিনি ইংরাজি জানেন না, কথা চালাইবেন কি করিয়া সেও এক সমস্যা।

আমি বলিলাম, "সে জন্য ভাবনা নাই, তাঁহার সঙ্গে এক জন করিয়া দোভাষী থাকে; কিন্তু ছোটলাট সাহেবের বিশেষ ইচ্ছা, আর কেহ যেন উপস্থিত না থাকে।

মধ্যাহ্নে পাড়ার অধিকাংশ লোক যখন আপিসে গিয়াছে এবং অবশিষ্ট অংশ দ্বার রুদ্ধ করিয়া নিদ্রামগ্ন, তখন কৈলাস বাবুর বাসার সম্মুখে এক জুড়ি আসিয়া দাঁড়াইল।

তক্‌মা-পরা চাপ্‌রাসি তাঁহাকে খবর দিল ছোটলাট সাহেব আয়া! ঠাকুর্দ্দা প্রাচীনকাল-প্রচলিত শুভ্র জামাযোড়া এবং পাগড়ি পরিয়া প্রস্তুত হইয়াছিলেন তাঁহার পুরাতন ভৃত্য গণেশটিকেও তাঁহার নিজের ধুতি চাদর জামা পরাইয়া ঠিকঠাক

করিয়া রাখিয়াছিলেন। ছোটলাটের আগমন সংবাদ শুনিয়াই হাঁপাইতে হাঁপাইতে কাঁপিতে কাঁপিতে ছুটিয়া দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন—এবং সন্নতদেহে বারম্বার সেলাম করিতে করিতে ইংরাজবেশধারী আমার এক প্রিয়বয়স্যকে ঘরে লইয়া গেলেন।

সেখানে চৌকির উপরে তাঁহার একমাত্র বহুমূল্য শালটি পাতিয়া রাখিয়াছিলেন তাহারই উপর কৃত্রিম ছোটলাটকে বসাইয়া উর্দ্দু ভাষায় এক অতি বিনীত সুদীর্ঘ বক্তৃতা পাঠ করিলেন, এবং নজরের স্বরূপে স্বর্ণ রেকাবীতে তাঁহাদের বহু-কষ্টরক্ষিত কুলক্রমাগত এক আস্‌রফির মালা ধরিলেন। প্রাচীন ভৃত্য গণেশ গোলাপপাশ এবং আতরদান লইয়া উপস্থিত ছিল!

কৈলাশ বাবু বারম্বার আক্ষেপ করিতে লাগিলেন যে, তাঁহাদের নয়নজোড়ের বাড়িতে হজুর বাহাদুরের পদধূলি পড়িলে তাঁহাদের যথাসাধ্য যথোচিত আতিথ্যের আয়োজন করিতে পারিতেন—কলিকাতায় তিনি প্রবাসী—এখানে তিনি জলহীন মীনের ন্যায় সর্ব্ব বিষয়েই অক্ষম—ইত্যাদি।

আমার বন্ধু দীর্ঘ হ্যাট্ সমেত অত্যন্ত গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িতে লাগিলেন। ইংরাজি কায়দা-অনুসারে এরূপ স্থলে মাথায় টুপি না থাকিবার কথা কিন্তু আমার বন্ধু ধরা পড়িবার ভয়ে যথাসম্ভব আচ্ছন্ন থাকিবার চেষ্টায় টুপি খোলেন নাই। কৈলাসবাবু এবং তাঁহার গর্ব্বান্ধ প্রাচীন ভৃত্যটি ছাড়া আর সকলেই মুহূর্ত্তের মধ্যে বাঙ্গালীর এই ছদ্মবেশ ধরিতে পারিত।

দশমিনিট কাল ঘাড় নাড়িয়া আমার বন্ধু গাত্রোত্থান করিলেন এবং পূর্ব্বশিক্ষামত চাপ্‌রাসিগণ সোনার রেকাবীসুদ্ধ আসরফির মালা, চৌকি হইতে সেই শাল, এবং ভৃত্যের হাত হইতে গোলাপপাশ এবং আতরদান সংগ্রহ করিয়া ছদ্মবেশীর গাড়িতে তুলিয়া দিল -কৈলাস বাবু বুঝিলেন ইহাই ছোটলাটের প্রথা। আমি গোপনে এক পাশের ঘরে লুকাইয়া দেখিতেছিলাম এবং রুদ্ধ হাস্যাবেশে আমার পঞ্জর বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইতেছিল।

অবশেষে কিছুতে আর থাকিতে না পারিয়া ছুটিয়া কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তী এক ঘরের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিলাম—এবং সেখানে হাসির উচ্ছ্বাস উন্মুক্ত করিয়া দিয়া হঠাৎ দেখি, একটি বালিকা তক্তপোষের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে।

আমাকে হঠাৎ ঘরে প্রবেশ করিয়া হাসিতে দেখিয়া সে তৎক্ষণাৎ তক্তা ছাড়িয়া দাঁড়াইল—এবং অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে রোষের গর্জ্জন আনিয়া আমার মুখের উপর সজল বিপুল কৃষ্ণচক্ষের সুতীক্ষ্ণ বিদ্যুৎ বর্ষণ করিয়া কহিল—"আমার দাদামশায় তোমাদের কি করেছেন—কেন তোমরা তাঁহাকে ঠকাতে এসেচ--কেন এসেচ তোমরা"—অবশেষে আর কোন কথা জুটিল না—বাক্‌রুদ্ধ হইয়া মুখে কাপড় দিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

কোথায় গেল আমার হাস্যাবেগ! আমি যে কাজটি করিয়াছি তাহার মধ্যে কৌতুক ছাড়া আর যে কিছু ছিল এতক্ষণ তাহা আমার মাথায় আসে নাই—হঠাৎ দেখিলাম অত্যন্ত কোমল স্থানে অত্যন্ত কঠিন আঘাত করিয়াছি; হঠাৎ আমার

কৃতকার্য্যের বীভৎস নিষ্ঠুরতা আমার সম্মুখে দেদীপ্যমান হইয়া উঠিল—লজ্জায় এবং অনুতাপে পদাহত কুক্কুরের ন্যায় ঘর হইতে নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেলাম। বৃদ্ধ আমার কাছে কি দোষ করিয়াছিল? তাহার নিরীহ অহঙ্কার ত কখন কোন প্রাণীকে আঘাত করে নাই! আমার অহঙ্কার কেন এমন হিংস্রমূর্ত্তি ধারণ করিল?

তাহা ছাড়া আর একটি বিষয়ে আজ হঠাৎ দৃষ্টি খুলিয়া গেল। এতদিন আমি কুসুমকে, কোন অবিবাহিত পাত্রের প্রসন্ন দৃষ্টিপাতের প্রতীক্ষায় সংরক্ষিত পণ্য-পদার্থের মত দেখিতাম—ভাবিতাম, আমি পছন্দ করি নাই বলিয়া ও পড়িয়া আছে, দৈবাৎ যাহার পছন্দ হইবে ও তাহারই হইবে। আজ দেখিলাম এই গৃহকোণে, ঐ বালিকমূর্ত্তির অন্তরালে একটি মানব হৃদয় আছে। তাহার নিজের সুখ দুঃখ অনুরাগ বিরাগ লইয়া একটি অন্তঃকরণ একদিকে অজ্ঞেয় অতীত আর একদিকে অভাবনীয় ভবিষ্যৎ নামক দুই অনন্ত রহস্যরাজ্যের দিকে পূর্ব্বে পশ্চিমে প্রসারিত হইয়া রহিয়াছে। যে মানুষের মধ্যে হৃদয় আছে সে কি কেবল পণের টাকা এবং নাক চোখের পরিমাণ মাপিয়া পছন্দ করিয়া লইবার যোগ্য?

সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইল না। পরদিন প্রত্যূষে বৃদ্ধের সমস্ত অপহৃত বহুমূল্য দ্রব্যগুলি লইয়া চোরের ন্যায় চুপি চুপি ঠাকুর্দ্দার বাসায় গিয়া প্রবেশ করিলাম—ইচ্ছা ছিল, কাহাকেও কিছু না বলিয়া গোপনে চাকরের হস্তে সমস্ত দিয়া আসিব।

চাকরকে দেখিতে না পাইয়া ইতস্ততঃ করিতেছি এমন সময় অদূরবর্ত্তী ঘরে বৃদ্ধের সহিত বালিকার কথোপকথন শুনিতে পাইলাম। বালিকা সুমিষ্ট সস্নেহ স্বরে জিজ্ঞাসা করিতেছিল, "দাদা মশায়, কাল লাট সাহেব তোমাকে কি বল্লেন?" ঠাকুর্দ্দা অত্যন্ত হর্ষিত চিত্তে লাট সাহেবের মুখে প্রাচীন নয়নজোড় বংশের বিস্তর কাল্পনিক গুণানুবাদ বসাইতেছিলেন। বালিকা তাহাই শুনিয়া মহোৎসাহ প্রকাশ করিতেছিল।

বৃদ্ধ অভিভাবকের প্রতি মাতৃহৃদয়া এই ক্ষুদ্র বালিকার সকরুণ ছলনায় আমার দুই চক্ষে জল ছল্ ছল্ করিয়া আসিল। অনেকক্ষণ চুপ্ করিয়া বসিয়া রহিলাম অবশেষে ঠাকুর্দ্দা তাঁহার কাহিনী সমাপন করিয়া চলিয়া আসিলে আমার প্রতারণার বমালগুলি লইয়া বালিকার নিকট উপস্থিত হইলাম এবং নিঃশব্দে তাহার সম্মুখে সমস্ত রাখিয়া বাহিরে চলিয়া আসিলাম।

বর্ত্তমান কালের প্রথানুসারে অন্যদিন বৃদ্ধকে দেখিয়া কোন প্রকার অভিবাদন করিতাম না—আজ তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। বৃদ্ধ নিশ্চয় মনে ভাবিলেন, গতকল্য ছোট লাট তাঁহার বাড়িতে আসাতেই সহসা তাঁহার প্রতি আমার ভক্তির উদ্রেক হইয়াছে। তিনি পুলকিত হইয়া শতমুখে ছোটলাটের গল্প বানাইয়া বলিতে লাগিলেন—আমিও কোন প্রতিবাদ না করিয়া তাহাতে যোগ দিলাম। বাহিরের অন্য লোক যাহারা শুনিল তাহারা এ কথাটাকে আদ্যোপান্ত গল্প বলিয়া স্থির করিল, এবং সকৌতুকে বৃদ্ধের সহিত সকল কথায় সায় দিয়া গেল।

সকলে উঠিয়া গেলে আমি অত্যন্ত সলজ্জ মুখে দীনভাবে বৃদ্ধের নিকট একটি প্রস্তাব করিলাম। বলিলাম, যদিও নয়নজোড়ের বাবুদের সহিত আমাদের বংশমর্য্যাদার তুলনাই হইতে পারে না, তথাপি—

প্রস্তাবটা শেষ হইবামাত্র বৃদ্ধ আমাকে বক্ষে আলিঙ্গন করিয়া ধরিলেন, এবং আনন্দবেগে বলিয়া উঠিলেন—আমি গরীব—আমার যে এমন সৌভাগ্য হবে তা আমি জানতুম না ভাই— আমার কুসুম অনেক পুণ্য করেছে তাই তুমি আজ ধরা দিলে!" বলিতে বলিতে বৃদ্ধের চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

বৃদ্ধ, আজ এই প্রথম, তাঁহার মহিমান্বিত পূর্ব্বপুরুষদের প্রতি কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া স্বীকার করিলেন যে, তিনি গরীব, স্বীকার করিলেন যে আমাকে লাভ করিয়া নয়নজোড় বংশের গৌরব হানি হয় নাই। আমি যখন বৃদ্ধকে অপদস্থ করিবার জন্য চক্রান্ত করিতেছিলাম তখন বৃদ্ধ আমাকে পরম সৎপাত্র জানিয়া একান্তমনে কামনা করিতেছিলেন।

স্বর্ণমৃগ।

আদ্যনাথ এবং বৈদ্যনাথ চক্রবর্ত্তী দুই সরিক। উভয়ের মধ্যে বৈদ্যনাথের অবস্থাই কিছু খারাপ। বৈদ্যনাথের বাপ মহেশচন্দ্রের বিষয়বুদ্ধি আদৌ ছিল না, তিনি দাদা শিবনাথের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকিতেন। শিবনাথ ভাইকে প্রচুর স্নেহ দিয়া তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার বিষয়সম্পত্তি সমস্ত আত্মসাৎ করিয়া লন কেবল খানকতক কোম্পানির কাগজ অবশিষ্ট থাকে। জীবনসমুদ্রে সেই কাগজ ক'খানি বৈদ্যনাথের একমাত্র অবলম্বন।

শিবনাথ বহু অনুসন্ধানে তাঁহার পুত্র আদ্যনাথের সহিত এক ধনীর একমাত্র কন্যার বিবাহ দিয়া বিষয় বৃদ্ধির আর একটি সুযোগ করিয়া রাখিয়াছেন। মহেশচন্দ্র একটি সপ্তকন্যাভারগ্রস্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণের প্রতি দয়া করিয়া এক পয়সা পণ না লইয়া তাহার জ্যেষ্ঠা কন্যাটির সহিত পুত্রের বিবাহ দেন। সাতটি কন্যাকেই যে ঘরে লন নাই তাহার কারণ, তাঁহার একটিমাত্র পুত্র এবং ব্রাহ্মণও সেরূপ অনুরোধ করে নাই। তবে, তাহাদের বিবাহের উদ্দেশে সাধ্যাতিরিক্ত অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন।

পিতার মৃত্যুর পর বৈদ্যনাথ তাঁহার কাগজ কয়খানি লইয়া সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ও সন্তুষ্টচিত্তে ছিলেন। কাজকর্ম্মের কথা তাঁহার মনেও উদয় হইত না। কাজের মধ্যে তিনি গাছের ডাল কাটিয়া

বসিয়া বসিয়া বহুযত্নে ছড়ি তৈরি করিতেন। রাজ্যের বালক এবং যুবকগণ তাঁহার নিকট ছড়ির জন্য উমেদার হইত, তিনি দান করিতেন। ইহা ছাড়া বদান্যতার উত্তেজনায় ছিপ ঘুড়ি লাটাই নির্ম্মাণ করিতেও তাঁহার বিস্তর সময় যাইত। যাহাতে বহুযত্নে বহুকাল ধরিয়া চাঁচাছোলার আবশ্যক, অথচ সংসারের উপকারিতা দেখিলে যাহা সে পরিমাণে পরিশ্রম ও কালব্যয়ের অযোগ্য, এমন একটা হাতের কাজ পাইলে তাঁহার উৎসাহের সীমা থাকে না।

পাড়ায় যখন দলাদলি এবং চক্রান্ত লইয়া বড় বড় পবিত্র বঙ্গীয় চণ্ডীমণ্ডপ ধূমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিতেছে তখন বৈদ্যনাথ একটি কলম-কাটা ছুরি এবং একখণ্ড গাছের ডাল লইয়া প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্ন এবং আহার ও নিদ্রার পর হইতে সায়াহ্নকাল পর্য্যন্ত নিজের দাওয়াটিতে একাকী অতিবাহিত করিতেছেন এমন প্রায় দেখা যাইত।

ষষ্ঠীর প্রসাদে শত্রুর মুখে যথাক্রমে ছাই দিয়া বৈদ্যনাথের দুইটি পুত্র এবং একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করিল।

গৃহিণী মোক্ষদাসুন্দরীর অসন্তোষ প্রতিদিন বাড়িয়া উঠিতেছে। আদ্যনাথের ঘরে যেরূপ সমারোহ বৈদ্যনাথের ঘরে কেন সেরূপ না হয়! ও বাড়ির বিন্ধ্যবাসিনীর যেমন গহনাপত্র, বেনারসী সাড়ি, কথাবার্ত্তার ভঙ্গী এবং চালচলনের গৌরব মোক্ষদার যে ঠিক তেমনটা হইয়া উঠে না, ইহা অপেক্ষা যুক্তিবিরুদ্ধ ব্যাপার আর কি হইতে পারে। অথচ একই ত পরিবার। ভাইয়ের বিষয়

বঞ্চনা করিয়া লইয়াই ত উহাদের এত উন্নতি! যত শোনে ততই মোক্ষদার হৃদয়ে নিজের শ্বশুরের প্রতি এবং শ্বশুরের একমাত্র পুত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা এবং অবজ্ঞা আর ধরে না! নিজগৃহের কিছুই তাঁহার ভাল লাগে না। সকলি অসুবিধা এবং মানহানিজনক। শয়নের খাটটা মৃতদেহ বহনেরও যোগ্য নয়, যাহার সাতকুলে কেহ নাই এমন একটা অনাথ চাম্‌চিকেশাবকও এই জীর্ণ প্রাচীরে বাস করিতে চাহে না এবং গৃহসজ্জা দেখিলে ব্রহ্মচারী পরমহংসের চখেও জল আসে। এ সকল অত্যুক্তির প্রতিবাদ করা পুরুষের ন্যায় কাপুরুষজাতির পক্ষে অসম্ভব সুতরাং বৈদ্যনাথ বাহিরের দাওয়ায় বসিয়া দ্বিগুণ মনোযোগের সহিত ছড়ি চাঁচিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

কিন্তু মৌনব্রত বিপদের একমাত্র পরিতারণ নহে। এক একদিন স্বামীর শিল্পকার্য্যে বাধা দিয়া গৃহিণী তাহাকে অন্তঃপুরে আহ্বান করিয়া আনিতেন।

অত্যন্ত গম্ভীরভাবে অন্যদিকে চাহিয়া বলিতেন "গোয়ালার দুধ বন্ধ করিয়া দাও!"

বৈদ্যনাথ কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া নম্রভাবে বলিতেন "দুধটা বন্ধ করিলে কি চলিবে?—ছেলেরা খাইবে কি?"

গৃহিণা উত্তর করিতেন, "আমানি।"

আবার কোনদিন ইহার বিপরীত ভাব দেখা যাইত—গৃহিণী বৈদ্যনাথকে ডাকিয়া বলিতেন, "আমি জানি না। যা' করিতে হয় তুমি কর।"

বৈদ্যনাথ ম্লানমুখে জিজ্ঞাসা করিতেন, "কি করিতে হইবে ?'

স্ত্রী বলিতেন, "এ মাসের মত বাজার করিয়া আন" বলিয়া এমন একটা ফর্দ্দ দিতেন যাহাতে রাজসূয় যজ্ঞ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইতে পারিত।

বৈদ্যনাথ যদি সাহসপূর্ব্বক প্রশ্ন করিতেন, "এত কি আবশ্যক আছে ?"

উত্তর শুনিতেন, "তবে ছেলেগুলা না খাইতে পাইয়া মরুক এবং আমিও যাই, তাহা হইলে তুমি একলা বসিয়া খুব শস্তায় চালাইতে পারিবে।"

এইরূপে ক্রমে ক্রমে বৈদ্যনাথ বুঝিতে পারিলেন ছড়ি চাঁচিয়া আর চলে না। একটা কিছু উপায় করা চাই। চাকরি করা অথবা ব্যবসা করা বৈদ্যনাথের পক্ষে দুরাশা। অতএব কুবেরের ভাণ্ডারে প্রবেশ করিবার একটা সংক্ষেপ রাস্তা আবিষ্কার করা চাই।

একদিন রাত্রে বিছানায় শুইয়া কাতরভাবে প্রার্থনা করিলেন, "হে মা জগদম্বে, স্বপ্নে যদি একটা দুঃসাধ্য রোগের পেটেণ্ট ঔষধ বলিয়া দাও, কাগজে বিজ্ঞাপন লিখিবার ভার আমি লইব !"

সে রাত্রে স্বপ্নে দেখিলেন তাঁহার স্ত্রী তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া "বিধবাবিবাহ করিব" বলিয়া একান্ত পণ করিয়া বসিয়াছেন। অর্থাভাব সত্ত্বে উপযুক্ত গহনা কোথায় পাওয়া যাইবে বলিয়া বৈদ্যনাথ উক্ত প্রস্তাবে আপত্তি করিতেছেন; বিধবার গহনা আবশ্যক করে না বলিয়া পত্নী আপত্তি খণ্ডন করিতেছেন।

তাহার কি একটা চূড়ান্ত জবাব আছে বলিয়া তাঁহার মনে হইতেছে অথচ কিছুতেই মাথায় আসিতেছে না, এমন সময় নিদ্রাভঙ্গ হইয়া দেখিলেন সকাল হইয়াছে ; এবং কেন যে তাঁহার স্ত্রীর বিধবাবিবাহ হইতে পারে না তাহার সদুত্তর তৎক্ষণাৎ মনে পড়িয়া গেল এবং সে জন্য বোধ করি কিঞ্চিৎ দুঃখিত হইলেন।

প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া একাকী বসিয়া ঘুড়ির লখ্ তৈরি করিতেছেন এমন সময় এক সন্ন্যাসী জয়ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া দ্বারে আগত হইল। সেই মুহূর্ত্তেই বিদ্যুতের মত বৈদ্যনাথ ভাবী ঐশ্বর্য্যের উজ্জ্বল মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন ; সন্ন্যাসীকে প্রচুর পরিমাণে আদর অভ্যর্থনা ও আহার্য্য যোগাইলেন। অনেক সাধ্যসাধনার পর জানিতে পারিলেন সন্ন্যাসী সোনা তৈরি করিতে পারে এবং সে বিদ্যা তাঁহাকে দান করিতেও অসম্মত হইল না।

গৃহিণীও নাচিয়া উঠিলেন। যকৃতের বিকার উপস্থিত হইলে লোকে যেমন সমস্ত হলুদবর্ণ দেখে, তিনি সেইরূপ পৃথিবীময় সোনা দেখিতে লাগিলেন। কল্পনা-কারিকরের দ্বারা শয়নের খাট, গৃহসজ্জা এবং গৃহপ্রাচীর পর্য্যন্ত সোনায় মণ্ডিত করিয়া মনে মনে বিন্ধ্যবাসিনীকে নিমন্ত্রণ করিলেন।

সন্ন্যাসী প্রতিদিন দুইসের করিয়া দুগ্ধ এবং দেড় সের করিয়া মোহনভোগ খাইতে লাগিল এবং বৈদ্যনাথের কোম্পানির কাগজ দোহন করিয়া অজস্র রৌপ্যরস নিঃসৃত করিয়া লইল।

ছিপ ছড়ি লাঠাইয়ের কাঙালরা বৈদ্যনাথের রুদ্ধদ্বারে নিষ্ফল

আঘাত করিয়া চলিয়া যায়। ঘরে ছেলেগুলো যথাসময়ে খাইতে পায় না, পড়িয়া গিয়া কপাল ফুলায়, কাঁদিয়া আকাশ ফাটাইয়া দেয়, কর্ত্তা গৃহিণী কাহারো ভ্রূক্ষেপ নাই। নিস্তব্ধভাবে অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে বসিয়া কটাহের দিকে চাহিয়া উভয়ের চোখে পল্লব নাই, মুখে কথা নাই। তৃষিত একাগ্রনেত্রে অবিশ্রান্ত অগ্নিশিখার প্রতিবিম্ব পড়িয়া চোখের মণি যেন স্পর্শমণির গুণ স্বর্ণ প্রাপ্ত হইল। দৃষ্টিপথ সায়াহ্নের সূর্য্যাস্তপথের মত জ্বলন্ত প্রলেপে রাঙা হইয়া উঠিল।

দুখানা কোম্পানির কাগজ এই স্বর্ণ-অগ্নিতে আহুতি দেওয়ার পর একদিন সন্ন্যাসী আশ্বাস দিল, "কাল সোনার রং ধরিবে।"

সেদিন রাত্রে কাহারো ঘুম হইল না; স্ত্রীপুরুষে মিলিয়া স্বর্ণপুরী নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন। তৎসম্বন্ধে মাঝে মাঝে উভয়ের মধ্যে মতভেদ এবং তর্কও উপস্থিত হইয়াছিল কিন্তু আনন্দ আবেগে তাহার মীমাংসা হইতে বিলম্ব হয় নাই—পরস্পর পরস্পরের খাতিরে নিজ নিজ মত কিছু কিছু পরিত্যাগ করিতে অধিক ইতস্ততঃ করেন নাই সে রাত্রে দাম্পত্য একীকরণ এত ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল।

পরদিন আর সন্ন্যাসীর দেখা নাই। চারিদিক হইতে সোনার রং ঘুচিয়া গিয়া সূর্য্যকিরণ পর্য্যন্ত অন্ধকার হইয়া দেখা দিল। ইহার পর হইতে শয়নের খাট গৃহসজ্জা এবং গৃহপ্রাচীর চতুর্গুণ দারিদ্র্য এবং জীর্ণতা প্রকাশ করিতে লাগিল।

এখন হইতে গৃহকার্য্যে বৈদ্যনাথ কোন একটা সামান্য মত

প্রকাশ করিতে গেলে গৃহিণী তীব্রমধুর স্বরে বলেন,"বুদ্ধির পরিচয় অনেক দিয়াছ এখন কিছুদিন ক্ষান্ত থাক!" বৈদ্যনাথ একেবারে নিবিয়া যায়।

মোক্ষদা এমনি একটা শ্রেষ্ঠতার ভাব ধারণ করিয়াছে যেন এই স্বর্ণমরীচিকায় সে নিজে এক মুহূর্ত্তের জন্যও আশ্বস্ত হয় নাই।

অপরাধী বৈদ্যনাথ স্ত্রীকে কিঞ্চিৎ সন্তুষ্ট করিবার জন্য বিবিধ উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। একদিন একটি চতুষ্কোণ মোড়কে গোপন উপহার লইয়া স্ত্রীর নিকট গিয়া প্রচুর হাস্যবিকাশ পূর্ব্বক সাতিশয় চতুরতার সহিত ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, "কি আনিয়াছি বল দেখি!

স্ত্রী কৌতূহল গোপন করিয়া উদাসীনভাবে কহিলেন, "কেমন করিয়া বলিব! আমি ত আর 'জান' নহি!"

বৈদ্যনাথ অনাবশ্যক কালব্যয় করিয়া প্রথমে দড়ির গাঠ অতি ধীরে ধীরে খুলিলেন তার পর ফুঁ দিয়া কাগজের ধূলা ঝাড়িলেন, তাহার পর অতি সাবধানে এক এক ভাঁজ করিয়া কাগজের মোড়ক খুলিয়া আর্টষ্টুডিয়োর রংকরা দশমহাবিদ্যার ছবি বাহির করিয়া আলোর দিকে ফিরাইয়া গৃহিণীর সম্মুখে ধরিলেন।

গৃহিণীর তৎক্ষণাৎ বিন্ধ্যবাসিনীর শয়নকক্ষের বিলাতী তেলের ছবি মনে পড়িল—অপর্য্যাপ্ত অবজ্ঞার স্বরে কহিলেন, "আ মরে' যাই! এ তোমার বৈঠকখানায় রাখিয়া বসিয়া বসিয়া নিরীক্ষণ কর গে। এ আমার কাজ নাই।" বিমর্ষ বৈদ্যনাথ বুঝিলেন অন্যান্য অনেক ক্ষমতার সহিত স্ত্রীলোকের মন

যোগাইবার দুরূহ ক্ষমতা হইতেও বিধাতা তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়াছেন।

এদিকে দেশে যত দৈবজ্ঞ আছে মোক্ষদা সকলকে হাত দেখাইলেন, কোষ্ঠী দেখাইলেন। সকলেই বলিল, তিনি সধবাবস্থায় মরিবেন। কিন্তু সেই পরমানন্দময় পরিণামের জন্য তিনি একান্ত ব্যগ্র ছিলেন না, অতএব ইহাতেও তাঁহার কৌতূহল নিবৃত্তি হইল না।

শুনিলেন তাঁহার সন্তানভাগ্য ভাল, পুত্রকন্যায় তাঁহার গৃহ অবিলম্বে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা আছে; শুনিয়া তিনি বিশেষ প্রফুল্লতা প্রকাশ করিলেন না।

অবশেষে একজন গণিয়া বলিল বৎসরখানেকের মধ্যে যদি বৈদ্যনাথ দৈব ধন প্রাপ্ত না হন, তাহা হইলে গণক তাহার পাঁজি-পুঁথি সমস্তই পুড়াইয়া ফেলিবে। গণকের এইরূপ নিদারুণ পণ শুনিয়া মোক্ষদার মনে আর তিলমাত্র অবিশ্বাসের কারণ রহিল না।

গণৎকার ত প্রচুর পারিতোষিক লইয়া বিদায় হইয়াছেন, কিন্তু বৈদ্যনাথের জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিল। ধন উপার্জ্জনের কতকগুলি সাধারণ প্রচলিত পথ আছে, যেমন চাষ, চাকরি ব্যবসা, চুরি এবং প্রতারণা। কিন্তু দৈব ধন উপার্জ্জনেরর সেরূপ নির্দ্দিষ্ট কোন উপায় নাই। এই জন্য মোক্ষদা বৈদ্যনাথকে যতই উৎসাহ দেন এবং ভর্ৎসনা করেন বৈদ্যনাথ ততই কোন দিকে রাস্তা দেখিতে পান না। কোন্‌খানে খুঁড়িতে আরম্ভ করিবেন

কোন্ পুকুরে ডুবারি নামাইবেন, বাড়ির কোন প্রাচীরটা ভাঙ্গিতে হইবে, কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারেন না।

মোক্ষদা নিতান্ত বিরক্ত হইয়া স্বামীকে জানাইলেন যে, পুরুষমানুষের মাথায় যে মস্তিষ্কের পরিবর্ত্তে এতটা গোময় থাকিতে পারে তাহা তাঁহার পূর্ব্বে ধারণা ছিল না।

বলিলেন "একটু নড়িয়া চড়িয়া দেখ। হাঁ করিয়া বসিয়া থাকিলে কি আকাশ হইতে টাকা বৃষ্টি হইবে?"

কথাটা সঙ্গত বটে, এবং বৈদ্যনাথের একান্ত ইচ্ছাও তাই, কিন্তু কোন্ দিকে নড়িবেন কিসের উপর চড়িবেন তাহা যে কেহ বলিয়া দেয় না! অতএব দাওয়ায় বসিয়া বৈদ্যনাথ আবার ছড়ি চাঁচিতে লাগিলেন।

এদিকে আশ্বিন মাসে দুর্গোৎসব নিকটবর্ত্তী হইল। চতুর্থীর দিন হইতেই ঘাটে নৌকা আসিয়া লাগিতে লাগিল। প্রবাসীরা দেশে ফিরিয়া আসিতেছে। ঝুড়িতে মানকচু কুমড়া শুষ্ক নারিকেল টিনের বাক্সের মধ্যে ছেলেদের জন্য জুতা ছাতা কাপড় এবং প্রেয়সীর জন্য এসেন্স সাবান নূতন গল্পের বহি এবং সুবাসিত নারিকেল তৈল।

মেঘমুক্ত আকাশে শরতের সূর্য্যকিরণ উৎসবের হাস্যের মত ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, পক্কোন্মুখ ধান্যক্ষেত্র থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিতেছে, বর্ষাধৌত সতেজ তরুপল্লব নব শীতবায়ুতে সির্ সির্ করিয়া উঠিতেছে—এবং তসরের চায়নাকোট পরিয়া কাঁধে একটী

পাকান চাদর ঝুলাইয়া ছাতি মাথায় প্রত্যাগত পথিকেরা মাঠের পথ দিয়া ঘরের মুখে চলিয়াছে।

বৈদ্যনাথ বসিয়া বসিয়া তাই দেখে এবং তাহার হৃদয় হইতে দীর্ঘনিশ্বাস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। নিজের নিরানন্দ গৃহের সহিত বাঙ্গলা দেশের সহস্র গৃহের মিলনোৎসবের তুলনা করে, এবং মনে মনে বলে, "বিধাতা কেন আমাকে এমন অকর্ম্মণ্য করিয়া সৃজন করিয়াছে!"—

ছেলেরা ভোরে উঠিয়াই প্রতিমা নির্ম্মাণ দেখিবার জন্য আদ্যনাথের বাড়ির প্রাঙ্গণে গিয়া হাজির ছিল। খাবারবেলা হইলে দাসী তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক গ্রেফ্‌তার করিয়া লইয়া আসিল। তখন বৈদ্যনাথ বসিয়া বসিয়া এই বিশ্বব্যাপী উৎসবের মধ্যে নিজের জীবনের নিস্ফলতা স্মরণ করিতেছিলেন। দাসীর হাত হইতে ছেলে দুটিকে উদ্ধার করিয়া কোলের কাছে ঘনিষ্ঠভাবে টানিয়া বড়টিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হাঁরে অবু, এবার পূজোর সময় কি চাস্ বল্ দেখি।"

অবিনাশ তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল "একটা নৌকো দিয়ো বাবা!"

ছোটটিও মনে করিল, বড় ভাইয়ের চেয়ে কোন বিষয়ে ন্যূন হওয়া কিছু নয়, কহিল "আমাকেও একটা নৌকো দিয়ো বাবা।"

বাপের উপযুক্ত ছেলে! একটা অকর্ম্মণ্য কারুকার্য্য পাইলে আর কিছু চাহে না। বাপ বলিলেন, "আচ্ছা।"

এদিকে যথাকালে পূজার ছুটিতে কাশী হইতে মোক্ষদার এক খুড়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন। তিনি ব্যবসায়ে উকীল। মোক্ষদা কিছুদিন ঘন ঘন তাঁহার বাড়ী যাতায়াত করিলেন।

অবশেষে একদিন স্বামীকে আসিয়া বলিলেন, "ওগো, তোমাকে কাশী যাইতে হইতেছে!"

বৈদ্যনাথ সহসা মনে করিলেন, বুঝি তাঁহার মৃত্যুকাল উপস্থিত, গণক কোষ্ঠী হইতে আবিষ্কার করিয়াছে; সহধর্ম্মিণী সেই সন্ধান পাইয়া তাঁহার সদ্গতি করিবার যুক্তি করিতেছেন।

পরে শুনিলেন, এইরূপ জনশ্রুতি, যে কাশীতে একটি বাড়ি আছে সেখানে গুপ্তধন মিলিবার কথা, সেই বাড়ি কিনিয়া তাহার ধন উদ্ধার করিয়া আনিতে হইবে।

বৈদ্যনাথ বলিলেন—কি সর্ব্বনাশ। আমি কাশী যাইতে পারিব না!"

বৈদ্যনাথ কখনও ঘর ছাড়িয়া কোথাও যান নাই। গৃহস্থকে কি করিয়া ঘরছাড়া করিতে হয় প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ লিখিতেছেন, স্ত্রীলোকের সে সম্বন্ধে "অশিক্ষিতপটুত্ব" আছে। মোক্ষদা মুখের কথায় ঘরের মধ্যে যেন লঙ্কার ধোঁয়া দিতে পারিতেন, কিন্তু তাহাতে হতভাগ্য বৈদ্যনাথ কেবল চোখের জলে ভাসিয়া যাইত, কাশী যাইবার নাম করিত না।

দিন দুই তিন গেল। বৈদ্যনাথ বসিয়া বসিয়া কতকগুলা কাষ্ঠখণ্ড কাটিয়া কুঁদিয়া জোড়া দিয়া দুইখানি খেলার নৌকা তৈরার করিলেন। তাহাতে মাস্তুল বসাইলেন, কাপড় কাটিয়া

পাল আঁটিয়া দিলেন; লাল শালুর নিশান উড়াইলেন, হাল ও দাঁড় বসাইয়া দিলেন। একটি পুতুল কর্ণধার এবং আরোহীও ছাড়িলেন না। তাহাতে বহু যত্ন এবং আশ্চর্য্য নিপুণতা প্রকাশ করিলেন। সে নৌকা দেখিয়া অসহ্য চিত্তচাঞ্চল্য না জন্মে এমন সংযতচিত্ত বালক সম্প্রতি পাওয়া দুর্লভ। অতএব বৈদ্যনাথ সপ্তমীর পূর্ব্বরাত্রে যখন নৌকা দুটি লইয়া ছেলেদের হাতে দিলেন তাহারা আনন্দে নাচিয়া উঠিল। একেত নৌকার খোলটাই যথেষ্ট, তাহাতে আবার হাল আছে, দাঁড় আছে, মাস্তুল আছে, পাল আছে, আবার যথাস্থানে মাঝি বসিয়া, ইহাই তাহাদের সমধিক বিস্ময়ের কারণ হইল।

ছেলেদের আনন্দকলরবে আকৃষ্ট হইয়া মোক্ষদা আসিয়া দরিদ্র পিতার পূজার উপহার দেখিলেন।

দেখিয়া, রাগিয়া কাঁদিয়া কপালে করাঘাত করিয়া খেলেনা দুটো কাড়িয়া জান্‌লার বাহিরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। সোনার হার গেল, সাটিনের জামা গেল, জরির টুপি গেল, শেষে কিনা হতভাগ্য মনুষ্য দুইখানা খেলানা দিয়া নিজের ছেলেকে প্রতারণা করিতে আসিয়াছে! তাও আবার দুই পয়সা ব্যয় নাই, নিজের হাতে নির্ম্মাণ!

ছোট ছেলে ত উর্দ্ধশ্বাসে কাঁদিতে লাগিল, "বোকা ছেলে" বলিয়া তাহাকে মোক্ষদা ঠাস্ করিয়া চড়াইয়া দিলেন।

বড় ছেলেটি বাপের মুখের দিকে চাহিয়া নিজের দুঃখ

ভুলিয়া গেল। উল্লাসের ভাণমাত্র করিয়া কহিল, “বাবা, আমি কাল ভোরে গিয়ে কুড়িয়ে নিয়ে আস্‌ব।”

বৈদ্যনাথ তাহার পরদিন কাশী যাইতে সম্মত হইলেন। কিন্তু টাকা কোথায়! তাঁহার স্ত্রী গহনা বিক্রয় করিয়া টাকা সংগ্রহ করিলেন। বৈদ্যনাথের পিতামহীর আমলের গহনা, এমন খাঁটি সোনা এবং ভারী গহনা আজকালকার দিনে পাওয়াই যায় না।

বৈদ্যনাথের মনে হইল তিনি মরিতে যাইতেছেন। ছেলেদের কোলে করিয়া চুম্বন করিয়া সাশ্রুনেত্রে বাড়ি হইতে বাহির হইলেন। তখন মোক্ষদাও কাঁদিতে লাগিলেন।

কাশীর বাড়িওয়ালা বৈদ্যনাথের খুড়শ্বশুরের মক্কেল। বোধ করি সেই কারণে বাড়ি খুব চড়া দামেই বিক্রয় হইল। বৈদ্যনাথ একাকী বাড়ি দখল করিয়া বসিলেন। একেবারে নদীর উপরেই বাড়ি। ভিত্তি ধৌত করিয়া নদীস্রোত প্রবাহিত হইতেছে।

রাত্রে বৈদ্যনাথের গা ছম্‌ ছম্‌ করিতে লাগিল। শূন্য গৃহে শিয়রের কাছে প্রদীপ জ্বালাইয়া চাদর মুড়ি দিয়া শয়ন করিলেন।

কিন্তু কিছুতেই নিদ্রা হয় না। গভীর রাত্রে যখন সমস্ত কোলাহল থামিয়া গেল তখন কোথা হইতে একটা ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ শুনিয়া বৈদ্যনাথ চমকিয়া উঠিলেন। শব্দ মৃদু কিন্তু পরিষ্কার। যেন পাতালে বলিরাজের ভাণ্ডারে কোষাধ্যক্ষ বসিয়া বসিয়া টাকা গণনা করিতেছে।

বৈদ্যনাথের মনে ভয় হইল, কৌতূহল হইল এবং সেই সঙ্গে দুর্জ্জয় আশার সঞ্চার হইল। কম্পিতহস্তে প্রদীপ লইয়া ঘরে ঘরে ফিরিলেন। এঘরে গেলে মনে হয় শব্দ ওঘর হইতে আসিতেছে—ওঘরে গেলে মনে হয় এঘর হইতে আসিতেছে। বৈদ্যনাথ সমস্ত রাত্রি কেবলই এঘর ওঘর করিলেন। দিনের বেলা সেই পাতালভেদী শব্দ অন্যান্য শব্দের সহিত মিশিয়া গেল, আর তাহাকে চিনা গেল না।

রাত্রি দুই তিন প্রহরের সময় যখন জগৎ নিদ্রিত হইল তখন আবার সেই শব্দ জাগিয়া উঠিল। বৈদ্যনাথের চিত্ত নিতান্ত অস্থির হইল। শব্দ লক্ষ্য করিয়া কোন্ দিকে যাইবেন ভাবিয়া পাইলেন না। মরুভূমির মধ্যে জলের কল্লোল শোনা যাইতেছে অথচ কোন্ দিক্ হইতে আসিতেছে নির্ণয় হইতেছে না; ভয় হইতেছে পাছে একবার ভুল পথ অবলম্বন করিলে গুপ্ত নির্ঝরিণী একেবারে আয়ত্তের অতীত হইয়া যায়; তৃষিত পথিক স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া প্রাণপণে কান খাড়া করিয়া থাকে, এদিকে তৃষ্ণা উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠে—বৈদ্যনাথের সেই অবস্থা হইল।

বহুদিন অনিশ্চিত অবস্থাতেই কাটিয়া গেল। কেবল অনিদ্রা এবং বৃথা আশ্বাসে তাঁহার সন্তোষস্নিগ্ধ মুখে ব্যগ্রতার তীব্রভাব রেখাঙ্কিত হইয়া উঠিল। কোটরনিবিষ্ট চকিতনেত্রে মধ্যাহ্নের মরুবালুকার মত একটা জ্বালা প্রকাশ পাইল।

অবশেষে একদিন দ্বিপ্রহরে সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করিয়া ঘরের

মেঝেময় শাবল ঠুকিয়া শব্দ করিতে লাগিলেন। একটি পার্শ্ববর্ত্তী ছোট কুঠরির মেঝের মধ্য হইতে ফাঁপা আওয়াজ দিল।

রাত্রি নিষুপ্ত হইলে পর বৈদ্যনাথ একাকী বসিয়া সেই মেঝে খনন করিতে লাগিলেন। যখন রাত্রি প্রভাত প্রায়, তখন ছিদ্রখনন সম্পূর্ণ হইল।

বৈদ্যনাথ দেখিলেন নীচে একটা ঘরের মত আছে—কিন্তু সেই রাত্রের অন্ধকারে তাহার মধ্যে নির্ব্বিচারে পা নামাইয়া দিতে সাহস করিলেন না। গর্ত্তের উপর বিছানা চাপা দিয়া শয়ন করিলেন। কিন্তু শব্দ এমান পরিস্ফুট হইয়া উঠিল যে ভয়ে সেখান হইতে উঠিয়া আসিলেন—অথচ গৃহ অরক্ষিত রাখিয়া দ্বার ছাড়িয়া দূরে যাইতে প্রবৃত্তি হইল না। লোভ এবং ভয় দুই দিক হইতে দুই হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল। রাত কাটিয়া গেল।

আজ দিনের বেলাও শব্দ শুনা যায়। ভৃত্যকে ঘরের মধ্যে ঢুকিতে না দিয়া বাহিরে আহারাদি করিলেন। আহরান্তে ঘরে ঢুকিয়া দ্বারে চাবি লাগাইয়া দিলেন।

দুর্গানাম উচ্চারণ করিয়া গহ্বরমুখ হইতে বিছানা সরাইয়া ফেলিলেন। জলের ছল্‌ছল্ এবং ধাতুদ্রব্যের ঠংঠং খুব পরিষ্কার শুনা গেল।

ভয়ে ভয়ে গর্ত্তের কাছে আস্তে আস্তে মুখ লইয়া গিয়া দেখিলেন অনতি উচ্চ কক্ষের মধ্যে জলের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে—অন্ধকারে আর বিশেষ কিছু দেখিতে পাইলেন না।

একটা বড় লাঠি নামাইয়া দেখিলেন জল এক হাঁটুর অধিক নহে। একটি দিয়াশালাই ও বাতি লইয়া সেই অগভীর গৃহের মধ্যে অনায়াসে লাফাইয়া পড়িলেন। পাছে এক মুহূর্ত্তে সমস্ত আশা নিবিয়া যায় এইজন্য বাতি জ্বালাইতে হাত কাঁপিতে লাগিল। অনেকগুলি দেশালাই নষ্ট করিয়া অবশেষে বাতি জ্বলিল।

দেখিলেন, একটি মোটা লোহার শিকলিতে একটি বৃহৎ তাঁবার কলসী বাঁধা রহিয়াছে, এক একবার জলের স্রোত প্রবল হয় এবং শিক্‌লি কলসীর উপর পড়িয়া শব্দ করিতে থাকে।

বৈদ্যনাথ জলের উপর ছন্‌ছন্‌ শব্দ করিতে করিতে তাড়াতাড়ি সেই কলসীর কাছে উপস্থিত হইলেন। গিয়া দেখিলেন কলসী শূন্য।

তথাপি নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না—দুই হস্তে কলসী তুলিয়া খুব করিয়া ঝাঁকানি দিলেন। ভিতরে কিছুই নাই। উপুড় করিয়া ধরিলেন। কিছুই পড়িল না। দেখিলেন কলসীর গলা ভাঙ্গা। যেন এককালে এই কলসীর মুখ সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল কে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে।

তখন বৈদ্যনাথ জলের মধ্যে দুই হস্ত দিয়া পাগলের মত হাতড়াইতে লাগিলেন। কর্দ্দমস্তরের মধ্যে হাতে কি একটা ঠেকিল, তুলিয়া দেখিলেন মড়ার মাথা—সেটাও একবার কানের কাছে লইয়া ঝাঁকাইলেন—ভিতরে কিছুই নাই। ছুড়িয়া ফেলিয়া

দিলেন। অনেক খুঁজিয়া নরকঙ্কালের অস্থি ছাড়া আর কিছুই পাইলেন না।

দেখিলেন নদীর দিকে দেয়ালের এক জায়গা ভাঙ্গা; সেইখান দিয়া জল প্রবেশ করিতেছে, এবং তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী যে ব্যক্তির কোষ্ঠীতে দৈবধনলাভ লেখা ছিল, সেও সম্ভবত এই ছিদ্র দিয়া প্রবেশ করিয়াছিল।

অবশেষে সম্পূর্ণ হতাশ হইয়া "মা" বলিয়া মস্ত একটা মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন—প্রতিধ্বনি যেন অতীত কালের আরো অনেক হতাশ্বাস ব্যক্তির নিশ্বাস একত্রিত করিয়া ভীষণ গাম্ভীর্য্যের সহিত পাতাল হইতে স্তনিত হইয়া উঠিল।

সর্ব্বাঙ্গে জলকাদা মাখিয়া বৈদ্যনাথ উপরে উঠিলেন।

জনপূর্ণ কোলাহলময় পৃথিবী তাঁহার নিকটে আদ্যোপান্ত মিথ্যা এবং সেই শৃঙ্খলবদ্ধ ভগ্নঘটের মত শূন্য বোধ হইল।

আবার যে জিনিষপত্র বাঁধিতে হইবে, টিকিট কিনিতে হইবে, গাড়িচড়িতে হইবে, বাড়ি ফিরিতে হইবে, স্ত্রীর সহিত বাক্‌বিতণ্ডা করিতে হইবে, জীবন প্রতিদিন বহন করিতে হইবে সে তাঁহার অসহ্য বলিয়া বোধ হইল। ইচ্ছা হইল নদীর জীর্ণ পাড়ের মত ঝুপ করিয়া ভাঙ্গিয়া জলে পড়িয়া যান।

কিন্তু তবু সেই জিনিষপত্র বাঁধিলেন, টিকিট কিনিলেন, এবং গাড়িও চড়িলেন।

এবং একদিন শীতের সায়াহ্নে বাড়ির দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। আশ্বিন মাসে শরতের প্রাতঃকালে দ্বারের কাছে

বসিয়া বৈদ্যনাথ অনেক প্রবাসীকে বাড়ি ফিরিতে দেখিয়াছেন, এবং দীর্ঘশ্বাসের সহিত মনে মনে এই বিদেশ হইতে দেশে ফিরিবার সুখের জন্য লালায়িত হইয়াছেন—তখন আজিকার সন্ধ্যা স্বপ্নেরও অগম্য ছিল।

বাড়িতে প্রবেশ করিয়া প্রাঙ্গণের কাষ্ঠাসনে নির্ব্বোধের মত বসিয়া রহিলেন, অন্তঃপুরে গেলেন না। সর্ব্বপ্রথমে ঝি তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দকোলাহল বাধাইয়া দিল, ছেলেরা ছুটিয়া আসিল, গৃহিণী ডাকিয়া পাঠাইলেন।

বৈদ্যনাথের যেন একটা ঘোর ভাঙ্গিয়া গেল, আবার যেন তাঁহার সেই পূর্ব্বসংসারে জাগিয়া উঠিলেন।

শুষ্কমুখে ম্লানহাস্য লইয়া একটা ছেলেকে কোলে করিয়া একটা ছেলের হাত ধরিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

তখন ঘরে প্রদীপ জ্বালান হইয়াছে এবং যদিও রাত হয় নাই তথাপি শীতের সন্ধ্যা, রাত্রির মত নিস্তব্ধ হইয়া আসিয়াছে।

বৈদ্যনাথ খানিকক্ষণ কিছু বলিলেন না, তার পর মৃদুস্বরে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন আছ?"

স্ত্রী তাহার কোন উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইল?"

বৈদ্যনাথ নিরুত্তরে কপালে আঘাত করিলেন। মোক্ষদার মুখ ভারি শক্ত হইয়া উঠিল।

ছেলেরা প্রকাণ্ড একটা অকল্যাণের ছায়া দেখিয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া গেল। ঝির কাছে গিয়া বলিল, "সেই নাপিতের গল্প বল্।" বলিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

রাত হইতে লাগিল কিন্তু দুজনের মুখে একটি কথা নাই। বাড়ির মধ্যে কি একটা যেন ছম্‌ছম্ করিতে লাগিল এবং মোক্ষদার ঠোঁট দুটি ক্রমশই বজ্রের মত আঁটিয়া আসিল।

অনেকক্ষণ পরে মোক্ষদা কোন কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে শয়নগৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন।

বৈদ্যনাথ চুপ করিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। চৌকিদার প্রহর হাঁকিয়া গেল। শ্রান্ত পৃথিবী অকাতর নিদ্রায় মগ্ন হইয়া রহিল। আপনার আত্মীয় হইতে আরম্ভ করিয়া অনন্ত আকাশের নক্ষত্র পর্য্যন্ত কেহই এই লাঞ্ছিত ভগ্ননিদ্র বৈদ্যনাথকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিল না।

অনেক রাত্রে, বোধ করি কোন স্বপ্ন হইতে জাগিয়া বৈদ্য-নাথের বড় ছেলেটি শয্যা ছাড়িয়া আস্তে আস্তে বারেন্দায় আসিয়া ডাকিল, "বাবা!"

তখন তাহার বাবা সেখানে নাই। অপেক্ষাকৃত ঊর্দ্ধকণ্ঠে রুদ্ধদ্বারের বাহির হইতে ডাকিল, "বাবা!" কিন্তু কোন উত্তর পাইল না।

আবার ভয়ে ভয়ে বিছানায় গিয়া শয়ন করিল।

পূর্ব্বপ্রথানুসারে ঝি সকালবেলায় তামাক সাজিয়া তাঁহাকে খুঁজিল, কোথাও দেখিতে পাইল না। বেলা হইলে প্রতিবেশিগণ গৃহপ্রত্যাগত বান্ধবের খোঁজ লইতে আসিল, কিন্তু বৈদ্যনাথের সহিত সাক্ষাৎ হইল না।

প্রতিবেশিনী।

আমার প্রতিবেশিনী বালবিধবা। যেন শরতের শিশিরাশ্রুপ্লুত শেফালির মত বৃন্তচ্যুত,—কোন বাসরগৃহের ফুলশয্যার জন্য সে নহে, সে কেবল দেবপূজার জন্যই উৎসর্গ-করা।

তাহাকে আমি মনে মনে পূজা করিতাম। তাহার প্রতি আমার মনের ভাবটা যে কি ছিল পূজা ছাড়া তাহা অন্য কোন সহজ ভাষায় প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি না—পরের কাছে ত নয়ই, নিজের কাছেও না!

আমার অন্তরঙ্গ প্রিয়বন্ধু নবীনমাধব, সেও কিছু জানিত না। এইরূপে এই যে আমার গভীরতম আবেগটিকে গোপন করিয়া নির্ম্মল করিয়া রাখিয়াছিলাম ইহাতে আমি কিছু গর্ব্ব অনুভব করিতাম।

কিন্তু মনের বেগ পার্ব্বতী নদীর মত, নিজের জন্মশিখরে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে চাহে না। কোন একটা উপায়ে বাহির হইবার চেষ্টা করে। অকৃতকার্য্য হইলে বক্ষের মধ্যে বেদনার সৃষ্টি করিতে থাকে। তাই ভাবিতেছিলাম, কবিতায় ভাব প্রকাশ করিব কিন্তু কুণ্ঠিতা লেখনী কিছুতেই অগ্রসর হইতে চাহিল না।

পরমাশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঠিক এই সময়েই আমার বন্ধু

নবীনমাধবের অকস্মাৎ বিপুলবেগে কবিতা লিখিবার ঝোঁক আসিল; যেন হঠাৎ ভূমিকম্পের মত।

সে বেচারার এরূপ দৈববিপত্তি পূর্ব্বে কখন হয় নাই; সুতরাং সে এই অভিনয় আন্দোলনের জন্য লেশমাত্র প্রস্তুত ছিল না। তাহার হাতের কাছে ছন্দ মিল কিছুরই জোগাড় ছিল না, তবু সে দমিল না দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। কবিতা যেন বৃদ্ধ বয়সের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর মত তাহাকে পাইয়া বসিল। নবীনমাধব ছন্দ মিল সম্বন্ধে সহায়তা ও সংশোধনের জন্য আমার শরণাপন্ন হইল।

কবিতার বিষয়গুলি নূতন নহে; অথচ পুরাতনও নহে। অর্থাৎ তাহাকে চিরনূতনও বলা যায়, চিরপুরাতন বলিলেও চলে! প্রেমের কবিতা, প্রিয়তমার প্রতি। আমি তাহাকে একটা ঠেলা দিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কে হে, ইনি কে?

নবীন হাসিয়া কহিল—এখনো সন্ধান পাই নাই!

নবীন রচয়িতার সহায়তাকার্য্যে আমি অত্যন্ত আরাম পাইলাম। নবীনের কাল্পনিক প্রিয়তমার প্রতি আমার রুদ্ধ আবেগ প্রয়োগ করিলাম। শাবকহীন মুরগি যেমন হাঁসের ডিম পাইলেও বুক পাতিয়া তা দিতে বসে, হতভাগ্য আমি তেমনি নবীনমাধবের ভাবের উপরে হৃদয়ের সমস্ত উত্তাপ দিয়া চাপিয়া বসিলাম। আনাড়ির লেখা এমনি প্রবল বেগে সংশোধন করিতে লাগিলাম যে প্রায় পনেরো আনা আমারি লেখা দাঁড়াইল।

নবীন বিস্মিত হইয়া বলে—ঠিক এই কথাই আমি বলিতে চাই কিন্তু বলিতে পারি না! অথচ তোমার এ সব ভাব জোগায় কোথা হইতে ?

আমি কবির মত উত্তর করি—কল্পনা হইতে। কারণ, সত্য নীরব, কল্পনাই মুখরা। সত্যঘটনা ভাবস্রোতকে পাথরের মত চাপিয়া থাকে, কল্পনাই তাহার পথ মুক্ত করিয়া দেয়।

নবীন গম্ভীর মুখে একটুখানি ভাবিয়া কহিল,—তাই ত দেখিতেছি! ঠিক বটে!—আবার খানিকক্ষণ ভাবিয়া বলিল—ঠিক্ ঠিক্!

পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমার ভালবাসার মধ্যে একটি কাতর সঙ্কোচ ছিল, তাই নিজের জবানীতে কোনমতে লিখিতে পারিলাম না। নবীনকে পর্দ্দার মধ্যে মাঝখানে রাখিয়া তবেই আমার লেখনী মুখ খুলিতে পারিল। লেখাগুলো যেন রসে ভরিয়া উত্তাপে ফাটিয়া উঠিতে লাগিল!

নবীন বলিল, এত তোমারি লেখা! তোমারি নামে বাহির করি।

আমি কহিলাম,—বিলক্ষণ! এ তোমারি লেখা—আমি সামান্য একটু বদল করিয়াছি মাত্র!

ক্রমে নবীনেরও সেইরূপ ধারণা জন্মিল!

জ্যোতির্ব্বিদ্ যেমন নক্ষত্রোদয়ের অপেক্ষায় আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকে, আমিও যে তেমনি মাঝে মাঝে আমাদের পাশের বাড়ির বাতায়নের দিকে চাহিয়া দেখিতাম সে কথা

অস্বীকার করিতে পারি না। মাঝে মাঝে ভক্তের সেই ব্যাকুল দৃষ্টিক্ষেপ সার্থকও হইত। সেই কর্ম্মযোগনিরতা ব্রহ্মচারিণীর সৌম্য মুখশ্রী হইতে শান্তস্নিগ্ধ জ্যোতি প্রতিবিম্বিত হইয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে আমার সমস্ত চিত্তক্ষোভ দমন করিয়া দিত।

কিন্তু সেদিন সহসা এ কি দেখিলাম! আমার চন্দ্রলোকেও কি এখনো অগ্ন্যুৎপাত আছে? সেখানকার জনশূন্য সমাধিমগ্ন গিরিগুহার সমস্ত বহ্নিদাহ এখনো সম্পূর্ণ নির্ব্বাণ হইয়া যায় নাই কি?

সে দিন বৈশাখ মাসের অপরাহ্ণে ঈশান কোণে মেঘ ঘনাইয়া আসিতেছিল। সেই আসন্ন ঝঞ্চার মেঘবিচ্ছুরিত রুদ্রদীপ্তিতে আমার প্রতিবেশিনী জানালায় একাকিনী দাঁড়াইয়াছিল। সে দিন তাহার শূন্যনিবিষ্ট ঘনকৃষ্ণ দৃষ্টির মধ্যে কি সুদূর প্রসারিত নিবিড় বেদনা দেখিতে পাইলাম!

আছে, আমার ঐ চন্দ্রালোকে এখনো উত্তাপ আছে! এখনো সেখানে উষ্ণ নিঃশ্বাস সমীরিত। দেবতার জন্য মানুষ নহে, মানুষের জন্যই সে! তাহার সেই দুটি চক্ষুর বিশাল ব্যাকুলতা সেদিনকার সেই ঝড়ের আলোকে ব্যগ্র পাখীর মত উড়িয়া চলিয়াছিল। স্বর্গের দিকে নহে—মানব হৃদয়নীড়ের দিকে।

সেই উৎসুক আকাঙ্ক্ষা-উদ্দীপ্ত দৃষ্টিপাতটি দেখার পর হইতে অশান্ত চিত্তকে সুস্থির করিয়া রাখা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হইল। তখন কেবল পরের কাঁচা কবিতা সংশোধন করিয়া তৃপ্তি হয় না —একটা যে-কোনপ্রকার কাজ করিবার জন্য চঞ্চলতা জন্মিল।

তখন সংকল্প করিলাম, বাঙ্গালা দেশে বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিবার জন্য আমার সমস্ত চেষ্টা প্রয়োগ করিব। কেবল বক্তৃতা ও লেখা নহে, অর্থ সাহায্য করিতেও অগ্রসর হইলাম।

নবীন আমার সঙ্গে তর্ক করিতে লাগিল। সে বলিল—চিরবৈধব্যের মধ্যে একটি পবিত্র শান্তি আছে, একাদশীর ক্ষীণ জ্যোৎস্নালোকিত সমাধিভূমির মত একটি বিরাট রমণীয়তা আছে; বিবাহের সম্ভাবনামাত্রেই কি সেটা ভাঙ্গিয়া যায় না?

এ সব কবিত্বের কথা শুনিলেই আমার রাগ হইত। দুর্ভিক্ষে যে লোক জীর্ণ হইয়া মরিতেছে তাহার কাছে আহারপুষ্ট লোক যদি খাদ্যের স্থূলত্বের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়া ফুলের গন্ধ এবং পাখীর গান দিয়া মুমূর্ষুর পেট ভরাইতে চাহে তাহা হইলে সে কেমন হয়?

আমি রাগিয়া কহিলাম,—দেখ নবীন, আর্টিষ্ট লোকে বলে, দৃশ্য হিসাবে পোড়ো বাড়ির বড় একটি সৌন্দর্য্য আছে। কিন্তু বাড়িটাকে কেবল ছবির হিসাবে দেখিলে চলে না, তাহাতে বাস করিতে হয়—অতএব আর্টিষ্ট্ যাহাই বলুন মেরামত আবশ্যক। বৈধব্য লইয়া তুমি ত দূর হইতে দিব্য কবিত্ব করিতে চাও—কিন্তু তাহার মধ্যে একটি আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ মানবহৃদয় আপনার বিচিত্র বেদনা লইয়া বাস করিতেছে সেটা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

মনে করিয়াছিলাম নবীনমাধবকে কোনমতেই দলে টানিতে পারিব না—সেদিন সেই জন্যই কিছু অতিরিক্ত উষ্মার সহিত কথা কহিয়াছিলাম। কিন্তু হঠাৎ দেখিলাম, আমার বক্তৃতা অবসানে

নবীনমাধব একটিমাত্র গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আমার সমস্ত কথা মানিয়া লইল; বাকি আরও অনেক ভাল ভাল কথা বলিবার অবকাশই দিল না!

সপ্তাহখানেক পরে নবীন আসিয়া কহিল, তুমি যদি সাহায্য কর আমি একটি বিধবাবিবাহ করিতে প্রস্তুত আছি।

এমনি খুসি হইলাম—নবীনকে বুকে টানিয়া কোলাকুলি করিলাম, কহিলাম যত টাকা লাগে আমি দিব। তখন নবীন তাহার ইতিহাস বলিল।

বুঝিলাম তাহার প্রিয়তমা কাল্পনিক নহে। কিছুকাল ধরিয়া একটি বিধবা নারীকে সে দূর হইতে ভাল বাসিত, কাহারও কাছে তাহা প্রকাশ করে নাই। যে মাসিকপত্রে নবীনের ওরফে আমার কবিতা বাহির হইত সেই পত্রগুলি যথা স্থানে গিয়া পৌছিত। কবিতাগুলি ব্যর্থ হয় নাই। বিনা সাক্ষাৎকারে চিত্ত আকর্ষণের এই এক উপায় আমার বন্ধু বাহির করিয়াছিলেন।

কিন্তু নবীন বলেন তিনি চক্রান্ত করিয়া এই সকল কৌশল অবলম্বন করেন নাই। এমন কি, তাঁহার বিশ্বাস ছিল বিধবা পড়িতে জানেন না। বিধবার ভাইয়ের নামে কাগজগুলি বিনা স্বাক্ষরে বিনা মূল্যে পাঠাইয়া দিতেন। এ কেবল মনকে সান্ত্বনা দিবার একটা পাগ্‌লামি মাত্র। মনে হইত দেবতার উদ্দেশে পুষ্পাঞ্জলি দান করা গেল, তিনি জানুন্ বা না জানুন্, গ্রহণ করুন্ বা নাই করুন্।

নানা ছুতায় বিধবার ভাইয়ের সঙ্গে নবীন যে বন্ধুত্ব করিয়া

লইয়াছিলেন নবীন বলেন তাহারও মধ্যে কোন উদ্দেশ্য ছিল না। যাহাকে ভালবাসা যায় তাহার নিকটবর্ত্তী আত্মীয়ের সঙ্গ মধুর বোধ হয়।

অবশেষে ভাইয়ের কঠিন পীড়া উপলক্ষে ভগিনীর সহিত কেমন করিয়া সাক্ষাৎ হয় সে সুদীর্ঘ কথা। কবির সহিত কবিতার অবলম্বিত বিষয়টির প্রত্যক্ষ পরিচয় হইয়া কবিতা সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়া গেছে। আলোচনা যে, কেবল ছাপান কবিতা কয়টির মধ্যেই বদ্ধ ছিল তাহাও নহে।

সম্প্রতি আমার সহিত তর্কে পরাস্ত হইয়া নবীন সেই বিধবার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিবাহের প্রস্তাব করিয়া বসিয়াছে। প্রথমে কিছুতেই সম্মতি পায় নাই। নবীন তখন আমার মুখের সমস্ত যুক্তিগুলি প্রয়োগ করিয়া এবং তাহার সহিত নিজের চোখের দুই চা'র ফোঁটা জল মিশাইয়া তাহাকে সম্পূর্ণ হার মানাইয়াছে। এখন বিধবার অভিভাবক পিসে কিছু টাকা চায়।

আমি বলিলাম—এখনি লও!

নবীন বলিল, তাহা ছাড়া বিবাহের পর প্রথম মাস পাঁচ ছয় বাবা নিশ্চয় আমার মাসহারা বন্ধ করিয়া দিবেন, তখনকার মত উভয়ের খরচ চালাইবার জোগাড় করিয়া দিতে হইবে। আমি কথাটি না কহিয়া চেক্ লিখিয়া দিলাম। বলিলাম—এখন তাঁহার নামটি বল। আমার সঙ্গে যখন কোন প্রতিযোগিতা নাই তখন পরিচয় দিতে ভয় করিয়োনা, তোমার গা ছুঁইয়া শপথ করিতেছি

আমি তাঁহার নামে কবিতা লিখিব না, এবং যদি লিখি তাঁহার ভাইকে না পাঠাইয়া তোমার কাছে পাঠাইয়া দিব!

নবীন কহিল—আরে, সে জন্য আমি ভয় করি না। বিধবা বিবাহের লজ্জায় তিনি অত্যন্ত কাতর—তাই তোমাদের কাছে তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে তিনি অনেক করিয়া নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু এখন আর ঢাকিয়া রাখা মিথ্যা।—তিনি তোমারই প্রতিবেশিনী, ১৯ নম্বরে থাকেন।

হৃৎপিণ্ডটা যদি লোহার বয়লার হইত ত এক চমকে ধক্ করিয়া ফাটিয়া যাইত। জিজ্ঞাসা করিলাম, বিধবা বিবাহে তাঁহার অমত নাই?

নবীন হাসিয়া কহিল, সম্প্রতি ত নাই!

আমি কহিলাম—কেবল কবিতা পড়িয়াই তিনি মুগ্ধ?

নবীন কহিল—কেন, আমার সেই কবিতাগুলি ত মন্দ হয় নাই?

আমি মনে মনে কহিলাম—ধিক্!

ধিক্ কাহাকে? তাঁহাকে, না আমাকে, না বিধাতাকে? কিন্তু ধিক্!

অনধিকার প্রবেশ

একদা প্রাতঃকালে পথের ধারে দাঁড়াইয়া এক বালক আর এক বালকের সহিত একটি অসমসাহসিক অনুষ্ঠান সম্বন্ধে বাজি রাখিয়াছিল। ঠাকুরবাড়ির মাধবী-বিতান হইতে ফুল তুলিয়া আনিতে পারিবে কি না ইহাই লইয়া তর্ক। একটি বালক বলিল পারিব, আর একটি বালক বলিল কখনই পারিবে না!

কাজটি শুনিতে সহজ অথচ করিতে কেন সহজ নহে তাহার বৃত্তান্ত আর একটু বিস্তারিত করিয়া বলা আবশ্যক।

পরলোকগত মাধবচন্দ্র তর্কবাচস্পতির বিধবা স্ত্রী জয়কালী দেবী এই রাধানাথ জীউর মন্দিরের অধিকারিণী। অধ্যাপক মহাশয় টোলে যে তর্কবাচস্পতি উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন পত্নীর নিকটে একদিনের জন্যও সে উপাধি সপ্রমাণ করিতে পারেন নাই। কোন কোন পণ্ডিতের মতে উপাধির সার্থকতা ঘটিয়াছিল, কারণ, তর্ক এবং বাক্য সমস্তই তাঁহার পত্নীর অংশে পড়িয়াছিল, তিনি পতিরূপে তাহার সম্পূর্ণ ফলভোগ করিয়াছিলেন।

সত্যের অনুরোধে বলিতে হইবে জয়কালী অধিক কথা কহিতেন না—কিন্তু অনেক সময় দুটি কথায়, এমন কি, নীরবে অতি বড় প্রবল মুখবেগও বন্ধ করিয়া দিতে পারিতেন।

জয়কালী দীর্ঘাকার, দৃঢ়শরীর, তীক্ষ্ণনাসা, প্রখরবুদ্ধি স্ত্রীলোক। তাঁহার স্বামী বর্ত্তমানে তাঁহাদের দেবত্র সম্পত্তি নষ্ট হইবার জো হইয়াছিল। বিধবা তাহার সমস্ত বাকি বকেয়া আদায়, সীমা সরহদ্দ স্থির এবং বহুকালের বেদখল উদ্ধার করিয়া সমস্ত পরিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রাপ্য হইতে কেহ তাঁহাকে এক কড়ি বঞ্চিত করিতে পারিত না।

এই স্ত্রীলোকটির প্রকৃতির মধ্যে বহুল পরিমাণে পৌরুষের অংশ থাকাতে তাঁহার যথার্থ সঙ্গী কেহ ছিল না। স্ত্রীলোকেরা তাঁহাকে ভয় করিত। পরনিন্দা, ছোট কথা বা নাকীকান্না তাঁহার অসহ্য ছিল। পুরুষেরাও তাঁহাকে ভয় করিত; কারণ, পল্লিবাসী ভদ্রপুরুষদের চণ্ডীমণ্ডপগত অগাধ আলস্যকে তিনি এক প্রকার নীরব ঘৃণাপূর্ণ তীক্ষ্ণ কটাক্ষের দ্বারা ধিক্কার করিয়া যাইতে পারিতেন যাহা তাঁহাদের স্থূল জড়ত্ব ভেদ করিয়াও অন্তরে প্রবেশ করিত।

প্রবলরূপে ঘৃণা করিবার এবং সে ঘৃণা প্রবলরূপে প্রকাশ করিবার অসাধারণ ক্ষমতা এই প্রৌঢ়া বিধবাটির ছিল। বিচারে যাহাকে অপরাধী করিতেন তাহাকে তিনি কথায় এবং বিনা কথায়, ভাবে এবং ভঙ্গীতে একেবারে দগ্ধ করিয়া যাইতে পারিতেন।

পল্লীর সমস্ত ক্রিয়াকর্ম্মে বিপদে সম্পদে তাঁহার নিরলস হস্ত ছিল। সর্ব্বত্রই তিনি নিজের একটি গৌরবের স্থান বিনা চেষ্টায় অতি সহজেই অধিকার করিয়া লইতেন। যেখানে তিনি উপস্থিত থাকিতেন সেখানে তিনিই যে, সকলের প্রধানপদে, সে সম্বন্ধে

তাঁহার নিজের অথবা উপস্থিত কোন ব্যক্তির মনে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকিত না।

রোগীর সেবায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন, কিন্তু রোগী তাঁহাকে যমের মত ভয় করিত। পথ্য বা নিয়মের লেশমাত্র লঙ্ঘন হইলে তাঁহার ক্রোধানল রোগের তাপ অপেক্ষা রোগীকে অধিক উত্তপ্ত করিয়া তুলিত।

এই দীর্ঘাকার কঠিন বিধবাটি বিধাতার কঠোর নিয়মদণ্ডের ন্যায় পল্লীর মস্তকের উপর উদ্যত ছিলেন; কেহ তাঁহাকে ভালবাসিতে অথবা অবহেলা করিতে সাহস করিত না। পল্লীর সকলের সঙ্গেই তাঁহার যোগ ছিল অথচ তাঁহার মত অত্যন্ত একাকিনী কেহ ছিল না।

বিধবা নিঃসন্তান ছিলেন। পিতৃমাতৃহীন দুইটি ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহার গৃহে মানুষ হইত। পুরুষ অভিভাবক অভাবে তাহাদের যে কোন প্রকার শাসন ছিল না এবং স্নেহান্ধ পিসিমার আদরে তাহারা যে নষ্ট হইয়া যাইতেছিল এমন কথা কেহ বলিতে পারিত না। তাহাদের মধ্যে বড়টির বয়স আঠারো হইয়াছিল। মাঝে মাঝে তাহার বিবাহের প্রস্তাবও আসিত এবং পরিণয়বন্ধন সম্বন্ধে বালকটির চিত্তও উদাসীন ছিল না। কিন্তু পিসিমা তাহার সেই সুখবাসনায় একদিনের জন্যও প্রশ্রয় দেন নাই। অন্য স্ত্রীলোকের ন্যায় কিশোর নবদম্পতির নব প্রেমোদ্গমদৃশ্য তাঁহার কল্পনায় অত্যন্ত উপভোগ্য মনোরম বলিয়া প্রতীত হইত না। বরং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বিবাহ করিয়া অন্য ভদ্র গৃহস্থের ন্যায়

আলস্যভরে বসিয়া পত্নীর আদরে প্রতিদিন স্ফীত হইতে থাকিবে এ সম্ভাবনা তাঁহার নিকট নিরতিশয় হেয় বলিয়া প্রতীত হইত। তিনি কঠিন ভাবে বলিতেন, পুলিন আগে উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করুক্ তার পরে বধূ ঘরে আনিবে। পিসিমার মুখের সেই কঠোর বাক্যে প্রতিবেশিনীদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত।

ঠাকুরবাড়িটি জয়কালীর সর্ব্বাপেক্ষা যত্নের ধন ছিল। ঠাকুরের শয়ন বসন স্নানাহারের তিলমাত্র ত্রুটি হইতে পারিত না। পূজক ব্রাহ্মণ দুটি দেবতার অপেক্ষা এই একটি মানবীকে অনেক বেশি ভয় করিত। পূর্ব্বে এক সময় ছিল যখন দেবতার বরাদ্দ দেবতা পূরা পাইতেন না। কারণ, পূজক ঠাকুরের আর একটি পূজার প্রতিমা গোপন মন্দিরে ছিল। তাহার নাম ছিল নিস্তারিণী। গোপনে ঘৃত দুগ্ধ ছানা ময়দার নৈবেদ্য স্বর্গে নরকে ভাগাভাগি হইয়া যাইত। কিন্তু আজ-কাল জয়কালীর শাসনে পূজার ষোলআনা অংশই ঠাকুরের ভোগে আসিতেছে, উপদেবতাগণকে অন্যত্র জীবিকার অন্য উপায় অন্বেষণ করিতে হইয়াছে।

বিধবার যত্নে ঠাকুরবাড়ির প্রাঙ্গণটি পরিষ্কার তক্‌তক্ করিতেছে—কোথাও একটি তৃণমাত্র নাই। একপার্শ্বে মঞ্চ অবলম্বন করিয়া মাধবীলতা উঠিয়াছে, তাহার শুষ্কপত্র পড়িবামাত্র জয়কালী তাহা তুলিয়া লইয়া বাহিরে ফেলিয়া দেন। ঠাকুরবাড়িতে পারিপাট্য পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার কিছুমাত্র ব্যাঘাত হইলে বিধবা তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না। পাড়ার ছেলেরা পূর্ব্বে লুকাচুরি খেলা উপলক্ষে এই প্রাঙ্গণের প্রান্তে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ

করিত এবং মধ্যে মধ্যে পাড়ার ছাগশিশু আসিয়া মাধবীলতার বল্কলাংশ কিছু কিছু ভক্ষণ করিয়া যাইত। এখন আর সে সুযোগ নাই। পর্ব্বকাল ব্যতীত অন্য দিনে ছেলেরা প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে পাইত না এবং ক্ষুধাতুর ছাগশিশুকে দণ্ডাঘাত খাইয়াই দ্বারের নিকট হইতে তারস্বরে আপন অজ-জননীকে আহ্বান করিতে করিতে ফিরিতে হইত।

অনাচারী ব্যক্তি পরমাত্মীয় হইলেও দেবালয়ের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে পাইত না। জয়কালীর একটি যবনকরপক্ক-কুক্কুটমাংসলোলুপ ভগিনীপতি আত্মীয় সন্দর্শন উপলক্ষে গ্রামে উপস্থিত হইয়া মন্দির-অঙ্গণে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিয়াছিলেন, জয়কালী তাহাতে ত্বরিত ও তীব্র আপত্তি প্রকাশ করাতে সহোদরা ভগিনীর সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল। এই দেবালয় সম্বন্ধে বিধবার এতই অতিরিক্ত অনাবশ্যক সতর্কতা ছিল যে, সাধারণের নিকট তাহা অনেকটা বাতুলতারূপে প্রতীয়মান হইত।

জয়কালী আর সর্ব্বত্রই কঠিন উন্নত স্বতন্ত্র, কেবল এই মন্দিরের সম্মুখে তিনি পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। এই বিগ্রহটির নিকট তিনি একান্তরূপে জননী পত্নী দাসী—ইহার কাছে তিনি সতর্ক, সুকোমল, সুন্দর এবং সম্পূর্ণ অবনম্র। এই প্রস্তরের মন্দির এবং প্রস্তরের মূর্ত্তিটি তাঁহার নিগূঢ় নারীস্বভাবের একমাত্র চরিতার্থতার বিষয় ছিল। ইহাই তাঁহার স্বামী পুত্র, তাঁহার সমস্ত সংসার।

ইহা হইতেই পাঠকেরা বুঝিবেন যে, যে বালকটি মন্দিরপ্রাঙ্গণ হইতে মাধবীমঞ্জরী আহরণ করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল তাহার সাহসের সীমা ছিল না। সে জয়কালীর কনিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র নলিন্। সে তাহার পিসিমাকে ভাল করিয়াই জানিত তথাপি তাহার দুর্দ্দান্ত প্রকৃতি শাসনের বশ হয় নাই। যেখানে বিপদ সেখানেই তাহার একটা আকর্ষণ ছিল, এবং যেখানে শাসন সেখানেই লঙ্ঘন করিবার জন্য তাহার চিত্ত চঞ্চল হইয়া থাকিত! জনশ্রুতি আছে বাল্যকালে তাহার পিসিমার স্বভাবটিও এইরূপ ছিল।

জয়কালী তখন মাতৃস্নেহমিশ্রিত ভক্তির সহিত ঠাকুরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দালানে বসিয়া একমনে মালা জপিতেছিলেন।

বালকটি নিঃশব্দপদে পশ্চাৎ হইতে আসিয়া মাধবীতলায় দাঁড়াইল। দেখিল নিম্নশাখার ফুলগুলি পূজার জন্য নিঃশেষিত হইয়াছে। তখন অতি ধীরে ধীরে সাবধানে মঞ্চে আরোহণ করিল। উচ্চশাখায় দুটি একটি বিকচোন্মুখ কুঁড়ি দেখিয়া যেমন সে শরীর এবং বাহু প্রসারিত করিয়া তুলিতে যাইবে অমনি সেই প্রবল চেষ্টার ভরে জীর্ণ মঞ্চ সশব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িল। আশ্রিত লতা এবং বালক একত্রে ভূমিসাৎ হইল।

জয়কালী তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রটির কীর্ত্তি দেখিলেন। সবলে বাহু ধরিয়া তাহাকে মাটি হইতে তুলিলেন। আঘাত তাহার যথেষ্ট লাগিয়াছিল—কিন্তু সে আঘাতকে শাস্তি বলা যায় না, কারণ, তাহা অজ্ঞান জড়ের

আঘাত। সেই জন্য পতিত বালকের ব্যথিত দেহে জয়কালীর সজ্ঞান শাস্তির মুহুর্মুহু সবলে বর্ষিত হইতে লাগিল। বালক একবিন্দু অশ্রুপাত না করিয়া নীরবে সহ্য করিল। তখন তাহার পিসিমা তাহাকে টানিয়া লইয়া ঘরের মধ্যে রুদ্ধ করিলেন। তাহার সেদিনকার বৈকালিক আহার নিষিদ্ধ হইল।

আহার বন্ধ হইল শুনিয়া দাসী মোক্ষদা কাতরকণ্ঠে ছলছলনেত্রে বালককে ক্ষমা করিতে অনুনয় করিল। জয়কালীর হৃদয় গলিল না। ঠাকুরাণীর অজ্ঞাতসারে গোপনে ক্ষুধিত বালককে কেহ যে খাদ্য দিবে বাড়িতে এমন দুঃসাহসিক কেহ ছিল না।

বিধবা মঞ্চসংস্কারের জন্য লোক ডাকিতে পাঠাইয়া পুনর্ব্বার মালাহস্তে দালানে আসিয়া বসিলেন। মোক্ষদা কিছুক্ষণ পরে সভয়ে নিকটে আসিয়া কহিল, ঠাকুরমা, কাকাবাবু ক্ষুধায় কাঁদিতেছেন তাঁহাকে কিছু দুধ আনিয়া দিব কি?

জয়কালী অবিচলিত মুখে কহিলেন, "না।" মোক্ষদা ফিরিয়া গেল। অদূরবর্ত্তী কুটীরের গৃহ হইতে নলিনের করুণ ক্রন্দন ক্রমে ক্রোধের গর্জ্জনে পরিণত হইয়া উঠিল—অবশেষে অনেকক্ষণ পরে তাহার কাতরতার শ্রান্ত উচ্ছ্বাস থাকিয়া থাকিয়া জপনিরতা পিসিমার কানে আসিয়া ধ্বনিত হইতে লাগিল।

নলিনের আর্ত্তকণ্ঠ যখন পরিশ্রান্ত ও মৌনপ্রায় হইয়া আসিয়াছে এমন সময়ে আর একটি জীবের ভীত কাতর ধ্বনি নিকটে ধ্বনিত হইতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে ধাবমান মনুষ্যের

দূরবর্ত্তী চীৎকারশব্দ মিশ্রিত হইয়া মন্দিরের সম্মুখস্থ পথে একটা তুমুল কলরব উত্থিত হইল।

সহসা প্রাঙ্গণের মধ্যে একটা পদশব্দ শোনা গেল। জয়কালী পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন ভূপর্য্যন্ত মাধবীলতা আন্দোলিত হইতেছে।

সরোষকণ্ঠে ডাকিলেন, "নলিন্!"

কেহ উত্তর দিল না। বুঝিলেন অবাধ্য নলিন বন্দীশালা হইতে কোন ক্রমে পলায়ন করিয়া পুনরায় তাঁহাকে রাগাইতে আসিয়াছে!

তখন অত্যন্ত কঠিনভাবে অধরের উপরে ওষ্ঠ চাপিয়া বিধবা প্রাঙ্গণে নামিয়া আসিলেন।

লতাকুঞ্জের নিকট পুনরায় ডাকিলেন—নলিন্!

উত্তর পাইলেন না। শাখা তুলিয়া দেখিলেন, একটা অত্যন্ত মলিন শূকর প্রাণভয়ে ঘন পল্লবের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে।

যে লতাবিতান এই ইষ্টক প্রাচীরের মধ্যে বৃন্দাবিপিনের সংক্ষিপ্ত প্রতিরূপ; যাহার বিকসিত কুসুমমঞ্জরীর সৌরভ গোপীবৃন্দের সুগন্ধি নিশ্বাস স্মরণ করাইয়া দেয় এবং কালিন্দীতীরবর্ত্তী সুখবিহারের সৌন্দর্য্যস্বপ্ন জাগ্রত করিয়া তোলে—বিধবার সেই প্রাণাধিক যত্নের সুপবিত্র নন্দনভূমিতে অকস্মাৎ এই বীভৎস ব্যাপার ঘটিল।

পূজারি ব্রাহ্মণ লাঠিহস্তে তাড়া করিয়া আসিল।

জয়কালী তৎক্ষণাৎ নামিয়া আসিয়া তাহাকে নিষেধ করিলেন। এবং দ্রুতবেগে ভিতর হইতে মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন।

অনতিকাল পরেই সুরাপানে উন্মত্ত ডোমের দল মন্দিরের দ্বারে উপস্থিত হইয়া তাহাদের বলির পশুর জন্য চীৎকার করিতে লাগিল।

জয়কালী রুদ্ধদ্বারের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া কহিলেন, যা বেটারা ফিরে যা! আমার মন্দির অপবিত্র করিস্‌নে!

ডোমের দল ফিরিয়া গেল। জয়কালী ঠাকুরাণী যে তাঁহার রাধানাথ জীউর মন্দিরের মধ্যে অশুচি জন্তুকে আশ্রয় দিবেন ইহা তাহারা প্রায় প্রত্যক্ষ দেখিয়াও বিশ্বাস করিতে পারিল না।

এই সামান্য ঘটনায় নিখিল জগতের সর্ব্বজীবের মহাদেবতা পরম প্রসন্ন হইলেন কিন্তু ক্ষুদ্র পল্লীর সমাজনামধারী অতি ক্ষুদ্র দেবতাটি নিরতিশয় সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

ত্যাগ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ফাল্গুনের প্রথম পূর্ণিমায় আম্রমুকুলের গন্ধ লইয়া নব বসন্তের বাতাস বহিতেছে। পুষ্করিণীর তীরের একটি পুরাতন লিচু গাছের ঘন পল্লবের মধ্য হইতে একটি নিদ্রাহীন অশ্রান্ত পাপিয়ার গান মুখুয্যেদের বাড়ির একটি নিদ্রাহীন শয়নগৃহের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিতেছে। হেমন্ত কিছু চঞ্চল ভাবে কখন তার স্ত্রীর এক গুচ্ছ চুল খোঁপা হইতে বিশ্লিষ্ট করিয়া লইয়া আঙুলে জড়াইতেছে, কখন তাহার বালাতে চুড়িতে সংঘাত করিয়া ঠং ঠং শব্দ করিতেছে, কখন তাহার মাথার ফুলের মালাটা টানিয়া স্বস্থানচ্যুত করিয়া তাহার মুখের উপর আনিয়া ফেলিতেছে। সন্ধ্যাবেলাকার নিস্তব্ধ ফুলের গাছটিকে সচেতন করিয়া তুলিবার জন্য বাতাস যেমন একবার এপাশ হইতে একবার ওপাশ হইতে একটু আধটু নাড়াচাড়া করিতে থাকে, হেমন্তের কতকটা সেই ভাব।

কিন্তু কুসুম সম্মুখের চন্দ্রালোকপ্লাবিত অসীম শূন্যের মধ্যে দুই নেত্রকে নিমগ্ন করিয়া দিয়া স্থির হইয়া বসিয়া আছে। স্বামীর চাঞ্চল্য তাহাকে স্পর্শ করিয়া প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া যাইতেছে।

অবশেষে হেমন্ত কিছু অধীর ভাবে কুসুমের দুই হাত নাড়া দিয়া বলিল "কুসুম তুমি আছ কোথায়। তোমাকে যেন একটা মস্ত দূরবীণ কষিয়া বিস্তর ঠাহর করিয়া বিন্দুমাত্র দেখা যাইবে এম্‌নি দূরে গিয়া পড়িয়াছ! আমার ইচ্ছা, তুমি আজ একটু কাছাকাছি এস। দেখ দেখি কেমন চমৎকার রাত্রি!"

কুসুম শূন্য হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া স্বামীর মুখের দিকে রাখিয়া কহিল—"এই জ্যোৎস্না রাত্রি এই বসন্তকাল সমস্ত এই মুহূর্ত্তে মিথ্যা হইয়া ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে এমন একটা মন্ত্র আমি জানি।"

হেমন্ত বলিল, "যদি জান ত সেটা উচ্চারণ করিয়া কাজ নাই। বরং এমন যদি কোন মন্ত্র জানা থাকে যাহাতে সপ্তাহের মধ্যে তিনটে চারটে রবিবার আসে কিম্বা রাত্রিটা বিকাল পাঁচটা সাড়ে পাঁচটা পর্য্যন্ত টিকিয়া যায়, ত তাহা শুনিতে রাজি আছি।" বলিয়া কুসুমকে আর একটু টানিয়া লইতে চেষ্টা করিল। কুসুম সে আলিঙ্গনপাশে ধরা না দিয়া কহিল —"আমার মৃত্যুকালে তোমাকে যে কথাটা বলিব মনে করিয়াছিলাম আজ তাহা বলিতে ইচ্ছা করিতেছে। আজ মনে হইতেছে তুমি আমাকে যত শাস্তি দাও না কেন আমি বহন করিতে পারিব।"

শাস্তি সম্বন্ধে জয়দেব হইতে শ্লোক আওড়াইয়া হেমন্ত একটা রসিকতা করিবার উদ্যোগ করিতেছিল। এমন সময়ে শোনা গেল একটা ক্রুদ্ধ চটি জুতার চটাচট্‌ শব্দ নিকটবর্ত্তী হইতেছে।

হেমন্তের পিতা হরিহর মুখুয্যের পরিচিত পদশব্দ। হেমন্ত শশব্যস্ত হইয়া উঠিল।

হরিহর দ্বারের নিকটে দাঁড়াইয়া ক্রুদ্ধ গর্জ্জনে কহিল "হেমন্ত, বৌকে এখনি বাড়ি হইতে দূর করিয়া দাও।" হেমন্ত স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিল, স্ত্রী কিছুই বিস্ময় প্রকাশ করিল না, কেবল দুই হাতের মধ্যে কাতরে মুখ লুকাইয়া আপনার সমস্ত বল এবং ইচ্ছা দিয়া আপনাকে যেন লুপ্ত করিয়া দিতে চেষ্টা করিল। দক্ষিণে বাতাসে পাপিয়ার স্বর ঘরে প্রবেশ করিতে লাগিল, কাহারো কানে গেল না। পৃথিবী এমন অসীম সুন্দর অথচ এত সহজেই সমস্ত বিকল হইয়া যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

হেমন্ত বাহির হইতে ফিরিয়া আসিয়া স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, "সত্য কি?"

স্ত্রী কহিল, "সত্য।"

"এতদিন বল নাই কেন?"

"অনেক বার বলিতে চেষ্টা করিয়াছি বলিতে পারি নাই। আমি বড় পাপিষ্ঠা।"

"তবে আজ সমস্ত খুলিয়া বল।"

কুসুম গম্ভীর দৃঢ়স্বরে সমস্ত বলিয়া গেল—যেন অটল চরণে ধীর গতিতে আগুনের মধ্যে দিয়া চলিয়া গেল, কতখানি দগ্ধ হইতেছিল কেহ বুঝিতে পারিল না। সমস্ত শুনিয়া হেমন্ত উঠিয়া গেল।

কুসুম বুঝিল, যে স্বামী চলিয়া গেল, সে স্বামীকে আর ফিরিয়া পাইবে না। কিছু আশ্চর্য্য মনে হইল না; এ ঘটনাও যেন অন্যান্য দৈনিক ঘটনার মত অত্যন্ত সহজ ভাবে উপস্থিত হইল; মনের মধ্যে এমন একটা শুষ্ক অসাড়তার সঞ্চার হইয়াছে। কেবল পৃথিবীকে এবং ভালবাসাকে আগাগোড়া মিথ্যা এবং শূন্য বলিয়া মনে হইল। এমন কি, হেমন্তের সমস্ত অতীত ভালবাসার কথা স্মরণ করিয়া অত্যন্ত নীরস কঠিন নিরানন্দ হাসি একটা খরধার নিষ্ঠুর ছুরির মত তাহার মনের একধার হইতে আর একধার পর্য্যন্ত একটি দাগ রাখিয়া দিয়া গেল। বোধ করি সে ভাবিল, যে ভালবাসাকে এতখানি বলিয়া মনে হয়, এত আদর, এত গাঢ়তা, যাহার তিলমাত্র বিচ্ছেদ এমন মর্ম্মান্তিক, যাহার মুহূর্ত্তমাত্র মিলন এমন নিবিড়ানন্দময়; যাহাকে অসীম অনন্ত বলিয়া মনে হয়, জন্মজন্মান্তরেও যাহার অবসান কল্পনা করা যায় না—সেই ভালবাসা এই! এইটুকুর উপর নির্ভর! সমাজ যেমনি একটু আঘাত করিল অমনি অসীম ভালবাসা চূর্ণ হইয়া এক মুষ্টি ধূলি হইয়া গেল! হেমন্ত কম্পিতস্বরে এই কিছুপূর্ব্বে কানের কাছে বলিতেছিল "চমৎকার রাত্রি!" সে রাত্রি ত এখনও শেষ হয় নাই; এখনো সেই পাপিয়া ডাকিতেছে, দক্ষিণের বাতাস

মশারি কাঁপাইয়া যাইতেছে, এবং জ্যোৎস্না সুখশ্রান্ত সুপ্ত সুন্দরীর মত বাতায়নবর্ত্তী পালঙ্কের এক প্রান্তে নিলীন হইয়া পড়িয়া আছে। সমস্তই মিথ্যা! ভালবাসা আমার অপেক্ষাও মিথ্যাবাদিনী মিথ্যাচারিণী!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রভাতেই অনিদ্রাশুষ্ক হেমন্ত পাগলের মত হইয়া প্যারিশঙ্কর ঘোষালের বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইল। প্যারিশঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, "কিহে বাপু, কি খবর!"

হেমন্ত মস্ত একটা আগুনের মত যেন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে জ্বলিতে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "তুমি আমাদের জাতি নষ্ট করিয়াছ, সর্ব্বনাশ করিয়াছ— তোমাকে ইহার শাস্তি ভোগ করিতে হইবে"—বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

প্যারিশঙ্কর ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "আর তোমরা আমার জাতি রক্ষা করিয়াছ আমার সমাজ রক্ষা করিয়াছ, আমার পিঠে হাত বুলাইয়া দিয়াছ! আমার প্রতি তোমাদের বড় যত্ন, বড় ভালবাসা।"

হেমন্তের ইচ্ছা হইল সেই মুহূর্ত্তেই প্যারিশঙ্করকে ব্রহ্মতেজে ভস্ম করিয়া দিতে কিন্তু সেই তেজে সে নিজেই জ্বলিতে

লাগিল, প্যারিশঙ্কর দিব্য সুস্থ নিরাময় ভাবে বসিয়া রহিল।

হেমন্ত ভগ্নকণ্ঠে বলিল, "আমি তোমার কি করিয়াছিলাম।"

প্যারিশঙ্কর কহিল, "আমি জিজ্ঞাসা করি, আমার একটিমাত্র কন্যা ছাড়া আর সন্তান নাই, আমার সেই কন্যা তোমার বাপের কাছে কি অপরাধ করিয়াছিল! তুমি তখন ছোট ছিলে, তুমি হয়ত জান না—ঘটনাটা তবে মন দিয়া শোন। ব্যস্ত হইয়ো না, বাপু, ইহার মধ্যে বিস্তর কৌতুক আছে।

"আমার জামাতা নবকান্ত আমার কন্যার গহনা চুরি করিয়া যখন পলাইয়া বিলাতে গেল, তখন তুমি শিশু ছিলে। তাহার পর পাঁচ বৎসর বাদে সে যখন বারিষ্টার হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিল তখন পাড়ায় যে একটা গোলমাল বাধিল তোমার বোধ করি কিছু কিছু মনে থাকিতে পারে। কিম্বা তুমি না জানিতেও পার, তুমি তখন কলিকাতার স্কুলে পড়িতে। তোমার বাপ গ্রামের দলপতি হইয়া বলিলেন—মেয়েকে যদি স্বামীগৃহে পাঠান অভিপ্রায় থাকে তবে সে মেয়েকে আর ঘরে লইতে পারিবে না। আমি তাঁহাকে হাতে পায়ে ধরিয়া বলিলাম, দাদা এ যাত্রা তুমি আমাকে ক্ষমা কর। আমি ছেলেটিকে গোবর খাওয়াইয়া প্রায়শ্চিত্ত করাইতেছি তোমরা তাহাকে জাতে তুলিয়া লও। তোমার বাপ কিছুতেই রাজি হইলেন না, আমিও আমার একমাত্র মেয়েকে ত্যাগ করিতে পারিলাম না। জাত ছাড়িয়া দেশ ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিয়া ঘর করিলাম। এখানে আসিয়াও আপদ

মিটিল না। আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের যখন বিবাহের সমস্ত আয়োজন করিয়াছি তোমার বাপ কন্যাকর্ত্তাদের উত্তেজিত করিয়া সে বিবাহ ভাঙ্গিয়া দিলেন। আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম যদি ইহার প্রতিশোধ না লই তবে আমি ব্রাহ্মণের ছেলে নহি।—এইবার কতকটা বুঝিতে পারিয়াছ—কিন্তু আর একটু সবুর কর—সমস্ত ঘটনাটি শুনিলে খুসী হইবে—ইহার মধ্যে একটু রস আছে।

"তুমি যখন কালেজে পড়িতে তোমার বাসার পাশেই বিপ্রদাস চাটুয্যের বাড়ি ছিল। বেচারা এখন মারা গিয়াছে। চাটুয্যে মহাশয়ের বাড়িতে কুসুম নামে একটি শৈশববিধবা অনাথা কায়স্থকন্যা আশ্রিতভাবে থাকিত। মেয়েটি বড় সুন্দরী—বুড়ো ব্রাহ্মণ কালেজের ছেলেদের দৃষ্টিপথ হইতে তাহাকে সম্বরণ করিয়া রাখিবার জন্য কিছু দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু বুড়ো মানুষকে ফাঁকি দেওয়া একটি মেয়ের পক্ষে কিছুই শক্ত নহে। মেয়েটি প্রায়ই কাপড় শুকাইতে দিতে ছাতে উঠিত এবং তোমারও বোধ করি ছাতে না উঠিলে পড়া মুখস্থ হইত না। পরস্পরের ছাত হইতে তোমাদের কোনরূপ কথাবার্ত্তা হইত কি না সে তোমরাই জান, কিন্তু মেয়েটির ভাবগতিক দেখিয়া বুড়ার মনেও সন্দেহ হইল। কারণ, কাজকর্ম্মে তাহার ক্রমিক ভুল হইতে দেখা গেল এবং তপস্বিনী গৌরীর মত দিন দিন সে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিতে লাগিল। এক এক দিন সন্ধ্যাবেলায় সে বুড়ার সম্মুখেই অকারণে অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিত না।

"অবশেষে বুড়া আবিষ্কার করিল ছাতে তোমাদের মধ্যে

সময়ে অসময়ে নীরব দেখা সাক্ষাৎ চলিয়া থাকে—এমন কি কালেজ কামাই করিয়াও মধ্যাহ্নে চিলের ঘরের ছায়ায় ছাতের কোণে তুমি বই হাতে করিয়া বসিয়া থাকিতে; নির্জ্জনে অধ্যয়নে সহসা তোমার এত উৎসাহ জন্মিয়াছিল। বিপ্রদাস যখন আমার কাছে পরামর্শ জানিতে আসিল আমি কহিলাম, খুড়ো, তুমি ত অনেক দিন হইতে কাশী যাইবার মানস করিয়াছ, মেয়েটিকে আমার কাছে রাখিয়া তীর্থবাস করিতে যাও আমি তাহার ভার লইতেছি।

"বিপ্রদাস তীর্থে গেল। আমি মেয়েটিকে শ্রীপতি চাটুয্যের বাসায় রাখিয়া তাহাকেই মেয়ের বাপ বলিয়া চালাইলাম। তাহার পর যাহা হইল তোমার জানা আছে। তোমার কাছে আগাগোড়া সব কথা খোলসা করিয়া বলিয়া বড় আনন্দ লাভ করিলাম। এ যেন একটি গল্পের মত। ইচ্ছা আছে সমস্তটি লিখিয়া একটি বই করিয়া ছাপাইব। আমার লেখা আসে না। আমার ভাইপোটা শুনিতেছি একটু আধটু লেখে—তাহাকে দিয়া লেখাইবার মানস আছে। কিন্তু তোমাতে তাহাতে মিলিয়া লিখিলে সব চেয়ে ভাল হয়, কারণ, গল্পের উপসংহারটি আমার ভাল জানা নাই।"

হেমন্ত প্যারিশঙ্করের এই শেষ কথাগুলিতে বড় একটা কান না দিয়া কহিল "কুসুম এই বিবাহে কোন আপত্তি করে নাই?"

প্যারিশঙ্কর কহিল, "আপত্তি ছিল কি না বোঝা ভারি শক্ত। জান ত, বাপু, মেয়েমানুষের মন; যখন 'না' বলে তখন 'হাঁ' বুঝিতে হয়। প্রথমে ত দিনকতক নূতন বাড়িতে আসিয়া

তোমাকে না দেখিতে পাইয়া কেমন পাগলের মত হইয়া গেল। তুমিও দেখিলাম কোথা হইতে সন্ধান পাইয়াছ; প্রায়ই বই হাতে করিয়া কালেজে যাত্রা করিয়া তোমার পথ ভুল হইত—এবং শ্রীপতির বাসার সম্মুখে আসিয়া কি যেন খুঁজিয়া বেড়াইতে; ঠিক যে প্রেসিডেন্সি কালেজের রাস্তা খুঁজিতে তাহা বোধ হইত না, কারণ ভদ্রলোকের বাড়ির জানলার ভিতর দিয়া কেবল পতঙ্গ এবং উন্মাদ যুবকদের হৃদয়ের পথ ছিল মাত্র। দেখিয়া শুনিয়া আমার বড় দুঃখ হইল। দেখিলাম, তোমার পড়ার বড়ই ব্যাঘাত হইতেছে এবং মেয়েটির অবস্থাও সঙ্কটাপন্ন।

"একদিন কুসুমকে ডাকিয়া লইয়া কহিলাম—বাছা, আমি বুড়মানুষ, আমার কাছে লজ্জা করিবার আবশ্যক নাই—তুমি যাহাকে মনে মনে প্রার্থনা কর আমি জানি। ছেলেটিও মাটি হইবার যো হইয়াছে। আমার ইচ্ছা তোমাদের মিলন হয়। শুনিবামাত্র কুসুম একেবারে বুক ফাটিয়া কাঁদিয়া উঠিল এবং ছুটিয়া পালাইয়া গেল। এমনি করিয়া প্রায় মাঝে মাঝে সন্ধ্যাবেলায় শ্রীপতির বাড়ি গিয়া কুসুমকে ডাকিয়া তোমার কথা পাড়িয়া ক্রমে তাহার লজ্জা ভাঙ্গিলাম। অবশেষে প্রতিদিন ক্রমিক আলোচনা করিয়া তাহাকে বুঝাইলাম যে, বিবাহ ব্যতীত পথ দেখি না। তাহা ছাড়া মিলনের আর কোন উপায় নাই। কুসুম, "কহিল কেমন করিয়া হইবে?" আমি কহিলাম, তোমাকে কুলীনের মেয়ে বলিয়া চালাইয়া দিব। অনেক তর্কের পর সে এ বিষয়ে তোমার মত জানিতে কহিল। আমি কহিলাম, ছেলেটা

একে ক্ষেপিয়া যাইবার যো হইয়াছে, তাহাকে আবার এ সকল গোলমালের কথা বলিবার আবশ্যক কি? কাজটা বেশ নিরাপত্তে নিশ্চিন্তে নিষ্পন্ন হইয়া গেলেই সকল দিকে সুখের হইবে। বিশেষতঃ এ কথা যখন কখনও প্রকাশ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই তখন বেচারাকে কেন গায়ে পড়িয়া চিরজীবনের মত অসুখী করা!—

"কুসুম বুঝিল, কি বুঝিল না, আমি বুঝিতে পারিলাম না। কখন কাঁদে কখন চুপ করিয়া থাকে। অবশেষে আমি যখন বলি, তবে কাজ নাই, তখন আবার সে অস্থির হইয়া উঠে। এইরূপ অবস্থায় শ্রীপতিকে দিয়া তোমাকে বিবাহের প্রস্তাব পাঠাই। দেখিলাম সম্মতি দিতে তোমার তিলমাত্র বিলম্ব হইল না। তখন বিবাহের সমস্ত ঠিক হইল।

"বিবাহের অনতিপূর্ব্বে কুসুম এমনি বাঁকিয়া দাঁড়াইল তাহাকে আর কিছুতেই বাগাইতে পারি না। সে আমার হাতে পায়ে ধরে, বলে ইহাতে কাজ নাই জ্যাঠামশায়। আমি বলিলাম, কি সর্ব্বনাশ, সমস্ত স্থির হইয়া গেছে, এখন কি বলিয়া ফিরাইব!—কুসুম বলে তুমি রাষ্ট্র করিয়া দাও আমার হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছে, আমাকে এখান হইতে কোথাও পাঠাইয়া দাও!— আমি বলিলাম তাহা হইলে ছেলেটির দশা কি হইবে! তাহার বহুদিনের আশা কাল পূর্ণ হইবে বলিয়া সে স্বর্গে চড়িয়া বসিয়াছে, আজ আমি হঠাৎ তাহাকে তোমার মৃত্যুসংবাদ পাঠাইব! আবার তাহার পরদিন তোমাকে তাহার মৃত্যুসংবাদ পাঠাইতে হইবে, এবং

সেই দিন সন্ধ্যাবেলায় আমার কাছে তোমার মৃত্যুসংবাদ আসিবে। আমি কি এই বুড়া বয়সে স্ত্রীহত্যা ব্রহ্মহত্যা করিতে বসিয়াছি!

"তাহার পর শুভলগ্নে শুভবিবাহ সম্পন্ন হইল—আমি আমার একটা কর্ত্তব্যদায় হইতে অব্যাহতি পাইয়া বাঁচিলাম। তাহার পর কি হইল তুমি জান।"

হেমন্ত কহিলেন "আমাদের যাহা করিবার তাহা ত করিলেন আবার কথাটা প্রকাশ করিলেন কেন?"

প্যারিশঙ্কর কহিলেন, "দেখিলাম তোমার ছোট ভগ্নীর বিবাহের সমস্ত স্থির হইয়া গেছে। তখন মনে মনে ভাবিলাম, একটা ব্রাহ্মণের জাত মারিয়াছি কিন্তু সে কেবল কর্ত্তব্যবোধে। আবার আর একটা ব্রাহ্মণের জাত মারা পড়ে, আমার কর্ত্তব্য এটা নিবারণ করা। তাই তাঁহাদের চিঠি লিখিয়া দিলাম। বলিলাম, হেমন্ত যে শূদ্রের কন্যা বিবাহ করিয়াছে তাহার প্রমাণ আছে।"

হেমন্ত বহুকষ্টে ধৈর্য্য সম্বরণ করিয়া কহিল—"এই যে মেয়েটিকে আমি পরিত্যাগ করিব, ইহার দশা কি হইবে? আপনি ইহাকে আশ্রয় দিবেন?

প্যারিশঙ্কর কহিলেন "আমার যাহা কাজ তাহা আমি করিয়াছি, এখন পরের পরিত্যক্ত স্ত্রীকে পোষণ করা আমার কর্ম্ম নহে। ওরে! হেমন্ত বাবুর জন্য বরফ দিয়া এক গ্লাস ডাবের জল লইয়া আয়, আর পান আনিস্!"

হেমন্ত এই সুশীতল আতিথ্যের জন্য অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী। অন্ধকার রাত্রি। পাখী ডাকিতেছে না। পুষ্করিণীর ধারের লিচু গাছটি কালো চিত্রপটের উপর গাঢ়তর কালির দাগের মত লেপিয়া গেছে। কেবল দক্ষিণের বাতাস এই অন্ধকারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, যেন তাহাকে নিশিতে পাইয়াছে। আর আকাশের তারা নির্নিমেষ সতর্ক নেত্রে প্রাণপণে অন্ধকার ভেদ করিয়া কি একটা রহস্য আবিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত আছে।

শয়নগৃহে দীপ জ্বালা হয় নাই। হেমন্ত বাতায়নের কাছে খাটের উপরে বসিয়া সম্মুখের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া আছে। কুসুম ভূমিতলে দুই হাতে তাহার পা জড়াইয়া পায়ের উপর মুখ রাখিয়া পড়িয়া আছে। সময় যেন স্তম্ভিত সমুদ্রের মত স্থির হইয়া আছে। যেন অনন্ত নিশীথিনীর উপর অদৃষ্ট চিত্রকর এই একটি চিরস্থায়ী ছবি আঁকিয়া রাখিয়াছে—চারিদিকে প্রলয়, মাঝখানে একটি বিচারক, এবং তাহার পায়ের কাছে একটি অপরাধিনী।

আবার চটিজুতার শব্দ হইল। হরিহর মুখুয্যে দ্বারের কাছে আসিয়া বলিলেন—"অনেকক্ষণ হইয়া গিয়াছে আর সময় দিতে পারি না। মেয়েটাকে ঘর হইতে দূর করিয়া দাও!"—

কুসুম এই স্বর শুনিবামাত্র একবার মুহূর্ত্তের মত চিরজীবনের সাধ মিটাইয়া হেমন্তের দুই পা দ্বিগুণতর আবেগে চাপিয়া ধরিল—চরণ চুম্বন করিয়া পায়ের ধুলা মাথায় লইয়া পা ছাড়িয়া দিল।

হেমন্ত উঠিয়া গিয়া পিতাকে বলিল—"আমি স্ত্রীকে ত্যাগ করিব না।"

হরিহর গর্জ্জিয়া উঠিয়া কহিল—"জাত খোয়াইবি?"

হেমন্ত কহিল, "আমি জাত মানি না।"

"তবে তুইসুদ্ধ দূর হইয়া যা!"

হাস্যকৌতুক আবালবৃদ্ধবনিতার আনন্দ ও আদরের সামগ্রী!

রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে রাজাপ্রজার সম্বন্ধ ও কর্ত্তব্য অবশ্য পাঠ করুন—

রাজা প্রজা ১৲; সমূহ ॥০; স্বদেশ ॥০

সমাজহিতেচ্ছুর অনুধ্যানের সামগ্রী, চিন্তাশীলের খোরাক—

সমাজ ৸০

রবিবাবুর অপূর্ব্ব মধুর কাব্যগ্রন্থ

কথা ও কাহিনী।

সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক ও কাল্পনিক চিত্রাবলী, মূল্য ৸০।

খেয়া।

রবীন্দ্রবাবুর অপূর্ব্ব কাব্যগ্রন্থ। কাব্যামোদীর তৃপ্তি, ভক্তের সঙ্গী, উপাসনার সাধন; বিপদে সান্ত্বনা, হতাশার অবলম্বন, দুর্ব্বলের বল, মধুর ভাবে ঈশ্বরাধনার অভিব্যক্তি যিনি দেখিতে চাহেন, তিনি ইহা পাঠ করুন, প্রিয়জনকে পাঠ করান -চিত্ত নির্ম্মল ও প্রসন্ন হইবে। মূল্য ১৲ মাত্র।

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের প্রসিদ্ধ পুস্তক। তৃতীয় সংস্করণ। এই সংস্করণে এত নূতন বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে যে ইহাকে একখানি সম্পূর্ণ নূতন পুস্তক বলা যাইতে পারে। গ্রন্থের অবয়ব যথেষ্ট বর্দ্ধিত হইয়াছে, অথচ মূল্য পূর্ব্বের ন্যায় ৪৲ টাকাই নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের বাহুল্য পরিচয় অনাবশ্যক।

রাজা রামমোহন রায়ের জীবন চরিত।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। চতুর্থ সংস্করণ। সংশোধিত ও বহুলভাবে পরিবর্দ্ধিত। মূল্য পূর্ব্ববৎ ৩৲ টাকা মাত্র! বাংলার শ্রেষ্ঠ জীবনচরিত কতিপয়ের মধ্যে ইহা অন্যতম। সুতরাং বাহুল্য পরিচয় অনাবশ্যক।

যুগান্তর।

শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত। প্রসিদ্ধ সমাজিক উপন্যাস। দ্বিতীয় সংস্করণ মূল্য ১।০। ইহাতে প্রাচীন হিন্দুসমাজের একটি চমৎকার নিখুঁত চিত্র আলেখ্যবৎ বর্ণিত হইয়াছে। পড়িতে পড়িতে মুগ্ধ হইতে হয়, ছাপা, কাগজ, বাঁধাই পরিষ্কার।

আরব্যোপন্যাস।

শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, এম, এ, সম্পাদিত। মূল্য দুই টাকা, ডাকমাশুল তিন আনা। সুন্দর রঙ্গীন কালিতে মুদ্রিত বহু চিত্রসম্বলিত এই শিশুপাঠ্য পুস্তকখানি সর্ব্বত্রই যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছে। এই পুস্তকখানি বালক বালিকাগণ পাইলে আহ্লাদে উৎফুল্ল হইবে।

একটি বসন্তপ্রাতের প্রস্ফুটিত

সকুরা পুষ্প।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিবৃত জাপানী গল্প। দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য ৸০ আনা। বাহ্যদৃশ্য মনোহর। বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন। ইহাতে জাপানবাসীদিগের অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ ও দেশহিতৈষণার বিচিত্র কাহিনী মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে।

হস্তলিপি লিখন-প্রণালী।

শ্রীশিবরতন মিত্র প্রণীত। মূল্য চারি আনা মাত্র। অভিনব সরল বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ছেলেদিগকে অসংযুক্ত ও সংযুক্ত বর্ণপরিচয়, ধারাপাত ও লিখন-শিক্ষা দিবার অত্যুৎকৃষ্ট পুস্তক। আমোদের সহিত ৪।৫ দিন মধ্যে সমগ্র বর্ণমালা অনায়াসে লিখিতে শিখিবে—আর দাগা বুলাইয়া ছেলেদের সময় নষ্ট হইবে না। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের হস্তাক্ষর টানা-লেখার আদর্শস্বরূপ একটি সমগ্র পৃষ্ঠব্যাপী প্রতিলিপিতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রায় ৩৫০ টি ব্লক দ্বারা সুশোভিত এবং উৎকৃষ্ট

কাগজে নানাবিধ রঙ্গীন কালীতে মুদ্রিত। শিশুগণ পাইলে আহ্লাদে উৎফুল্ল হইবে। কি সংবাদপত্র, কি সুধীসমাজ, সর্ব্বত্র বহুল প্রশংসিত।

বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবক।

শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র সঙ্কলিত। সমগ্র গ্রন্থের অগ্রিম মূল্য ৮০ টাকা। এই গ্রন্থখানি বঙ্গভাষার পরলোকগত যাবতীয় (চতুর্দ্দশ শতাব্দিক) সাহিত্য-সেবকগণের বর্ণানুক্রমিক সচিত্র চরিতাভিধান। বঙ্গভাষায় সম্পূর্ণ নূতন। সর্ব্বত্রই বহুল প্রশংসিত। ২৫০ পৃষ্ঠায় 'ব' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। অবশিষ্ট শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারগণের সুন্দর সুন্দর হাফ্‌টোন ছবি আছে।

'ইহা বঙ্গসাহিত্যে চিরস্থায়ী কীর্ত্তি স্বরূপ প্রতিষ্ঠা পাইবে।' শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বি, এ।

'সুন্দর গ্রন্থ—বঙ্গসাহিত্য আলোকিত করিতেছে'—অঃ জষ্টিস শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি, এল।

শকুন্তলা।৵০।

ক্ষীরের পুতুল।৵০।

রাজস্থানে গল্প ॥০।

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। মনোরম শিশুপাঠ্য এই তিনখানি পুস্তক কলাসম্মত বহু চিত্রভূষিত, সুদৃশ্য ও সুমুদ্রিত। আবালবৃদ্ধবনিতার উপভোগ ও আনন্দের সামগ্রী।

চরিত্রগঠন।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস-প্রণীত। শিশুপাঠ্য সুন্দর পুস্তক মূল্য আট আনা মাত্র।

গল্পগুচ্ছ

(চতুর্থ ভাগ)

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রকাশক

কলিকাতা—ইণ্ডিয়ান্ পাব্‌লিশিং হাউস্

৭৩।১ স্কীয়া ষ্ট্রীট

এলাহাবাদ—ইণ্ডিয়ান্ প্রেস।

প্যারাগন প্রেস

২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট

কলিকাতা।

শ্রীগোপালচন্দ্র রায় কর্তৃক মুদ্রিত।

সূচী।

বিষয়			পৃষ্ঠা।
দিদি	...	...	১
তারাপ্রসন্নের কীর্ত্তি	...	...	২০
ডুব্‌বুদ্ধি	...	...	৩৩
আপদ	...	...	৪১
সম্পাদক	...	...	৬১
নিশীথে	...	...	৬৯
জয় পরাজয়	...	...	৯১
প্রতিহিংসা	...	...	১০৮
ঠাকুর্দ্দা	...	..	১৩[illegible]
স্বর্ণমৃগ	...	...	১৫০
প্রতিবেশিনী	...	...	১৭০
অনধিকার প্রবেশ	...	...	১৭৮
ত্যাগ	...	..	[illegible]

দিদি।

পল্লীবাসিনী কোন এক হতভাগিনীর অন্যায়কারী অত্যাচারী স্বামীর দুষ্কৃতি সকল সবিস্তারে বর্ণন পূর্ব্বক প্রতিবেশিনী তারা অত্যন্ত সংক্ষেপে নিজের রায় প্রকাশ করিয়া কহিল, এমন স্বামীর মুখে আগুন।

শুনিয়া জয়গোপাল বাবুর স্ত্রী শশি অত্যন্ত পীড়া অনুভব করিলেন ;-- স্বামী জাতির মুখে চুরটের আগুন ছাড়া অন্য কোন প্রকার আগুন কোন অবস্থাতেই কামনা করা স্ত্রীজাতিকে শোভা পায় না।

অতএব এ সম্বন্ধে তিনি কিঞ্চিৎ সঙ্কোচ প্রকাশ করাতে কঠিন-হৃদয় তারা দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত কহিল, এমন স্বামী থাকার চেয়ে সাতজন্ম বিধবা হওয়া ভাল। এই বলিয়া সে সভাভঙ্গ করিয়া চলিয়া গেল।

শশি মনে করিল, স্বামীর এমন কোন অপরাধ কল্পনা করিতে পারি না, যাহাতে তাঁহার প্রতি মনের ভাব এত কঠিন হইয়া উঠিতে পারে। এই কথা মনের মধ্যে আলোচনা করিতে করিতেই তাহার কোমল হৃদয়ের সমস্ত প্রীতিরস তাহার প্রবাসী স্বামীর অভিমুখে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল ; শয্যাতলে তাহার স্বামী যে অংশে শয়ন করিত সেই অংশের উপর বাহু প্রসারণ করিয়া

পড়িয়া শূন্য বালিশকে চুম্বন করিল, বালিশের মধ্যে স্বামীর মাথার আঘ্রাণ অনুভব করিল এবং দ্বার রুদ্ধ করিয়া কাঠের বাক্স হইতে স্বামীর একখানি বহুকালের লুপ্তপ্রায় ফোটোগ্রাফ এবং হাতের লেখা চিঠিগুলি বাহির করিয়া বসিল। সেদিনকার নিস্তব্ধ মধ্যাহ্ন এইরূপে নিভৃত কক্ষে, নির্জ্জন চিন্তায় পুরাতন স্মৃতিতে এবং বিষাদের অশ্রুজলে কাটিয়া গেল।

শশিকলা এবং জয়গোপালের যে নবদাম্পত্য তাহা নহে। বাল্যকালে বিবাহ হইয়াছিল ইতিমধ্যে সন্তানাদিও হইয়াছে। উভয়ে বহুকাল একত্র অবস্থান করিয়া নিতান্ত সহজ সাধারণ ভাবেই দিন কাটিয়াছে; কোন পক্ষেই অপরিমিত প্রেমোচ্ছ্বাসের কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই। প্রায় ষোল বৎসর একাদিক্রমে অবিচ্ছেদে যাপন করিয়া হঠাৎ কর্ম্মবশে তাহার স্বামী বিদেশে চলিয়া যাওয়ার পর শশির মনে একটা প্রবল প্রেমাবেগ জাগ্রত হইয়া উঠিল। বিরহের দ্বারা বন্ধনে যতই টান পড়িল কোমল হৃদয়ে প্রেমের ফাঁশ ততই শক্ত করিয়া আঁটিয়া ধরিল; ঢিলা অবস্থায় যাহার অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারে নাই এখন তাহার বেদনা টন্‌টন্ করিতে লাগিল।

তাই আজ এতদিন পরে এত বয়সে ছেলের মা হইয়া শশি বসন্তমধ্যাহ্নে নির্জ্জন ঘরে বিরহশয্যায় উন্মেষিতযৌবনা নববধূর সুখস্বপ্ন দেখিতে লাগিল। যে প্রেম অজ্ঞাতভাবে জীবনের সম্মুখ দিয়া প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে, সহসা আজ তাহারই কলগীতিশব্দে জাগ্রত হইয়া মনে মনে তাহারই উজান বাহিয়া দুই

তীরে বহুদূরে অনেক সোনার পুরী অনেক কুঞ্জবন দেখিতে লাগিল ;—কিন্তু সেই অতীত সুখসম্ভাবনার মধ্যে এখন আর পদার্পণ করিবার স্থান নাই। মনে করিতে লাগিল এইবার যখন স্বামীকে নিকটে পাইব, তখন জীবনকে নীরস এবং বসন্তকে নিষ্ফল হইতে দিব না। কতদিন কতবার তুচ্ছতর্কে সামান্য কলহে স্বামীর প্রতি সে উপদ্রব করিয়াছে আজ অনুতপ্তচিত্তে একান্ত মনে সঙ্কল্প করিল আর কখনই সে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিবে না, স্বামীর ইচ্ছায় বাধা দিবে না, স্বামীর আদেশ পালন করিবে, প্রীতিপূর্ণ নম্রহৃদয়ে নীরবে স্বামীর ভালমন্দ সমস্ত আচরণ সহ্য করিবে ; কারণ, স্বামী সর্ব্বস্ব, স্বামী প্রিয়তম, স্বামী দেবতা। অনেক দিন পর্যান্ত শশিকলা তাহার পিতামাতার একমাত্র আদরের কন্যা ছিল। সেই জন্য, জয়গোপাল যদিও সামান্য চাকরি করিত, তবু ভবিষ্যতের জন্য তাহার কিছুমাত্র ভাবনা ছিল না। পল্লীগ্রামে রাজভোগে থাকিবার পক্ষে তাহার শ্বশুরের যথেষ্ট সম্পত্তি ছিল।

এমন সময় নিতান্ত অকালে প্রায় বৃদ্ধবয়সে শশিকলার পিতা কালীপ্রসন্নের একটি পুত্রসন্তান জন্মিল। সত্য কথা বলিতে কি, পিতামাতার এইরূপ অনপেক্ষিত অসঙ্গত অন্যায় আচরণে শশি মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল ; জয়গোপালও সবিশেষ প্রীতিলাভ করে নাই।

অধিক বয়সের ছেলেটির প্রতি পিতামাতার স্নেহ অত্যন্ত ঘনীভূত হইয়া উঠিল। এই নবাগত, ক্ষুদ্রকায়, স্তন্যপিপাসু,

নিদ্রাতুর শ্যালকটি অজ্ঞাতসারে দুই দুর্ব্বল হস্তের অতি ক্ষুদ্র বদ্ধমুষ্টির মধ্যে জয়গোপালের সমস্ত আশা ভরসা যখন অপহরণ করিয়া বসিল, তখন সে আসামের চা-বাগানে এক চাকরি লইল।

নিকটবর্ত্তী স্থানে চাকরির সন্ধান করিতে সকলেই তাহাকে পীড়াপীড়ি করিয়াছিল—কিন্তু সর্ব্বসাধারণের উপর রাগ করিয়াই হউক, অথবা চা-বাগানে দ্রুত বাড়িয়া উঠিবার কোন উপায় জানিয়াই হউক, জয়গোপাল কাহারও কথায় কর্ণপাত করিল না; শশিকে সন্তানসহ তাহার বাপের বাড়ি রাখিয়া সে আসামে চলিয়া গেল। বিবাহিত জীবনে স্বামী স্ত্রীর এই প্রথম বিচ্ছেদ।

এই ঘটনায় শিশু ভ্রাতাটির প্রতি শশিকলার ভারি রাগ হইল। যে মনের আক্ষেপ মুখ ফুটিয়া বলিবার জো নাই, তাহারই আক্রোশটা সব চেয়ে বেশি হয়। ক্ষুদ্র ব্যক্তিটি আরামে স্তনপান করিতে ও চক্ষু মুদিয়া নিদ্রা দিতে লাগিল এবং তাহার বড় ভগিনীটি দুধ গরম, ভাত ঠাণ্ডা, ছেলের ইস্কুলে যাওয়ার দেরি প্রভৃতি নানা উপলক্ষে নিশিদিন মান অভিমান করিয়া অস্থির হইল এবং অস্থির করিয়া তুলিল।

অল্পদিনের মধ্যেই ছেলেটির মার মৃত্যু হইল; মরিবার পূর্ব্বে জননী তাঁহার কন্যার হাতে শিশুপুত্রটিকে সমর্পণ করিয়া দিয়া গেলেন।

তখন অনতিবিলম্বেই সেই মাতৃহীন ছেলেটি অনায়াসেই তাহার দিদির হৃদয় অধিকার করিয়া লইল। হুহুঙ্কার শব্দ পূর্ব্বক

সে যখন তাঁহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া পরম আগ্রহের সহিত দন্তহীন ক্ষুদ্র মুখের মধ্যে তাঁহার মুখ চক্ষু নাসিকা সমস্তটা গ্রাস করিবার চেষ্টা করিত, ক্ষুদ্র মুষ্টিমধ্যে তাঁহার কেশগুচ্ছ লইয়া কিছুতেই দখল ছাড়িতে চাহিত না, সূর্য্যোদয় হইবার পূর্ব্বেই জাগিয়া উঠিয়া গড়াইয়া তাঁহার গায়ের কাছে আসিয়া কোমল স্পর্শে তাঁহাকে পুলকিত করিয়া মহাকলরব আরম্ভ করিয়া দিত; —যখন ক্রমে সে তাঁহাকে জিজি এবং জিজিমা বলিয়া ডাকিতে লাগিল, এবং কাজকর্ম্ম ও অবসরের সময় নিষিদ্ধ কার্য্য করিয়া, নিষিদ্ধ খাদ্য খাইয়া, নিষিদ্ধ স্থানে গমনপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি বিধিমত উপদ্রব আরম্ভ করিয়া দিল, তখন শশি আর থাকিতে পারিলেন না। এই স্বেচ্ছাচারী ক্ষুদ্র অত্যাচারীর নিকটে সম্পূর্ণ-রূপে আত্মসমর্পণ করিয়া দিলেন। ছেলেটির মা ছিল না বলিয়া তাহার প্রতি তাঁহার আধিপত্য ঢের বেশি হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ছেলেটির নাম হইল নীলমণি। তাহার বয়স যখন দুই বৎসর তখন তাহার পিতার কঠিন পীড়া হইল। অতি শীঘ্র চলিয়া আসিবার জন্য জয়গোপালের নিকট পত্র গেল। জয়গোপাল যখন বহু চেষ্টায় ছুটি লইয়া আসিয়া পৌছিল তখন কালীপ্রসন্নের মৃত্যুকাল উপস্থিত।

মৃত্যুর পূর্ব্বে কালীপ্রসন্ন, নাবালক ছেলেটির তত্ত্বাবধানের

ভার জয়গোপালের প্রতি অর্পণ করিয়া তাঁহার বিষয়ের সিকি অংশ কন্যার নামে লিখিয়া দিলেন।

সুতরাং বিষয়-রক্ষার জন্য জয়গোপালকে কাজ ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া আসিতে হইল।

অনেক দিনের পরে স্বামীস্ত্রীর পুনর্ম্মিলন হইল। একটা জড়পদার্থ ভাঙ্গিয়া গেলে আবার ঠিক তাহার খাঁজে খাঁজে মিলাইয়া দেওয়া যায়। কিন্তু দুটি মানুষকে যেখানে বিচ্ছিন্ন করা হয়, দীর্ঘ বিচ্ছেদের পরে আর ঠিক সেখানে রেখায় রেখায় মেলে না।—কারণ, মন জিনিষটা সজীব পদার্থ; নিমিষে তাহার পরিণতি এবং পরিবর্ত্তন।

শশির পক্ষে এই নূতন মিলনে নূতন ভাবের সঞ্চার হইল। সে যেন তাহার স্বামীকে ফিরিয়া বিবাহ করিল। পুরাতন দাম্পত্যের মধ্যে চিরাভ্যাস বশত যে এক অসাড়তা জন্মিয়া গিয়াছিল, বিরহের আকর্ষণে তাহা অপসৃত হইয়া সে তাহার স্বামীকে যেন পূর্ব্বাপেক্ষা সম্পূর্ণতর ভাবে প্রাপ্ত হইল,—মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, যেমন দিনই আসুক, যতদিনই যাক্, স্বামীর প্রতি এই দীপ্ত প্রেমের উজ্জ্বলতাকে কখনই ম্লান হইতে দিব না।

নূতন মিলনে জয়গোপালের মনের অবস্থাটা অন্যরূপ। পূর্ব্বে যখন উভয়ে অবিচ্ছেদে একত্র ছিল যখন স্ত্রীর সহিত তাহার সমস্ত স্বার্থের এবং বিচিত্র অভ্যাসের ঐক্যবন্ধন ছিল, স্ত্রী তখন জীবনের একটি নিত্য সত্য হইয়াছিল,—তাহাকে বাদ দিতে

গেলে দৈনিক অভ্যাসজালের মধ্যে সহসা অনেকখানি ফাঁক পড়িত। এইজন্য বিদেশে গিয়া জয়গোপাল প্রথম প্রথম অগাধ জলের মধ্যে পড়িয়াছিল। কিন্তু ক্রমে তাহার সেই অভ্যাস-বিচ্ছেদের মধ্যে নূতন অভ্যাসের তালি লাগিয়া গেল।

কেবল তাহাই নহে। পূর্ব্বে নিতান্ত নিশ্চেষ্ট নিশ্চিন্তভাবে তাহার দিন কাটিয়া যাইত। মাঝে দুই বৎসর, অবস্থা-উন্নতি—চেষ্টা তাহার মনে এমন প্রবলভাবে জাগিয়া উঠিয়াছিল যে, তাহার মনের সম্মুখে আর কিছুই ছিল না। এই নূতন নেশার তীব্রতার তুলনায় তাহার পূর্ব্বজীবন বস্তুহীন ছায়ার মত দেখাইতে লাগিল। স্ত্রীলোকের প্রকৃতিতে প্রধান পরিবর্ত্তন ঘটায় প্রেম, এবং পুরুষের ঘটায় দুশ্চেষ্টা।

জয়গোপাল দুই বৎসর পরে আসিয়া অবিকল তাহার পূর্ব্ব স্ত্রীটিকে ফিরিয়া পাইল না। তাহার স্ত্রীর জীবনে শিশু শ্যালকটি একটা নূতন পরিসর বৃদ্ধি করিয়াছে। এই অংশটি তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ অপরিচিত,—এই অংশে স্ত্রীর সহিত তাহার কোন যোগ নাই। স্ত্রী তাহাকে আপনার এই শিশুস্নেহের ভাগ দিবার অনেক চেষ্টা করিত—কিন্তু ঠিক কৃতকার্য্য হইত কি না, বলিতে পারি না।

শশি নীলমণিকে কোলে করিয়া আনিয়া হাস্যমুখে তাহার স্বামীর সম্মুখে ধরিত—নীলমণি প্রাণপণে শশির গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার কাঁধে মুখ লুকাইত, কোন প্রকার কুটুম্বিতার খাতির মানিত না। শশির ইচ্ছা, তাহার এই ক্ষুদ্র ভ্রাতাটির

যত প্রকার মন ভুলাইবার বিদ্যা আয়ত্ত আছে, সবগুলি জয়-গোপালের নিকট প্রকাশ হয়; কিন্তু জয়গোপালও সে জন্য বিশেষ আগ্রহ অনুভব করিত না এবং শিশুটিও বিশেষ উৎসাহ দেখাইত না। জয়গোপাল কিছুতেই বুঝিতে পারিত না এই কৃশকায় বৃহৎমস্তক গম্ভীরমুখ শ্যামবর্ণ ছেলেটার মধ্যে এমন কি আছে যে জন্য তাহার প্রতি এতটা স্নেহের অপব্যয় করা হইতেছে।

ভালবাসার ভাবগতিক মেয়েরা খুব চট্ করিয়া বোঝে। শশি অবিলম্বেই বুঝিল জয়গোপাল নীলমণির প্রতি বিশেষ অনুরক্ত নহে। তখন ভাইটিকে সে বিশেষ সাবধানে আড়াল করিয়া রাখিত—স্বামীর স্নেহহীন বিরাগদৃষ্টি হইতে তাহাকে তফাতে রাখিতে চেষ্টা করিত। এইরূপে ছেলেটি তাহার গোপন যত্নের ধন, তাহার একলার স্নেহের সামগ্রী হইয়া উঠিল। সকলেই জানেন, স্নেহ যত গোপনের, যত নির্জ্জনের হয় ততই প্রবল হইতে থাকে।

নীলমণি কাঁদিলে জয়গোপাল অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিত—এই জন্য শশি তাহাকে তাড়াতাড়ি বুকের মধ্যে চাপিয়া সমস্ত প্রাণ দিয়া বুক দিয়া, তাহার কান্না থামাইবার চেষ্টা করিত,—বিশেষত নীলমণির কান্নায় যদি রাত্রে তাহার স্বামীর ঘুমের ব্যাঘাত হইত, এবং স্বামী এই ক্রন্দনপরায়ণ ছেলেটার প্রতি অত্যন্ত হিংস্রভাবে ঘৃণা প্রকাশ পূর্ব্বক জর্জ্জরচিত্তে গর্জ্জন করিয়া উঠিত, তখন শশি যেন অপরাধিনীর মত সঙ্কুচিত শশব্যস্ত হইয়া পড়িত, তৎক্ষণাৎ তাহাকে কোলে করিয়া দূরে লইয়া গিয়া

একান্ত সানুনয় স্নেহের স্বরে সোনা আমার, ধন আমার, মাণিক আমার বলিয়া ঘুম পাড়াইতে থাকিত।

ছেলেতে ছেলেতে নানা উপলক্ষে ঝগড়া বিবাদ হইয়াই থাকে। পূর্ব্বে এরূপ স্থলে শশি নিজের ছেলেদেব দণ্ড দিয়া ভাইয়ের পক্ষ অবলম্বন করিত, কারণ, তাহার মা ছিল না। এখন বিচারকের সঙ্গে সঙ্গে দণ্ডবিধির পরিবর্ত্তন হইল। এখন সর্ব্বদাই নিরপরাধে এবং অবিচারে নীলমণিকে কঠিন দণ্ড ভোগ করিতে হইত। সেই অন্যায় শশির বক্ষে শেলের মত বাজিত; তাই সে দণ্ডিত ভ্রাতাকে ঘরে লইয়া গিয়া তাহাকে মিষ্ট দিয়া খেলেনা দিয়া আদর করিয়া চুমো খাইয়া শিশুর আহত হৃদয়ে যথাসাধ্য সান্ত্বনা বিধান করিবার চেষ্টা করিত।

ফলতঃ দেখা গেল, শশি নীলমণিকে যতই ভালবাসে জয়-গোপাল নীলমণির প্রতি ততই বিরক্ত হয়; আবার জয়গোপাল নীলমণির প্রতি যতই বিরাগ প্রকাশ করে, শশি তাহাকে ততই স্নেহসুধায় অভিষিক্ত করিয়া দিতে থাকে।

জয়গোপাল লোকটা কখনও তাহার স্ত্রীর প্রতি কোনরূপ কঠোর ব্যবহার করে না এবং শশি নীরবে নম্রভাবে প্রীতির সহিত তাহার স্বামীর সেবা করিয়া থাকে, কেবল এই নীল-মণিকে লইয়া ভিতরে ভিতরে উভয়ে উভয়কে অহরহ আঘাত দিতে লাগিল।

এইরূপ নীরব দ্বন্দ্বের গোপন আঘাত প্রতিঘাত প্রকাশ্য বিবাদের অপেক্ষা ঢের বেশি দুঃসহ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নীলমণির সমস্ত শরীরের মধ্যে মাথাটাই সর্ব্বপ্রধান ছিল। দেখিলে মনে হইত বিধাতা যেন একটা সরু কাঠির মধ্যে ফুঁদিয়া তাহার ডগার উপরে একটা বড় বুদ্বুদ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ডাক্তাররাও মাঝে মাঝে আশঙ্কা প্রকাশ করিত ছেলেটি এইরূপ বুদ্বুদের মতই ক্ষণভঙ্গুর ক্ষণস্থায়ী হইবে। অনেক দিন পর্য্যন্ত সে কথা কহিতে এবং চলিতে শেখে নাই। তাহার বিষণ্ণ গম্ভীর মুখ দেখিয়া বোধ হইত, তাহার পিতামাতা তাঁহাদের অধিক বয়সের সমস্ত চিন্তাভার এই ক্ষুদ্র শিশুর মাথার উপরে চাপাইয়া দিয়া গেছেন।

দিদির যত্নে ও সেবায় নীলমণি তাহার বিপদের কাল উত্তীর্ণ হইয়া ছয় বৎসরে পা দিল।

কার্ত্তিক মাসে ভাইফোঁটার দিনে নূতন জামা, চাদর এবং একখানি লালপেড়ে ধুতি পরাইয়া বাবু সাজাইয়া নীলমণিকে শশি ভাইফোঁটা দিতেছেন এমন সময়ে পূর্ব্বোক্ত স্পষ্টভাষিণী প্রতিবেশিনী তারা আসিয়া কথায় কথায় শশির সহিত ঝগড়া বাধাইয়া দিল।

সে কহিল, গোপনে ভাইয়ের সর্ব্বনাশ করিয়া ঘটা করিয়া ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দিবার কোন ফল নাই।

শুনিয়া শশি বিস্ময়ে ক্রোধে বেদনায় বজ্রাহত হইল। অবশেষে শুনিতে পাইল, তাহারা স্বামিস্ত্রীতে পরামর্শ করিয়া নাবালক নীলমণির সম্পত্তি খাজনার দায়ে নিলাম করাইয়া তাহার স্বামীর পিস্তুতো ভাইয়ের নামে বেনামী করিয়া কিনিতেছে।

শুনিয়া শশি অভিশাপ দিল, যাহারা এতবড় মিথ্যা কথা রটনা করিতে পারে তাহাদের মুখে কুষ্ঠ হউক্।

এই বলিয়া সরোদনে স্বামীর নিকট উপস্থিত হইয়া জনশ্রুতির কথা তাহাকে জানাইল।

জয়গোপাল কহিল আজকালকার দিনে কাহাকেও বিশ্বাস করিবার জো নাই। উপেন্ আমার আপন পিস্তুতো ভাই, তাহার উপরে বিষয়ের ভার দিয়া আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ছিলাম —সে কখন্ গোপনে খাজনা বাকি ফেলিয়া মহল হাসিল্পুর নিজে কিনিয়া লইয়াছে আমি জানিতেও পারি নাই।

শশি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, নালিশ করিবে না?

জয়গোপাল কহিল, ভাইয়ের নামে নালিশ করি কি করিয়া? এবং নালিশ করিয়াও ত কোন ফল নাই, কেবল অর্থ নষ্ট।

স্বামীর কথা বিশ্বাস করা শশির পরম কর্ত্তব্য, কিন্তু কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না। তখন এই সুখের সংসার, এই প্রেমের গার্হস্থ্য সহসা তাহার নিকট অত্যন্ত বিকট বীভৎস আকার ধারণ করিয়া দেখা দিল। যে সংসারকে আপনার পরম আশ্রয় বলিয়া মনে হইত—হঠাৎ দেখিল সে একটা নিষ্ঠুর স্বার্থের ফাঁদ—তাহাদের দুটি ভাইবোনকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ধরিয়াছে। সে একা স্ত্রীলোক, অসহায় নীলমণিকে কেমন করিয়া রক্ষা করিবে ভাবিয়া কূল কিনারা পাইল না। যতই চিন্তা করিতে লাগিল, ততই ভয়ে এবং ঘৃণায় বিপন্ন বালক ভ্রাতাটির প্রতি অপরিসীম স্নেহে তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া

উঠিল। তাহার মনে হইতে লাগিল সে যদি উপায় জানিত তবে লাট্‌সাহেবের নিকট নিবেদন করিয়া, এমন কি, মহারাণীর নিকট পত্র লিখিয়া তাহার ভাইয়ের সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারিত। মহারাণী কখনই নীলমণির বার্ষিক সাত শ আটান্ন টাকার মুনফার হাসিলপুর মহল বিক্রয় হইতে দিতেন না।

এইরূপে শশি যখন একেবারে মহারাণীর নিকট দরবার করিয়া তাহার পিস্‌তুতো দেবরকে সম্পূর্ণ জব্দ করিয়া দিবার উপায় চিন্তা করিতেছে তখন হঠাৎ নীলমণির জ্বর আসিয়া আক্ষেপসহকারে মূর্চ্ছা হইতে লাগিল।

জয়গোপাল এক গ্রাম্য নেটিভ ডাক্তারকে ডাকিল। শশি ভাল ডাক্তারের জন্য অনুরোধ করাতে জয়গোপাল বলিল, কেন মতিলাল মন্দ ডাক্তার কি!

শশি তখন তাঁহার পায়ে পড়িল, মাথার দিব্য দিল; জয়-গোপাল বলিল, আচ্ছা সহর হইতে ডাক্তার ডাকিতে পাঠাইতেছি।

শশি নীলমণিকে কোলে করিয়া বুকে করিয়া পড়িয়া রহিল। নীলমণিও তাহাকে এক দণ্ড চোখের আড়াল হইতে দেয় না; পাছে ফাঁকি দিয়া পালায় এই ভয়ে তাহাকে জড়াইয়া থাকে; এমন কি, ঘুমাইয়া পড়িলেও আঁচলটি ছাড়ে না।

সমস্ত দিন এমনি ভাবে কাটিলে সন্ধ্যার পর জয়গোপাল আসিয়া বলিল—সহরে ডাক্তার বাবুকে পাওয়া গেল না, তিনি দূরে কোথায় রোগী দেখিতে গিয়াছেন। ইহাও বলিল, মকদ্দমা উপলক্ষে আমাকে আজই অন্যত্র যাইতে হইতেছে; আমি মতি-

লালকে বলিয়া গেলাম সে নিয়মিত আসিয়া রোগী দেখিয়া যাইবে।

রাত্রে নীলমণি ঘুমের ঘোরে প্রলাপ বকিল। প্রাতঃকালেই শশি কিছুমাত্র বিচার না করিয়া রোগী ভ্রাতাকে লইয়া নৌকা চড়িয়া একবারে সহরে গিয়া ডাক্তারের বাড়ি উপস্থিত হইল। ডাক্তার বাড়িতে আছেন—সহর ছাড়িয়া কোথাও যান নাই। ভদ্র স্ত্রীলোক দেখিয়া তিনি তাড়াতাড়ি বাসা ঠিক করিয়া একটি প্রাচীনা বিধবার তত্ত্বাবধানে শশিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিলেন এবং ছেলেটির চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন।

পরদিনই জয়গোপাল আসিয়া উপস্থিত। ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া স্ত্রীকে তৎক্ষণাৎ তাহার সহিত ফিরিতে অনুমতি করিল।

স্ত্রী কহিল, আমাকে যদি কাটিয়া ফেল তবু আমি এখন ফিরিব না। তোমরা আমার নীলমণিকে মারিয়া ফেলিতে চাও, উহার মা নাই বাপ নাই, আমি ছাড়া উহার আর কেহ নাই—আমি উহাকে রক্ষা করিব।

জয়গোপাল রাগিয়া কহিল, তবে এইখানেই থাক, তুমি আর আমার ঘরে ফিরিয়ো না।

শশি তখন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়া কহিল, ঘর তোমার কি! আমার ভাইয়েরই ত ঘর!

জয়গোপাল কহিল—আচ্ছা সে দেখা যাইবে!

পাড়ার লোকে এই ঘটনায় কিছুদিন খুব আন্দোলন করিতে লাগিল। প্রতিবেশিনী তারা কহিল, স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করিতে

হয় ঘরে বসিয়া কর না বাপু। ঘর ছাড়িয়া যাইবার আবশ্যক কি! হাজার হৌক্ স্বামী ত বটে।

সঙ্গে যাহা টাকা ছিল সমস্ত খরচ করিয়া গহনাপত্র বেচিয়া শশি তাহার ভাইকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিল। তখন সে খবর পাইল, দ্বারিগ্রামে তাহাদের যে বড় জোৎ ছিল, যে জোতের উপরে তাহাদের বাড়ি, নানারূপে যাহার আয় প্রায় বার্ষিক দেড় হাজার টাকা হইবে সেই জোৎটি জমিদারের সহিত যোগ করিয়া জয়গোপাল নিজের নামে খারিজ করিয়া লইয়াছে। এখন বিষয়টি সমস্তই তাহাদের—তাহার ভাইয়ের নহে।

ব্যামো হইতে সারিয়া উঠিয়া নীলমণি করুণস্বরে বলিতে লাগিল, দিদি, বাড়ি চল। সেখানে তাহার সঙ্গী ভাগিনেয়দের জন্য তাহার মনকেমন করিতেছে। তাই বারম্বার বলিল, দিদি আমাদের সেই ঘরে চল না, দিদি! শুনিয়া দিদি কাঁদিতে লাগিল। আমাদের ঘর আর কোথায়!

কিন্তু কেবল কাঁদিয়া কোন ফল নাই, তখন পৃথিবীতে দিদি ছাড়া তাহার ভাইয়ের আর কেহ ছিল না। ইহা ভাবিয়া চোখের জল মুছিয়া শশি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ তারিণী বাবুর অন্তঃপুরে গিয়া তাঁহার স্ত্রীকে ধরিল।

ডেপুটি বাবু জয়গোপালকে চিনিতেন। ভদ্রঘরের স্ত্রী ঘরের বাহির হইয়া বিষয় সম্পত্তি লইয়া স্বামীর সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে চাহে ইহাতে শশির প্রতি তিনি বিশেষ বিরক্ত হইলেন। তাহাকে ভুলাইয়া রাখিয়া তৎক্ষণাৎ জয়গোপালকে পত্র লিখি-

লেন। জয়গোপাল শ্যালকসহ তাহার স্ত্রীকে বলপূর্ব্বক নৌকায় তুলিয়া বাড়ি লইয়া গিয়া উপস্থিত করিল।

স্বামী স্ত্রীতে, দ্বিতীয় বিচ্ছেদের পর, পুনশ্চ এই দ্বিতীয় বার মিলন হইল! প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ!

অনেক দিন পরে ঘরে ফিরিয়া পুরাতন সহচরদিগকে পাইয়া নীলমণি বড় আনন্দে খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার সেই নিশ্চিন্ত আনন্দ দেখিয়া অন্তরে অন্তরে শশির হৃদয় বিদীর্ণ হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

শীতকালে ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব মফঃস্বল পর্য্যবেক্ষণে বাহির হইয়া শীকার সন্ধানে গ্রামের মধ্যে তাঁবু ফেলিয়াছেন। গ্রামের পথে সাহেবের সঙ্গে নীলমণির সাক্ষাৎ হয়। অন্য বালকেরা তাঁহাকে দেখিয়া চাণক্য শ্লোকের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক নখী দন্তী শৃঙ্গী প্রভৃতির সহিত সাহেবকেও যোগ করিয়া যথেষ্ট দূরে সরিয়া গেল। কিন্তু সুগম্ভীর প্রকৃতি নীলমণি অটল কৌতুহলের সহিত প্রশান্তভাবে সাহেবকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিল।

সাহেব সকৌতুকে কাছে আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি পাঠশালায় পড়?—

বালক নীরবে মাথা নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কোন পুস্তক পড়িয়া থাক?

নীলমণি পুস্তক শব্দের অর্থ না বুঝিয়া নিস্তব্ধভাবে ম্যাজিষ্ট্রেটের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ম্যাজিষ্টর সাহেবের সহিত এই পরিচয়ের কথা নীলমণি অত্যন্ত উৎসাহের সহিত তাহার দিদির নিকট বর্ণনা করিল।

মধ্যাহ্নে চাপকান প্যাণ্ট্‌লুন পাগ্‌ড়ি পরিয়া জয়গোপাল ম্যাজিষ্ট্রেট্‌কে সেলাম করিতে গিয়াছে। অর্থী প্রত্যর্থী চাপ্‌রাশী কন্‌ষ্টেবলে চারিদিক লোকারণ্য। সাহেব গরমের ভয়ে তাম্বুর বাহিরে খোলা ছায়ায় ক্যাম্পটেবিল পাতিয়া বসিয়াছেন এবং জয়গোপালকে চৌকিতে বসাইয়া তাহাকে স্থানীয় অবস্থা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। জয়গোপাল তাহার গ্রামবাসী সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে এই গৌরবের আসন অধিকার করিয়া মনে মনে স্ফীত হইতেছিল, এবং মনে করিতেছিল এই সময়ে চক্রবর্ত্তীরা এবং নন্দীরা কেহ আসিয়া দেখিয়া যায় ত বেশ হয়!

এমন সময় নীলমণিকে সঙ্গে করিয়া অবগুণ্ঠনাবৃত একটি স্ত্রীলোক একেবারে ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কহিল, সাহেব, তোমার হাতে আমার এই অনাথ ভাইটিকে সমর্পণ করিলাম, তুমি ইহাকে রক্ষা কর!

সাহেব তাঁহার সেই পূর্ব্বপরিচিত বৃহৎমস্তক গম্ভীরপ্রকৃতি বালকটিকে দেখিয়া এবং স্ত্রীলোকটিকে ভদ্রস্ত্রীলোক বলিয়া অনুমান করিয়া তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন—কহিলেন, আপনি তাঁবুতে প্রবেশ করুন।

স্ত্রীলোকটি কহিল, আমার যাহা বলিবার আছে আমি এই-খানেই বলিব।

জয়গোপাল বিবর্ণমুখে ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। কৌতূহলী গ্রামের লোকেরা পরম কৌতুক অনুভব করিয়া চারিদিকে ঘেঁষিয়া আসিবার উপক্রম করিল। সাহেব বেত উঁচাইবামাত্র সকলে দৌড় দিল।

তখন শশি তাহার ভ্রাতার হাত ধরিয়া সেই পিতৃমাতৃহীন বালকের সমস্ত ইতিহাস আদ্যোপান্ত বলিয়া গেল। জয়গোপাল মধ্যে মধ্যে বাধা দিবার উপক্রম করাতে ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ রক্তবর্ণ মুখে গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন—চুপ্‌ রও! এবং বেত্রাগ্র দ্বারা চৌকি ছাড়িয়া সম্মুখে দাঁড়াইতে নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন।

জয়গোপাল মনে মনে শশির প্রতি গর্জ্জন করিতে করিতে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নীলমণি দিদির অত্যন্ত কাছে ঘেঁষিয়া অবাক্‌ হইয়া দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিল।

শশির কথা শেষ হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ জয়গোপালকে গুটিকতক প্রশ্ন করিলেন এবং তাহার উত্তর শুনিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শশিকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন—বাছা, এ মকর্দ্দমা যদিও আমার কাছে উঠিতে পারে না তথাপি তুমি নিশ্চিন্ত থাক—এ সম্বন্ধে যাহা কর্ত্তব্য আমি করিব। তুমি তোমার ভাইটিকে লইয়া নির্ভয়ে বাড়ি ফিরিয়া যাইতে পার!

শশি কহিল—সাহেব, যতদিন নিজের বাড়ি ও না ফিরিয়া

পায় ততদিন আমার ভাইকে বাড়ি লইয়া যাইতে আমি সাহস করি না। এখন নীলমণিকে তুমি নিজের কাছে না রাখিলে ইহাকে কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না।

সাহেব কহিলেন, তুমি কোথায় যাইবে।

শশি কহিল, আমি আমার স্বামীর ঘরে ফিরিয়া যাইব, আমার কোন ভাবনা নাই।

সাহেব ঈষৎ হাসিয়া অগত্যা এই গলায় মাদুলি পরা কৃশ-কায় শ্যামবর্ণ গম্ভীর প্রশান্ত মৃদুস্বভাব বাঙ্গালীর ছেলেটিকে সঙ্গে লইতে রাজি হইলেন।

তখন শশি বিদায় লইবার সময় বালক তাহার আঁচল চাপিয়া ধরিল। সাহেব কহিলেন, বাবা তোমার কোন ভয় নেই—এস!

ঘোম্‌টার মধ্য হইতে অবিরল অশ্রু মোচন করিতে করিতে শশি কহিল—লক্ষ্মী ভাই, যা ভাই—আবার তোর দিদির সঙ্গে দেখা হবে!

এই বলিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার মাথায় পিঠে হাত বুলাইয়া কোন মতে আপন অঞ্চল ছাড়াইয়া তাড়াতাড়ি সে চলিয়া গেল; অমনি সাহেব নীলমণিকে বাম হস্তের দ্বারা বেষ্টন করিয়া ধরিলেন, সে দিদিগো দিদি করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল;—শশি একবার ফিরিয়া চাহিয়া দূর হইতে প্রসারিত দক্ষিণ হস্তে তাহার প্রতি নীরবে সান্ত্বনা প্রেরণ করিয়া বিদীর্ণ হৃদয়ে চলিয়া গেল।

আবার সেই বহুকালের চিরপরিচিত পুরাতন ঘরে স্বামী স্ত্রীর মিলন হইল। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ!

কিন্তু এ মিলন অধিক দিন স্থায়ী হইল না। কারণ, ইহার অনতিকাল পরেই একদিন প্রাতঃকালে গ্রামবাসিগণ সংবাদ পাইল যে, রাত্রে শশি ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইয়া মরিয়াছে—এবং রাত্রেই তাহার দাহক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেছে।

কেহ এ সম্বন্ধে কোন কথা বলিল না। কেবল সেই প্রতিবেশিনী তারা মাঝে মাঝে গর্জ্জন করিয়া উঠিতে চাহিত, সকলে চুপ্ চুপ্ করিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দিত।

বিদায়কালে শশি ভাইকে কথা দিয়া গিয়াছিল আবার দেখা হইবে—সে কথা কোন্‌খানে রক্ষা হইয়াছে জানি না।

তারাপ্রসন্নের কীর্ত্তি।

লেখক জাতির প্রকৃতি অনুসারে তারাপ্রসন্ন কিছু লাজুক এবং মুখচোরা ছিলেন। লোকের কাছে বাহির হইতে গেলে তাঁহার সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইত। ঘরে বসিয়া কলম চালাইয়া তাঁহার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ, পিঠ একটু কুঁজা, সংসারের অভিজ্ঞতা অতি অল্প। লৌকিকতার বাঁধি বোল সকল সহজে তাঁহাব মুখে আসিত না, এই জন্য গৃহদুর্গের বাহিরে তিনি আপনাকে কিছুতেই নিরাপদ জ্ঞান করিতেন না।

লোকেও তাঁহাকে কি একটা অদ্ভুত রকমের মনে করিত এবং লোকেরও দোষ দেওয়া যায় না। মনে কর, প্রথম পরিচয়ে একটি পরম ভদ্রলোক উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে তারাপ্রসন্নকে বলিলেন—"মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হয়ে যে কি পর্য্যন্ত আনন্দলাভ করা গেল তা এক মুখে বল্‌তে পারিনে"—তারাপ্রসন্ন নিরুত্তর হইয়া নিজের দক্ষিণ করতল বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। হঠাৎ সে নীরবতার অর্থ এইরূপ মনে হয় "তা, তোমার আনন্দ হয়েছে সেটা খুব সম্ভব বটে, কিন্তু আমার যে আনন্দ হয়েছে এমন মিথ্যা কথাটা কি করে মুখে উচ্চারণ ক'রব তাই ভাবচি।"

মধ্যাহ্নভোজে নিমন্ত্রণ করিয়া লক্ষপতি গৃহস্বামী যখন

সায়াহ্নের প্রাক্কালে পরিবেশন করিতে আরম্ভ করেন—এবং মধ্যে মধ্যে বিনীত কাকুতি সহকারে ভোজ্য সামগ্রীর অকিঞ্চিৎকরত্ব সম্বন্ধে তারাপ্রসন্নকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিতে থাকেন, "এ কিছুই না! অতি যৎসামান্য! দরিদ্রের ক্ষুদ্ কুঁড়া, বিদুরের আয়োজন! মহাশয়কে কেবলি কষ্ট দেওয়া", তারাপ্রসন্ন চুপ করিয়া থাকেন—যেন কথাটা এমনি প্রামাণিক যে তাহার আর উত্তর সম্ভবে না।

মধ্যে মধ্যে এমনও হয় কোন সুশীল ব্যক্তি যখন তারপ্রসন্নকে সংবাদ দেন যে, তাঁহার মত অগাধপাণ্ডিত্য বর্ত্তমান কালে দুর্লভ, এবং সরস্বতী নিজের পদ্মাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক তারাপ্রসন্নের কণ্ঠাগ্রে বাসস্থান গ্রহণ করিয়াছেন, তখন তারাপ্রসন্ন তাহার তিলমাত্র প্রতিবাদ করেন না যেন সত্য সত্যই সরস্বতী তাঁহার কণ্ঠরোধ করিয়া বসিয়া আছেন। তারাপ্রসন্নের এইটে জানা উচিত যে, মুখের সামনে যাহারা প্রশংসা করে এবং পরের কাছে যাহারা আত্মনিন্দায় প্রবৃত্ত হয়, তাহারা অন্যের নিকট হইতে প্রতিবাদ প্রত্যাশা করিয়াই অনেকটা অসঙ্কোচে অত্যুক্তি করিয়া থাকে—অপর পক্ষ আগাগোড়া সমস্ত কথাটা যদি অম্লানবদনে গ্রহণ করে তবে বক্তা আপনাকে প্রতারিত জ্ঞান করিয়া বিষম ক্ষুব্ধ হয়। এইরূপ স্থলে লোকে নিজের কথা মিথ্যা প্রতিপন্ন হইলে দুঃখিত হয় না।

ঘরের লোকের কাছে তারাপ্রসন্নের ভাব অন্যরূপ; এমন কি তাঁহার নিজের স্ত্রী দাক্ষায়ণীও তাঁহার সহিত কথায় আঁটিয়া

উঠিতে পারেন না। গৃহিণী কথায় কথায় বলেন—"নেও নেও, আমি হার মান্‌লুম! আমার এখন অন্য কাজ আছে।" বাগ্‌যুদ্ধে কে আত্মমুখে পরাজয় স্বীকার করাইতে পারে এমত ক্ষমতা এবং এমন সৌভাগ্য কয়জন স্বামীর আছে?

তারাপ্রসন্নের দিন বেশ কাটিয়া যাইতেছে। দাক্ষায়ণীর দৃঢ় বিশ্বাস, বিদ্যাবুদ্ধি ক্ষমতায় তাঁহার স্বামীর সমতুল্য কেহ নাই এবং সে কথা তিনি প্রকাশ করিয়া বলিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না—শুনিয়া তারাপ্রসন্ন বলিতেন "তোমার একটি বই স্বামী নাই, তুলনা কাহার সহিত করিবে?" শুনিয়া দাক্ষায়ণী ভারি রাগ করিতেন।

দাক্ষায়ণীর কেবল একটা এই মনস্তাপ ছিল যে, তাঁহার স্বামীর অসাধারণ ক্ষমতা বাহিরে প্রকাশ হয় না—স্বামীর সে সম্বন্ধে কিছুমাত্র চেষ্টা নাই। তারাপ্রসন্ন যাহা লিখিতেন তাহা ছাপাইতেন না।

অনুরোধ করিয়া দাক্ষায়ণী মাঝে মাঝে স্বামীর লেখা শুনিতেন—যতই না বুঝিতেন ততই আশ্চর্য্য হইয়া যাইতেন; মনে কর, তিনি কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীদাসের মহাভারত, কবিকঙ্কণ-চণ্ডী পড়িয়াছেন এবং কথকতাও শুনিয়াছেন। সে সমস্তই জলের মত বুঝা যায়—এমন কি নিরক্ষর লোকেও অনায়াসে বুঝিতে পারে, কিন্তু তাঁহার স্বামীর মত এমন সম্পূর্ণ দুর্ব্বোধ হইবার আশ্চর্য্য ক্ষমতা তিনি ইতিপূর্ব্বে কোথাও দেখেন নাই।

তিনি মনে মনে কল্পনা করিতেন এই বই যখন ছাপা হইবে এবং কেহ এক অক্ষর বুঝিতে পারিবে না, তখন দেশসুদ্ধ লোক বিস্ময়ে কিরূপ অভিভূত হইয়া যাইবে। সহস্রবার করিয়া স্বামীকে বলিতেন—"এ সব লেখা ছাপাও!"

স্বামী বলিতেন—"বই ছাপান সম্বন্ধে ভগবান্ মনু স্বয়ং বলে গেছেন 'প্রবৃত্তিরেষা ভূতানং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা'।"

তারাপ্রসন্নের চারিটি সন্তান, চারই কন্যা। দাক্ষায়ণী মনে করিতেন সেটা গর্ভধারিণীরই অক্ষমতা। এই জন্য তিনি আপনাকে প্রতিভাসম্পন্ন স্বামীর অত্যন্ত অযোগ্য স্ত্রী মনে করিতেন। যে স্বামী কথায় কথায় এমন সকল দুরূহ গ্রন্থ রচনা করেন, তাঁহার স্ত্রীর গর্ভে কন্যা বই আর সন্তান হয় না, স্ত্রীর পক্ষে এমন অপটুতার পরিচয় আর কি দিব!

প্রথম কন্যাটি যখন পিতার বক্ষের কাছ পর্য্যন্ত বাড়িয়া উঠিল তখন তারাপ্রসন্নের নিশ্চিন্তভাব ঘুচিয়া গেল। তখন তাঁহার স্মরণ হইল একে একে চারিটি কন্যারই বিবাহ দিতে হইবে, এবং সে জন্য বিস্তর অর্থের প্রয়োজন। গৃহিণী অত্যন্ত নিশ্চিন্ত মুখে বলিলেন, "তুমি যদি একবার একটুখানি মন দাও তাহা হইলে ভাবনা কিছুই নাই।"

তারাপ্রসন্ন কিঞ্চিৎ ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "সত্য না কি! আচ্ছা, বল দেখি কি করিতে হইবে।"

দাক্ষায়ণী সংশয়শূন্য নিরুদ্বিগ্নভাবে বলিলেন, "কলিকাতায় চল—তোমার বইগুলা ছাপাও—পাঁচজন লোকে তোমাকে

জামুক—তার পরে দেখ দেখি, টাকা আপনি আসে কি না!”

স্ত্রীর আশ্বাসে তারাপ্রসন্নও ক্রমে আশ্বাস লাভ করিতে লাগিলেন—এবং মনে প্রত্যয় হইল, তিনি ইস্তক নাগাদ্ বসিয়া বসিয়া যতই লিখিয়াছেন তাহাতে পাড়াশুদ্ধ লোকের কন্যাদায় মোচন হইয়া যায়।

এখন, কলিকাতায় যাইবার সময় ভারি গোল পড়িয়া গেল। দাক্ষায়ণী তাঁহার নিরুপায় নিঃসহায় সযত্নপালিত স্বামীটিকে কিছুতেই একলা ছাড়িয়া দিতে পারেন না। তাঁহাকে খাওয়াইয়া পরাইয়া নিত্য নৈমিত্তিক কর্ত্তব্য স্মরণ করাইয়া সংসারের বিবিধ উপদ্রব হইতে কে রক্ষা করিবে?

কিন্তু অনভিজ্ঞ স্বামীও অপরিচিত বিদেশে স্ত্রী কন্যা সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে অত্যন্ত ভীত ও অসম্মত। অবশেষে দাক্ষায়ণী পাড়ার একটি চতুর লোককে স্বামীর নিত্য অভ্যাস সম্বন্ধে সহস্র উপদেশ দিয়া আপনার পদে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। এবং স্বামীকে অনেক মাথার দিব্য ও অনেক মাদুলি তাগায় আচ্ছন্ন করিয়া বিদেশে রওনা করিয়া দিলেন। এবং ঘরে আছাড় খাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

কলিকাতায় আসিয়া তারাপ্রসন্ন তাঁহার চতুর সঙ্গীর সাহায্যে ‘বেদান্ত-প্রভাকর’ প্রকাশ করিলেন। দাক্ষায়ণীর গহনা বন্ধক রাখিয়া যে টাকা ক’টি পাইয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশই খরচ হইয়া গেল।

বিক্রয়ের জন্য বহির দোকানে এবং সমালোচনার জন্য দেশের ছোট বড় সমস্ত সম্পাদকের নিকট বেদান্ত-প্রভাকর পাঠাইয়া দিলেন। ডাকযোগে গৃহিণীকেও একখানা বহি রেজেষ্টারি করিয়া পাঠাইলেন। আশঙ্কা ছিল, পাছে ডাকওয়ালারা পথের মধ্যে হইতে চুরি করিয়া লয়।

গৃহিণী যে দিন ছাপার বইয়ের উপরের পৃষ্ঠায় ছাপার অক্ষরে তাঁহার স্বামীর নাম দেখিলেন, সে দিন পাড়ার সকল মেয়েকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইলেন। যেখানে সকলে আসিয়া বসিবার কথা, সেইখানে বইটা ফেলিয়া রাখিলেন।

সকলে আসিয়া বসিলে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "ওমা, বইটা ওখানে কে ফেলে রেখেছে! অন্নদা বইটা দাওনা, ভাই, তুলে রাখি।" উঁহাদের মধ্যে অন্নদা পড়িতে জানে। বইটা কুলঙ্গির উপর তুলিয়া রাখিলেন।

মুহূর্ত্ত পরেই একটা জিনিষ পাড়িতে গিয়া ফেলিয়া দিলেন—তার পরে নিজের বড় মেয়েকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "শশি, বাবার বই পড়তে ইচ্ছে হয়েচে বুঝি? তা নে না মা, পড়না! তাতে লজ্জা কি!" বাবার বহির প্রতি শশির কিছুমাত্র আগ্রহ ছিল না।

কিছুক্ষণ পরেই তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন "ছি মা, বাবার বই অমন করে নষ্ট করতে নেই, তোমার কমলা দিদির হাতে দাও, উনি ঐ আলমারির মাথায় তুলে রাখবেন।"

বহির যদি কিছুমাত্র চেতনা থাকিত, তাহা হইলে সেই একদিনের উৎপীড়নে বেদান্তের প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ হইত।

একে একে কাগজে সমালোচনা বাহির হইতে লাগিল। গৃহিণী যাহা ঠাহরাইয়াছিলেন, তাহা অনেকটা সত্য হইয়া দাঁড়াইল। গ্রন্থের এক অক্ষর বুঝিতে না পারিয়া দেশশুদ্ধ সমালোচক একেবারে বিহ্বল হইয়া উঠিল। সকলেই এক-বাক্যে কহিল, এমন সারবান্ গ্রন্থ ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই।

যে সকল সমালোচক রেনল্ডসের লণ্ডনরহস্যের বাঙ্গালা অনুবাদ ছাড়া আর কোন বই স্পর্শ করিতে পারে না, তাহারা অত্যন্ত উৎসাহের সহিত লিখিল—দেশের ঝুড়ি ঝুড়ি নাটক নবেলের পরিবর্ত্তে যদি এমন দুই এক খানি গ্রন্থ মধ্যে মধ্যে বাহির হয়, তবে বঙ্গসাহিত্য বাস্তবিকই পাঠ্য হয়।

যে ব্যক্তি পুরুষানুক্রমে বেদান্তের নাম কখনও শুনে নাই সেই কেবল লিখিল—তারাপ্রসন্ন বাবুর সহিত সকল স্থানে আমাদের মতের মিল হয় নাই—স্থানাভাববশতঃ এস্থলে তাহার উল্লেখ করিলাম না। কিন্তু মোটের উপরে গ্রন্থকারের সহিত আমাদের মতের অনেক ঐক্যই লক্ষিত হয়। কথাটা যদি সত্য হইত, তাহা হইলে মোটের উপর গ্রন্থখানি পুড়াইয়া ফেলা উচিত ছিল।

দেশের যেখানে যত লাইব্রেরী ছিল এবং ছিল না তাহার সম্পাদকগণ মুদ্রার পরিবর্ত্তে মুদ্রাঙ্কিত পত্রে তারাপ্রসন্নের গ্রন্থ

ভিক্ষা চাহিয়া পাঠাইলেন। অনেকেই লিখিল—আপনার এই চিন্তাশীল গ্রন্থে দেশের একটি মহৎ অভাব দূর হইয়াছে। চিন্তাশীল গ্রন্থ কাহাকে বলে তারাপ্রসন্ন ঠিক বুঝিতে পারিলেন না, কিন্তু পুলকিতচিত্তে ঘর হইতে মাশুল দিয়া প্রত্যেক লাইব্রেরীতে "বেদান্ত-প্রভাকর" পাঠাইয়া দিলেন।

এইরূপে অজস্র স্তুতিবাক্যে তারাপ্রসন্ন যখন অতিমাত্র উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছেন, এমন সময়ে পত্র পাইলেন দাক্ষায়ণীর পঞ্চম সন্তান সম্ভাবনা অতি নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। তখন রক্ষকটিকে সঙ্গে করিয়া অর্থসংগ্রহের জন্য দোকানে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

সকল দোকানদার একবাক্যে বলিল, একখানি বইও বিক্রয় হয় নাই, কেবল এক জায়গায় শুনিলেন, মফস্বল হইতে কে একজন তাঁহার এক বই চাহিয়া পাঠাইয়াছিল, এবং তাহাকে ভ্যালুপেবেলে পাঠানও হইয়াছিল কিন্তু বই ফেরত আসিয়াছে কেহ গ্রহণ করে নাই। দোকানদারকে তাহার মাশুল দণ্ড দিতে হইয়াছে এই জন্য সে বিষম আক্রোশে গ্রন্থকারের সমস্ত বহি তখনই তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিতে উদ্যত হইল।

গ্রন্থকার বাসায় ফিরিয়া আসিয়া অনেক ভাবিলেন কিন্তু কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। তাঁহার চিন্তাশীল গ্রন্থ সম্বন্ধে যতই চিন্তা করিলেন, ততই অধিকতর উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতে লাগিলেন। অবশেষে যে কয়েকটি টাকা অবশিষ্ট ছিল তাহাই অবলম্বন করিয়া অবিলম্বে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

তারাপ্রসন্ন গৃহিণীর নিকট আসিয়া অত্যন্ত আড়ম্বরের সহিত প্রফুল্লতা প্রকাশ করিলেন। দাক্ষায়ণী শুভসংবাদের জন্য সহাস্য মুখে প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন।

তখন তারাপ্রসন্ন একখানি "গৌড় বার্ত্তাবহ" আনিয়া গৃহিণীর ক্রোড়ে ফেলিয়া দিলেন। পাঠ করিয়া তিনি মনে মনে সম্পাদকের অক্ষয় ধনপুত্র কামনা করিলেন। এবং তাঁহার মুখে মানসিক পুষ্প চন্দন অর্ঘ্য উপহার দিলেন। পাঠ সমাপন করিয়া আবার স্বামীর মুখের দিকে চাহিলেন।

স্বামী তখন 'নবপ্রভাত" আনিয়া খুলিয়া দিলেন। পাঠ করিয়া আনন্দবিহ্বলা দাক্ষায়ণী আবার স্বামীর মুখের প্রতি প্রত্যাশাপূর্ণ স্নিগ্ধনেত্র উত্থাপিত করিলেন।

তখন তারাপ্রসন্ন একখণ্ড "যুগান্তর" বাহির করিলেন। তাহার পর? তাহার পর "ভারত ভাগ্যচক্র।" তাহার পর? তাহার পর "শুভজাগরণ।" তাহার পর "অরুণালোক।" তাহার পর "সংবাদ তরঙ্গভঙ্গ।" তাহার পর "আশা" "আগমনী" "উচ্ছ্বাস" "পুষ্পমঞ্জরী" "সহচরী" "সীতা গেজেঠ" "অহল্যা লাইব্রেরী প্রকাশিকা" "ললিত সমাচার" "কোটাল" "বিশ্ববিচারক" "লাবণ্য-লতিকা।" হাসিতে হাসিতে গৃহিণীর আনন্দাশ্রু পড়িতে লাগিল।

চোখ মুছিয়া আর একবার স্বামীর কীর্ত্তিরশ্মি-সমুজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিলেন—স্বামী বলিলেন, "এখনো অনেক কাগজ বাকি আছে।"

দাক্ষায়ণী বলিলেন, "সে বিকালে দেখিব, এখন অন্য খবর কি বল?"

তারাপ্রসন্ন বলিলেন "এবার কলিকাতায় গিয়া শুনিয়া আসিলাম লাট সাহেবের মেম এক খানা বই বাহির করিয়াছে কিন্তু তাহাতে "বেদান্ত প্রভাকরের" কোন উল্লেখ করে নাই।"

দাক্ষায়ণী বলিলেন "আহা ওসব কথা নয়—আর কি আন্‌লে বল না।"

তারাপ্রসন্ন বলিলেন "কতকগুলা চিঠি আছে।"

তখন দাক্ষায়ণী স্পষ্ট করিয়া বলিলেন "টাকা কত আন্‌লে?" তারাপ্রসন্ন বলিলেন, "বিধুভূষণের কাছে পাঁচটাকা হাওলাত করে এনেছি।"

অবশেষে দাক্ষায়ণী যখন সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিলেন, তখন পৃথিবীর সাধুতা সম্বন্ধে তাঁহার সমস্ত বিশ্বাস বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল। নিশ্চয় দোকানদারেরা তাঁহার স্বামীকে ঠকাইয়াছে, এবং বাঙ্গলা দেশের সমস্ত ক্রেতা ষড়যন্ত্র করিয়া দোকানদারদের ঠকাইয়াছে।

অবশেষে সহসা মনে হইল যাহাকে নিজের প্রতিনিধি করিয়া স্বামীর সহিত পাঠাইয়াছিলেন সেই বিধুভূষণ দোকানদারদের সহিত তলে তলে যোগ দিয়াছে—এবং যত বেলা যাইতে লাগিল ততই তিনি পরিষ্কার বুঝিতে পারিলেন—ও পাড়ার বিশ্বম্ভর চাটুয্যে তাঁহার স্বামীর পরম শত্রু, নিশ্চয়ই এ সমস্ত তাঁহারই চক্রান্তে ঘটিয়াছে। তাই বটে, যে দিন তাঁহার স্বামী কলি-

কাতায় যাত্রা করেন, তাহার দুই দিন পরেই বিশ্বম্ভরকে বটতলায় দাঁড়াইয়া কানাই পালের সহিত কথা কহিতে দেখা গিয়াছিল— কিন্তু বিশ্বম্ভর মাঝে মাঝে প্রায়ই কানাই পালের সহিত কথাবার্ত্তা কয় না কি, এইজন্য তখন কিছু মনে হয় নাই এখন সমস্ত জলের মত বুঝা যাইতেছে।

এদিকে দাক্ষায়ণীর সাংসারিক দুর্ভাবনা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। যখন অর্থসংগ্রহের এই একমাত্র সহজ উপায় নিষ্ফল হইল তখন আপনার কন্যা প্রসবের অপরাধ তাঁহাকে চতুর্গুণ দগ্ধ করিতে লাগিল। বিশ্বম্ভর, বিধুভূষণ, অথবা বাঙ্গলাদেশের অধিবাসীদিগকে এই অপরাধের জন্য দায়িক করিতে পারিলেন না—সমস্তই একলা নিজের স্কন্ধে তুলিয়া লইতে হইল—কেবল যে মেয়েরা জন্মিয়াছে এবং জন্মিবে তাহাদিগকেও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অংশ দিলেন। অহোরাত্রি মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার মনে আর শান্তি রহিল না।

অসন্নপ্রসবকালে দাক্ষায়ণীর শারীরিক অবস্থা এমন হইল যে, সকলের বিশেষ আশঙ্কার কারণ হইয়া দাঁড়াইল। নিরুপায় তারাপ্রসন্ন পাগলের মত হইয়া বিশ্বম্ভরের কাছে গিয়া বলিল—"দাদা, আমার এই থান পঞ্চাশেক বই বাঁধা রাখিয়া যদি কিছু টাকা দাও ত আমি সহর হইতে ভাল দাই আনাই।"

বিশ্বম্ভর বলিল—"ভাই, সেজন্য ভাবনা নাই, টাকা যাহা লাগে আমি দিব, তুমি বই লইয়া যাও।" এই বলিয়া কানাই

পালের সহিত অনেক বলা কহা করিয়া কিঞ্চিৎ টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিল এবং বিধুভূষণ স্বয়ং গিয়া নিজে হইতে পাথেয় দিয়া কলিকাতা হইতে ধাত্রী আনিল।

দাক্ষায়ণী কি মনে করিয়া স্বামীকে ঘরে ডাকাইয়া আনিলেন এবং মাথার দিব্য দিয়া বলিলেন—যখনি তোমার সেই বেদনার উপক্রম হইবে স্বপ্নলব্ধ ঔষধটা খাইতে ভুলিও না। আর সেই সন্ন্যাসীর মাছুলিটা কখনই খুলিয়া রাখিও না। আর এমন ছোট খাট সহস্র বিষয়ে স্বামীর দুটি হাতে ধরিয়া অঙ্গীকার করাইয়া লইলেন। আর বলিলেন, বিধুভূষণের উপর কিছুই বিশ্বাস নাই, সেই তাঁহার স্বামীর সর্ব্বনাশ করিয়াছে। নতুবা ঔষধি, মাছুলি এবং মাথার দিব্য সমেত তাঁহার সমস্ত স্বামীটিকে তাহার হস্তে দিয়া যাইতেন।

তার পরে মহাদেবের মত তাঁহার বিশ্বাসপ্রবণ ভোলানাথ স্বামীটিকে পৃথিবীর নির্ম্মল কুটিল-বুদ্ধি চক্রান্তকারিদের সম্বন্ধে বারবার সতর্ক করিয়া দিলেন। অবশেষে চুপি চুপি বলিলেন, "দেখ আমার যে মেয়েটি হইবে, সে যদি বাঁচে তাহার নাম রাখিও 'বেদান্ত-প্রভা', তার পরে তাহাকে শুধু প্রভা বলিয়া ডাকিলেই হইবে।

এই বলিয়া স্বামীর পায়ের ধুলা মাথায় লইলেন। মনে মনে কহিলেন "কেবল কন্যা জন্ম দিবার জন্যই স্বামীর ঘরে আসিয়াছিলাম। এবার বোধ হয় সে আপদ ঘুচিল।"

ধাত্রী যখন বলিল—"মা একবার দেখ, মেয়েটি কি সুন্দর

হয়েছে।" মা একবার চাহিয়া নেত্র নিমীলন করিলেন, মৃদুস্বরে বলিলেন "বেদান্ত-প্রভা।" তার পরে ইহসংসারে আর একটি কথা বলিবারও অবসর পাইলেন না।

দুর্ব্বুদ্ধি।

ভিটা ছাড়িতে হইল। কেমন করিয়া তাহা খোলসা করিয়া বলিব না—আভাস দিব মাত্র।

আমি পাড়াগেঁয়ে নেটিভ ডাক্তার, পুলিসের থানার সম্মুখে আমার বাড়ি। যমরাজের সহিত আমার যে পরিমাণ আনুগত্য ছিল দারোগা বাবুদের সহিত তাহা অপেক্ষা কম ছিল না—সুতরাং নর এবং নারায়ণের দ্বারা মানুষের যত বিবিধ রকমের পীড়া ঘটিতে পারে তাহা আমার সুগোচর ছিল। যেমন মণির দ্বারা বলয়ের এবং বলয় দ্বারা মণির শোভা বৃদ্ধি হয় তেমনি আমার মধ্যস্থতায় দারোগার এবং দারোগার মধ্যস্থতায় আমার উত্তরোত্তর আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটিতেছিল।

এই সকল ঘনিষ্ঠ কারণে হাল নিয়মের কৃতবিদ্য দারোগা ললিত চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে আমার একটু বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। তাঁহার একটি অরক্ষণীয়া আত্মীয়া কন্যার সহিত বিবাহের জন্য মাঝে মাঝে অনুরোধ করিয়া আমাকেও প্রায় তিনি অরক্ষণীয় করিয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু শশি আমার একমাত্র কন্যা, মাতৃহীনা, তাহাকে বিমাতার হাতে সমর্পণ করিতে পারিলাম না। বর্ষে বর্ষে নূতন পঞ্জিকার মতে বিবাহের কত শুভ লগ্নই ব্যর্থ হইল। আমার চখের সম্মুখে কত যোগ্য এবং অযোগ্য পাত্র চতুর্দ্দোলায়

চড়িল, আমি কেবল বরযাত্রীর দলে বাহির বাড়িতে মিষ্টান্ন খাইয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম।

শশির বয়স বারো হইয়া প্রায় তেরোয় পড়ে। কিছু সুবিধামত টাকার যোগাড় করিতে পারিলেই মেয়েটিকে একটি বিশিষ্ট বড় ঘরে বিবাহ দিতে পারিব এমন আশা পাইয়াছি। সেই কর্ম্মটি শেষ করিতে পারিলে অবিলম্বে আর একটি শুভ কর্ম্মের আয়োজনে মনোনিবেশ করিতে পারিব।

সেই অত্যাবশ্যক টাকাটার কথা ধ্যান করিতেছিলাম, এমন সময় তুলসী পাড়ার হরিনাথ মজুমদার আসিয়া আমার পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া পড়িল। কথাটা এই, তাহার বিধবা কন্যা রাত্রে হঠাৎ মারা গিয়াছে; শত্রুপক্ষ গর্ভপাতের অপবাদ দিয়া দারোগার কাছে বেনামা পত্র লিখিয়াছে। এক্ষণে পুলিস তাহার মৃতদেহ লইয়া টানাটানি করিতে উদ্যত।

সদ্য কন্যাশোকের উপর এতবড় অপমানের আঘাত তাহার পক্ষে অসহ্য হইয়াছে। আমি ডাক্তারও বটে, দারোগার বন্ধুও বটে, কোন মতে উদ্ধার করিতে হইবে।

লক্ষ্মী যখন ইচ্ছা করেন তখন এমনি করিয়াই কখনো সদর কখনো খিড়কি দরজা দিয়া অনাহূত আসিয়া উপস্থিত হন। আমি ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম ব্যাপারটা বড় গুরুতর, দুটো একটা কল্পিত উদাহরণ প্রয়োগ করিলাম—কম্পমান বৃদ্ধ হরিনাথ শিশুর মত কাঁদিতে লাগিল।

বিস্তারিত বলা বাহুল্য—কন্যার অন্ত্যেষ্টি সংকারের সুযোগ করিতে হরিনাথ ফতুর হইয়া গেল।

আমার কন্যা শশি করুণ স্বরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—বাবা, ঐ বুড়ো তোমার পায়ে ধরিয়া কেন অমন করিয়া কাঁদিতে ছিল? আমি তাহাকে ধমক দিয়া বলিলাম—যা, যা, তোর এত খবরে দরকার কি?

এইবার সংপাত্রে কন্যাদানের পথ সুপ্রশস্ত হইল। বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল। একমাত্র কন্যার বিবাহ, ভোজের আয়োজন প্রচুর করিলাম। বাড়িতে গৃহিণী নাই, প্রতিবেশীরা দয়া করিয়া আমাকে সাহায্য করিতে আসিল। সর্ব্বস্বান্ত কৃতজ্ঞ হরিনাথ দিনরাত্রি খাটিতে লাগিল।

গায়ে হলুদের দিনে রাত তিনটার সময় হঠাৎ শশিকে ওলাউঠায় ধরিল। রোগ উত্তরোত্তর কঠিন হইয়া উঠিতে লাগিল। অনেক চেষ্টার পর নিষ্ফল ঔষধের শিশিগুলা ভূতলে ফেলিয়া ছুটিয়া গিয়া হরিনাথের পা জড়াইয়া ধরিলাম। কহিলাম,—মাপ কর দাদা, এই পাষণ্ডকে মাপ কর। আমার একমাত্র কন্যা, আমার আর কেহ নাই।

হরিনাথ শশব্যস্ত হইয়া কহিল,—ডাক্তার বাবু, করেন কি করেন কি! আপনার কাছে আমি চিরঋণী—আমার পায়ে হাত দিবেন না!

আমি কহিলাম, নিরপরাধে আমি তোমার সর্ব্বনাশ করিয়াছি, সেই পাপে আমার কন্যা মরিতেছে।

এই বলিয়া সর্ব্বলোকের সমক্ষে আমি চীৎকার করিয়া বলিলাম, ওগো আমি এই বৃদ্ধের সর্ব্বনাশ করিয়াছি, আমি তাহার দণ্ড লইতেছি, ভগবান্ আমার শশিকে রক্ষা করুন্!

বলিয়া হরিনাথের চটিজুতা খুলিয়া নিজের মাথায় মারিতে লাগিলাম; বৃদ্ধ ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া আমার হাত হইতে জুতা কাড়িয়া লইল।

পর দিন দশটা বেলায় গায়ে হলুদের হরিদ্রা চিহ্ন লইয়া শশি ইহসংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিল।

তাহার পর দিনেই দারোগা বাবু কহিলেন—ওহে, আর কেন এইবার বিবাহ করিয়া ফেল! দেখা শুনার ত একজন লোক চাই?

মানুষের মর্ম্মান্তিক দুঃখশোকের প্রতি এরূপ নিষ্ঠুর অশ্রদ্ধা সয়তানকেও শোভা পায় না। কিন্তু নানা ঘটনায় দারোগার কাছে এমন মনুষত্বের পরিচয় দিয়াছিলাম যে, কোন কথা বলিবার মুখ ছিল না। দারোগার বন্ধুত্ব সেই দিন যেন আমাকে চাবুক মারিয়া অপমান করিল!

হৃদয় যতই ব্যথিত থাক্ কর্ম্মচক্র চলিতেই থাকে! আগেকার মতই ক্ষুধার আহার, পরিধানের বস্ত্র, এমন কি, চুলার কাষ্ঠ এবং জুতার ফিতা পর্য্যন্ত পরিপূর্ণ উদ্যমে নিয়মিত সংগ্রহ করিয়া ফিরিতে হয়।

কাজের অবকাশে যখন একলা ঘরে আসিয়া বসিয়া থাকি তখন মাঝে মাঝে কানে সেই করুণকণ্ঠের প্রশ্ন বাজিতে থাকে,

"বাবা ঐ বুড়ো তোমার পায়ে ধরিয়া কেন অমন করিয়া কাঁদিতে-ছিল ?"—দরিদ্র হরিনাথের জীর্ণ ঘর নিজের ব্যয়ে ছাইয়া দিলাম, আমার দুগ্ধবতী গাভীটি তাহাকে দান করিলাম, তাহার বন্দকি জোত জমা মহাজনের হাত হইতে উদ্ধার করিয়া দিলাম।

কিছুদিন সদ্যশোকের দুঃসহ বেদনায় নির্জ্জন সন্ধ্যায় এবং অনিদ্র রাত্রে কেবলি মনে হইত, আমার কোমলহৃদয়া মেয়েটি সংসারলীলা শেষ করিয়াও তাহার বাপের নিষ্ঠুর দুষ্কর্ম্মে পরলোকে কোন মতেই শান্তি পাইতেছে না, সে যেন ব্যথিত হইয়া কেবলি আমাকে প্রশ্ন করিয়া ফিরিতেছে, বাবা, কেন এমন করিলে ?

কিছুদিন এমনি হইয়াছিল গরীবের চিকিৎসা করিয়া টাকার জন্য তাগিদ্ করিতে পারিতাম না। কোন ছোট মেয়ের ব্যামো হইলে মনে হইত আমার শশিই যেন পল্লীর সমস্ত রুগ্না বালিকার মধ্যে রোগ ভোগ করিতেছে।

তখন পূরা বর্ষায় পল্লী ভাসিয়া গেছে। ধানের ক্ষেত এবং গৃহের অঙ্গন-পার্শ্ব দিয়া নৌকায় করিয়া ফিরিতে হয়। ভোর রাত্রি হইতে বৃষ্টি সুরু হইয়াছে, এখনো বিরাম নাই।

জমিদারের কাছারি বাড়ি হইতে আমার ডাক পড়িয়াছে। বাবুদের পান্সির মাঝি সামান্য বিলম্বটুকু সহ্য করিতে না পারিয়া উদ্ধত হইয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছে।

ইতিপূর্ব্বে এরূপ দুর্য্যোগে যখন আমাকে বাহির হইতে হইত তখন একটি লোক ছিল যে আমার পুরাতন ছাতাটি খুলিয়

দেখিত তাহাতে কোথাও ছিদ্র আছে কি না, এবং একটি ব্যগ্র-কণ্ঠ বাদলার হাওয়া ও বৃষ্টির ছাঁট হইতে সযত্নে আত্মরক্ষা করিবার জন্য আমাকে বারম্বার সতর্ক করিয়া দিত। আজ শূন্য নীরব গৃহ হইতে নিজের ছাতা নিজে সন্ধান করিয়া লইয়া বাহির হইবার সময় তাহার সেই স্নেহমুখখানি স্মরণ করিয়া একটুখানি বিলম্ব হইতেছিল। তাহার রুদ্ধ শয়ন ঘরটার দিকে তাকাইয়া ভাবিতেছিলাম, যে লোক পরের দুঃখকে কিছুই মনে করে না, তাহার সুখের জন্য ভগবান ঘরের মধ্যে এত স্নেহের আয়োজন কেন রাখিবেন? এই ভাবিতে ভাবিতে সেই শূন্য ঘরটার দরজার কাছে আসিয়া বুকের মধ্যে হু হু করিতে লাগিল! বাহিরে বড়লোকের ভৃত্যের তর্জ্জন স্বর শুনিয়া তাড়াতাড়ি শোক সম্বরণ করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

নৌকায় উঠিবার সময় দেখি থানার ঘাটে ডোঙ্গা বাঁধা—একজন চাষা কৌপীন পরিয়া বৃষ্টিতে ভিজিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কিরে?" উত্তরে শুনিলাম, গত রাত্রে তাহার কন্যাকে সাপে কাটিয়াছে, থানায় রিপোর্ট করিবার জন্য হতভাগ্য তাহাকে দূর গ্রাম হইতে বাহিয়া আনিয়াছে। দেখিলাম সে তাহার নিজের একমাত্র গাত্রবস্ত্র খুলিয়া মৃত দেহ ঢাকিয়া রাখিয়াছে। জমিদারী কাছারীর অসহিষ্ণু মাঝি নৌকা ছাড়িয়া দিল।

বেলা একটার সময় বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া দেখি তখনো সেই লোকটা বুকের কাছে হাত পা গুটাইয়া বসিয়া বসিয়া ভিজিতেছে

দারোগা বাবুর দর্শন মেলে নাই। আমি তাহাকে আমার রন্ধন অন্নের এক অংশ পাঠাইয়া দিলাম। সে তাহা ছুঁইল না।

তাড়াতাড়ি আহার সারিয়া কাছারির রোগীর তাগিদে পুনর্ব্বার বাহির হইলাম। সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিয়া দেখি তখনো লোকটা একেবারে অভিভূতের মত বসিয়া আছে। কথা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিতে পারে না, মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে। এখন তাহার কাছে, এই নদী, ঐ গ্রাম, ঐ থানা, এই মেঘাচ্ছন্ন আর্দ্র পঙ্কিল পৃথিবীটা স্বপ্নের মত। বারম্বার প্রশ্নের দ্বারা জানিলাম, একবার একজন কন্‌ষ্টেবল্ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল ট্যাঁকে কিছু আছে কি না। সে উত্তর করিয়াছিল, সে নিতান্তই গরীব, তাহার কিছু নাই। কনষ্টেবল বলিয়া গেছে, থাক বেটা তবে এখন বসিয়া থাক্।

এমন দৃশ্য পূর্ব্বেও অনেক বার দেখিয়াছি কখনো কিছুই মনে হয় নাই। আজ কোন মতেই সহ্য করিতে পারিলাম না। আমার শশির করুণা-গদ্‌গদ অব্যক্ত কণ্ঠ সমস্ত বাদ্‌লার আকাশ জুড়িয়া বাজিয়া উঠিল। ঐ কন্যাহারা বাক্যহীন চাষার অপরিমেয় দুঃখ আমার বুকের পাঁজর গুলাকে যেন ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল।

দারোগা বাবু বেতের মোড়ায় বসিয়া আরামে গুড়গুড়ি টানিতেছিলেন, তাঁহার কন্যাদায়গ্রস্ত আত্মীয় মেসোটি আমার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই সম্প্রতি দেশ হইতে আসিয়াছেন; তিনি মাদুরের উপর বসিয়া গল্প করিতেছিলেন। আমি একদমে

ঝড়ের বেগে সেথানে উপস্থিত হইলাম। চীৎকার করিয়া বলিলাম, আপনারা মানুষ না পিশাচ? বলিয়া আমার সমস্ত দিনের উপার্জ্জনের টাকা ছনাৎ করিয়া তাহার সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া কহিলাম—টাকা চান্ ত এই নিন্, যখন মরিবেন সঙ্গে লইয়া যাইবেন, এখন এই লোকটাকে ছুটি দিন, ও কন্যার সৎকার করিয়া আসুক!

বহু উৎপীড়িতের অশ্রু-সেচনে দারোগার সহিত ডাক্তারের যে প্রণয় বাড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা এই ঝড়ে ভূমিসাৎ হইয়া গেল।

অনতিকাল পরে দারোগার পায়ে ধরিয়াছি, তাঁহার মহদাশয়তার উল্লেখ করিয়া অনেক স্তুতি এবং নিজের বুদ্ধিভ্রংশতা লইয়া অনেক আত্মধিক্কার প্রয়োগ করিয়াছি, কিন্তু শেষটা ভিটা ছাড়িতে হইল।

আপদ।

সন্ধ্যার দিকে ঝড় ক্রমশ প্রবল হইতে লাগিল। বৃষ্টির ঝাপট, বজ্রের শব্দ, এবং বিদ্যুতের ঝিক্‌মিকিতে আকাশে যেন সুরাসুরের যুদ্ধ বাধিয়া গেল। কালো কালো মেঘগুলি মহাপ্রলয়ের জয়পতাকার মত দিগ্বিদিকে উড়িতে আরম্ভ করিল, গঙ্গার এপারে ওপারে বিদ্রোহী ঢেউগুলো কলশব্দে নৃত্য জুড়িয়া দিল, এবং বাগানের বড় বড় গাছগুলো সমস্ত শাখা ঝট্‌ পট্‌ করিয়া হা হুতাশ সহকারে দক্ষিণে বামে লুটোপুটি করিতে লাগিল।

তখন চন্দননগরের বাগানবাড়িতে একটি দীপালোকিত রুদ্ধ কক্ষে খাটের সম্মুখবর্ত্তী নীচের বিছানায় বসিয়া স্ত্রীপুরুষে কথা-বার্ত্তা চলিতেছিল।

শরৎ বাবু বলিতেছিলেন, "আর কিছু দিন থাকিলেই তোমার শরীর সম্পূর্ণ সারিয়া উঠিবে, তখন "অমরা দেশে ফিরিতে পারিব।"

কিরণময়ী বলিতেছিলেন, "আমার শরীর সম্পূর্ণ সারিয়া উঠিয়াছে, এখন দেশে ফিরিলে কোন ক্ষতি হইবে না।"

বিবাহিত ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন, কথাটা যত সংক্ষেপে রিপোর্ট্‌ করিলাম তত সংক্ষেপে শেষ হয় নাই। বিষয়টি বিশেষ দুরূহ নয়, তথাপি বাদ প্রতিবাদ কিছুতেই মীমাংসার দিকে

অগ্রসর হইতেছিল না; কর্ণহীন নৌকার মত ক্রমাগতই ঘুর খাইয়া মরিতেছিল; অবশেষে অশ্রুতরঙ্গে ডুবি হইবার সম্ভাবনা দেখা দিল।

শরৎ কহিলেন, "ডাক্তার বলিতেছে আর কিছুদিন থাকিয়া গেলে ভাল হয়।"

কিরণ কহিলেন, "তোমার ডাক্তার ত সব জানে!"

শরৎ কহিলেন, "জান ত, এই সময়ে দেশে নানাপ্রকার ব্যামোর প্রাচুর্ভাব হয়, অতএব আর মাস দুয়েক কাটাইয়া গেলেই ভাল হয়।"

কিরণ কহিলেন, "এখানে এখন বুঝি কোথাও কাহারো কোন ব্যামো হয় নাই!"

পূর্ব্ব ইতিহাসটা এই। কিরণকে তাহার ঘরের এবং পাড়ার সকলেই ভালবাসে, এমন কি শ্বাশুড়ি পর্য্যন্ত। সেই কিরণের যখন কঠিন পীড়া হইল তখন সকলেই চিন্তিত হইয়া উঠিল—এবং ডাক্তার যখন বায়ুপরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করিল, তখন গৃহ এবং কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া প্রবাসে যাইতে তাহার স্বামী এবং শ্বাশুড়ি কোন আপত্তি করিলেন না। যদিও গ্রামের বিবেচক প্রাজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই, বায়ুপরিবর্ত্তনে আরোগ্যের আশা করা এবং স্ত্রীর জন্য এতটা হুলস্থূল করিয়া তোলা নব্য স্ত্রৈণতার একটা নির্ল্লজ্জ আতিশয্য বলিয়া স্থির করিলেন এবং প্রশ্ন করিলেন, ইতিপূর্ব্বে কি কাহারও স্ত্রীর কঠিন পীড়া হয় নাই, শরৎ যেখানে যাওয়া স্থির করিয়াছেন সেখানে কি মানুষরা অমর, এবং এমন কোন

দেশ আছে কি যেখানে অদৃষ্টের লিপি সফল হয় নাই—তথাপি শরৎ এবং তাঁহার মা সে সকল কথায় কর্ণপাত করিলেন না; তখন গ্রামের সমস্ত সমবেত বিজ্ঞতার অপেক্ষা তাঁহাদের হৃদয়-লক্ষ্মী কিরণের প্রাণটুকু তাঁহাদের নিকট গুরুতর বোধ হইল। প্রিয়ব্যক্তির বিপদে মানুষের এরূপ মোহ ঘটিয়া থাকে।

শরৎ চন্দননগরের বাগানে আসিয়া বাস করিতেছেন, এবং কিরণও রোগমুক্ত হইয়াছেন, কেবল শরীর এখনও সম্পূর্ণ সবল হয় নাই। তাঁহার মুখে চক্ষে একটি সকরুণ কৃশতা অঙ্কিত হইয়া আছে, যাহা দেখিলে হৃৎকম্পসহ মনে উদয় হয়, আহা, বড় রক্ষা পাইয়াছে!

কিন্তু কিরণের স্বভাবটা সঙ্গপ্রিয়, আমোদপ্রিয়। এখানে একলা আর ভাল লাগিতেছে না; তাহার ঘরের কাজ নাই, পাড়ার সঙ্গিনী নাই; কেবল সমস্ত দিন আপনার রুগ্ন শরীরটাকে লইয়া নাড়াচাড়া করিতে মন যায় না। ঘণ্টায় ঘণ্টায় দাগ মাপিয়া ঔষধ খাও, তাপ দাও, পথ্য পালন কর, ইহাতে বিরক্তি ধরিয়া গিয়াছে; আজ ঝড়ের সন্ধ্যাবেলায় রুদ্ধগৃহে স্বামী স্ত্রীতে তাহাই লইয়া আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল।

কিরণ যতক্ষণ উত্তর দিতেছিল ততক্ষণ উভয় পক্ষে সমকক্ষ-ভাবে দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলিতেছিল, কিন্তু অবশেষে কিরণ যখন নিরুত্তর হইয়া বিনা প্রতিবাদে শরতের দিক হইতে ঈষৎ বিমুখ হইয়া ঘাড় বাঁকাইয়া বসিল, তখন দুর্ব্বল নিরুপায় পুরুষটির আর কোন অস্ত্র রহিল না। পরাভব স্বীকার করিবার উপক্রম করিতেছে,

এমন সময়ে বাহির হইতে বেহারা উচ্চৈঃস্বরে কি একটা নিবেদন করিল।

শরৎ উঠিয়া দ্বার খুলিয়া শুনিলেন, নৌকা ডুবি হইয়া একটি ব্রাহ্মণ বালক সাঁতার দিয়া তাঁহাদের বাগানে আসিয়া উঠিয়াছে।

শুনিয়া কিরণের মান অভিমান দূর হইয়া গেল, তৎক্ষণাৎ আলনা হইতে শুষ্ক বস্ত্র বাহির করিয়া দিলেন, এবং শীঘ্র এক বাটি দুধ গরম করিয়া ব্রাহ্মণের ছেলেকে অন্তঃপুরে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

ছেলেটির লম্বা চুল, বড় বড় চোখ, গোঁফের রেখা এখনো উঠে নাই। কিরণ তাহাকে নিজে থাকিয়া ভোজন করাইয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

শুনিলেন সে যাত্রার দলের ছোকরা; তাহার নাম নীলকান্ত। তাহারা নিকটবর্ত্তী সিংহ বাবুদের বাড়ি যাত্রার জন্য আহূত হইয়াছিল; ইতিমধ্যে নৌকা ডুবি হইয়া তাহাদের দলের লোকের কি গতি হইল কে জানে; সে ভাল সাঁতার জানিত, কোন মতে প্রাণরক্ষা করিয়াছে।

ছেলেটি এইখানেই রহিয়া গেল। আর একটু হইলেই সে মারা পড়িত, এই মনে করিয়া তাহার প্রতি কিরণের অত্যন্ত দয়ার উদ্রেক হইল।

শরৎ মনে করিলেন, হইল ভাল, কিরণ একটা নূতন কাজ হাতে পাইলেন, এখন কিছুকাল এইভাবেই কাটিয়া যাইবে। ব্রাহ্মণ বালকের কল্যাণে পুণ্যসঞ্চয়ের প্রত্যাশায়

শ্বাশুড়িও প্রসন্নতা লাভ করিলেন। এবং অধিকারী মহাশয় ও যমরাজের হাত হইতে সহসা এই ধনী পরিবারের হাতে বদ্‌লি হইয়া নীলকান্ত বিশেষ আরাম বোধ করিল।

কিন্তু অনতিবিলম্বে শরৎ এবং তাঁহার মাতার মত পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। তাঁহারা ভাবিলেন, আর আবশ্যক নাই, এখন এই ছেলেটাকে বিদায় করিতে পারিলে আপদ যায়।

নীলকান্ত গোপনে শরতের গুড়্‌গুড়িতে ফড়্‌ ফড়্‌ শব্দে তামাক টানিতে আরম্ভ করিল। বৃষ্টির দিনে অম্লানবদনে তাঁহার সখের সিল্কের ছাতাটি মাথায় দিয়া নববন্ধুসঞ্চয়চেষ্টায় পল্লীতে পর্য্যটন করিতে লাগিল। কোথাকার একটা মলিন গ্রাম্য কুক্কুরকে আদর দিয়া এমনি স্পর্দ্ধিত করিয়া তুলিল যে, সে অনাহূত শরতের সুসজ্জিত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নির্ম্মল জাজিমের উপর পদপল্লবচতুষ্টয়ের ধূলিরেখায় আপন শুভাগমন-সংবাদ স্থায়িভাবে মুদ্রিত করিয়া আসিতে লাগিল। নীলকান্তের চতুর্দ্দিকে দেখিতে দেখিতে একটি সুবৃহৎ ভক্তশিশুসম্প্রদায় গঠিত হইয়া উঠিল, এবং সে বৎসর গ্রামের আম্রকাননে কচি আম পাকিয়া উঠিবার অবসর পাইল না।

কিরণ এই ছেলেটিকে বড় বেশি আদর দিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। শরৎ এবং শরতের মা সে বিষয়ে তাঁহাকে অনেক নিষেধ করিতেন, কিন্তু তিনি তাহা মানিতেন না। শরতের পুরাতন জামা মোজা এবং নূতন ধূতি চাদর জুতা পরাইয়া তিনি তাহাকে বাবু সাজাইয়া তুলিলেন। মাঝে মাঝে যখন তখন

তাহাকে ডাকিয়া লইয়া তাঁহার স্নেহ এবং কৌতুক উভয়ই চরিতার্থ হইত। কিরণ সহাস্যমুখে পানের বাটা পাশে রাখিয়া খাটের উপর বসিতেন, দাসী তাঁহার ভিজে এলোচুল চিরিয়া চিরিয়া ঘষিয়া ঘষিয়া শুকাইয়া দিত এবং নীলকান্ত নীচে দাঁড়াইয়া হাত নাড়িয়া নলদময়ন্তীর পালা অভিনয় করিত—এইরূপে দীর্ঘ মধ্যাহ্ন অত্যন্ত শীঘ্র কাটিয়া যাইত। কিরণ শরৎকে তাঁহার সহিত একাসনে দর্শকশ্রেণীভুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু শরৎ অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন এবং শরতের সম্মুখে নীলকান্তের সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি পাইত না। শ্বাশুড়ি এক একদিন ঠাকুর-দেবতার নাম শুনিবার আশায় আকৃষ্ট হইয়া আসিতেন কিন্তু অবিলম্বে তাঁহার চিরাভ্যস্ত মধ্যাহ্নকালীন নিদ্রাবেশ ভক্তিকে অভিভূত এবং তাঁহাকে শয্যাশায়ী করিয়া দিত।

শরতের কাছ হইতে কানমলা চড়টা চাপড়টা নীলকান্তের অদৃষ্টে প্রায়ই জুটিত; কিন্তু তদপেক্ষা কঠিনতর শাসনপ্রণালীতে আজন্ম অভ্যস্ত থাকাতে সেটা তাহার নিকট অপমান বা বেদনা-জনক বোধ হইত না। নীলকান্তের দৃঢ় ধারণা ছিল যে পৃথিবীর জল স্থল বিভাগের ন্যায় মানবজন্মটা আহার এবং প্রহারে বিভক্ত; প্রহারের অংশটাই অধিক।

নীলকান্তের ঠিক কত বয়স নির্ণয় করিয়া বলা কঠিন; যদি চোদ্দ পনেরো হয়, তবে বয়সের অপেক্ষা মুখ অনেক পাকিয়াছে বলিতে হইবে; যদি সতেরো আঠোরো হয়, তবে বয়সের অনুরূপ পাক ধরে নাই। হয় সে অকাল পক্ক, নয় সে অকাল-অপক্ক।

আসল কথা এই, সে অতি অল্প বয়সেই যাত্রার দলে ঢুকিয়া রাধিকা, দময়ন্তী, সীতা এবং বিদ্যার সখী সাজিত। অধিকারীর আবশ্যকমত বিধাতার বরে খানিক দূর পর্য্যন্ত বাড়িয়া তাহার বাড় থামিয়া গেল। তাহাকে সকলে ছোটই দেখিত, আপনাকেও সে ছোটই জ্ঞান করিত, বয়সের উপযুক্ত সন্মান সে কাহারও কাছে পাইত না। এই সকল স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক কারণ প্রভাবে সতেরো বৎসর বয়সের সময় তাহাকে অনতিপক্ক, সতেরোর অপেক্ষা অতিপরিপক্ক চোদ্দর মত দেখাইত। গোঁফের রেখা না উঠাতে এই ভ্রম আরো দৃঢ়মূল হইয়াছিল। তামাকের ধোঁয়া লাগিয়াই হৌক বা বয়সানুচিত ভাষা প্রয়োগবশতই হৌক, নীলকান্তের ঠোঁটের কাছটা কিছু বেশি পাকা বোধ হইত, কিন্তু তাহার বৃহৎ তারাবিশিষ্ট দুইটি চক্ষের মধ্যে একটা সারল্য এবং তারুণ্য ছিল। অনুমান করি, নীলকান্তের ভিতরটা স্বভাবতঃ কাঁচা, কিন্তু যাত্রার দলের তা' লাগিয়া উপরিভাগে পক্কতার লক্ষণ দেখা দিয়াছে।

শরৎ বাবুর আশ্রয়ে চন্দননগরের বাগানে বাস করিতে করিতে নীলকান্তের উপর স্বভাবের নিয়ম অব্যাহতভাবে আপন কাজ করিতে লাগিল। সে এতদিন যে একটা বয়ঃসন্ধিস্থলে অস্বাভাবিকভাবে দীর্ঘকাল থামিয়া ছিল, এখানে আসিয়া সেটা কখন এক সময় নিঃশব্দে পার হইয়া গেল। তাহার সতেরো আঠারো বৎসরের বয়ঃক্রম বেশ সম্পূর্ণভাবে পরিণত হইয়া উঠিল।

তাহার সে পরিবর্ত্তন বাহির হইতে কাহারও চোখে পড়িল না, কিন্তু তাহার প্রথম লক্ষণ এই, যে, যখন কিরণ নীলকান্তের প্রতি বালকযোগ্য ব্যবহার করিতেন সে মনে মনে লজ্জিত এবং ব্যথিত হইত। একদিন আমোদপ্রিয় কিরণ তাহাকে স্ত্রীবেশে সখী সাজিবার কথা বলিয়াছিলেন, সে কথাটা অকস্মাৎ তাহার বড়ই কষ্টদায়ক লাগিল অথচ তাহার উপযুক্ত কারণ খুঁজিয়া পাইল না। আজকাল তাহাকে যাত্রার অনুকরণ করিতে ডাকিলে সে অদৃশ্য হইয়া যাইত। সে যে একটা লক্ষ্মীছাড়া যাত্রার দলের ছোকরার অপেক্ষা অধিক কিছু নয় এ কথা কিছুতে তাহার মনে লইত না।

এমন কি, সে বাড়ির সরকারের নিকট কিছু কিছু করিয়া লেখাপড়া করিবার সংকল্প করিল। কিন্তু বৌঠাকরুণের স্নেহ-ভাজন বলিয়া নীলকান্তকে সরকার দুই চক্ষে দেখিতে পারিত না—এবং মনের একাগ্রতা রক্ষা করিয়া পড়াশুনো কোন কালে অভ্যাস না থাকাতে অক্ষরগুলো তাহার চোখের সাম্‌নে দিয়া ভাসিয়া যাইত। গঙ্গার ধারে চাঁপাতলায় গাছের গুঁড়িতে ঠেসান দিয়া কোলের উপর বই খুলিয়া সে দীর্ঘকাল বসিয়া থাকিত; জল ছল ছল করিত, নৌকা ভাসিয়া যাইত, শাখার উপরে চঞ্চল অন্যমনস্ক পাখী কিচ্‌মিচ্‌ শব্দে স্বগত উক্তি প্রকাশ করিত, নীলকান্ত বইয়ের পাতায় চক্ষু রাখিয়া কি ভাবিত সেই জানে অথবা সেও জানে না। একটা কথা হইতে কিছুতেই আর একটা কথায় গিয়া পেঁাছিতে পারিত না, অথচ, বই

পড়িতেছি মনে করিয়া তাহার ভারি একটা আত্মগৌরব উপস্থিত হইত। সামে দিয়া যখন একটা নৌকা যাইত তখন সে আরও অধিক আড়ম্বরের সহিত বইখানা তুলিয়া লইয়া বিড় বিড় করিয়া পড়ার ভাণ করিত; দর্শক চলিয়া গেলে সে আর পড়ার উৎসাহ রক্ষা করিতে পারিত না।

পূর্ব্বে সে অভ্যস্ত গানগুলো যন্ত্রের মত যথানিয়মে গাহিয়া যাইত, এখন সেই গানের সুরগুলো তাহার মনে এক অপূর্ব্ব চাঞ্চল্য সঞ্চার করে। গানের কথা অতি যৎসামান্য, তুচ্ছ অনুপ্রাসে পরিপূর্ণ, তাহার অর্থও নীলকান্তের নিকট সম্যক্ বোধগম্য নহে, কিন্তু যখন সে গাহিত—

ওরে রাজহংস, জন্মি দ্বিজবংশে,
এমন নৃশংস কেন হলি রে,—
বল্ কি জন্যে, এ অরণ্যে,
রাজকন্যার প্রাণসংশয় করিলি রে,—

তখন সে যেন সহসা লোকান্তরে জন্মান্তরে উপনীত হইত—তখন চারিদিকের অভ্যস্ত জগৎটা এবং তাহার তুচ্ছ জীবনটা গানে তর্জ্জমা হইয়া নূতন চেহারা ধারণ করিত। রাজহংস এবং রাজকন্যার কথা হইতে তাহার মনে এক অপরূপ ছবির আভাস জাগিয়া উঠিত, সে আপনাকে কি মনে করিত স্পষ্ট করিয়া বলা যায় না, কিন্তু যাত্রার দলের পিতৃমাতৃহীন ছোকরা বলিয়া ভুলিয়া যাইত। নিতান্ত অকিঞ্চনের ঘরের হতভাগ্য মলিন শিশু যখন সন্ধ্যাশয্যায় শুইয়া, রাজপুত্র, রাজকন্যা এবং সাত রাজার ধন

মাণিকের কথা শোনে, তখন সেই ক্ষীণ দীপালোকিত জীর্ণ গৃহকোণের অন্ধকারে তাহার মনটা সমস্ত দারিদ্র্য ও হীনতার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া এক সর্ব্বসম্ভব রূপকথার রাজ্যে একটা নূতন রূপ, উজ্জ্বল বেশ এবং অপ্রতিহত ক্ষমতা ধারণ করে; সেইরূপ গানের সুরের মধ্যে এই যাত্রার দলের ছেলেটি আপনাকে এবং আপনার জগৎটিকে একটি নবীন আকারে সৃজন করিয়া তুলিত; জলের ধ্বনি, পাতার শব্দ, পাখীর ডাক, এবং যে লক্ষ্মী এই লক্ষ্মীছাড়াকে আশ্রয় দিয়াছেন, তাঁহার সহাস্য স্নেহমুখচ্ছবি, তাঁহার কল্যাণমণ্ডিত বলয়বেষ্টিত বাহু দুইখানি এবং দুর্লভ সুন্দর পুষ্পদল-কোমল রক্তিম চরণযুগল কি এক মায়ামন্ত্রবলে রাগিণীর মধ্যে রূপান্তরিত হইয়া যাইত। আবার এক সময় এই গীতি-মরীচিকা কোথায় অপসারিত হইত, যাত্রার দলের নীলকান্ত ঝাঁকড়া চুল লইয়া প্রকাশ পাইত, আমবাগানের অধ্যক্ষ প্রতিবেশীর অভিযোগক্রমে শরৎ আসিয়া তাহার গালে ঠাস্ ঠাস্ করিয়া চড় কসাইয়া দিতেন, এবং বালক ভক্তমণ্ডলীর অধিনায়ক হইয়া নীলকান্ত জলে স্থলে এবং তরুশাখাগ্রে নব নব উপদ্রব সৃজন করিতে বাহির হইত।

ইতিমধ্যে শরতের ভাই সতীশ কলিকাতা কলেজের ছুটিতে বাগানে আসিয়া আশ্রয় লইল। কিরণ ভারি খুসি হইলেন, তাঁহার হাতে আর একটি কাজ জুটিল; উপবেশনে আহারে আচ্ছাদনে সমবয়স্ক ঠাকুরপোর প্রতি পরিহাসপাশ বিস্তার করিতে লাগিলেন। কখনও হাতে সিঁদুর মাখিয়া তাহার চোখ টিপিয়া

ধরেন, কখনো তাহার জামার পিঠে বাঁদর লিখিয়া রাখেন, কখনো ঝনাৎ করিয়া বাহির হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া সুললিত উচ্চহাস্যে পলায়ন করেন। সতীশও ছাড়িবার পাত্র নহে; সে তাঁহার :চাবি :চুরি করিয়া, তাঁহার পানের মধ্যে লঙ্কা পূরিয়া, অলক্ষিতে খাটের খুরার সহিত তাঁহার আঁচল বাঁধিয়া প্রতিশোধ তুলিতে থাকে। এইরূপে উভয়ে সমস্ত দিন তর্জ্জন ধাবন হাস্য, এমন কি, মাঝে মাঝে কলহ ক্রন্দন, সাধাসাধি এবং পুনরায় শান্তিস্থাপন চলিতে লাগিল।

নীলকান্তকে কি ভূতে পাইল কে জানে! সে কি উপলক্ষ করিয়া কাহার সহিত বিবাদ করিবে ভাবিয়া পায় না, অথচ ত'হার মন তীব্র তিক্তরসে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সে তাহার ভক্ত বালকগুলিকে অন্যায়রূপে কাঁদাইতে লাগিল, তাহার সেই পোষা দিশী কুকুরটাকে অকারণে লাথি মারিয়া কেঁই কেঁই শব্দে নভোমণ্ডল ধ্বনিত করিয়া তুলিল, এমন কি, পথে ভ্রমণের সময় সবেগে ছড়ি মারিয়া আগাছাগুলার শাখাচ্ছেদন করিয়া চলিতে লাগিল।

যাহারা ভাল খাইতে পারে, তাহাদিগকে সম্মুখে বসিয়া খাওয়াইতে কিরণ অত্যন্ত ভালবাসেন। ভাল খাইবার ক্ষমতাটা নালকান্তের ছিল, সুখাদ্য দ্রব্য পুনঃ পুনঃ খাইবার অনুরোধ তাহার নিকট কদাচ ব্যর্থ হইত না। এই জন্য কিরণ প্রায় তাহাকে ডাকিয়া লইয়া নিজে থাকিয়া খাওয়াইতেন, এবং এই ব্রাহ্মণ বালকের তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার দেখিয়া তিনি বিশেষ সুখ

অনুভব করিতেন। সতীশ আসার পরে অনবসরবশতঃ নীলকান্তের আহারস্থলে প্রায় মাঝে মাঝে কিরণকে অনুপস্থিত থাকিতে হইত; পূর্ব্বে এরূপ ঘটনায় তাহার ভোজনের কিছুমাত্র ব্যাঘাত হইত না; সে সর্ব্বশেষে দুধের বাটি ধুইয়া তাহার জলশুদ্ধ খাইয়া তবে উঠিত,—কিন্তু আজকাল কিরণ নিজে ডাকিয়া না খাওয়াইলে তাহার বক্ষ ব্যথিত, তাহার মুখ বিস্বাদ হইয়া উঠিত, না খাইয়া উঠিয়া পড়িত; বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে দাসীকে বলিয়া যাইত, আমার ক্ষুধা নাই। মনে করিত, কিরণ সংবাদ পাইয়া এখনি অনুতপ্তচিত্তে তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইবেন, এবং খাইবার জন্য বারম্বার অনুরোধ করিবেন, সে তথাপি কিছুতেই সে অনুরোধ পালন করিবে না, বলিবে,—আমার ক্ষুধা নাই। কিন্তু কিরণকে কেহ সংবাদও দেয় না, কিরণ তাহাকে ডাকিয়াও পাঠান না; খাবার যাহা থাকে দাসী খাইয়া ফেলে। তখন সে আপন শয়নগৃহের প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া অন্ধকার বিছানার উপর পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া ফাঁপিয়া ফাঁপিয়া মুখের উপর সবলে বালিশ চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিতে থাকে; কিন্তু কি তাহার নালিশ, কাহার উপরে তাহার দাবী, কে তাহাকে সান্ত্বনা করিতে আসিবে! যখন কেহই আসে না, তখন স্নেহময়ী বিশ্বধাত্রী নিদ্রা আসিয়া ধীরে ধীরে কোমল করস্পর্শে এই মাতৃহীন ব্যথিত বালকের অভিমান শান্ত করিয়া দেন।

নীলকান্তের দৃঢ় ধারণা হইল সতীশ কিরণের কাছে তাহার নামে সর্ব্বদাই লাগায়; যে দিন কিরণ কোন কারণে গম্ভীর

হইয়া থাকিতেন সে দিন নীলকান্ত মনে করিত, সতীশের চক্রান্তে কিরণ তাহারই উপর রাগ করিয়া আছেন।

এখন হইতে নীলকান্ত একমনে তীব্র আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সর্ব্বদাই দেবতার নিকট প্রার্থনা করে, আর জন্মে আমি যেন সতীশ হই, এবং সতীশ যেন আমি হয়। সে জানিত ব্রাহ্মণের একান্ত মনের অভিশাপ কখন নিষ্ফল হয় না; এই জন্য সে মনে মনে সতীশকে ব্রহ্মতেজে দগ্ধ করিতে গিয়া নিজে দগ্ধ হইতে থাকিত, এবং উপরের তলা হইতে সতীশ ও তাহার বৌঠাকুরাণীর উচ্ছ্বসিত উচ্চহাস্যমিশ্রিত পরিহাসকলরব শুনিতে পাইত।

নীলকান্ত স্পষ্টতঃ সতীশের কোনরূপ শত্রুতা করিতে সাহস করিত না, কিন্তু সুযোগমত তাহার ছোটখাট অসুবিধা ঘটাইয়া প্রীতিলাভ করিত। ঘাটের সোপানে সাবান রাখিয়া সতীশ যখন গঙ্গায় নামিয়া ডুব দিতে আরম্ভ করিত, তখন নীলকান্ত ফস্ করিয়া আসিয়া সাবান চুরি করিয়া লইত—সতীশ যথাকালে সাবানের সন্ধানে আসিয়া দেখিত, সাবান নাই। একদিন নাহিতে নাহিতে হঠাৎ দেখিল তাহার বিশেষ সখের চিকণের কাজ করা জামাটি গঙ্গার জলে ভাসিয়া যাইতেছে, ভাবিল হাওয়ায় উড়িয়া গেছে, কিন্তু হাওয়াটা কোন্‌দিক্ হইতে বহিল তাহা কেহ জানে না।

একদিন সতীশকে আমোদ দিবার জন্য কিরণ নীলকান্তকে ডাকিয়া তাহাকে যাত্রার গান গাহিতে বলিলেন—নীলকান্ত নিরুত্তর হইয়া রহিল। কিরণ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন

তোর আবার কি হলরে? নীলকান্ত তাহার জবাব দিল না। কিরণ পুনশ্চ বলিলেন, সেই গানটা গা না!—সে আমি ভুলে গেছি বলিয়া নীলকান্ত চলিয়া গেল।

অবশেষে কিরণের দেশে ফিরিবার সময় হইল। সকলেই প্রস্তুত হইতে লাগিল;—সতীশও সঙ্গে যাইবে। কিন্তু নীলকান্তকে কেহ কোন কথাই বলে না। সে সঙ্গে যাইবে কি থাকিবে সে প্রশ্নমাত্র কাহারও মনে উদয় হয় না।

কিরণ নীলকান্তকে সঙ্গে লইবার প্রস্তাব করিলেন। তাহাতে শাশুড়ি স্বামী এবং দেবর সকলেই একবাক্যে আপত্তি করিয়া উঠিলেন, কিরণও তাঁহার সংকল্প ত্যাগ করিলেন। অবশেষে যাত্রার দুই দিন আগে ব্রাহ্মণ বালককে ডাকিয়া কিরণ তাহাকে স্নেহবাক্যে স্বদেশে যাইতে উপদেশ করিলেন।

সে উপরি উপরি কয় দিন অবহেলার পর মিষ্টবাক্য শুনিতে পাইয়া আর থাকিতে পারিল না, একেবারে কাঁদিয়া উঠিল। কিরণেরও চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল;—যাহাকে চিরকাল কাছে রাখা যাইবে না, তাহাকে কিছুদিন আদর দিয়া তাহার মায়া বসিতে দেওয়া ভাল হয় নাই বলিয়া কিরণের মনে বড় অনুতাপ উপস্থিত হইল।

সতীশ কাছে উপস্থিত ছিল, সে অতবড় ছেলের কান্না দেখিয়া ভারি বিরক্ত হইয়া উঠিল—আরে মোলো! কথা নাই বার্তা নাই, একেবারে কাঁদিয়াই অস্থির!—

কিরণ এই কঠোর উক্তির জন্য সতীশকে ভৎর্সনা করিলেন;

সতীশ কহিল, "তুমি বোঝ না বৌদিদি, তুমি সকলকেই বড় বেশি বিশ্বাস কর; কোথাকার কে তার ঠিক নাই, এখানে আসিয়া দিব্য রাজার হালে আছে। আবার পুনর্মূষিক হইবার আশঙ্কায় আজ মায়া-কান্না জুড়িয়াছে—ও বেশ জানে যে দু ফোঁটা চখের জল ফেলিলেই তুমি গলিয়া যাইবে।"

নীলকান্ত তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল;—কিন্তু তাহার মনটা সতীশের কাল্পনিক মূর্ত্তিকে ছুরি হইয়া কাটিতে লাগিল, ছুঁচ হইয়া বিঁধিতে লাগিল, আগুন হইয়া জ্বালাইতে লাগিল, কিন্তু প্রকৃত সতীশের গায়ে একটি চিহ্নমাত্র বসিল না, কেবল তাহারই মর্ম্মস্থল হইতে রক্তপাত হইতে লাগিল।

কলিকাতা হইতে সতীশ একটা সৌখীন দোয়াতদান কিনিয়া আনিয়াছিল, তাহাতে দুই পাশে দুই ঝিনুকের নৌকার উপর দোয়াত বসান, এবং মাঝে একটা জর্ম্মন্ রৌপ্যের হাঁস উন্মুক্ত চঞ্চুপুটে কলম লইয়া পাখা মেলিয়া বসিয়া আছে, সেটির প্রতি সতীশের অত্যন্ত যত্ন ছিল; প্রায় সে মাঝে মাঝে সিল্কের রুমাল দিয়া অতি সযত্নে সেটি ঝাড়পোঁচ করিত। কিরণ প্রায়ই পরিহাস করিয়া সেই রৌপ্যহংসের চঞ্চু-অগ্রভাগে অঙ্গুলির আঘাত করিয়া বলিতেন, "ওরে রাজহংস, জন্মি দ্বিজবংশে এমন নৃশংস কেন হলি রে"—এবং ইহাই উপলক্ষ করিয়া দেবরে তাঁহাতে হাস্যকৌতুকের বাগ্‌যুদ্ধ চলিত।

স্বদেশযাত্রার আগের দিন সকালবেলায় সে জিনিষটা খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। কিরণ হাসিয়া কহিলেন,

"ঠাকুরপো, তোমার রাজহংস তোমার দময়ন্তীর অন্বেষণে উড়িয়াছে।"

কিন্তু সতীশ অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিল! নীলকান্তই যে সেটা চুরি করিয়াছে সে বিষয়ে তাহার সন্দেহ মাত্র রহিল না—গতকল্য সন্ধ্যার সময় তাহাকে সতীশের ঘরের কাছে ঘুর ঘুর করিতে দেখিয়াছে এমন সাক্ষীও পাওয়া গেল।

সতীশের সম্মুখে অপরাধী আনীত হইল। সেখানে কিরণও উপস্থিত ছিলেন। সতীশ একেবারেই তাহাকে বলিয়া উঠিলেন, "তুই আমার দোয়াত চুরি করে' কোথায় রেখেছিস্, এনে দে!"

নীলকান্ত নানা অপরাধে এবং বিনা অপরাধেও শরতের কাছে অনেক মার খাইয়াছে, এবং বরাবর প্রফুল্লচিত্তে তাহা বহন করিয়াছে। কিন্তু কিরণের সম্মুখে যখন তাহার নামে দোয়াৎ চুরির অপবাদ আসিল, তখন তার বড় বড় দুই চোখ আগুনের মত জ্বলিতে লাগিল; তাহার বুকের কাছটা ফুলিয়া কণ্ঠের কাছে ঠেলিয়া উঠিল; সতীশ আর একটা কথা বলিলেই সে তাহার দুই হাতের দশ নখ লইয়া ক্রুদ্ধ বিড়ালশাবকের মত সতীশের উপর গিয়া পড়িত।

তখন কিরণ তাহাকে পাশের ঘরে ডাকিয়া লইয়া মৃদুমিষ্ট স্বরে বলিলেন—"নীলু, যদি সেই দোয়াৎটা নিয়ে থাকিস্, আমাকে আস্তে আস্তে দিয়ে যা, তোকে কেউ কিছু বল্‌বে না!"

নীলকান্তের চোখ ফাটিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল, অবশেষে সে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল।

কিরণ বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "নীলকান্ত কখনই চুরি করে নি।"

শরৎ এবং সতীশ উভয়েই বলিতে লাগিলেন, "নিশ্চয়, নীলকান্ত ছাড়া আর কেহই চুরি করে নি।"

কিরণ সবলে বলিলেন, "কখনই না।"

শরৎ নীলকান্তকে ডাকিয়া সওয়াল করিতে ইচ্ছা করিলেন, কিরণ বলিলেন, "না, উহাকে এই চুরি সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিবে না।"

সতীশ কহিলেন, "উহার ঘর এবং বাক্স খুঁজিয়া দেখা উচিত।"

কিরণ বলিলেন, "তাহা যদি কর, তাহা হইলে তোমার সঙ্গে আমার জন্মশোধ আড়ি হইবে। নির্দ্দোষীর প্রতি কোনরূপ সন্দেহ প্রকাশ করিতে পাইবে না।"

বলিতে বলিতে তাঁহার চোখের পাতা দুই ফোঁটা জলে ভিজিয়া উঠিল। তাহার পর সেই দুটি করুণ চক্ষুর অশ্রুজলের দোহাই মানিয়া নীলকান্তের প্রতি আর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হইল না!

নিরীহ আশ্রিত বালকের প্রতি এইরূপ অত্যাচারে কিরণের মনে অত্যন্ত দয়ার সঞ্চার হইল। তিনি ভাল দুই জোড়া ফরাসডাঙ্গার ধুতি চাদর, দুইটি জামা, এক জোড়া নূতন জুতা এবং একখানি দশ টাকার নোট লইয়া সন্ধ্যাবেলায় নীলকান্তের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, নীলকান্তকে

না বলিয়া সেই স্নেহ-উপহারগুলি আস্তে আস্তে তাহার বাক্সর মধ্যে রাখিয়া আসিবেন। টিনের বাক্সটিও তাঁহার দত্ত।

আঁচল হইতে চাবির গোছা লইয়া নিঃশব্দে সেই বাক্স খুলিলেন। কিন্তু তাঁহার উপহারগুলি ধরাইতে পারিলেন না। বাক্সর মধ্যে লাঠাই, কঞ্চি, কাঁচা আম কাটিবার জন্য ঘষা ঝিনুক, ভাঙ্গা গ্লাসের তলা প্রভৃতি জাতীয় পদার্থ স্তূপাকারে রক্ষিত।

কিরণ ভাবিলেন, বাক্সটি ভাল করিয়া গুছাইয়া তাহার মধ্যে সকল জিনিষ ধরাইতে পারিবেন। সেই উদ্দেশে বাক্সটি খালি করিতে লাগিলেন। প্রথমে লাঠাই, লাঠিম, ছুরি, ছড়ি প্রভৃতি বাহির হইতে লাগিল—তাহার পরে খান কয়েক ময়লা এবং কাচা কাপড় বাহির হইল, তাহার পরে সকলের নীচে হঠাৎ সতীশের সেই বহুযত্নের রাজহংসশোভিত দোয়াতদানটি বাহির হইয়া আসিল।

কিরণ আশ্চর্য্য হইয়া আরক্তিমমুখে অনেকক্ষণ সেটি হাতে করিয়া লইয়া ভাবিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে কখন্ নীলকান্ত পশ্চাৎ হইতে ঘরে প্রবেশ করিল তিনি তাহা জানিতেও পারিলেন না। নীলকান্ত সমস্তই দেখিল, মনে করিল স্বয়ং চোরের মত তাহার চুরি ধরিতে আসিয়াছেন, এবং তাহার চুরিও ধরা পড়িয়াছে। সে যে সামান্য চোরের মত লোভে পড়িয়া চুরি করে নাই, সে যে কেবল প্রতিহিংসাসাধনের

জন্য এ কাজ করিয়াছে, সে যে ঐ জিনিষটা গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিবে বলিয়াই ঠিক করিয়াছিল, কেবল এক মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতাবশতঃ ফেলিয়া না দিয়া নিজের বাক্সের মধ্যে পুরিয়াছে, সে সকল কথা সে কেমন করিয়া বুঝাইবে! সে চোর নয়, সে চোর নয়! তবে সে কি? কেমন করিয়া বলিবে সে কি! সে চুরি করিয়াছে কিন্তু সে চোর নহে; কিরণ যে তাহাকে চোর বলিয়া সন্দেহ করিয়াছেন এ নিষ্ঠুর অন্যায় সে কিছুতেই বুঝাইতে পারিবে না, বহন করিতেও পারিবে না।

কিরণ একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সেই দোয়াতদানটা বাক্সর ভিতরে রাখিলেন। চোরের মত তাহার উপরে ময়লা কাপড় চাপা দিলেন, তাহার উপর বালকের লাঠাই, লাঠি, লাঠিম, ঝিনুক, কাঁচের টুকরা প্রভৃতি সমস্তই রাখিলেন, এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার উপহারগুলি ও দশ টাকার নোটটি সাজাইয়া রাখিলেন।

কিন্তু পরের দিন সেই ব্রাহ্মণ বালকের কোন উদ্দেশ পাওয়া গেল না। গ্রামের লোকেরা বলিল, তাহাকে দেখে নাই; পুলিস বলিল, তাহার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। তখন শরৎ বলিল, এইবার নীলকণ্ঠের বাক্সটা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক্।

কিরণ জেদ্ করিয়া বলিলেন, সে কিছুতেই হইবে না।

বলিয়া বাক্সটি আপন ঘরে আনাইয়া দোয়াৎটি বাহির করিয়া গোপনে গঙ্গার জলে ফেলিয়া আসিলেন।

শরৎ সপরিবারে দেশে চলিয়া গেল ; বাগান একদিন শূন্য হইয়া গেল ; কেবল নীলকান্তের সেই পোষা গ্রাম্য কুকুরটা আহার ত্যাগ করিয়া নদীর ধারে ধারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া খুঁজিয়া খুঁজিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিল।

সম্পাদক।

আমার স্ত্রী বর্ত্তমানে প্রভা সম্বন্ধে আমার কোন চিন্তা ছিল না। তখন প্রভা অপেক্ষা প্রভার মাতাকে লইয়া কিছু অধিক ব্যস্ত ছিলাম।

তখন কেবল প্রভার খেলাটুকু হাসিটুকু দেখিয়া তাহার আধ আধ কথা শুনিয়া এবং আদরটুকু লইয়াই তৃপ্ত থাকিতাম; যতক্ষণ ভাল লাগিত নাড়াচাড়া করিতাম, কান্না আরম্ভ করিলেই তাহার মার কোলে সমর্পণ করিয়া সত্বর অব্যাহতি লইতাম। তাহাকে যে বহু চিন্তা ও চেষ্টায় মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে, এ কথা আমার মনে আসে নাই।

অবশেষে অকালে আমার স্ত্রীর মৃত্যু হইলে এক দিন মায়ের কোল হইতে খসিয়া মেয়েটি আমার কোলের কাছে আসিয়া পড়িল, তাহাকে বুকে টানিয়া লইলাম।

কিন্তু মাতৃহীনা দুহিতাকে দ্বিগুণ স্নেহে পালন করা আমার কর্ত্তব্য এটা আমি বেশি চিন্তা করিয়াছিলাম, না, পত্নীহীন পিতাকে পরম যত্নে রক্ষা করা তাহার কর্ত্তব্য এইটে সে বেশি অনুভব করিয়াছিল, আমি ঠিক বুঝিতে পারি না; কিন্তু ছয় বৎসর বয়স হইতেই সে গিন্নিপনা আরম্ভ করিয়াছিল। বেশ দেখা গেল, ঐটুকু মেয়ে তাহার বাবার একমাত্র অভিভাবক হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

আমি মনে মনে হাসিয়া তাহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিলাম। দেখিলাম, যতই আমি অকর্ম্মণ্য অসহায় হই ততই তাহার লাগে ভাল ; দেখিলাম, আমি নিজে কাপড়টা ছাতাটা পাড়িয়া লইলে সে এমন ভাব ধারণ করে, যেন তাহার অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হইতেছে। বাবার মত এত বড় পুতুল সে ইতিপূর্ব্বে কখনো পায় নাই, এইজন্য বাবাকে খাওয়াইয়া পরাইয়া বিছানায় শুয়াইয়া সে সমস্ত দিন বড় আনন্দে আছে। কেবল ধারাপাত এবং পদ্য-পাঠ প্রথম ভাগ অধ্যাপনের সময় আমার পিতৃত্বকে কিঞ্চিৎ সচেতন করিয়া তুলিতে হইত।

কিন্তু মাঝে মাঝে ভাবনা হইত মেয়েটিকে সৎপাত্রে বিবাহ দিতে হইলে অনেক অর্থের আবশ্যক—আমার এত টাকা কোথায় ? মেয়েকে ত সাধ্যমত লেখাপড়া শিখাইতেছি কিন্তু একটা পরিপূর্ণ মূর্খের হাতে পড়িলে তাহার কি দশা হইবে ?

উপার্জ্জনে মন দেওয়া গেল। গবর্ণমেণ্ট আফিসে চাকরি করিবার বয়স গেছে, অন্য আপিসে প্রবেশ করিবারও ক্ষমতা নাই ! অনেক ভাবিয়া বই লিখিতে লাগিলাম।

বাঁশের নল ফুটা করিলে তাহাতে তেল রাখা যায় না, জল রাখা যায় না, তাহার ধারণশক্তি মূলেই থাকে না ; তাহাতে সংসারের কোন কাজই হয় না, কিন্তু ফুঁ দিলে বিনা খরচে বাঁশি বাজে ভাল। আমি স্থির জানিতাম সংসারের কোন কাজেই যে হতভাগ্যের বুদ্ধি খেলে না, সে নিশ্চয়ই ভাল বই লিখিবে।

সেই সাহসে একখান প্রহসন লিখিলাম, লোকে ভাল বলিল এবং রঙ্গভূমিতে অভিনয় হইয়া গেল।

সহসা যশের আস্বাদ পাইয়া এম্‌নি বিপদ হইল, প্রহসন আর কিছুতেই ছাড়িতে পারি না। সমস্ত দিন ব্যাকুল চিন্তান্বিত মুখে প্রহসন লিখিতে লাগিলাম।

প্রভা আসিয়া আদর করিয়া স্নেহসহাস্যে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, নাইতে যাবে না?"

আমি হুঙ্কার দিয়া উঠিলাম, "এখন যা, এখন যা, এখন বিরক্ত করিস্‌নে!"

বালিকার মুখখানি বোধ করি একটি ফুৎকারে নির্ব্বাপিত প্রদীপের মত অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল; কখন্ সে অভিমান-বিস্ফারিত হৃদয়ে নীরবে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, আমি জানিতেও পারি নাই।

দাসীকে তাড়াইয়া দিই, চাকরকে মারিতে যাই, ভিক্ষুক সুর করিয়া ভিক্ষা করিতে আসিলে তাহাকে লাঠি লইয়া তাড়া করি। পথপার্শ্বেই আমার ঘর হওয়াতে যখন কোন নিরীহ পান্থ জানালার বাহির হইতে আমাকে পথ জিজ্ঞাসা করে, আমি তাহাকে জাহান্নম নামক একটা অস্থানে যাইতে অনুরোধ করি। হায়, কেহই বুঝিত না, আমি খুব একটা মজার প্রহসন লিখিতেছি!

কিন্তু যতটা মজা এবং যতটা যশ হইতেছিল সে পরিমাণে টাকা কিছুই হয় নাই। তখন টাকার কথা মনেও ছিল না।

এদিকে প্রভার যোগ্য পাত্রগুলি অন্য ভদ্রলোকদের কন্যাদায় মোচন করিবার জন্য গোকুলে বাড়িতে লাগিল, আমার তাহাতে খেয়াল ছিল না।

পেটের জ্বালা না ধরিলে চৈতন্য হইত না, কিন্তু এমন সময় একটা সুযোগ জুটিয়া গেল। জাহিরগ্রামের এক জমিদার একখানি কাগজ বাহির করিয়া আমাকে তাহার বেতনভোগী সম্পাদক হইবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছেন। কাজটা স্বীকার করিলাম।

দিনকতক এম্‌নি প্রতাপের সহিত লিখিতে লাগিলাম যে, পথে বাহির হইলে লোকে আমাকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইত এবং আপনাকে মধ্যাহ্নতপনের মত দুর্নিরীক্ষ্য বলিয়া বোধ হইত।

জাহিরগ্রামের পার্শ্বে আহিরগ্রাম। দুই গ্রামের জমিদারে ভারি দলাদলি। পূর্ব্বে কথায় কথায় লাঠালাঠি হইত। এখন উভয় পক্ষে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট মুচ্‌লেকা দিয়া লাঠি বন্ধ করিয়াছে এবং কৃষ্ণের জীব আমাকে পূর্ব্ববর্ত্তী খুনী লাঠিয়ালদের স্থানে নিযুক্ত করিয়াছে। সকলেই বলিতেছে আমি পদমর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছি।

আমার লেখার জ্বালায় আহিরগ্রাম আর মাথা তুলিতে পারে না। তাহাদের জাতিকুল পূর্ব্বপুরুষের ইতিহাস সমস্ত আদ্যোপান্ত মসীলিপ্ত করিয়া দিয়াছি।

এই সময়টা ছিলাম ভাল। বেশ মোটাসোটা হইয়া উঠিলাম।

মুখ সর্ব্বদা প্রসন্ন হাস্যময় ছিল। আহিরগ্রামের পিতৃপুরুষদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এক একটা মর্ম্মান্তিক বাক্যশেল ছাড়িতাম; আর সমস্ত জাহিরগ্রাম হাসিতে হাসিতে পাকা ফুটির মত বিদীর্ণ হইয়া যাইত। বড় আনন্দে ছিলাম।

অবশেষে আহিরগ্রামও একখানা কাগজ বাহির করিল। সে কোন কথা ঢাকিয়া বলিত না। এমনি উৎসাহের সহিত অবিমিশ্র প্রচলিত ভাষায় গাল পাড়িত যে, ছাপার অক্ষরগুলা পর্য্যন্ত যেন চক্ষের সমক্ষে চীৎকার করিতে থাকিত। এই জন্য দুই গ্রামের লোকেই তাহার কথা খুব স্পষ্ট বুঝিতে পারিত।

কিন্তু আমি চিরাভ্যাসবশত এমনি মজা করিয়া এত কূট-কৌশল সহকারে বিপক্ষদিগকে আক্রমণ করিতাম যে, শত্রু মিত্র কেহই বুঝিতে পারিত না আমার কথার মর্ম্মটা কি।

তাহার ফল হইল এই, জিৎ হইলেও সকলে মনে করিত আমার হার হইল। দায়ে পড়িয়া সুরুচি সম্বন্ধে একটি উপদেশ লিখিলাম। দেখিলাম ভারি ভুল করিয়াছি; কারণ, যথার্থ ভাল জিনিষকে যেমন বিদ্রূপ করিবার সুবিধা, এমন উপহাস্য বিষয়কে নহে। হনুবংশীয়েরা মনুবংশীয়দের যেমন সহজে বিদ্রূপ করিতে পারে, মনুবংশীয়েরা হনুবংশীয়দিগকে তদ্রূপ করিয়া কখন তেমন কৃতকার্য্য হইতে পারে না। সুতরাং সুরুচিকে তাহারা দন্তোন্মীলন করিয়া দেশছাড়া করিল।

আমার প্রভু আমার প্রতি আর তেমন সমাদর প্রকাশ

করেন না। সভাস্থলেও আমার কোন সম্মান নাই। পথে বাহির হইলে লোকে গায়ে পড়িয়া আলাপ করিতে আসে না। এমন কি, আমাকে দেখিয়া কেহ কেহ হাসিতে আরম্ভ করিয়াছে।

ইতিমধ্যে আমার প্রহসনগুলার কথাও লোকে সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছে। হঠাৎ বোধ হইল, আমি যেন একটা দেশালায়ের কাঠি; মিনিটখানেক জ্বলিয়া একেবারে শেষ পর্য্যন্ত পুড়িয়া গিয়াছি।

মন এমনি নিরুৎসাহ হইয়া গেল মাথা খুঁড়িয়া মরিলে এক লাইন লেখা বাহির হয় না। মনে হইতে লাগিল বাঁচিয়া কোন সুখ নাই।

প্রভা আমাকে এখন ভয় করে। বিনা আহ্বানে সহসা কাছে আসিতে সাহস করে না। সে বুঝিতে পারিয়াছে, মজার কথা লিখিতে পারে এমন বাবার চেয়ে মাটির পুতুল ঢের ভাল সঙ্গী।

একদিন দেখা গেল আমাদের আহিরগ্রামপ্রকাশ জমিদারকে ছাড়িয়া আমাকে লইয়া পড়িয়াছে। গোটাকতক অত্যন্ত কুৎসিত কথা লিখিয়াছে। আমার পরিচিত বন্ধুবান্ধবেরা একে একে সকলেই সেই কাগজখানা লইয়া হাসিতে হাসিতে আমাকে শুনাইয়া গেল। কেহ কেহ বলিল, ইহার বিষয়টা যেমনই হোক, ভাষার বাহাদুরী আছে! অর্থাৎ গালি যে দিয়াছে তাহা ভাষা দেখিলেই পরিষ্কার বুঝা যায়। সমস্ত দিন ধরিয়া বিশ জনের কাছে ঐ এক কথা শুনিলাম।

আমার বাসার সম্মুখে একটু বাগানের মত ছিল। সন্ধ্যা-বেলায় নিতান্ত পীড়িতচিত্তে সেইখানে একাকী বেড়াইতে-ছিলাম। পাখীরা নীড়ে ফিরিয়া আসিয়া যখন কলরব বন্ধ করিয়া স্বচ্ছন্দে সন্ধ্যার শান্তির মধ্যে আত্মসমর্পণ করিল, তখন বেশ বুঝিতে পারিলাম পাখীদের মধ্যে রসিক লেখকের দল নাই, এবং সুরুচি লইয়া তর্ক হয় না।

মনের মধ্যে কেবলি ভাবিতেছি কি উত্তর দেওয়া যায়। ভদ্রতার একটা বিশেষ অসুবিধা এই যে, সকল স্থানের লোকে তাহাকে বুঝিতে পারে না। অভদ্রতার ভাষা অপেক্ষাকৃত পরিচিত, তাই ভাবিতেছিলাম সেই রকম ভাবের একটা মুখের মত জবাব লিখিতে হইবে। কিছুতেই হার মানিতে পারিব না।

এমন সময়ে সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে একটি পরিচিত ক্ষুদ্র কণ্ঠের স্বর শুনিতে পাইলাম, এবং তাহার পরেই আমার করতলে একটি কোমল উষ্ণ স্পর্শ অনুভব করিলাম। এত উদ্বেজিত অন্যমনস্ক ছিলাম যে, সেই মুহূর্ত্তে সেই স্বর ও সেই স্পর্শ জানিয়াও জানিতে পারিলাম না।

কিন্তু এক মুহূর্ত্ত পরেই সেই স্বর ধীরে ধীরে আমার কর্ণে জাগ্রত, সেই সুধাস্পর্শ আমার করতলে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। বালিকা একবার আস্তে আস্তে কাছে আসিয়া মৃদুস্বরে ডাকিয়া-ছিল, "বাবা!" কোন উত্তর না পাইয়া আমার দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া ধরিয়া একবার আপনার কোমল কপোলে বুলাইয়া আবার ধীরে ধীরে গৃহে ফিরিয়া যাইতেছে।

বহুদিন প্রভা আমাকে এমন করিয়া ডাকে নাই এবং স্বেচ্ছাক্রমে আসিয়া আমাকে এতটুকু আদর করে নাই। তাই আজ সেই স্নেহস্পর্শে আমার হৃদয় সহসা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ পরে ঘরে ফিরিয়া গিয়া দেখিলাম প্রভা বিছানায় শুইয়া আছে। শরীর ক্লিষ্টচ্ছবি, নয়ন ঈষৎ নিমিলিত; দিনশেষের ঝরিয়া-পড়া ফুলের মত পড়িয়া আছে।

মাথায় হাত দিয়া দেখি অত্যন্ত উষ্ণ; উত্তপ্ত নিশ্বাস পড়িতেছে; কপালের শিরা দপ্ দপ্ করিতেছে।

বুঝিতে পারিলাম, বালিকা আসন্ন রোগের তাপে কাতর হইয়া পিপাসিত হৃদয়ে একবার পিতার স্নেহ, পিতার আদর লইতে গিয়াছিল, পিতা তখন জাহিরপ্রকাশের জন্য খুব একটা কড়া জবাব কল্পনা করিতেছিল।

পাশে আসিয়া বসিলাম। বালিকা কোন কথা না বলিয়া তাহার দুই জ্বরতপ্ত করতলের মধ্যে আমার হস্ত টানিয়া লইয়া তাহার উপরে কপোল রাখিয়া চুপ করিয়া শুইয়া রহিল।

জাহিরগ্রাম এবং আহিরগ্রামের যত কাগজ ছিল সমস্ত পুড়াইয়া ফেলিলাম। কোন জবাব লেখা হইল না। হার মানিয়া এত সুখ কখনো হয় নাই।

বালিকার যখন মাতা মরিয়াছিল তখন তাহাকে কোলে টানিয়া লইয়াছিলাম, আজ তাহার বিমাতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিয়া আবার তাহাকে বুকে তুলিয়া লইয়া ঘরে চলিয়া গেলাম।

নিশীথে।

"ডাক্তার! ডাক্তার!"

জ্বালাতন করিল! এই অর্দ্ধেক রাত্রে—

চোখ মেলিয়া দেখি আমাদের জমিদার দক্ষিণাচরণ বাবু। ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া পিঠভাঙ্গা চৌকিটা টানিয়া আনিয়া তাঁহাকে বসিতে দিলাম এবং উদ্বিগ্নভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম। ঘড়িতে দেখি তখন রাত্রি আড়াইটা।

দক্ষিণাচরণ বাবু বিবর্ণমুখে বিস্ফারিত নেত্রে কহিলেন, "আজ রাত্রে আবার সেইরূপ উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে,—তোমার ঔষধ কোন কাজে লাগিল না।"

আমি কিঞ্চিৎ সসঙ্কোচে বলিলাম, "আপনি বোধ করি মদের মাত্রা আবার বাড়াইয়াছেন।"

দক্ষিণা বাবু অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কহিলেন,—"ওটা তোমার ভারি ভ্রম। মদ নহে; আদ্যোপান্ত বিবরণ না শুনিলে তুমি আসল কারণটা অনুমান করিতে পারিবে না।"

কুলুঙ্গির মধ্যে ক্ষুদ্র টিনের ডিবায় ম্লানভাবে কেরোসিন্ জ্বলিতেছিল, আমি তাহা উস্কাইয়া দিলাম; একটুখানি আলো জাগিয়া উঠিল এবং অনেকখানি ধোঁয়া বাহির হইতে লাগিল। কোঁচাখানা গায়ের উপর টানিয়া একখানা খবরের

কাগজ-পাতা প্যাক্ বাক্সের উপর বসিলাম। দক্ষিণা বাবু বলিতে লাগিলেন।—

"আমার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর মত এমন গৃহিণী অতি দুর্লভ ছিল। কিন্তু আমার তখন বয়স বেশি ছিল না; সহজেই রসাধিক্য ছিল, তাহার উপর আবার কাব্যশাস্ত্রটা ভাল করিয়া অধ্যয়ন করিয়াছিলাম, তাই অবিমিশ্র গৃহিণীপণায় মন উঠিত না। কালিদাসের সেই শ্লোকটা প্রায় মনে উদয় হইত,—

গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ
প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।

কিন্তু আমার গৃহিণীর কাছে ললিত কলাবিধির কোন উপদেশ খাটিত না এবং সখীভাবে প্রণয়সম্ভাষণ করিতে গেলে তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। গঙ্গার স্রোতে যেমন ইন্দ্রের ঐরাবত নাকাল হইয়াছিল, তেমনি তাঁহার হাসির মুখে বড় বড় কাব্যের টুকরা এবং ভাল ভাল আদরের সম্ভাষণ মুহূর্ত্তের মধ্যে অপদস্ত হইয়া ভাসিয়া যাইত। তাঁহার হাসিবার আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল।

তাহার পর, আজ বছর চারেক হইল আমাকে সাংঘাতিক রোগে ধরিল। ওষ্ঠব্রণ হইয়া জ্বরবিকার হইয়া মরিবার দাখিল হইলাম। বাঁচিবার আশা ছিল না। একদিন এমন হইল যে, ডাক্তারে জবাব দিয়া গেল। এমন সময় আমার এক আত্মীয় কোথা হইতে এক ব্রহ্মচারী আনিয়া উপস্থিত করিল;—সে গব্য ঘৃতের সহিত একটা শিকড় বাঁটিয়া আমাকে খাওয়াইয়া

দিল। ঔষধের গুণেই হউক বা অদৃষ্টক্রমেই হউক সে যাত্রা বাচিয়া গেলাম।

রোগের সময় আমার স্ত্রী অহর্নিশি এক মুহূর্ত্তের জন্য বিশ্রাম করেন নাই। সেই ক'টা দিন একটি অবলা স্ত্রীলোক, মানুষের সামান্য শক্তি লইয়া, প্রাণপণ ব্যাকুলতার সহিত, দ্বারে সমাগত যমদূতগুলার সঙ্গে অনবরত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার সমস্ত প্রেম, সমস্ত হৃদয়, সমস্ত যত্ন দিয়া আমার এই অযোগ্য প্রাণটাকে যেন বক্ষের শিশুর মত দুই হস্তে ঝাঁপিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছিলেন। আহার ছিল না, নিদ্রা ছিল না, জগতের আর কোন কিছুর প্রতিই দৃষ্টি ছিল না।

যম তখন পরাহত ব্যাঘ্রের ন্যায় আমাকে তাঁহার কবল হইতে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু যাইবার সময় আমার স্ত্রীকে একটা প্রবল থাবা মারিয়া গেলেন।

আমার স্ত্রী তখন গর্ভবতী ছিলেন, অনতিকাল পরে এক মৃত সন্তান প্রসব করিলেন। তাহার পর হইতেই তাঁহার নানা-প্রকার জটিল ব্যামোর সূত্রপাত হইল। তখন আমি তাঁহার সেবা আরম্ভ করিয়া দিলাম। তাহাতে তিনি বিব্রত হইয়া উঠিলেন। বলিতে লাগিলেন—আঃ, কর কি! লোকে বলিবে কি! অমন করিয়া দিন রাত্রি তুমি আমার ঘরে যাতায়াত করিয়ো না!

যেন নিজে পাখা খাইতেছি এইরূপ ভাণ করিয়া রাত্রে যদি তাঁহাকে তাঁহার জ্বরের সময় পাখা করিতে যাইতামত ভারি একটা কাড়াকাড়ি ব্যাপার পড়িয়া যাইত; কোন দিন যদি

তাঁহার শুশ্রূষা উপলক্ষে আমার আহারের নিয়মিত সময় দশ মিনিট উত্তীর্ণ হইয়া যাইত তবে সেও নানাপ্রকার অনুনয় অনু-রোধ অনুযোগের কারণ হইয়া দাঁড়াইত। স্বল্পমাত্র সেবা করিতে গেলে হিতে বিপরীত হইয়া উঠিত। তিনি বলিতেন, পুরুষ মানুষের অতটা বাড়াবাড়ি ভাল নয়।

আমাদের সেই বরানগরের বাড়িটি বোধ করি তুমি দেখিয়াছ। বাড়ির সাম্‌নেই বাগান, এবং বাগানের সম্মুখেই গঙ্গা বহিতেছে। আমাদের শোবার ঘরের নীচেই দক্ষিণের দিকে খানিকটা জমি মেহেদির বেড়া দিয়া ঘিরিয়া আমার স্ত্রী নিজের মনের মত একটুক্‌রা বাগান বানাইয়াছিলেন। সমস্ত বাগানটির মধ্যে সেই খণ্ডটিই অত্যন্ত সাদাসিধা এবং নিতান্ত দিশী। অর্থাৎ তাহার মধ্যে গন্ধের অপেক্ষা বর্ণের বাহার, ফুলের অপেক্ষা পাতার বৈচিত্র্য ছিল না—এবং টবের মধ্যে অকিঞ্চিৎকর উদ্ভিজ্জের পার্শ্বে কাঠি অবলম্বন করিয়া কাগজে নির্ম্মিত লাটিন নামের জয়ধ্বজা উড়িত না। বেল, জুঁই, গোলাপ, গন্ধরাজ, করবী এবং রজনীগন্ধারই প্রাদুর্ভাব কিছু বেশি। প্রকাণ্ড একটা বকুল গাছের তলা সাদা মার্ব্বল পাথর দিয়া বাঁধানো ছিল। সুস্থ অবস্থায় তিনি নিজে দাঁড়াইয়া দুইবেলা তাহা ধুইয়া সাফ করাইয়া রাখিতেন। গ্রীষ্মকালে কাজের অবকাশে সন্ধ্যার সময় সেই তাঁহার বসিবার স্থান ছিল। সেখান হইতে গঙ্গা দেখা যাইত কিন্তু গঙ্গা হইতে কুঠির পান্সীর বাবুরা তাঁহাকে দেখিতে পাইত না।

অনেক দিন শয্যাগত থাকিয়া একদিন চৈত্রের শুক্লপক্ষ সন্ধ্যায় তিনি কহিলেন, ঘরে বদ্ধ থাকিয়া আমার প্রাণ কেমন করিতেছে ; আজ একবার আমার সেই বাগানে গিয়া বসিব।

আমি তাঁহাকে বহু যত্নে ধরিয়া ধীরে ধীরে সেই বকুলতলের প্রস্তর-বেদিকায় লইয়া গিয়া শয়ন করাইয়া দিলাম। আমারই জানুর উপরে তাঁহার মাথাটি তুলিয়া রাখিতে পারিতাম কিন্তু জানি সেটাকে তিনি অদ্ভুত আচরণ বলিয়া গণ্য করিবেন, তাই একটি বালিশ আনিয়া তাঁহার মাথার তলায় রাখিলাম।

দুটি একটি করিয়া প্রস্ফুট বকুল ফুল ঝরিতে লাগিল এবং শাখান্তরাল হইতে ছায়াঙ্কিত জ্যোৎস্না তাঁহার শীর্ণ মুখের উপর আসিয়া পড়িল। চারিদিক শান্ত নিস্তব্ধ ; সেই ঘনগন্ধ পূর্ণ ছায়ান্ধকারে একপার্শ্বে নীরবে বসিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আমার চোখে জল আসিল।

আমি ধীরে ধীরে কাছের গোড়ায় আসিয়া দুই হস্তে তাঁহার একটি উত্তপ্ত শীর্ণ হাত তুলিয়া লইলাম। তিনি তাহাতে কোন আপত্তি করিলেন না। কিছুক্ষণ এইরূপ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া আমার হৃদয় কেমন উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, আমি বলিয়া উঠিলাম—তোমার ভালবাসা আমি কোন কালে ভুলিব না !

তখনি বুঝিলাম, কথাটা বলিবার কোন আবশ্য[illegible] ছিল না। আমার স্ত্রী হাসিয়া উঠিলেন। সে হাসিতে লজ্জা ছিল, সুখ ছিল এবং কিঞ্চিৎ অবিশ্বাস ছিল—এবং উহার মধ্যে অনেকটা পরিমাণে পরিহাসের তীব্রতাও ছিল। প্রতিবাদস্বরূপে একটি

কথামাত্র না বলিয়া কেবল তাঁহার সেই হাসির দ্বারা জানাইলেন, কোন কালে ভুলিবে না, ইহা কখনও সম্ভব নহে, এবং আমি প্রত্যাশাও করি না।

এই সুমিষ্ট সুতীক্ষ্ণ হাসির ভয়েই আমি কখন আমার স্ত্রীর সঙ্গে রীতিমত প্রেমালাপ করিতে সাহস করি নাই। অসাক্ষাতে যে সকল কথা মনে উদয় হইত, তাঁহার সম্মুখে গেলেই সে গুলাকে নিতান্ত বাজে কথা বলিয়া বোধ হইত। ছাপার অক্ষরে যে সব কথা পড়িলে দুই চক্ষু বাহিয়া দর দর ধারায় জল পড়িতে থাকে সেইগুলা মুখে বলিতে গেলে কেন যে হাস্যের উদ্রেক করে এ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিলাম না।

বাদ প্রতিবাদ কথায় চলে, কিন্তু হাসির উপরে তর্ক চলে না, কাজেই চুপ করিয়া যাইতে হইল। জ্যোৎস্না উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল, একটা কোকিল ক্রমাগতই কুহু কুহু ডাকিয়া অস্থির হইয়া গেল। আমি বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম এমন জ্যোৎস্না রাত্রেও কি পিকবধূ বধির হইয়া আছে?

বহু চিকিৎসায় আমার স্ত্রীর রোগ-উপশমের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। ডাক্তার বলিল, একবার বায়ু পরিবর্ত্তন করিয়া দেখিলে ভাল হয়। আমি স্ত্রীকে লইয়া এলাহাবাদে গেলাম।"

এইখানে দক্ষিণাবাবু হঠাৎ থমকিয়া চুপ করিলেন। সন্দিগ্ধভাবে আমার মুখের দিকে চাহিলেন, তাহার পর দুই হাতের মধ্যে মাথা রাখিয়া ভাবিতে লাগিলেন। আমিও চুপ করিয়া রহিলাম। কুলুঙ্গিতে কেরোসিন্ মিট্‌মিট্ করিয়া জ্বলিতে

লাগিল এবং নিস্তব্ধ ঘরে মশার ভন্‌ভন্‌ শব্দ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। হঠাৎ মৌন ভঙ্গ করিয়া দক্ষিণাবাবু বলিতে আরম্ভ করিলেন—

"সেখানে হারাণ ডাক্তার আমার স্ত্রীকে চিকিৎসা করিতে লাগিলেন।

অবশেষে অনেক কাল একভাবে কাটাইয়া ডাক্তারও বলিলেন, আমিও বুঝিলাম এবং আমার স্ত্রীও বুঝিলেন যে, তাঁহার ব্যামো সারিবার নহে। তাঁহাকে চিররুগ্ন হইয়াই কাটাইতে হইবে।

তখন একদিন আমার স্ত্রী আমাকে বলিলেন,—যখন ব্যামোও সারিবে না এবং শীঘ্র আমার মরিবার আশাও নাই, তখন আর কতদিন এই জীবন্মৃতকে লইয়া কাটাইবে? তুমি আর একটা বিবাহ কর।

এটা যেন কেবল একটা সুযুক্তি এবং সদ্বিবেচনার কথা—ইহার মধ্যে যে, ভারি একটা মহত্ত্ব বীরত্ব বা অসামান্য কিছু আছে, এমন ভাব তাঁহার লেশমাত্র ছিল না।

এইবার আমার হাসিবার পালা ছিল। কিন্তু আমার কি তেমন করিয়া হাসিবার ক্ষমতা আছে? আমি উপন্যাসের প্রধান নায়কের ন্যায় গম্ভীর সমুচ্চভাবে বলিতে লাগিলাম—যতদিন এই দেহে জীবন আছে—

তিনি বাধা দিয়া কহিলেন—নাও! নাও! আর বলিতে হইবে না! তোমার কথা শুনিয়া আমি আর বাঁচি না!

আমি পরাজয় স্বীকার না করিয়া বলিলাম—এ জীবনে আর কাহাকেও ভালবাসিতে পারিব না।

শুনিয়া আমার স্ত্রী ভারি হাসিয়া উঠিলেন। তখন আমাকে ক্ষান্ত হইতে হইল।

জানিনা, তখন নিজের কাছেও কখনও স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছি কি না, কিন্তু এখন বুঝিতে পারিতেছি এই আরোগ্য-আশাহীন সেবাকার্য্যে আমি মনে মনে পরিশ্রান্ত হইয়া গিয়াছিলাম। এ কার্য্যে যে ভঙ্গ দিব, এমন কল্পনাও আমার মনে ছিল না; অথচ চিরজীবন এই চিররুগ্নকে লইয়া যাপন করিতে হইবে এ কল্পনাও আমার নিকট পীড়াজনক হইয়াছিল। হায়! প্রথম যৌবনকালে যখন সম্মুখে তাকাইয়াছিলাম তখন প্রেমের কুহকে, সুখের আশ্বাসে, সৌন্দর্য্যের মরীচিকায় সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবন প্রফুল্ল দেখাইতেছিল। আজ হইতে শেষ পর্য্যন্ত কেবলই আশাহীন সুদীর্ঘ সতৃষ্ণ মরুভূমি।

আমার সেবার মধ্যে সেই আন্তরিক শ্রান্তি নিশ্চয় তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন! তখন জানিতাম না কিন্তু এখন সন্দেহ-মাত্র নাই যে, তিনি আমাকে যুক্তঅক্ষরহীন প্রথমভাগ শিশু-শিক্ষার মত অতি সহজে বুঝিতেন। সেই জন্য, যখন উপন্যাসের নায়ক সাজিয়া গম্ভীরভাবে তাঁহার নিকট কবিত্ব ফলাইতে যাইতাম তিনি এমন সুগভীর স্নেহ অথচ অনিবার্য্য কৌতুকের সহিত হাসিয়া উঠিতেন। আমার নিজের অগোচর অন্তরের কথাও অন্তর্য্যামীর ন্যায় তিনি সমস্তই জানিতেন, এ কথা মনে করিলে আজও লজ্জায় মরিয়া যাইতে ইচ্ছা করে।

হারাণ ডাক্তার আমাদের স্বজাতীয়। তাঁহার বাড়িতে

আমার প্রায়ই নিমন্ত্রণ থাকিত। কিছুদিন যাতায়াতের পর ডাক্তার তাঁহার মেয়েটির সঙ্গে আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন। মেয়েটি অবিবাহিত—তাহার বয়স পনেরো হইবে। ডাক্তার বলেন তিনি মনের মত পাত্র পান নাই বলিয়া বিবাহ দেন নাই। কিন্তু বাহিরের লোকের কাছে গুজব শুনিতাম মেয়েটির কুলের দোষ ছিল।

কিন্তু আর কোন দোষ ছিল না। যেমন সুরূপ তেমনি সুশিক্ষা। সেই জন্য মাঝে মাঝে এক এক দিন তাঁহার সহিত নানা কথার আলোচনা করিতে করিতে আমার বাড়ি ফিরিতে রাত হইত, আমার স্ত্রীকে ঔষধ খাওয়াইবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইত। তিনি জানিতেন, আমি হারাণ ডাক্তারের বাড়ি গিয়াছি কিন্তু বিলম্বের কারণ একদিনও আমাকে জিজ্ঞাসাও করেন নাই।

মরুভূমির মধ্যে আর একবার মরীচিকা দেখিতে লাগিলাম। তৃষ্ণা যখন বুক পর্য্যন্ত, তখন সামনে কূলপরিপূর্ণ স্বচ্ছ জল ছল-ছল ঢলঢল করিতে লাগিল। তখন মনকে প্রাণপণে টানিয়া আর ফিরাইতে পারিলাম না।

রোগীর ঘর আমার কাছে দ্বিগুণ নিরানন্দ হইয়া উঠিল। এখন প্রায়ই শুশ্রূষা করিবার এবং ঔষধ খাওয়াইবার নিয়ম ভঙ্গ হইতে লাগিল।

হারাণ ডাক্তার আমাকে প্রায় মাঝে মাঝে বলিতেন, যাহাদের রোগ আরোগ্য হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, তাহাদের পক্ষে মৃত্যুই ভাল। কারণ, বাঁচিয়া তাহাদের নিজেরও সুখ

নাই, অন্যেরও অসুখ। কথাটা সাধারণভাবে বলিতে দোষ নাই, তথাপি আমার স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া এমন প্রসঙ্গ উত্থাপন করা উচিত হয় নাই। কিন্তু মানুষের জীবনমৃত্যু সম্বন্ধে ডাক্তারদের মন এমন অসার যে, তাহারা ঠিক আমাদের মনের অবস্থা বুঝিতে পারে না।

হঠাৎ একদিন পাশের ঘর হইতে শুনিতে পাইলাম, আমার স্ত্রী হারাণ বাবুকে বলিতেছেন,—ডাক্তার, কতকগুলা মিথ্যা ওষুধ গিলাইয়া ডাক্তারখানার দেনা বাড়াইতেছ কেন? আমার প্রাণটাই যখন একটা ব্যামো, তখন এমন একটা ওষুধ দাও যাহাতে শীঘ্র এই প্রাণটা যায়।

ডাক্তার বলিলেন, ছি, এমন কথা বলিবেন না।

কথাটা শুনিয়া হঠাৎ আমার বক্ষে বড় আঘাত লাগিল। ডাক্তার চলিয়া গেলে আমার স্ত্রীর ঘরে গিয়া তাঁহার শয্যাপ্রান্তে বসিলাম, তাঁহার কপালে ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলাম। তিনি কহিলেন, এ ঘর বড় গরম তুমি বাহিরে যাও। তোমার বেড়াইতে যাইবার সময় হইয়াছে। খানিকটা না বেড়াইয়া আসিলে রাত্রে ক্ষুধা হইবে না।

বেড়াইতে যাওয়ার অর্থ ডাক্তারের বাড়ি যাওয়া। আমিই তাঁহাকে বুঝাইয়াছিলাম, ক্ষুধাসঞ্চারের পক্ষে খানিকটা বেড়াইয়া আসা বিশেষ আবশ্যক। এখন নিশ্চয় বলিতে পারি, তিনি প্রতিদিনই আমার এই ছলনাটুকু বুঝিতেন। আমি নির্ব্বোধ, মনে করিতাম তিনি নির্ব্বোধ।”

এই বলিয়া দক্ষিণা বাবু অনেক ক্ষণ করতলে মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। অবশেষে কহিলেন, "আমাকে একগ্লাস জল আনিয়া দাও।" জল খাইয়া বলিতে লাগিলেন ;—

"একদিন ডাক্তার বাবুর কন্যা মনোরমা আমার স্ত্রীকে দেখিতে আসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। জানি না, কি কারণে তাঁহার সে প্রস্তাব আমার ভাল লাগিল না। কিন্তু প্রতিবাদ করিবার কোন হেতু ছিল না। তিনি একদিন সন্ধ্যাবেলায় আমাদের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সে দিন আমার স্ত্রীর বেদনা অন্য দিনের অপেক্ষা কিছু বাড়িয়া উঠিয়াছিল। যে দিন তাঁহার ব্যথা বাড়ে সে দিন তিনি অত্যন্ত স্থির নিস্তব্ধ হইয়া থাকেন ; কেবল মাঝে মাঝে মুষ্টিবদ্ধ হইতে থাকে এবং মুখ নীল হইয়া আসে, তাহাতেই তাঁহার যন্ত্রণা বুঝা যায়। ঘরে কোন সাড়া ছিল না, আমি শয্যাপ্রান্তে চুপ করিয়া বসিয়াছিলাম ; সে দিন আমাকে বেড়াইতে যাইতে অনুরোধ করেন, এমন সামর্থ্য তাঁহার ছিল না, কিম্বা হয়ত বড় কষ্টের সময় আমি কাছে থাকি এমন ইচ্ছা তাঁহার মনে মনে ছিল। চোখে লাগিবে বলিয়া কেরোসিনের আলোটা দ্বারের পার্শ্বে ছিল। ঘর অন্ধকার এবং নিস্তব্ধ। কেবল এক একবার যন্ত্রণার কিঞ্চিৎ উপশমে আমার স্ত্রীর গভীর দীর্ঘনিশ্বাস শুনা যাইতেছিল।

এমন সময়ে মনোরমা ঘরের প্রবেশদ্বারে দাঁড়াইলেন। বিপরীত দিক্ হইতে কেরোসিনের আলো আসিয়া তাঁহার মুখের উপর

পড়িল। আলো-আঁধারে লাগিয়া তিনি কিছুক্ষণ ঘরে কিছুই দেখিতে না পাইয়া দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া ইতস্তত করিতে লাগিলেন।

আমার স্ত্রী চমকিয়া আমার হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—ও কে?—তাঁহার সেই দুর্ব্বল অবস্থায় হঠাৎ অচেনা লোক দেখিয়া ভয় পাইয়া আমাকে দুই তিন বার অস্ফুটস্বরে প্রশ্ন করিলেন, ও কে? ও কে গো?

আমার কেমন দুর্ব্বুদ্ধি হইল আমি প্রথমেই বলিয়া ফেলিলাম, আমি চিনি না! বলিবামাত্রই কে যেন আমাকে কশাঘাত করিল। পরের মুহূর্ত্তেই বলিলাম—ওঃ, আমাদের ডাক্তার বাবুর কন্যা!

স্ত্রী একবার আমার মুখের দিকে চাহিলেন;—আমি তাঁহার মুখের দিকে চাহিতে পারিলাম না। পরক্ষণেই তিনি ক্ষীণস্বরে অভ্যাগতকে বলিলেন, আপনি আসুন।—আমাকে বলিলেন, আলোটা ধর!

মনোরমা ঘরে আসিয়া বসিলেন। তাঁহার সহিত রোগিণীর অল্পস্বর আলাপ চলিতে লাগিল। এমন সময় ডাক্তার বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তিনি তাঁহার ডাক্তারখানা হইতে দুই শিশি ওষুধ সঙ্গে আনিয়াছিলেন। সেই দুটি শিশি বাহির করিয়া আমার স্ত্রীকে বলিলেন—এই নীল শিশিটা মালিশ করিবার, আর এইটি খাইবার। দেখিবেন, দুইটাতে মিলাইবেন না, এ ওষুধটা ভারি বিষ।

আমাকেও একবার সতর্ক করিয়া দিয়া ঔষধ দুটি শয্যাপার্শ্ববর্ত্তী টেবিলে রাখিয়া দিলেন। বিদায় লইবার সময় ডাক্তার তাঁহার কন্যাকে ডাকিলেন।

মনোরমা কহিলেন—বাবা, আমি থাকি না কেন। সঙ্গে স্ত্রীলোক কেহ নাই, ইঁহাকে সেবা করিবে কে?

আমার স্ত্রী ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, না, না, আপনি কষ্ট করিবেন না। পুরাণো ঝি আছে সে আমাকে মায়ের মত যত্ন করে।

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন—উনি মা'লক্ষ্মী, চিরকাল পরের সেবা করিয়া আসিয়াছেন, অন্যের সেবা সহিতে পারেন না।

কন্যাকে লইয়া ডাক্তার গমনের উদ্যোগ করিতেছে এমন সময় আমার স্ত্রী বলিলেন,—ডাক্তার বাবু, ইনি বদ্ধঘরে অনেকক্ষণ বসিয়া আছেন, ইঁহাকে একবার বাহিরে বেড়াইয়া লইয়া আসিতে পারেন?

ডাক্তার বাবু আমাকে কহিলেন,—আসুন না, আপনাকে নদীর ধার হইয়া একবার বেড়াইয়া আনি।—

আমি ঈষৎ আপত্তি দেখাইয়া অনতিবিলম্বে সম্মত হইলাম। ডাক্তার বাবু যাইবার সময় দুই শিশি ঔষধ সম্বন্ধে আবার আমার স্ত্রীকে সতর্ক করিয়া দিলেন।

সে দিন ডাক্তারের বাড়িতেই আহার করিলাম। ফিরিয়া আসিতে রাত হইল। আসিয়া দেখি, আমার স্ত্রী ছট্‌ফট্‌ করি-

তেছেন। অনুতাপে বিদ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার কি ব্যথা বাড়িয়াছে?—

তিনি উত্তর করিতে পারিলেন না, নীরবে আমার মুখের দিকে চাহিলেন। তখন তাঁহার কণ্ঠ রোধ হইয়াছে।

আমি তৎক্ষণাৎ সেই রাত্রেই ডাক্তারকে ডাকাইয়া আনিলাম।

ডাক্তার প্রথমটা আসিয়া অনেক ক্ষণ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। অবশেষে জিজ্ঞাসা করিলেন,—সেই ব্যথাটা কি বাড়িয়া উঠিয়াছে? ঔষধটা একবার মালিশ করিলে হয় না?

বলিয়া শিশিটা টেবিল হইতে লইয়া দেখিলেন, সেটা খালি।

আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি ভুল করিয়া এই ওষুধটা খাইয়াছেন?—আমার স্ত্রী ঘাড় নাড়িয়া নীরবে জানাইলেন—হাঁ।

ডাক্তার তৎক্ষণাৎ গাড়ি করিয়া তাঁহার বাড়ি হইতে পাম্প আনিতে ছুটিলেন। আমি অর্দ্ধমূর্চ্ছিতের ন্যায় আমার স্ত্রীর বিছানার উপর গিয়া পড়িলাম।

তখন, মাতা তাহার পীড়িত শিশুকে যেমন করিয়া সান্ত্বনা করে তেমনি করিয়া তিনি আমার মাথা তাঁহার বক্ষের কাছে টানিয়া লইয়া দুই হস্তের স্পর্শে আমাকে তাঁহার মনের কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। কেবল তাঁহার সেই করুণ স্পর্শের দ্বারাই আমাকে বারম্বার করিয়া বলিতে লাগিলেন—শোক করিয়ো না, ভালই হইয়াছে—তুমি সুখী হইবে, এবং সেই মনে করিয়া আমি সুখে মরিলাম।

ডাক্তার যখন ফিরিলেন, তখন জীবনের সঙ্গে সঙ্গে আমার স্ত্রীর সকল যন্ত্রণার অবসান হইয়াছে।

—দক্ষিণাচরণ আর একবার জল খাইয়া বলিলেন, উঃ বড় গরম! বলিয়া দ্রুত বাহির হইয়া বার কয়েক বারান্দায় পায়চারি করিয়া আসিয়া বসিলেন। বেশ বোঝা গেল তিনি বলিতে চাহেন না কিন্তু আমি যেন যাদু করিয়া তাঁহার নিকট হইতে কথা কাড়িয়া লইতেছি। আবার আরম্ভ করিলেন—

মনোরমাকে বিবাহ করিয়া দেশে ফিরিলাম।

মনোরমা তাহার পিতার সম্মতিক্রমে আমাকে বিবাহ করিল। কিন্তু আমি যখন তাহাকে আদরের কথা বলিতাম, প্রেমালাপ করিয়া তাহার হৃদয় অধিকার করিবার চেষ্টা করিতাম, সে হাসিত না, গম্ভীর হইয়া থাকিত। তাহার মনের কোথায় কোনখানে কি খট্‌কা লাগিয়া গিয়াছিল আমি কেমন করিয়া বুঝিব?

এই সময় আমার মদ খাইবার নেশা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল।

একদিন প্রথম শরতের সন্ধ্যায় মনোরমাকে লইয়া আমাদের বরানগরের বাগানে বেড়াইতেছি। ছম্‌ছমে অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। পাখীদের বাসায় ডানা ঝাড়িবার শব্দটুকুও নাই। কেবল বেড়াইবার পথের দুই ধারে ঘন ছায়াবৃত ঝাউগাছ বাতাসে সশব্দে কাঁপিতেছিল।

শ্রান্তি বোধ করিতেই মনোরমা সেই বকুলতলার শুভ্র পাথরের বেদীর উপর আসিয়া নিজের দুই বাহুর উপর মাথা রাখিয়া শয়ন করিল। আমিও কাছে আসিয়া বসিলাম।

সেখানে অন্ধকার আরও ঘনীভূত,—যতটুকু আকাশ দেখা যাইতেছে একেবারে তারায় আচ্ছন্ন; তরুতলের ঝিল্লিধ্বনি যেন অনন্তগগনবক্ষচ্যুত নিঃশব্দতার নিম্নপ্রান্তে একটি শব্দের সরু পাড় বুনিয়া দিতেছে।

সেদিনও বৈকালে আমি কিছু মদ খাইয়াছিলাম, মনটা বেশ একটু তরলাবস্থায় ছিল। অন্ধকার যখন চোখে সহিয়া আসিল তখন বনচ্ছায়াতলে পাণ্ডুবর্ণে অঙ্কিত সেই শিথিলঅঞ্চল শ্রান্তকায় রমণীর আবছায়া মূর্ত্তিটি আমার মনে এক অনিবার্য্য আবেগের সঞ্চার করিল। মনে হইল, ও যেন একটি ছায়া, ওকে যেন কিছুতেই দুই বাহু দিয়া ধরিতে পারিব না।

এমন সময় অন্ধকার ঝাউগাছের শিখরদেশে যেন আগুন ধরিয়া উঠিল; তাহার পরে কৃষ্ণপক্ষের জীর্ণপ্রান্ত হলুদবর্ণ চাঁদ ধীরে ধীরে গাছের মাথার উপরকার আকাশে আরোহণ করিল;—শাদা পাথরের উপর শাদা সাড়িপরা সেই শ্রান্তশয়ান রমণীর মুখের উপর জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িল। আমি আর থাকিতে পারিলাম না। কাছে আসিয়া দুই হাতে তাহার হাতটি তুলিয়া ধরিয়া কহিলাম, মনোরমা, তুমি আমাকে বিশ্বাস কর না, কিন্তু তোমাকে আমি ভালবাসি, তোমাকে আমি কোনকালে ভুলিতে পারিব না।

কথাটা বলিবামাত্র চমকিয়া উঠিলাম; মনে পড়িল ঠিক এই কথাটা আর এক দিন আর কাহাকেও বলিয়াছি! এবং সেই মুহূর্ত্তেই বকুল গাছের শাখার উপর দিয়া ঝাউগাছের মাথার

উপর দিয়া, কৃষ্ণপক্ষের পীতবর্ণ ভাঙ্গা চাঁদের নীচে দিয়া গঙ্গার পূর্ব্ব পার হইতে গঙ্গার সুদূর পশ্চিম পার পর্য্যন্ত হাহা—হাহা হাহা—করিয়া অতি দ্রুতবেগে একটা হাসি বহিয়া গেল! সেটা মর্ম্মভেদী হাসি, কি অভ্রভেদী হাহাকার, বলিতে পারি না। আমি তদ্দণ্ডেই পাথরের বেদীর উপর হইতে মূর্চ্ছিত হইয়া নীচে পড়িয়া গেলাম।

মূর্চ্ছাভঙ্গে দেখিলাম আমার ঘরে বিছানায় শুইয়া আছি। স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার হঠাৎ এমন হইল কেন?—আমি কাঁপিয়া উঠিয়া বলিলাম,—শুনিতে পাও নাই সমস্ত আকাশ ভরিয়া হাহা করিয়া একটা হাসি বাহিয়া গেল?

স্ত্রী হাসিয়া কহিলেন—সে বুঝি হাসি? সার বাঁধিয়া দীর্ঘ এক ঝাঁক পাখী উড়িয়া গেল তাহাদেরই পাখার শব্দ শুনিয়াছিলাম। তুমি অল্পেই ভয় পাও?—

দিনের বেলায় স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, পাখীর ঝাঁক উড়িবার শব্দই বটে, এই সময়ে উত্তর দেশ হইতে হংসশ্রেণী নদীর চরে চরিবার জন্য আসিতেছে। কিন্তু সন্ধ্যা হইলে সে বিশ্বাস রাখিতে পারিতাম না। তখন মনে হইত চারিদিকে সমস্ত অন্ধকার ভরিয়া ঘন হাসি জমা হইয়া রহিয়াছে, সামান্য একটা উপলক্ষে হঠাৎ আকাশ ভরিয়া অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া ধ্বনিত হইয়া উঠিবে। অবশেষে এমন হইল, সন্ধ্যার পর মনোরমার সহিত একটা কথা বলিতে আমার সাহস হইত না।

তখন আমাদের বরানগরের বাড়ি ছাড়িয়া মনোরমাকে লইয়া

বোটে করিয়া বাহির হইলাম। অগ্রহায়ণ মাসে নদীর বাতাসে সমস্ত ভয় চলিয়া গেল। কয়দিন বড় সুখে ছিলাম। চারিদিকের সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া মনোরমাও যেন তাহার হৃদয়ের রুদ্ধদ্বার অনেক দিন পরে ধীরে ধীরে আমার নিকট খুলিতে লাগিল।

গঙ্গা ছাড়াইয়া,খড়ে' ছাড়াইয়া, অবশেষে পদ্মায় আসিয়া পৌঁছিলাম। ভয়ঙ্করী পদ্মা তখন হেমন্তের বিবরলীন ভুজঙ্গিনীর মত কৃশ নির্জ্জীবভাবে সুদীর্ঘ শীতনিদ্রায় নিবিষ্ট ছিল। উত্তর পারে জনশূন্য তৃণশূন্য দিগন্তপ্রসারিত বালির চর ধূ ধূ করিতেছে — এবং দক্ষিণের উচ্চ পাড়ের উপর গ্রামের আমবাগানগুলি এই রাক্ষসীনদীর নিতান্ত মুখের কাছে যোড়হস্তে দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছে ;— পদ্মা ঘুমের ঘোরে এক একবার পাশ ফিরিতেছে এবং বিদীর্ণ তটভূমি ঝুপ্ ঝাপ্ করিয়া ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।

এইখানে বেড়াইবার সুবিধা দেখিয়া বোট বাঁধিলাম।

একদিন আমরা দুই জনে বেড়াইতে বেড়াইতে বহুদূর চলিয়া গেলাম। সূর্য্যাস্তের স্বর্ণচ্ছায়া মিলাইয়া যাইতেই শুক্লপক্ষের নির্ম্মল চন্দ্রালোক দেখিতে দেখিতে ফুটিয়া উঠিল। সেই অন্তহীন শুভ্র বালির চরের উপর যখন অজস্র অবারিত উদ্ভাসিত জ্যোৎস্না একেবারে আকাশের সীমান্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়া গেল— তখন মনে হইল যেন জনশূন্য চন্দ্রালোকের অসীম স্বপ্নরাজ্যের কেবল আমরা দুই জনে ভ্রমণ করিতেছি। একটি লাল শাল মনোরমার মাথার উপর হইতে নামিয়া তাহার মুখখানি বেষ্টন করিয়া তাহার শরীরটি আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। নিস্তব্ধতা

যখন নিবিড় হইয়া আসিল, কেবল একটি সীমাহীন দিশাহীন শুভ্রতা এবং শূন্যতা ছাড়া যখন আর কিছুই রহিল না, তখন মনোরমা ধীরে ধীরে হাতটি বাহির করিয়া আমার হাত চাপিয়া ধরিল; অত্যন্ত কাছে আসিয়া সে যেন তাহার সমস্ত শরীর মন, জীবন, যৌবন আমার উপর বিন্যস্ত করিয়া নিতান্ত নির্ভর করিয়া দাঁড়াইল। পুলকিত উদ্বেলিত হৃদয়ে মনে করিলাম, ঘরের মধ্যে কি যথেষ্ট ভালবাসা যায়? এইরূপ অনাবৃত অবারিত অনন্ত আকাশ নহিলে কি দুটি মানুষকে কোথায় ধরে? তখন মনে হইল, আমাদের ঘর নাই, দ্বার নাই, কোথাও ফিরিবার নাই, এমনি করিয়া হাতে হাতে ধরিয়া গম্যহীন পথে, উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণে চন্দ্রালোকিত শূন্যতার উপর দিয়া অবারিত ভাবে চলিয়া যাইবে।

এইরূপে চলিতে চলিতে এক জায়গায় আসিয়া দেখিলাম সেই বালুকারাশির মাঝখানে অদূরে একটি জলাশয়ের মত হইয়াছে—পদ্মা সরিয়া যাওয়ার পর সেই খানে জল বাধিয়া আছে।

সেই মরুবালুকাবেষ্টিত নিস্তরঙ্গ নিসুপ্ত নিশ্চল জলটুকুর উপরে একটি সুদীর্ঘ জ্যোৎস্নার রেখা মূর্চ্ছিতভাবে পড়িয়া আছে। সেই জায়গাটাতে আসিয়া আমরা দুইজনে দাঁড়াইলাম—মনোরমা কি ভাবিয়া আমার মুখের দিকে চাহিল; তাহার মাথার উপর হইতে শালটা হঠাৎ খসিয়া পড়িল। আমি তাহার সেই জ্যোৎস্না-বিকশিত মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া চুম্বন করিলাম।

এই সময় সেই জনমানবশূন্য নিঃশব্দ মরুভূমির মধ্যে গম্ভীর-স্বরে কে তিনবার বলিয়া উঠিল—ও কে ? ও কে ? ও কে ?

আমি চমকিয়া উঠিলাম, আমার স্ত্রীও কাঁপিয়া উঠিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই আমরা দুই জনেই বুঝিলাম, এই শব্দ মানুষিক নহে, অমানুষিকও নহে—চর-বিহারী জলচর পাখীর ডাক। হঠাৎ এতরাত্রে তাহাদের নিরাপদ নিভৃত নিবাসের কাছে লোকসমাগম দেখিয়া চকিত হইয়া উঠিয়াছে।

সেই ভয়ের চমক খাইয়া আমরা দুই জনেই তাড়াতাড়ি বোটে ফিরিলাম। রাত্রে বিছানায় আসিয়া শুইলাম; শ্রান্তশরীরে মনোরমা অবিলম্বে ঘুমাইয়া পড়িল।

তখন অন্ধকারে কে একজন আমার মশারির কাছে দাঁড়াইয়া সুষুপ্ত মনোরমার দিকে একটি মাত্র দীর্ঘ শীর্ণ অস্থিসার অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া যেন আমার কানে কানে অত্যন্ত চুপি চুপি অস্ফুটকণ্ঠে কেবলি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল—ও কে ? ও কে ? ও কে গো ?—

তাড়াতাড়ি উঠিয়া দেশালাই জ্বালাইয়া বাতি ধরিলাম। সেই মুহূর্ত্তেই মিলাইয়া গিয়া, আমার মশারি কাঁপাইয়া, বোট দুলাইয়া আমার সমস্ত ঘর্ম্মাক্ত শরীরের রক্ত হিম করিয়া দিয়া হাহা—হাহা—হাহা করিয়া একটা হাসি অন্ধকার রাত্রির ভিতর দিয়া বহিয়া চলিয়া গেল। পদ্মা পার হইল, পদ্মার চর পার হইল, তাহার পরবর্ত্তী সমস্ত সুপ্ত দেশ, গ্রাম, নগর পার হইয়া গেল—যেন তাহা চিরকাল ধরিয়া দেশদেশান্তর লোকলোকান্তর পার

হইয়া ক্রমশ ক্ষীণ, ক্ষীণতর, ক্ষীণতম হইয়া অসীম সুদূরে চলিয়া যাইতেছে,—ক্রমে যেন তাহা জন্মমৃত্যুর দেশ ছাড়াইয়া গেল—ক্রমে তাহা যেন সূচির অগ্রভাগের ন্যায় ক্ষীণতম হইয়া আসিল—এত ক্ষীণ শব্দ কখন শুনি নাই, কল্পনা করি নাই—আমার মাথার মধ্যে যেন অনন্ত আকাশ রহিয়াছে এবং সেই শব্দ যতই দূরে যাইতেছে, কিছুতেই আমার মস্তিষ্কের সীমা ছাড়াইতে পারিতেছে না ; অবশেষে যখন একান্ত অসহ্য হইয়া আসিল, তখন ভাবিলাম, আলো নিবাইয়া না দিলে ঘুমাইতে পারিব না। যেমন আলো নিবাইয়া শুইলাম, অমনি আমার মশারির পাশে, আমার কানের কাছে অন্ধকারে আবার সেই অবরুদ্ধ স্বর বলিয়া উঠিল—ও কে ও কে, ও কে ও কে গো। আমার বুকের রক্তের ঠিক সমান তালে ক্রমাগতই ধ্বনিত হইতে লাগিল—ও কে, ও কে, ও কে গো! ও কে, ও কে, ও কে গো! সেই গভীর রাত্রে নিস্তব্ধ বোটের মধ্যে আমার গোলাকার ঘড়িটাও সজীব হইয়া উঠিয়া তাহার ঘণ্টার কাঁটা মনোরমার দিকে প্রসারিত করিয়া শেল্‌ফের উপর হইতে তালে তালে বলিতে লাগিল, ও কে, ও কে, ও কে গো! ও কে, ও কে, ও কে গো!

বলিতে বলিতে দক্ষিণাবাবু পাংশুবর্ণ হইয়া আসিলেন, তাঁহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল। আমি তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া কহিলাম একটু জল খান। এমন সময় হঠাৎ আমার কেরাসিনের শিখাটা দপ্‌দপ্ করিতে করিতে নিবিয়া গেল। হঠাৎ দেখিতে পাইলাম, বাহিরে আলো হইয়াছে। কাক ডাকিয়া উঠিল।

দোয়েল শিশ্ দিতে লাগিল। আমার বাড়ির সম্মুখবর্ত্তী পথে একটা মহিষের গাড়ির ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ শব্দ জাগিয়া উঠিল। তখন দক্ষিণাবাবুর মুখের ভাব একেবারে বদল হইয়া গেল। ভয়ের কিছুমাত্র চিহ্ন রহিল না। রাত্রির কুহকে, কাল্পনিক শঙ্কার মত্ততার আমার কাছে যে এত কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন সে জন্য যেন অত্যন্ত লজ্জিত এবং আমার উপর আন্তরিক ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। শিষ্টসম্ভাষনমাত্র না করিয়া অকস্মাৎ উঠিয়া দ্রুতবেগে চলিয়া গেলেন।

সেই দিনই অর্দ্ধরাত্রে আবার আমার দ্বারে আসিয়া ঘা পড়িল---ডাক্তার! ডাক্তার!

জয় পরাজয়।

রাজকন্যার নাম অপরাজিতা। উদয়নারায়ণের সভাকবি শেখর তাঁহাকে কখনও চক্ষেও দেখেন নাই। কিন্তু যে দিন কোন নূতন কাব্য রচনা করিয়া সভাতলে বসিয়া রাজাকে শুনাইতেন, সেদিন কণ্ঠস্বর ঠিক এতটা উচ্চ করিয়া পড়িতেন, যাহাতে তাহা সেই সমুচ্চ গৃহের উপরিতলের বাতায়নবর্ত্তিনী অদৃশ্য শ্রোত্রীগণের কর্ণপথে প্রবেশ করিতে পারে। যেন তিনি কোন এক অগম্য নক্ষত্রলোকের উদ্দেশে আপনার সঙ্গীতোচ্ছ্বাস প্রেরণ করিতেন, যেখানে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে তাঁহার জীবনের একটি অপরিচিত শুভগ্রহ অদৃশ্য মহিমায় বিরাজ করিতেছেন।

কখন ছায়ার মতন দেখিতে পাইতেন, কখন নূপুরশিঞ্জনের মতন শুনা যাইত; বসিয়া বসিয়া মনে মনে ভাবিতেন, সে কেমন দুইখানি চরণ যাহাতে সেই সোনার নূপুর বাধা থাকিয়া তালে তালে গান গাহিতেছে! সেই দুইখানি রক্তিম শুভ্র কোমল চরণতল প্রতি পদক্ষেপে কি সৌভাগ্য কি অনুগ্রহ কি করুণার মত করিয়া পৃথিবীকে স্পর্শ করে। মনের মধ্যে সেই চরণ দুটি প্রতিষ্ঠা করিয়া কবি অবসরকালে সেইখানে আসিয়া লুটাইয়া পড়িত এবং সেই নূপুরশিঞ্জনের সুরে আপনার গান বাঁধিত।

কিন্তু যে ছায়া দেখিয়াছিল, সে কাহার ছায়া কাহার নূপুর এমন তর্ক এমন সংশয় তাহার ভক্তহৃদয়ে কখন উদয় হয় নাই।

রাজকন্যার দাসী মঞ্জরী যখন ঘাটে যাইত, শেখরের ঘরের সম্মুখ দিয়া তাহার পথ ছিল। আসিতে যাইতে কবির সঙ্গে তাহার দুটা কথা না হইয়া যাইত না। তেমন নির্জ্জন দেখিলে সে সকালে সন্ধ্যায় শেখরের ঘরের মধ্যে গিয়াও বসিত। যতবার সে ঘাটে যাইত, ততবার যে তাহার আবশ্যক ছিল, এমনও হইত না, যদি বা আবশ্যক ছিল এমন হয়, কিন্তু ঘাটে যাইবার সময় উহারই মধ্যে একটু বিশেষ যত্ন করিয়া একটা রঙীন্ কাপড় এবং কানে দুইটা আম্রমুকুল পরিবার কোন উচিত কারণ পাওয়া যাইত না।

লোকে হাসাহাসি কানাকানি করিত। লোকের কোন অপরাধ ছিল না। মঞ্জরীকে দেখিলে শেখর বিশেষ আনন্দলাভ করিতেন। তাহা গোপন করিতেও তাঁহার তেমন প্রয়াস ছিল না।

তাহার নাম ছিল মঞ্জরী; বিবেচনা করিয়া দেখিলে সাধারণ লোকের পক্ষে সেই নামই যথেষ্ট ছিল, কিন্তু শেখর আবার আরও একটু কবিত্ব করিয়া তাহাকে বসন্তমঞ্জরী বলিতেন। লোকে শুনিয়া বলিত, আ সর্ব্বনাশ!

আবার কবির বসন্ত-বর্ণনার মধ্যে—"মঞ্জুল বঞ্জুল মঞ্জরী" এমনতর অনুপ্রাসও মাঝে মাঝে পাওয়া যাইত। এমন কি, জনরব রাজার কানেও উঠিয়াছিল।

রাজা তাঁহার কবির এইরূপ রসাধিক্যের পরিচয় পাইয়া বড়ই আমোদ বোধ করিতেন—তাহা লইয়া কৌতুক করিতেন, শেখরও তাহাতে যোগ দিতেন।

রাজা হাসিয়া প্রশ্ন করিতেন, "ভ্রমর কি কেবল বসন্তের রাজসভায় গান গায়"—

কবি উত্তর দিতেন, "না, পুষ্পমঞ্জরীর মধুও খাইয়া থাকে।"

এমনি করিয়া সকলেই হাসিত, আমোদ করিত; বোধ করি অন্তঃপুরে রাজকন্যা অপরাজিতাও মঞ্জরীকে লইয়া মাঝে মাঝে উপহাস করিয়া থাকিবেন। মঞ্জরী তাহাতে অসন্তুষ্ট হইত না।

এমনি করিয়া সত্যে মিথ্যায় মিশাইয়া মানুষের জীবন এক-রকম করিয়া কাটিয়া যায়—খানিকটা বিধাতা গড়েন, খানিকটা আপনি গড়ে, খানিকটা পাঁচজনে গড়িয়া দেয়; জীবনটা একটা পাঁচমিশালি রকমের জোড়াতাড়া; প্রকৃত এবং অপ্রকৃত, কাল্পনিক এবং বাস্তবিক।

কেবল কবি যে গানগুলি গাহিতেন তাহাই সত্য এবং সম্পূর্ণ। গানের বিষয় সেই রাধা এবং কৃষ্ণ—সেই চিরন্তন নর এবং চিরন্তন নারী, সেই অনাদি দুঃখ এবং অনন্ত সুখ। সেই গানেই তাঁহার যথার্থ নিজের কথা ছিল—এবং সেই গানের যাথার্থ্য অমরাপুরের রাজা হইতে দীনদুঃখী প্রজা পর্য্যন্ত সকলেই আপনার হৃদয়ে হৃদয়ে পরীক্ষা করিয়াছিল। তাঁহার গান সকলেরই মুখে। জ্যোৎস্না উঠিলেই, একটু দক্ষিণা বাতাসের আভাস দিলেই অমনি দেশের চতুর্দ্দিকে কত কানন, কত পথ,

কত নৌকা, কত বাতায়ন, কত প্রাঙ্গণ হইতে তাঁহার রচিত গান উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত—তাঁহার খ্যাতির আর সীমা ছিল না।

এই ভাবে অনেক দিন কাটিয়া গেল। কবি কবিতা লিখিতেন, রাজা শুনিতেন, রাজসভার লোক বাহবা দিত, মঞ্জরী ঘাটে আসিত, এবং অন্তঃপুরের বাতায়ন হইতে কখন কখন একটা ছায়া পড়িত, কখন কখন একটা নূপুর শুনা যাইত।

৩

এমন সময়ে দাক্ষিণাত্য হইতে দিগ্বিজয়ী কবি শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত ছন্দে রাজার স্তবগান করিয়া রাজসভায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি স্বদেশ হইতে বাহির হইয়া পথিমধ্যে সমস্ত রাজকবিদিগকে পরাস্ত করিয়া অবশেষে অমরাপুরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

রাজা পরম সমাদরের সহিত কহিলেন "এহি, এহি!"

কবি পুণ্ডরীক দম্ভভরে কহিলেন "যুদ্ধং দেহি।"

রাজার মান রাখিতে হইবে—যুদ্ধ দিতে হইবে, কিন্তু কাব্যযুদ্ধ যে কিরূপ হইতে পারে শেখরের সে সম্বন্ধে ভালরূপ ধারণা ছিল না। তিনি অত্যন্ত চিন্তিত ও শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। রাত্রে নিদ্রা হইল না। যশস্বী পুণ্ডরীকের দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, সুতীক্ষ্ণ বক্রনাসা এবং দর্পোদ্ধত উন্নত মস্তক দিগ্বিদিকে অঙ্কিত দেখিতে লাগিলেন।

প্রাতঃকালে কম্পিতহৃদয় কবি রণক্ষেত্রে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। প্রত্যুষ হইতে সভাতল লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গেছে,

কলরবের সীমা নাই ; নগরে আর সমস্ত কাজকর্ম্ম একেবারে বন্ধ।

কবি শেখর বহুকষ্টে মুখে সহাস্য প্রফুল্লতার আয়োজন করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী কবি পুণ্ডরীককে নমস্কার করিলেন—পুণ্ডরীক প্রচণ্ড অবহেলাভরে নিতান্ত ইঙ্গিতমাত্রে নমস্কার ফিরাইয়া দিলেন এবং নিজের অনুবর্ত্তী ভক্তবৃন্দের দিকে চাহিয়া হাসিলেন।

শেখর একবার অন্তঃপুরের জালায়নের দিকে কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন, বুঝিতে পারিলেন সেখান হইতে আজ শত শত কৌতূহলপূর্ণ কৃষ্ণতারকার ব্যগ্রদৃষ্টি এই জনতার উপরে অজস্র নিপতিত হইতেছে। একবার একাগ্রভাবে চিত্তকে সেই উৰ্দ্ধলোকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া আপনার জয়লক্ষ্মীকে বন্দনা করিয়া আসিলেন, মনে মনে কহিলেন, "আমার যদি আজ জয় হয় তবে, হে দেবি, হে অপরাজিতা, তাহাতে তোমারি নামের সার্থকতা হইবে।"

তূরী ভেরী বাজিয়া উঠিল। জয়ধ্বনি করিয়া সমাগত সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল। শুক্লবসন রাজা উদয় নারায়ণ শরৎ-প্রভাতের শুভ্র মেঘরাশির ন্যায় ধীরগমনে সভায় প্রবেশ করিলেন এবং সিংহাসনে উঠিয়া বসিলেন।

পুণ্ডরীক উঠিয়া সিংহাসনের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বৃহৎ সভা স্তব্ধ হইয়া গেল।

বক্ষ বিস্ফারিত করিয়া গ্রীবা ঈষৎ ঊৰ্দ্ধে হেলাইয়া বিরাটমূর্ত্তি পুণ্ডরীক গম্ভীরস্বরে উদয়নারায়ণের স্তব পাঠ করিতে আরম্ভ

করিলেন। কণ্ঠস্বর ঘরে ধরে না—বৃহৎ সভাগৃহের চারিদিকের ভিত্তিতে স্তম্ভে ছাদে সমুদ্রের তরঙ্গের মত গম্ভীর মন্দ্রে আঘাত প্রতিঘাত করিতে লাগিল, এবং কেবল সেই ধ্বনির বেগে সমস্ত জনমণ্ডলীর বক্ষকবাট থর্ থর্ করিয়া স্পন্দিত হইয়া উঠিল। কত কৌশল, কত কারুকার্য্য, উদয়নারায়ণ নামের কতরূপ ব্যাখ্যা রাজার নামাক্ষরের কতদিক হইতে কতপ্রকার বিন্যাস, কত ছন্দ, কত যমক!

পুণ্ডরীক যখন শেষ করিয়া বসিলেন, কিছুক্ষণের জন্য নিস্তব্ধ সভাগৃহ তাঁহার কণ্ঠের প্রতিধ্বনি ও সহস্র হৃদয়ের নির্ব্বাক্ বিস্ময়-রাশিতে গম্ গম্ করিতে লাগিল। বহুদূর দেশ হইতে আগত পণ্ডিতগণ দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া উচ্ছ্বসিত স্বরে সাধু সাধু করিয়া উঠিলেন।

তখন সিংহাসন হইতে রাজা শেখরের মুখের দিকে চাহিলেন। শেখরও ভক্তি প্রণয় অভিমান এবং একপ্রকার সকরুণ সঙ্কোচপূর্ণ দৃষ্টি রাজার দিকে প্রেরণ করিল এবং ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। রাম যখন লোকরঞ্জনার্থে দ্বিতীয় বার অগ্নিপরীক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন তখন সীতা যেন এইরূপ ভাবে চাহিয়া এম্‌নি করিয়া করিয়া তাঁহার স্বামীর সিংহাসনের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলেন।

কবির দৃষ্টি নীরবে রাজাকে জানাইলেন—"আমি তোমারই! তুমি যদি বিশ্বসমক্ষে আমাকে দাঁড় করাইয়া পরীক্ষা করিতে চাও ত কর। কিন্তু—" তাহার পরে নয়ন নত করিলেন।

পুণ্ডরীক সিংহের মত দাঁড়াইয়াছিল, শেখর চারিদিকে ব্যাধ-

বেষ্টিত হরিণের মত দাঁড়াইল। তরুণ যুবক, রমণীর ন্যায় লজ্জা এবং স্নেহ-কোমল মুখ, পাণ্ডুবর্ণ কপোল, শরীরাংশ নিতান্ত স্বল্প, দেখিলে মনে হয় ভাবের স্পর্শমাত্রেই সমস্ত দেহ যেন, বীণার তারের মত কাঁপিয়া বাজিয়া উঠিবে।

শেখর মুখ না তুলিয়া প্রথমে অতি মৃদুস্বরে আরম্ভ করিলেন। প্রথম একটা শ্লোক বোধ হয় কেহ ভাল করিয়া শুনিতে পাইল না। তাহার পরে ক্রমে ক্রমে মুখ তুলিলেন—যেখানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন সেখান হইতে যেন সমস্ত জনতা এবং রাজসভার পাষাণ-প্রাচীর বিগলিত হইয়া বহুদূরবর্ত্তী অতীতের মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া গেল। সুমিষ্ট পরিষ্কার কণ্ঠস্বর কাঁপিতে কাঁপিতে উজ্জ্বল অগ্নিশিখার ন্যায় ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল। প্রথমে রাজার চন্দ্র-বংশীয় আদিপুরুষের কথা আরম্ভ করিলেন। ক্রমে ক্রমে কত যুদ্ধ বিগ্রহ শৌর্য্য বীর্য্য যজ্ঞ দান কত মহদনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া তাঁহার রাজকাহিনীকে বর্ত্তমান কালের মধ্যে উপনীত করিলেন। অবশেষে সেই দূরস্মৃতিবদ্ধ দৃষ্টিকে ফিরাইয়া আনিয়া রাজার মুখের উপর স্থাপিত করিলেন এবং রাজ্যের সমস্ত প্রজাহৃদয়ের একটা বৃহৎ অব্যক্ত প্রীতিকে ভাষায় ছন্দে মূর্ত্তিমান্ করিয়া সভার মাঝখানে দাঁড় করাইয়া দিলেন—যেন দূর দূরান্তর হইতে শত সহস্র প্রজার হৃদয়স্রোত ছুটিয়া আসিয়া রাজপিতামহদিগের এই অতি পুরাতন প্রাসাদকে মহাসঙ্গীতে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল—ইহার, প্রত্যেক ইষ্টককে যেন তাহারা স্পর্শ করিল, আলিঙ্গন করিল, চুম্বন করিল, ঊর্দ্ধে অন্তঃপুরের বাতায়ন সম্মুখে উত্থিত

হইয়া রাজলক্ষ্মী-স্বরূপা প্রাসাদলক্ষ্মীদের চরণতলে স্নেহার্দ্র ভক্তিভরে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল, এবং সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া রাজাকে এবং রাজার সিংহাসনকে মহামহোল্লাসে শত শতবার প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। অবশেষে বলিলেন। মহারাজ, বাক্যেতে হার মানিতে পারি কিন্তু ভক্তিতে কে হারাইবে! এই বলিয়া কম্পিতদেহে বসিয়া পড়িলেন। তখন অশ্রুজলে অভিষিক্ত প্রজাগণ জয় জয় রবে আকাশ কাঁপাইতে লাগিল।

সাধারণ জনমণ্ডলীর এই উন্মত্ততাকে ধিক্কারপূর্ণ হাস্যের দ্বারা অবজ্ঞা করিয়া পুণ্ডরীক আবার উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দৃপ্তগর্জ্জনে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাক্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কে? সকলে এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া গেল।

তখন তিনি নানা ছন্দে অদ্ভুত পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া বেদ বেদান্ত আগম নিগম হইতে প্রমাণ করিতে লাগিলেন— বিশ্বের মধ্যে বাক্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বাক্যই সত্য, বাক্যই ব্রহ্ম। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বাক্যের বশ—অতএব বাক্য তাঁহাদের অপেক্ষা বড়। ব্রহ্মা চারিমুখে বাক্যকে শেষ করিতে পারিতেছেন না—পঞ্চানন পাঁচমুখে বাক্যের অন্ত না পাইয়া অবশেষে নীরবে ধ্যানপরায়ণ হইয়া বাক্য খুঁজিতেছেন।

এম্‌নি করিয়া পাণ্ডিত্যের উপর পাণ্ডিত্য এবং শাস্ত্রের উপর শাস্ত্র চাপাইয়া বাক্যের জন্য একটা অভ্রভেদী সিংহাসন নির্ম্মাণ করিয়া বাক্যকে মর্ত্ত্যলোক এবং সুরলোকের মস্তকের উপর

বসাইয়া দিলেন এবং পুনর্ব্বার বজ্রনিনাদে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাক্যের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কে?

দর্পভরে চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিলেন; যখন কেহ কোন উত্তর দিল না তখন ধীরে ধীরে আসন গ্রহণ করিলেন। পণ্ডিতগণ সাধু সাধু ধন্য ধন্য করিতে লাগিল—রাজা বিস্মিত হইয়া রহিলেন এবং কবি শেখর এই বিপুল পাণ্ডিত্যের নিকটে আপনাকে ক্ষুদ্র মনে করিলেন। আজিকার মত সভা ভঙ্গ হইল।

৬

পরদিন শেখর আসিয়া গান আরম্ভ করিয়া দিলেন;—বৃন্দাবনে প্রথমে বাঁশি বাজিয়াছে, তখন গোপিনারা জানে না, কে বাজাইল—জানে না, কোথায় বাজিতেছে। একবার মনে হইল, দক্ষিণ পবনে বাজিতেছে, একবার মনে হইল উত্তরে গিরি-গোবৰ্দ্ধনের শিখর হইতে ধ্বনি আসিতেছে, মনে হইল, উদয়াচলের উপরে দাঁড়াইয়া কে মিলনের জন্য আহ্বান করিতেছে; মনে হইল অস্তাচলের প্রান্তে বসিয়া কে বিরহশোকে কাঁদিতেছে; মনে হইল যমুনার প্রত্যেক তরঙ্গ হইতে বাঁশি বাজিয়া উঠিল, মনে হইল আকাশের প্রত্যেক তারা যেন সেই বাঁশির ছিদ্র—অবশেষে কুঞ্জে কুঞ্জে, পথে ঘাটে, ফুলে ফলে, জলে স্থলে, উচ্চে নীচে, অন্তরে বাহিরে বাঁশি সর্ব্বত্র হইতে বাজিতে লাগিল—বাঁশি কি বলিতেছে তাহা কেহ বুঝিতে পারিল না, এবং বাঁশির উত্তরে হৃদয় কি বলিতে চাহে তাহাও কেহ স্থির করিতে পারিল না; কেবল দুটি চক্ষু ভরিয়া অশ্রুজল জাগিয়া উঠিল, এবং

একটি আলোক-সুন্দর শ্যামস্নিগ্ধ মরণের আকাঙ্ক্ষায় সমস্ত প্রাণ যেন উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল।

সভা ভুলিয়া, রাজা ভুলিয়া, আত্মপক্ষ প্রতিপক্ষ ভুলিয়া, যশ অপযশ, জয় পরাজয়, উত্তর প্রত্যুত্তর, সমস্ত ভুলিয়া শেখর আপনার নির্জ্জন হৃদয়কুঞ্জের মধ্যে যেন একলা দাঁড়াইয়া এই বাঁশির গান গাহিয়া গেলেন। কেবল মনে ছিল একটি জ্যোতির্ম্ময়ী মানসী মূর্ত্তি, কেবল কানে বাজিতেছিল দুটি কমলচরণের নূপুরধ্বনি। কবি যখন গান শেষ করিয়া হতজ্ঞানের মত বসিয়া পড়িলেন, তখন একটি অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যে একটি বৃহৎ ব্যাপ্ত বিরহব্যাকুলতায় সভাগৃহ পরিপূর্ণ হইয়া রহিল, কেহ সাধুবাদ দিতে পারিল না।

এই ভাবের প্রবলতার কিঞ্চিৎ উপশম হইলে পুণ্ডরীক সিংহাসন সম্মুখে উঠিলেন। প্রশ্ন করিলেন—রাধাই বা কে, কৃষ্ণই বা কে?—বলিয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং শিষ্যদের প্রতি চাহিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, "রাধাই বা কে, কৃষ্ণই বা কে?" বলিয়া অসামান্য পাণ্ডিত্য বিস্তার করিয়া আপনিই তাহার উত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন।

বলিলেন রাধা প্রণব, ওঁকার, কৃষ্ণ ধ্যান যোগ এবং বৃন্দাবন দুই ভ্রূর মধ্যবর্ত্তী বিন্দু। ইড়া, সুষুম্না, পিঙ্গলা, নাভিপদ্ম, হৃৎপদ্ম, ব্রহ্মরন্ধ্র, সমস্ত আনিয়া ফেলিলেন। রা অর্থেই বা কি, ধা অর্থেই বা কি, কৃষ্ণ শব্দের ক হইতে মূর্দ্ধন্য ণ পর্য্যন্ত প্রত্যেক অক্ষরের কত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হইতে পারে তাহার একে

একে মীমাংসা করিলেন। একবার বুঝাইলেন কৃষ্ণ যজ্ঞ, রাধিকা অগ্নি, একবার বুঝাইলেন কৃষ্ণ বেদ এবং রাধিকা ষড়্‌দর্শন, তাহার পরে বুঝাইলেন কৃষ্ণ শিক্ষা এবং রাধিকা দীক্ষা। রাধিকা তর্ক, কৃষ্ণ মীমাংসা ; রাধিকা উত্তর প্রত্যুত্তর, কৃষ্ণ জয়লাভ।

এই বলিয়া রাজার দিকে পণ্ডিতের দিকে এবং অবশেষে তীব্র হাস্তে শেখরের দিকে চাহিয়া পুণ্ডরীক বসিলেন।

রাজা পুণ্ডরীকের আশ্চর্য্য ক্ষমতায় মুগ্ধ হইয়া গেলেন, পণ্ডিতদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না, এবং কৃষ্ণ রাধার নব নব ব্যাখ্যায় বাঁশির গান, যমুনার কল্লোল, প্রেমের মোহ একেবারে দূর হইয়া গেল ; যেন পৃথিবীর উপর হইতে কে এক জন বসন্তের সবুজ রংটুকু মুছিয়া লইয়া আগাগোড়া পবিত্র গোময় লেপন করিয়া গেল। শেখর আপনার এতদিনকার সমস্ত গান বৃথা বোধ করিতে লাগিলেন, ইহার পরে তাঁহার আর গান গাহিবার সামর্থ্য রহিল না। সেদিন সভা ভঙ্গ হইল।

৪

পরদিন পুণ্ডরীক ব্যস্ত এবং সমস্ত, দ্বিব্যস্ত এবং দ্বিসমস্তক, বৃত্ত, তার্ক্ষ্য সৌত্র, চক্র, পদ্ম, কাকপদ, আদ্যুত্তর মধ্যোত্তর, অন্তোত্তর, বাক্যোত্তর, বচনগুপ্ত, মাত্রাচ্যুতক, চ্যুতদত্তাক্ষর, অর্থগূঢ়, স্তুতিনিন্দা, অপহ্নুতি, শুদ্ধাপভ্রংশ, শাব্দী, কালসার, প্রহেলিকা প্রভৃতি অদ্ভুত শব্দচাতুরী দেখাইয়া দিলেন। শুনিয়া সভাশুদ্ধ লোক বিস্ময় রাখিতে স্থান পাইল না।

শেখর যে সকল পদ রচনা করিতেন তাহা নিতান্ত সরল

—তাহা সুখে দুঃখে উৎসবে আনন্দে সর্ব্বসাধারণে ব্যবহার করিত আজ তাহারা স্পষ্ট বুঝিতে পারিল তাহাতে কোন গুণপনা নাই, যেন তাহা ইচ্ছা করিলেই তাহারাও রচনা করিতে পারিত, কেবল অনভ্যাস অনিচ্ছা অনবসর ইত্যাদি কারণেই পারে না—নহিলে কথাগুলো বিশেষ নূতন নহে, দুরূহও নহে তাহাতে পৃথিবীর লোকের নূতন একটা শিক্ষাও হয় না, সুবিধাও হয় না—কিন্তু আজ যাহা শুনিল তাহা অদ্ভুত ব্যাপার; কাল যাহা শুনিয়াছিল তাহাতেও বিস্তর চিন্তা এবং শিক্ষার বিষয় ছিল। পুণ্ডরীকের পাণ্ডিত্য ও নৈপুণ্যের নিকট তাহাদের আপনার কবিটিকে নিতান্ত বালক ও সামান্য লোক বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

মৎস্যপুচ্ছের তাড়নায় জলের মধ্যে যে গূঢ় আন্দোলন চলিতে থাকে, সরোবরের পদ্ম যেমন তাহার প্রত্যেক আঘাত অনুভব করিতে পারে, শেখর তেমনি তাঁহার চতুর্দ্দিকবর্ত্তী সভাস্থ জনের মনের ভাব হৃদয়ের মধ্যে বুঝিতে পারিলেন।

আজ শেষ দিন। আজ জয় পরাজয় নির্ণয় হইবে। রাজা তাঁহার কবির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তাহার অর্থ এই, আজ নিরুত্তর হইয়া থাকিলে চলিবে না—তোমার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে।

শেখর প্রান্তভাগে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কেবল এই ক'টি কথা বলিলেন—"বীণাপাণি শ্বেতভুজা, তুমি যদি তোমার কমলবন শূন্য করিয়া আজ মল্লভূমিতে আসিয়া দাঁড়াইলে তবে তোমার

চরণাসক্ত যে ভক্তগণ অমৃতপিপাসী, তাহাদের কি গতি হইবে ?” মুখ ঈষৎ উপরে তুলিয়া করুণ স্বরে বলিলেন, যেন শ্বেতভূজা বীণাপাণি নতনয়নে রাজান্তঃপুরে বাতায়ন সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন।

তখন পুণ্ডরীক উঠিয়া সশব্দে হাস্য করিলেন—এবং “শেখর” শব্দের শেষ দুই অক্ষর গ্রহণ করিয়া অনর্গল শ্লোক রচনা করিয়া গেলেন। বলিলেন পদ্মবনের সহিত খরের কি সম্পর্ক ? এবং সঙ্গীতে বিস্তর চর্চ্চাসত্ত্বেও উক্ত প্রাণী কিরূপ ফললাভ করিয়াছে ? আর সরস্বতীর অধিষ্ঠান ত পুণ্ডরীকেই ; মহারাজের অধিকারে তিনি কি অপরাধ করিয়াছিলেন, যে, এদেশে তাঁহাকে খর-বাহন করিয়া অপমান করা যাইতেছে ?

পণ্ডিতেরা এই প্রত্যুত্তরে উচ্চস্বরে হাসিতে লাগিলেন। সভাসদেরাও তাহাতে যোগ দিল—তাঁহাদের দেখা-দেখি সভাশুদ্ধ সমস্ত লোক—যাহারা বুঝিল এবং না বুঝিল—সকলেই হাসিতে লাগিল।

ইহার উপযুক্ত প্রত্যুত্তরের প্রত্যাশায় রাজা তাঁহার কবিসখাকে বারবার অঙ্কুশের ন্যায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টির দ্বারা তাড়না করিতে লাগিলেন। কিন্তু শেখর তাহার প্রতি কিছুমাত্র মনোযোগ না করিয়া অটলভাবে বসিয়া রহিলেন।

তখন রাজা শেখরের প্রতি মনে মনে অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া সিংহাসন হইতে নামিয়া আসিলেন—এবং নিজের কণ্ঠ হইতে মুক্তার মালা খুলিয়া পুণ্ডরীকের গলায় পরাইয়া দিলেন—সভাস্থ

সকলেই ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। অন্তঃপুর হইতে এককালে অনেকগুলি বলয় কঙ্কন নূপুরের শব্দ শুনা গেল—তাহাই শুনিয়া শেখর আসন ছাড়িয়া উঠিলেন এবং ধীরে ধীরে সভাগৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

৫

কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীর রাত্রি। ঘন অন্ধকার। ফুলের গন্ধ বহিয়া দক্ষিণের বাতাস উদার বিশ্ববন্ধুর ন্যায় মুক্ত বাতায়ন দিয়া নগরের ঘরে ঘরে প্রবেশ করিতেছে।

ঘরের কাষ্ঠমঞ্চ হইতে শেখর আপনার পুঁথিগুলি পাড়িয়া সম্মুখে স্তূপাকার করিয়া রাখিয়াছেন। তাহার মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া নিজের রচিত গ্রন্থগুলি পৃথক্ করিয়া রাখিলেন। অনেকদিনকার অনেক লেখা। তাহার মধ্যে অনেকগুলি রচনা তিনি নিজেই প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সেগুলি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া এখানে ওখানে পড়িয়া দেখিতে লাগিলেন। আজ তাঁহার কাছে ইহা সমস্তই অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইল।

নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, সমস্ত জীবনের এই কি সঞ্চয়! কতকগুলা কথা এবং ছন্দ এবং মিল! ইহার মধ্যে যে কোন সৌন্দর্য্য, মানবের কোন চির আনন্দ, কোন বিশ্বসঙ্গীতের প্রতিধ্বনি, তাঁহার হৃদয়ের কোন গভীর আত্ম প্রকাশ নিবদ্ধ হইয়া আছে আজ তিনি তাহা দেখিতে পাইলেন না। রোগীর মুখে যেমন কোন খাদ্যই রুচে না, তেমনি আজ তাঁহার হাতের

কাছে যাহা কিছু আসিল সমস্তই ঠেলিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলেন। রাজার মৈত্রী, লোকের খ্যাতি, হৃদয়ের দুরাশা, কল্পনার কুহক—আজ অন্ধকার রাত্রে সমস্তই শূন্য বিড়ম্বনা বলিয়া ঠেকিতে লাগিল।

তখন একটি করিয়া তাঁহার পুঁথি ছিঁড়িয়া সম্মুখের জ্বলন্ত অগ্নিভাণ্ডে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। হঠাৎ একটা উপহাসের কথা মনে উদয় হইল। হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"বড় বড় রাজারা অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া থাকেন—আজ আমার এ কাব্যমেধ যজ্ঞ!" কিন্তু তখনি মনে উদয় হইল, তুলনাটি ঠিক হয় নাই। অশ্বমেধের অশ্ব যখন সর্ব্বত্র বিজয়ী হইয়া আসে তখনি অশ্বমেধ হয়—আমার কবিত্ব যে দিন পরাজিত হইয়াছে আমি সেই দিন কাব্যমেধ করিতে বসিয়াছে -আরো বহুদিন পূর্ব্বে করিলেই ভাল হইত।

একে একে নিজের সকল গ্রন্থগুলিই অগ্নিতে সমর্পণ করিলেন। আগুন ধূধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলে কবি সবেগে দুই শূন্য হস্ত শূন্যে নিক্ষেপ করিতে করিতে বলিলেন—"তোমাকে দিলাম, তোমাকে দিলাম, তোমাকে দিলাম—হে সুন্দরি অগ্নিশিখা, তোমাকেই দিলাম। এতদিন তোমাকেই সমস্ত আহুতি দিয়া আসিতেছিলাম, আজ একেবারে শেষ করিয়া দিলাম। বহুদিন তুমি আমার হৃদয়ের মধ্যে জ্বলিতেছিলে, হে মোহিনী বহ্নিরূপিণি! যদি সোনা হইতাম ত উজ্জ্বল হইয়া উঠিতাম—কিন্তু আমি তুচ্ছ তৃণ, দেবি, তাই আজ ভস্ম হইয়া গিয়াছি।"

রাত্রি অনেক হইল। শেখর তাঁহার ঘরের সমস্ত বাতায়ন খুলিয়া দিলেন। তিনি যে যে ফুল ভালবাসিতেন সন্ধ্যাবেলা বাগান হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। সবগুলি শাদা ফুল, যুঁই, বেল এবং গন্ধরাজ। তাহারই মুঠা মুঠা লইয়া নির্ম্মল বিছানার উপর ছড়াইয়া দিলেন। ঘরের চারিদিকে প্রদীপ জ্বালাইলেন।

তাহার পর মধুর সঙ্গে একটি উদ্ভিদের বিষরস মিশাইয়া নিশ্চিন্তমুখে পান করিলেন—এবং ধীরে ধীরে আপনার শয্যায় গিয়া শয়ন করিলেন। শরীর অবশ এবং নেত্র মুদ্রিত হইয়া আসিল।

নূপুর বাজিল। দক্ষিণের বাতাসের সঙ্গে কেশগুচ্ছের একটা সুগন্ধ ঘরে প্রবেশ করিল।

কবি নিমীলিত নেত্রে কহিলেন, "দেবি, ভক্তের প্রতি দয়া করিলে কি? এতদিন পরে আজ কি দেখা দিতে আসিলে?"

একটি সুমধুর কণ্ঠে উত্তর শুনিলেন, "কবি, আসিয়াছি।"

শেখর চমকিয়া উঠিয়া চক্ষু মেলিলেন—দেখিলেন শয্যার সম্মুখে এক অপরূপ রমণীমূর্ত্তি।

মৃত্যু-সমাচ্ছন্ন বাষ্পাকুলনেত্রে স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাইলেন না। মনে হইল তাঁহার হৃদয়ের সেই ছায়াময়ী প্রতিমা অন্তর হইতে বাহির হইয়া মৃত্যুকালে তাঁহার মুখের দিকে স্থিরনেত্রে চাহিয়া আছে।

রমণী কহিলেন, "আমি রাজকন্যা অপরাজিতা।"

কবি প্রাণপণে উঠিয়া বসিলেন।

রাজকন্যা কহিলেন—"রাজা তোমার সুবিচার করেন নাই। তোমারই জয় হইয়াছে, কবি, তাই আমি আজ তোমাকে জয়মাল্য দিতে আসিয়াছি।" বলিয়া অপরাজিতা নিজের কণ্ঠ হইতে স্বহস্তরচিত পুষ্প-মালা খুলিয়া কবির গলায় পরাইয়া দিলেন। মরণাহত কবি শয্যার উপরে পড়িয়া গেলেন।

প্রতিহিংসা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মুকুন্দ বাবুদের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ানের পৌত্রী, বর্ত্তমান ম্যানেজারের স্ত্রী ইন্দ্রাণী অশুভ ক্ষণে বাবুদের বাড়িতে তাঁহাদের দৌহিত্রের বিবাহে বৌ-ভাতের নিমন্ত্রণে উপস্থিত ছিলেন।

তৎপূর্ব্বকার ইতিহাস সংক্ষেপে বলিয়া রাখিলে কথাটা পরিষ্কার হইবে।

এক্ষণে মুকুন্দ বাবুও ভূতপূর্ব্ব, তাঁহার দেওয়ান গৌরীকান্তও ভূতপূর্ব্ব; কালের আহ্বান অনুসারে উভয়ের কেহই স্বস্থানে সশরীরে বর্ত্তমান নাই। কিন্তু যখন ছিলেন তখন উভয়ের মধ্যে বন্ধন অত্যন্ত দৃঢ় ছিল। পিতৃমাতৃহীন গৌরীকান্তের যখন কোন জীবনোপায় ছিল না, তখন মুকুন্দলাল কেবলমাত্র মুখ দেখিয়া তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার উপরে নিজের ক্ষুদ্র বিষয় সম্পত্তি পর্য্যবেক্ষণের ভার দেন। কালে প্রমাণ হইল যে, মুকুন্দলাল ভুল করেন নাই। কীট যেমন করিয়া বল্মীক রচনা করে, স্বর্গকামী যেমন করিয়া পুণ্যসঞ্চয় করে, গৌরিকান্ত তেমনি করিয়া অশ্রান্ত যত্নে তিলে তিলে দিনে দিনে মুকুন্দলালের বিষয় বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। অবশেষে যখন তিনি কৌশলে আশ্চর্য্য

সুলভ মূল্যে তরফ বাঁকাগাড়ি ক্রয় করিয়া মুকুন্দলালের সম্পত্তিভুক্ত করিলেন, তখন হইতে মুকুন্দবাবুরা গণ্যমান্য জমিদার শ্রেণীতে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। প্রভুর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভৃত্যেরও উন্নতি হইল ;—অল্পে অল্পে তাঁহার কোঠাবাড়ি, জোতজমা, এবং পূজার্চ্চনা বিস্তার লাভ করিল। এবং যিনি এককালে সামান্য তহশীলদার শ্রেণীর ছিলেন, তিনিও সাধারণের নিকট দেওয়ানজি নামে পরিচিত হইলেন।

ইহাই ভূতপূর্ব্ব কালের ইতিহাস। বর্ত্তমান কালে মুকুন্দ বাবুর একটি পোষ্য পুত্র আছেন, তাঁহার নাম বিনোদবিহারী। এবং গৌরীকান্তের সুশিক্ষিত নাতজামাই অম্বিকাচরণ তাঁহাদের ম্যানেজারের কাজ করিয়া থাকেন। দেওয়ানজি তাঁহার পুত্র রমাকান্তকে বিশ্বাস করিতেন না—সেই জন্য বার্দ্ধক্যবশতঃ নিজে যখন কাজ ছাড়িয়া দিলেন তখন পুত্রকে লঙ্ঘন করিয়া নাত-জামাই অম্বিকাকে আপন কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

কাজকর্ম্ম বেশ চলিতেছে ; পূর্ব্বের আমলে যেমন ছিল এখনও সকলি প্রায় তেমনি আছে, কেবল একটা বিষয়ে একটু প্রভেদ ঘটিয়াছে ; এখন প্রভু ভৃত্যের সম্পর্ক কেবল কাজকর্ম্মের সম্পর্ক—হৃদয়ের সম্পর্ক নহে। পূর্ব্বকালে টাকা শস্তা ছিল এবং হৃদয়টাও কিছু সুলভ ছিল, এখন সর্ব্বসম্মতিক্রমে হৃদয়ের বাজে খরচটা একপ্রকার রহিত হইয়াছে ; নিতান্ত আত্মীয়ের ভাগেই টানাটানি পড়িয়াছে, তা বাহিরের লোক পাইবে কোথা হইতে।

ইতিমধ্যে বাবুদের বাড়িতে দৌহিত্রের বিবাহে বৌ-ভাতের নিমন্ত্রণে দেওয়ানজির পৌত্রী ইন্দ্রাণী গিয়া উপস্থিত হইল।

সংসারটা কৌতূহলী অদৃষ্টপুরুষের রাসায়নিক পরীক্ষাশালা! এখানে কতকগুলা বিচিত্র-চরিত্র মানুষ একত্র করিয়া তাহাদের সংযোগ বিয়োগে নিয়ত কত চিত্রবিচিত্র অভূতপূর্ব্ব ইতিহাস সৃজিত হইতেছে, তাহার আর সংখ্যা নাই।

এই বৌভাতের নিমন্ত্রণস্থলে, এই আনন্দকার্য্যের মধ্যে দুটি দুই রকমের মানুষের দেখা হইল এবং দেখিতে দেখিতে সংসারের অশ্রান্ত জালবুনানীর মধ্যে একটা নূতন বর্ণের সূত্র উঠিয়া পড়িল এবং একটা নূতন রকমের গ্রন্থি পড়িয়া গেল।

সকলের আহারাদি শেষ হইয়া গেলে ইন্দ্রাণী বৈকালের দিকে কিছু বিলম্বে মনিববাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। বিনোদের স্ত্রী নয়নতারা যখন বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিল, ইন্দ্রাণী গৃহকর্ম্মের ব্যস্ততা, শারীরিক অস্বাস্থ্য প্রভৃতি দুই চারিটা কারণ প্রদর্শন করিল, কিন্তু তাহা কাহারও সন্তোষজনক বোধ হইল না।

প্রকৃত কারণ যদিও ইন্দ্রাণী গোপন করিল তথাপি তাহা বুঝিতে কাহারও বাকি রহিল না। সে কারণটি এই,—মুকুন্দবাবুরা প্রভু, ধনী বটেন কিন্তু কুলমর্য্যাদায় গৌরীকান্ত তাঁহাদের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। ইন্দ্রাণী সে শ্রেষ্ঠতা ভুলিতে পারে না। সেই জন্য মনিবের বাড়ি পাছে খাইতে হয় এই ভয়ে সে যথেষ্ট বিলম্ব করিয়া গিয়াছিল। তাহার অভিসন্ধি বুঝিয়া তাহাকে

খাওয়াইবার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করা হইয়াছিল কিন্তু ইন্দ্রাণী পরাস্ত হইবার মেয়ে নহে, তাহাকে কিছুতেই খাওয়ান গেল না।

একবার মুকুন্দ এবং গৌরীকান্ত বর্ত্তমানের কুলাভিমান লইয়া ইহা অপেক্ষা বৃহত্তর বিপ্লব বাধিয়াছিল। সে ঘটনা এই স্থানে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ইন্দ্রাণী দেখিতে বড় সুন্দর। আমাদের ভাষায় সুন্দরীর সহিত স্থির সৌদামিনীর তুলনা প্রসিদ্ধ আছে। সে তুলনা অধিকাংশ স্থলেই খাটে না, কিন্তু ইন্দ্রাণীকে খাটে। ইন্দ্রাণী যেন আপনার মধ্যে একটা প্রবল বেগ এবং প্রখর জ্বালা একটি সহজ শক্তির দ্বারা অটল গাম্ভীর্য্যপাশে অতি অনায়াসে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। বিদ্যুৎ তাহার মুখে চক্ষে এবং সর্ব্বাঙ্গে নিত্যকাল ধরিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে। এখানে তাহার চপলতা নিষিদ্ধ।

এই সুন্দরী মেয়েটিকে দেখিয়া মুকুন্দ বাবু তাঁহার পোষ্য পুত্রের সহিত ইহার বিবাহ দিবার প্রস্তাব গৌরীকান্তের নিকট উত্থাপিত করিয়াছিলেন। প্রভুভক্তিতে গৌরীকান্ত কাহারও নিকটে ন্যূন ছিলেন না; তিনি প্রভুর জন্য প্রাণ দিতে পারিতেন; এবং তাঁহার অবস্থার যতই উন্নতি হউক এবং কর্ত্তা তাহার প্রতি বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিয়া তাঁহাকে যতই প্রশ্রয় দিন তিনি কখনও ভ্রমেও স্বপ্নে প্রভুর সম্মান বিস্মৃত হন নাই; প্রভুর সম্মুখে, এমন কি, প্রভুর প্রসঙ্গে তিনি যেন সন্নত হইয়া পড়িতেন—কিন্তু এই বিবাহের প্রস্তাবে তিনি কিছুতেই সম্মত হন নাই। প্রভু-ভক্তির দেনা তিনি কড়ায় গণ্ডায় শোধ করিতেন, কুলমর্য্যাদার

পাওনা তিনি ছাড়িবেন কেন! মুকুন্দলালের পুত্রের সহিত তিনি তাঁহার পৌত্রীর বিবাহ দিতে পারেন না।

ভৃত্যের এই কুলগর্ব্ব মুকুন্দলালের ভাল লাগে নাই। তিনি আশা করিয়াছিলেন এই প্রস্তাবের দ্বারা তাঁহার ভক্ত সেবকের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করা হইবে; গৌরীকান্ত যখন কথাটা সে ভাবে লইলেন না তখন মুকুন্দলাল কিছুদিন তাঁহার সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত মনঃকষ্ট দিয়াছিলেন। প্রভুর এই বিমুখভাব গৌরীকান্তের বক্ষে মৃত্যুশেলের ন্যায় বাজিয়াছিল কিন্তু তথাপি তিনি তাঁহার পৌত্রীর সহিত পিতৃমাতৃহীন দরিদ্র কুলীনসন্তানের বিবাহ দিয়া তাহাকে ঘরে পালন করিয়া নিজের অর্থে শিক্ষা দান করিতে লাগিলেন।

সেই কুলমদগর্ব্বিত পিতামহের পৌত্রী ইন্দ্রাণী তাহার প্রভুগৃহে গিয়া আহার করিল না; ইহাতে তাহার প্রভুপত্নী নয়নতারার অন্তঃকরণে সুমধুর প্রীতিরস উদ্বেলিত হইয়া উঠে নাই সে কথা বলা বাহুল্য। তখন ইন্দ্রাণীর অনেকগুলি স্পর্দ্ধা নয়নতারার বিদ্বেষকষায়িত কল্পনাচক্ষে প্রকাশ পাইতে লাগিল।

প্রথম, ইন্দ্রাণী অনেক গহনা পরিয়া অত্যন্ত সুসজ্জিত হইয়া আসিয়াছিল। মনিববাড়িতে এত ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর করিয়া প্রভুদের সহিত সমকক্ষতা দেখাইবার কি আবশ্যক ছিল?

দ্বিতীয়, ইন্দ্রাণীর রূপের গর্ব্ব। ইন্দ্রাণীর রূপটা ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, এবং নিম্নপদস্থ ব্যক্তির এত অধিক রূপ থাকা অনাবশ্যক এবং অন্যায় হইতে পারে কিন্তু তাহার গর্ব্বটা

সম্পূর্ণ নয়নতারার কল্পনা। রূপের জন্য কাহাকেও দোষী করা যায় না, এই জন্য নিন্দা করিতে হইলে অগত্যা গর্ব্বের অবতারণা করিতে হয়।

তৃতীয়, ইন্দ্রাণীর দাম্ভিকতা,—চলিত ভাষায় যাহাকে বলে দেমাক্। ইন্দ্রাণীর একটি স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য ছিল। অত্যন্ত প্রিয় পরিচিত ব্যক্তি ব্যতীত সে কাহারও সহিত মাথামাখি করিতে পারিত না। তাহা ছাড়া গায়ে পড়িয়া একটা সোরগোল করা, অগ্রসর হইয়া সকল কাজে হস্তক্ষেপ করিতে যাওয়া সেও তাহার স্বভাবসিদ্ধ ছিলনা।

এইরূপ নানাপ্রকার অমূলক ও সমূলক কারণে নয়নতারা ক্রমশঃ উত্তপ্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। এবং অনাবশ্যক সূত্রে ধরিয়া ইন্দ্রাণীকে "আমাদের ম্যানেজারের স্ত্রী" "আমাদের দেওয়ানের নাত্‌নী" বলিয়া বারম্বার পরিচিত ও অভিহিত করিতে লাগিল। তাহার একজন প্রিয় মুখরা দাসীকে শিখাইয়া দিল—সে ইন্দ্রাণীর গায়ের উপর পড়িয়া পরম সখীভাবে তাহার গহনাগুলি হাত দিয়া নাড়িয়া নাড়িয়া সমালোচনা করিতে লাগিল, ---কণ্ঠী এবং বাজুবন্দের প্রশংসা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ ভাই, এ কি গিল্টিকরা ?"

ইন্দ্রাণী পরম গম্ভীর মুখে কহিল, "না, এ পিতলের !"

নয়নতারা ইন্দ্রাণীকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "ওগো, তুমি ওখানে একলা দাঁড়িয়ে কি করচ, এই খাবারগুলো হাটখোলার পাল্কীতে তুলে দিয়ে এস না।" অদূরে বাড়ির দাসী উপস্থিত ছিল।

ইন্দ্রাণী কেবল মুহূর্ত্তকালের জন্য তাহার বিপুলপক্ষ্মছায়াগভীর উদার দৃষ্টি মেলিয়া নয়নতারার মুখের দিকে চাহিল এবং পরক্ষণেই নীরবে মিষ্টান্নপূর্ণ সরা, খুরি তুলিয়া লইয়া হাটখোলার পাল্কীর উদ্দেশে নীচে চলিল।

যিনি এই মিষ্টান্ন উপহার প্রাপ্ত হইয়াছেন তিনি শশব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "তুমি কেন ভাই কষ্ট করচ, দাও না ঐ দাসার হাতে দাও!"

ইন্দ্রাণী তাহাতে সম্মত না হইয়া কহিলেন, "এতে আর কষ্ট কিসের!"

অপরা কহিলেন, "তবে ভাই, আমার হাতে দাও!"

ইন্দ্রাণী কহিলেন, "না, আমিই নিয়ে যাচ্চি!"

বলিয়া, অন্নপূর্ণা যেমন স্নিগ্ধগম্ভীর মুখে সমুচ্চ স্নেহে ভক্তকে স্বহস্তে অন্ন তুলিয়া দিতে পারিতেন, তেমনি অটল স্নিগ্ধভাবে তিনি পাল্কীতে মিষ্টান্ন রাখিয়া আসিলেন—এবং সেই দুই মিনিটকালের সংস্রবে হাটখোলাবাসিনী ধনিগৃহ-বধূ এই অল্পভাষিণী মিতহাসিনী ইন্দ্রাণীর সহিত জন্মের মত প্রাণের সখীত্ব স্থাপনের জন্য উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

এইরূপে নয়নতারা স্ত্রীজনসুলভ নিষ্ঠুর নৈপুণ্যের সহিত যতগুলি অপমানশর বর্ষণ করিল ইন্দ্রাণী তাহার কোনটাকেই গায়ে বিঁধিতে দিল না;—সকলগুলিই তাহার অকলঙ্ক সমুজ্জ্বল সহজ তেজস্বিতার কঠিন বর্ম্মে ঠেকিয়া আপনি ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল। তাহার গম্ভীর অবিচলতা দেখিয়া নয়নতারার

আক্রোশ আরও বাড়িয়া উঠিতে লাগিল এবং ইন্দ্রাণী তাহা বুঝিতে পারিয়া এক সময় অলক্ষ্যে কাহারও নিকট বিদায় না লইয়া বাড়ি চলিয়া আসিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

যাহারা শান্তভাবে সহ্য করে তাহারা গভীরতররূপে আহত হয়; অপমানের আঘাত ইন্দ্রাণী যদিও অসীম অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, তথাপি তাহা তাহার অন্তরে বাজিয়াছিল।

ইন্দ্রাণীর সহিত যেমন বিনোদবিহারীর বিবাহের প্রস্তাব হইয়াছিল তেমনি এক সময় ইন্দ্রাণীর এক দূর সম্পর্কের নিঃস্ব পিস্তুতো ভাই বামাচরণের সহিত নয়নতারার বিবাহের কথা হয়;—সেই বামাচরণ এখন বিনোদের সেরেস্তায় একজন সামান্য কর্ম্মচারী। ইন্দ্রাণীর এখনো মনে পড়ে, বাল্যকালে একদিন নয়নতারার বাপ নয়নকে সঙ্গে করিয়া তাঁহাদের বাড়িতে আসিয়া বামাচরণের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহের জন্য গৌরীকান্তকে বিস্তর অনুনয় বিনয় করিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষে ক্ষুদ্র বালিকা নয়নতারার অসামান্য প্রগল্‌ভতায় গৌরীকান্তের অন্তঃপুরে সকলেই আশ্চর্য্য এবং কৌতুকান্বিত হইয়াছিলেন, এবং তাহার সেই

অকালপক্কতার নিকট মুখচোরা লাজুক ইন্দ্রাণী নিজেকে নিতান্ত অক্ষমা অনভিজ্ঞা জ্ঞান করিয়াছিল। গৌরীকান্ত সেই মেয়েটির অনর্গল কথায় বার্ত্তায় এবং চেহারায় বড়ই খুসী হইয়াছিলেন কিন্তু কুলের যৎকিঞ্চিৎ ত্রুটি থাকায় বামাচরণের সহিত ইহার বিবাহ প্রস্তাবে মত দিলেন না। অবশেষে তাঁহারই পছন্দে এবং তাঁহারই চেষ্টায় অকুলীন বিনোদের সহিত নয়নতারার বিবাহ হয়।

এই সকল কথা মনে করিয়া ইন্দ্রাণী কোন সান্ত্বনা পাইল না, বরং অপমান আরও বেশী করিয়া বাজিতে লাগিল। মহাভারতে বর্ণিত শুক্রাচার্য্যদুহিতা দেবযানী এবং শর্ম্মিষ্ঠার কথা মনে পড়িল। দেবযানী যেমন তাহার প্রভুকন্যা শর্ম্মিষ্ঠার দর্পচূর্ণ করিয়া তাহাকে দাসী করিয়াছিল, ইন্দ্রাণী যদি তেমনি করিতে পারিত তবেই যথোপযুক্ত বিধান হইত। এক সময় ছিল, যখন দৈত্যদের নিকট দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের ন্যায় মুকুন্দ বাবুর পরিবারবর্গের নিকট তাহার পিতামহ গৌরীকান্ত একান্ত আবশ্যক ছিলেন। তখন তিনি যদি ইচ্ছা করিতেন তবে মুকুন্দ বাবুকে হীনতা স্বীকার করাইতে পারিতেন—কিন্তু তিনিই মুকুন্দলালের বিষয়-সম্পত্তিকে উন্নতির চরম সীমায় উত্তীর্ণ করিয়া দিয়া সর্ব্বপ্রকার শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, অতএব আজ আর তাঁহাকে স্মরণ করিয়া প্রভুদের কৃতজ্ঞ হইবার আবশ্যকতা নাই। ইন্দ্রাণী মনে করিল, বাঁকাগাড়ি পরগণা তাহার পিতামহ অনায়াসে নিজের জন্যই কিনিতে পারিতেন, তখন তাঁহার সে ক্ষমতা জন্মিয়াছিল, তাহা

না করিয়া তিনি সেটা মনিবকে কিনিয়া দিলেন—ইহা যে এক-প্রকার দান করা সে কথা কি আজ সেই মনিবের বংশে কেহ মনে করিয়া রাখিয়াছে? আমাদেরই দত্ত ধনমানের গর্ব্বে তোমরা আমাদিগকে আজ অপমান করিবার অধিকার পাইয়াছ ইহাই মনে করিয়া ইন্দ্রাণীর চিত্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া সে দেখিল তাহার স্বামী প্রভুগৃহের নিমন্ত্রণ ও তাহার পরে জমিদারী কাছারির সমস্ত কাজকর্ম্ম সারিয়া তাঁহার শয়নকক্ষের একটি কেদারা আশ্রয় করিয়া নিভৃতে খবরের কাগজ পাঠ করিতেছেন।

অনেকের ধারণা আছে যে স্বামী স্ত্রীর স্বভাব প্রায়ই একরূপ হইয়া থাকে। তাহার কারণ, দৈবাং কোন কোন স্থলে স্বামী-স্ত্রীর স্বভাবের মিল দেখিতে পাইলে সেটা আমাদের নিকট এমন সমুচিত এবং সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় যে, আমরা আশা করি এই নিয়ম বুঝি অধিকাংশ স্থলেই খাটে। যাহা হউক, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে অম্বিকাচরণের সহিত ইন্দ্রাণীর দুই একটা বিশেষ বিষয়ে বাস্তবিক স্বভাবের মিল দেখা যায়। অম্বিকাচরণ তেমন মিশুক্ লোক নহেন। তিনি বাহিরে যান কেবলমাত্র কাজ করিতে। নিজের কাজ সম্পূর্ণ শেষ করিয়া এবং অন্যকে পূরামাত্রায় কাজ করাইয়া লইয়া বাড়ি আসিয়া যেন তিনি অনাত্মীয়তার আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য এক দুর্গম দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করেন। বাহিরে তিনি এবং তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম, ঘরের মধ্যে তিনি এবং তাঁহার ইন্দ্রাণী, ইহাতেই তাঁহার সমস্ত জীবন পর্য্যাপ্ত।

ভূষণের ছটা বিস্তার করিয়া যখন সুসজ্জিতা ইন্দ্রাণী ঘরে প্রবেশ করিলেন, তখন অম্বিকাচরণ তাঁহাকে পরিহাস করিয়া কি একটা কথা বলিবার উপক্রম করিলেন, কিন্তু সহসা ক্ষান্ত হইয়া চিন্তিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার কি হয়েচে?"

ইন্দ্রাণী তাঁহার সমস্ত চিন্তা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া কহিলেন, "কি আর হবে? সম্প্রতি আমার স্বামী রত্নের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েচে।"

অম্বিকা খবরের কাগজ ভূমিতলে ফেলিয়া দিয়া কহিলেন—"সে ত আমার অগোচর নেই। তৎপূর্ব্বে?

ইন্দ্রাণী একে একে গহনা খুলিতে খুলিতে বলিলেন, "তৎ-পূর্ব্বে স্বামিনীর কাছ থেকে সমাদর লাভ হয়েচে।"

অম্বিকা জিজ্ঞাসা করিলেন—"সমাদরটা কি রকমের?"

ইন্দ্রাণী স্বামীর কাছে আসিয়া তাঁহার কেদারার হাতার উপর বসিয়া তাঁহার গ্রীবা বেষ্টন করিয়া উত্তর করিল, "তোমার কাছ থেকে যে রকমের পাই ঠিক সেই রকমের নয়।"

তাহার পর, ইন্দ্রাণী একে একে সকল কথা বলিয়া গেল। সে মনে করিয়াছিল স্বামীর কাছে এ সকল অপ্রিয় কথার উত্থাপন করিবে না; কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইল না, এবং ইহার অনুরূপ প্রতিজ্ঞাও ইন্দ্রাণী ইতিপূর্ব্বে কখনও রক্ষা করিতে পারে নাই। বাহিরের লোকের নিকট ইন্দ্রাণী যতই সংযত সমাহিত হইয়া থাকিত, স্বামীর নিকটে সে সেই পরিমাণে আপন প্রকৃতির

সমুদয় স্বাভাবিক বন্ধন মোচন করিয়া ফেলিত—সেখানে লেশমাত্র আত্মগোপন করিতে পারিত না।

অম্বিকাচরণ সমস্ত ঘটনা শুনিয়া মর্ম্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, এখনি আমি কাজে ইস্তফা দিব। তৎক্ষণাৎ তিনি বিনোদ বাবুকে এক কড়া চিঠি লিখিতে উদ্যত হইলেন।

ইন্দ্রাণী তখন চৌকির হাতা হইতে নীচে নামিয়া মাদুরপাতা মেজের উপর স্বামীর পায়ের কাছে বসিয়া তাঁহার কোলের উপর বাহু রাখিয়া বলিল—"এত তাড়াতাড়ি কাজ নেই। চিঠি আজ থাক্। কাল সকালে যা হয় স্থির কোরো।"

অম্বিকা উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া কহিলেন, "না, আর এক দণ্ড বিলম্ব করা উচিত নয়।"

ইন্দ্রাণী তাহার পিতামহের হৃদয়মৃণালে একটিমাত্র পদ্মের মত ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার অন্তর হইতে সে যেমন স্নেহরস আকর্ষণ করিয়া লইয়াছিল তেমনি পিতামহের চিত্তসঞ্চিত অনেকগুলি ভাব সে অলক্ষ্যে গ্রহণ করিয়াছিল। মুকুন্দলালের পরিবারের প্রতি গৌরীকান্তের যে একটি নিষ্ঠা ও ভক্তি ছিল ইন্দ্রাণী যদিও তাহা সম্পূর্ণ প্রাপ্ত হয় নাই, কিন্তু প্রভুপরিবারের হিতসাধনে জীবন অর্পণ করা যে তাহাদের কর্ত্তব্য, এই ভাবটি তাহার মনে দৃঢ় বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। তাহার সুশিক্ষিত স্বামী ইচ্ছা করিলে ওকালতী করিতে পারিতেন, সম্মানজনক কাজ লইতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহার স্ত্রীর হৃদয়ের দৃঢ় সংস্কার অনুসরণ করিয়া তিনি অনন্যমনে সন্তুষ্টচিত্ত বিনোদের বিষয়-

সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন। ইন্দ্রাণী যদিও অপমানে আহত হইয়াছিল, তথাপি তাহার স্বামী যে বিনোদলালের কাজ ছাড়িয়া দিবে এ তাহার কিছুতেই মনে লইল না।

ইন্দ্রাণী তখন যুক্তির অবতারণা করিয়া মৃদু মিষ্ট স্বরে কহিল,—"বিনোদ বাবুর ত কোন দোষ নেই, তিনি এর কিছুই জানেন না—তাঁর স্ত্রীর উপর রাগ করে তুমি হঠাৎ তাড়াতাড়ি তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করিতে যাবে কেন।

শুনিয়া অম্বিকা বাবু উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন,—নিজের সংকল্প তাঁহার নিকট অত্যন্ত হাস্যকর বলিয়া বোধ হইল। তিনি কহিলেন, "সে একটা কথা বটে! কিন্তু মনিব হোন আর যিনিই হোন্ ওদের ওখানে আর কখন তোমাকে পাঠাচ্চিনে।"

এই অল্প একটু ঝড়েই সেদিনকার মত মেঘ কাটিয়া গেল, গৃহ প্রসন্ন হইয়া উঠিল এবং স্বামীর বিশেষ আদেরে ইন্দ্রাণী বাহিরের সমস্ত অনাদর বিস্মৃত হইয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিনোদবিহারী অম্বিকাচরণের উপর সম্পূর্ণ ভার দিয়া জমিদারীর: কাজ কিছুই দেখিতেন না নিতান্ত-নির্ভর ও অতিনিশ্চয়তা-বশতঃ কোন কোন স্বামী ঘরের স্ত্রীকে যেরূপ অবহেলার চক্ষে দেখিয়া থাকে, নিজের জমিদারীর প্রতিও বিনোদের কতকটা

সেই ভাবের উপেক্ষা ছিল। জমিদারীর আয় এতই নিশ্চিত এতই বাঁধা যে তাহাকে আয় বলিয়া বোধ হয় না—তাহা অভ্যস্ত এবং তাহার কোন আকর্ষণ ছিল না।

বিনোদের ইচ্ছা ছিল, একটা সংক্ষেপ সুড়ঙ্গপথ অবলম্বন করিয়া হঠাৎ এক রাত্রির মধ্যে কুবেরের ভাণ্ডারের মধ্যে প্রবেশ করিবেন। সেই জন্য নানা লোকের পরামর্শে তিনি গোপনে নানা প্রকার আজ্‌গবী ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিতেন। কখনও স্থির হইত দেশের সমস্ত বাব্‌লা গাছ জমা লইয়া গোরুর গাড়ির চাকা তৈরি করিবেন, কখনও পরামর্শ হইত সুন্দর বনের সমস্ত মধুচক্র তিনি আহরণ করিবেন, কখনও লোক পাঠাইয়া পশ্চিম প্রদেশের বনগুলি বন্দোবস্ত করিয়া হরীতকার ব্যবসায় একচেটে করিবার আয়োজন হইত। বিনোদ মনে মনে ইহা বুঝিতেন যে, অন্য লোক শুনিলে হাসিবে, সেই জন্য কাহারও কাছে প্রকাশ করিতে চাহিতেন না। বিশেষতঃ অম্বিকাচরণকে তিনি একটু বিশেষ লজ্জা করিতেন ; অম্বিকা পাছে মনে করেন তিনি টাকাগুলো নষ্ট করিতে বসিয়াছেন সেজন্য মনে মনে সঙ্কুচিত ছিলেন। অম্বিকার নিকট তিনি এমনভাবে থাকিতেন যেন অম্বিকাই জমিদার এবং তিনি কেবল বসিয়া থাকিবার জন্য বার্ষিক কিছু বেতন পাইতেন।

নিমন্ত্রণের পরদিন হইতে নয়নতারা তাঁহার স্বামীর কানে মন্ত্র দিতে লাগিলেন। তুমি ত নিজে কিছুই দেখ না, তোমাকে অম্বিকা হাত তুলিয়া যাহা দেয় তাহাই শিরোধার্য্য করিয়া লও ;

এদিকে ভিতরে ভিতরে কি সর্ব্বনাশ হইতেছে তাহা কেহই জানে না। তোমার ম্যানেজারের স্ত্রী যা গয়না পরিয়া আসিয়াছিল, এমন গয়না তোমার ঘরে আসিয়া আমি কখনো চক্ষেও দেখি নাই। এ সব গয়না সে পায় কোথা হইতে এবং এই দেমাকই বা তাহার বাড়িল কিসের জোরে! ইত্যাদি ইত্যাদি গহনার বর্ণনা নয়নতারা অনেকটা অতিরঞ্জিত করিয়া বলিল, এবং ইন্দ্রাণী নিজমুখে তাহার দাসীকে কি সকল কথা বলিয়া গেছে তাহাও সে বহুল পরিমাণে রচনা করিয়া গেল।

বিনোদ দুর্ব্বল প্রকৃতির লোক—একদিকে সে পরের প্রতি নির্ভয় করিয়াও থাকিতে পারে না, অপরদিকে যে তাহার কানে যেরূপ সন্দেহ তুলিয়া দেয় সে তাহাই বিশ্বাস করিয়া বসে। ম্যানেজার যে চুরি করিতেছে মুহূর্ত্তকালের মধ্যেই এ বিশ্বাস তাহার দৃঢ় হইল। বিশেষতঃ কাজ সে নিজে দেখে না বলিয়া কল্পনায় সে নানাপ্রকার বিভীষিকা দেখিতে লাগিল—অথচ কেমন করিয়া ম্যানেজারের চুরি ধরিতে হইবে তাহারও রাস্তা সে জানে না। স্পষ্ট করিয়া তাহাকে কিছু বলিতে পারে এমন সাহস নাই— মহা মুস্কিল হইল।

অম্বিকাচরণের একাধিপত্যে কর্ম্মচারিগণ সকলেই ঈর্ষ্যান্বিত ছিল। বিশেষতঃ গৌরীকান্ত তাঁহার যে দূরসম্পর্কীয় ভাগিনেয় বামাচরণকে কাজ দিয়াছিলেন অম্বিকার প্রতি বিদ্বেষ তাহারই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল। কারণ, সম্পর্ক প্রভৃতি অনুসারে সে নিজেকে অম্বিকার সমান জ্ঞান করিত এবং অম্বিকা তাহার

আত্মীয় হইয়াও কেবলমাত্র ঈর্ষ্যাবশতঃই তাহাকে উচ্চপদ দিতেছে না, এ ধারণা তাহার দৃঢ় ছিল। পদ পাইলেই পদের উপযুক্ত যোগ্যতা আপনি যোগায় এই তাহার মত। বিশেষত ম্যানেজারের কাজকে সে অত্যন্ত তুচ্ছজ্ঞান করিত; বলিত, সেকালে রথের উপর যেমন ধ্বজা থাকিত, আজকাল আপিসের কাজে ম্যানেজার সেইরূপ—ঘোড়াবেটা খাটিয়া মরে আর ধ্বজা মহাশয় রথের সঙ্গে সঙ্গে কেবল দর্পভরে দুলিতে থাকেন।

বিনোদ ইতিপূর্ব্বে কাজকর্ম্মের কোন খোঁজখবর লইত না— কেবল যখন ব্যবসা উপলক্ষে হঠাৎ অনেক টাকার প্রয়োজন হইত তখন গোপনে খাজাঞ্চিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিত, এখন তহবিলে কত টাকা আছে? খাজাঞ্চি টাকার পরিমাণ বলিলে কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া সে টাকাটা চাহিয়া ফেলিত—যেন তাহা পরের টাকা। খাজাঞ্চি তাহার নিকট সই লইয়া টাকা দিত তাহার পরে কিছু কাল ধরিয়া অম্বিকা বাবুর নিকট বিনোদ কুণ্ঠিত হইয়া থাকিত। কোন মতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না হইলেই আরাম বোধ করিত।

অম্বিকাচরণ মাঝে মাঝে ইহা লইয়া বিপদে পড়িতেন। কারণ জমিদারের অংশ জমিদারকে দিয়া তহবিলে প্রায় আমানতী সদরখাজনা, অথবা আমলাবর্গের বেতন প্রভৃতি খরচের টাকা জমা থাকিত। সে টাকা অন্যায় ব্যয় হইয়া গেলে বড়ই অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। কিন্তু বিনোদ টাকাটি লইয়া এমনি চোরের মত লুকাইয়া বেড়াইত, যে, তাহাকে এ সম্বন্ধে কোন কথা

বলিবার অবসর পাইয়া যাইত না—পত্র লিখিলেও কোন ফল হইত না—কারণ, লোকটার কেবল চক্ষুলজ্জা ছিল আর কোন লজ্জা ছিল না, এই জন্য সে কেবল সাক্ষাৎকারকে ডরাইত।

ক্রমে যখন বিনোদ বাড়াবাড়ি করিতে লাগিল, তখন অম্বিকাচরণ বিরক্ত হইয়া লোহার সিন্ধুকের চাবি নিজের কাছে রাখিলেন। বিনোদের গোপনে টাকা লওয়া একেবারে বন্ধ হইল। অথচ লোকটা এতই দুর্ব্বলপ্রকৃতি যে, প্রভু হইয়াও স্পষ্ট করিয়া এ সম্বন্ধে কোন প্রকার বল খাটাইতে পারিল না। অম্বিকাচরণের বৃথা চেষ্টা! অলক্ষ্মী যাহার সহায় লোহার সিন্ধুকের চাবি তাহার টাকা আটক করিয়া রাখিতে পারে না। বরং হিতে বিপরীত হইল। কিন্তু সে সকল কথা পরে হইবে।

অম্বিকাচরণের কড়া নিয়মে বিনোদ ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত উত্যক্ত হইয়াছিল। এমন সময় নয়নতারা যখন তাহার মনে সন্দেহ জন্মাইয়া দিল তখন সে কিছু খুসি হইল। গোপনে একে একে নিম্নতন কর্ম্মচারীদিগকে ডাকিয়া সন্ধান লইতে লাগিল। তখন বামাচরণ তাহার প্রধান চর হইয়া উঠিল।

গৌরীকান্তের আমলে দেওয়ানজি বলপূর্ব্বক পার্শ্ববর্ত্তী জমিদারের জমিতে হস্তক্ষেপ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না এমন করিয়া তিনি অনেকের অনেক জমি অপহরণ করিয়াছেন। কিন্তু অম্বিকাচরণ কখনও সে কাজে প্রবৃত্ত হইতেন না। এবং মকদ্দমা বাধিবার উপক্রম হইলে তিনি যথাসাধ্য আপষের চেষ্টা করিতেন। বামাচরণ ইহারই প্রতি প্রভুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। স্পষ্ট বুঝাইয়া

দিল, অম্বিকাচরণ নিশ্চয় অপরপক্ষ হইতে ঘুষ লইয়া মনিবের ক্ষতি করিয়া আপষ করিয়াছে। বামাচরণের নিজেরও বিশ্বাস তাহাই—যাহার হাতে ক্ষমতা আছে সে যে ঘুষ না লইয়া থাকিতে পারে ইহা সে মরিয়া গেলেও বিশ্বাস করিতে পারে না।

এইরূপে গোপনে নানা মুখ হইতে ফুৎকার পাইয়া বিনোদের সন্দেহ শিখা ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল—কিন্তু সে প্রত্যক্ষ-ভাবে কোন উপায় অবলম্বন করিতেই সাহস করিল না। এক চক্ষুলজ্জা, দ্বিতীয়তঃ আশঙ্কা, পাছে সমস্ত অবস্থাভিজ্ঞ অম্বিকাচরণ তাহার কোন অনিষ্ট করে।

অবশেষে নয়নতারা স্বামীর এই কাপুরুষতায় জ্বলিয়া পুড়িয়া বিনোদের অজ্ঞাতসারে একদিন অম্বিকাচরণকে ডাকিয়া পর্দ্দার আড়াল হইতে বলিলেন—"তোমাকে আর রাখা হবে না, তুমি বামাচরণকে সমস্ত হিসেব বুঝিয়ে দিয়ে চলে যাও!"

তাঁহার সম্বন্ধে বিনোদের নিকট আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে সে কথা অম্বিকা পূর্ব্বেই আভাসে জানিতে পারিয়াছিলেন, সেই জন্য নয়নতারার কথায় তিনি তেমন আশ্চর্য্য হন নাই; তৎক্ষণাৎ বিনোদবিহারীর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে কি আপনি কাজ থেকে নিষ্কৃতি দিতে চান?"

বিনোদ শশব্যস্ত হইয়া কহিল, "না, কখনই না।"

অম্বিকাচরণ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার উপর কি আপনার কোন সন্দেহের কারণ ঘটেছে?"

বিনোদ অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া কহিল—"কিছুমাত্র না!" অম্বিকাচরণ নয়নতারার ঘটনা উল্লেখমাত্র না করিয়া আপিসে চলিয়া আসিলেন—বাড়িতে ইন্দ্রাণীকেও কিছু বলিলেন না। এইভাবে কিছুদিন গেল।

এমন সময় অম্বিকাচরণ ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় পড়িলেন। শক্ত ব্যামো নহে, কিন্তু দুর্ব্বলতাবশতঃ অনেকদিন আপিস কামাই করিতে হইল।

সেই সময় সদর খাজনা দেয় এবং অন্যান্য কাজের বড় ভীড়। সেই জন্য একদিন সকালে রোগশয্যা ত্যাগ করিয়া অম্বিকাচরণ হঠাৎ আপিসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সে দিন কেহই তাঁহাকে প্রত্যাশা করে নাই, এবং সকলেই বলিতে লাগিল, আপনি বাড়ি যান, এত কাহিল শরীরে কাজ করিবেন না।

অম্বিকাচরণ নিজের দুর্ব্বলতার প্রসঙ্গ উড়াইয়া দিয়া, ডেস্কে গিয়া বসিলেন। আম্‌লারা সকলেই কিছু যেন অস্থির হইয়া উঠিল এবং হঠাৎ অত্যন্ত অতিরিক্ত মনোযোগের সহিত নিজ নিজ কাজে প্রবৃত্ত হইল।

অম্বিকা ডেস্ক্‌ খুলিয়া দেখেন তাহার মধ্যে তাঁহার একখানি কাগজও নাই। সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ কি'; সকলেই যেন আকাশ হইতে পড়িল, চোরে লইয়াছে, কি, ভূতে লইয়াছে, কেহ ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না।

বামাচরণ কহিল, "আরে মশায়, আপনারা ন্যাকামি রেখে

দিন্! সকলেই জানেন্, ওর কাগজপত্র বাবু নিজে তলব করে নিয়ে গেছেন।”

অম্বিকা রুদ্ধ-রোষে শ্বেতবর্ণ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ‘কেন?’

বামাচরণ কাগজ লিখিতে লিখিতে বলিল, “সে আমরা কেমন ক’রে বল্‌ব?”

বিনোদ অম্বিকাচরণের অনুপস্থিতি সুযোগে বামাচরণের মন্ত্রণাক্রমে নূতন চাবি তৈয়ার করাইয়া ম্যানেজারের প্রাইভেট্ ডেস্ক খুলিয়া তাঁহার সমস্ত কাগজপত্র পরীক্ষা করিতে লইয়া গিয়াছেন। চতুর বামাচরণ সে কথা গোপন করিল না—অম্বিকা অপমানিত হইয়া কাজে ইস্তফা দেন ইহা তাহার অনভিপ্রেত ছিল না।

অম্বিকাচরণ ডেস্কে চাবি লাগাইয়া কম্পিতদেহে বিনোদের সন্ধানে গেলেন—বিনোদ বলিয়া পাঠাইল তাহার মাথা ধরিয়াছে; সেখান হইতে বাড়ি গিয়া হঠাৎ দুর্ব্বলদেহে বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। ইন্দ্রাণী তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে তাহার সমস্ত হৃদয় দিয়া যেন আবৃত করিয়া ধরিল। ক্রমে ইন্দ্রাণী সকল কথা শুনিল।

স্থির সৌদামিনী আজ স্থির রহিল না—তাহার বক্ষ ফুলিতে লাগিল, বিস্ফারিত মেঘকৃষ্ণ চক্ষুপ্রান্ত হইতে উন্মুক্ত বজ্রশিখা সুতীব্র উগ্রজ্বালা বিক্ষেপ করিতে লাগিল। এমন স্বামীর এমন অপমান! এত বিশ্বাসের এই পুরস্কার!

ইন্দ্রাণীর এই অত্যুগ্র নিঃশব্দ রোষদাহ দেখিয়া অম্বিকার

রাগ থামিয়া গেল—তিনি যেন দেবতার শাসন হইতে পাপীকে রক্ষা করিবার জন্য ইন্দ্রাণীর হাত ধরিয়া বলিলেন—"বিনোদ ছেলেমানুষ, দুর্ব্বলস্বভাব, পাঁচ জনের কথা শুনে তার মন বিগ্‌ড়ে গেছে!"

তখন ইন্দ্রাণী দুই হস্তে তাহার স্বামীর গলদেশ বেষ্টন করিয়া তাঁহাকে বক্ষের কাছে টানিয়া লইয়া আবেগের সহিত চাপিয়া ধরিল এবং হঠাৎ তাহার দুই চক্ষুর রোষদীপ্তি ম্লান করিয়া দিয়া ঝর্‌ঝর করিয়া অশ্রুজল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। পৃথিবীর সমস্ত অন্যায় হইতে সমস্ত অপমান হইতে দুই বাহুপাশে টানিয়া লইয়া সে যেন তাহার হৃদয়দেবতাকে আপন হৃদয় মন্দিরে তুলিয়া রাখিতে চায়!

স্থির হইল অম্বিকাচরণ এখনি কাজ ছাড়িয়া দিবেন,—আজ আর কেহ তাহাতে কিছুমাত্র প্রতিবাদ করিল না। কিন্তু যখন সন্দিগ্ধ প্রভু নিজেই অম্বিকাকে ছাড়াইতে উদ্যত, তখন কাজ ছাড়িয়া দিয়া তাহার আর কি শাসন হইল? কাজে জবাব দিবার সঙ্কল্প করিয়াই অম্বিকার রাগ থামিয়া গেল, কিন্তু সকল কাজকর্ম্ম সকল আরাম বিশ্রামের মধ্যে ইন্দ্রাণীর রাগ তাহার হৃৎপিণ্ডের মধ্যে জ্বলিতে লাগিল।

পরিশিষ্ট।

এমন সময়ে চাকর আসিয়া খবর দিল বাবুদের বাড়ির খাজাঞ্চি আসিয়াছে। অম্বিকা মনে করিলেন, বিনোদ স্বাভাবিক

চক্ষুলজ্জাবশতঃ খাজাঞ্চির মুখ দিয়া তাঁহাকে কাজ হইতে জবাব দিয়া পাঠাইয়াছেন। সেই জন্য নিজেই একখানি ইস্তফাপত্র লিখিয়া খাজাঞ্চির হস্তে গিয়া দিলেন।

খাজাঞ্চি তৎসম্বন্ধে কোন প্রশ্ন না করিয়া কহিল, সর্ব্বনাশ হইয়াছে! অম্বিকা জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হইয়াছে।

উত্তরে শুনিলেন, যখন হইতে অম্বিকাচরণের সতর্কতাবশতঃ খাজাঞ্চিখানা হইতে বিনোদের টাকা লওয়া বন্ধ হইয়াছে, তখন হইতে বিনোদ নানা স্থান হইতে গোপনে বিস্তর টাকা ধার লইতে আরম্ভ করিয়াছিল। একটার পর আর একটা ব্যবসা ফাঁদিয়া সে যতই প্রতারিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছিল ততই তাহার রোখ্ চড়িয়া যাইতেছিল—ততই নূতন নূতন অসম্ভব উপায়ে আপন ক্ষতি নিবারণের চেষ্টা করিয়া অবশেষে আকণ্ঠ ঋণে নিমগ্ন হইয়াছে। অম্বিকাচরণ যখন পীড়িত ছিলেন তখন বিনোদ সেই সুযোগে তহবিল হইতে সমস্ত টাকা উঠাইয়া লইয়াছে। নাকাগাড়ি পরগণা অনেককাল হইতেই পাশ্ববর্ত্তী জমিদারের নিকট রেহেনে আবদ্ধ; সে এ পর্য্যন্ত টাকার জন্য কোন প্রকার তাগাদা না দিয়া অনেক টাকা সুদ জমিতে দিয়াছে, এখন সময় বুঝিয়া হঠাৎ ডিক্রী করিয়া লইতে উদ্যত হইয়াছে। এই ত বিপদ।

শুনিয়া অম্বিকাচরণ কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। অবশেষে কহিলেন, "আজ কিছুই ভেবে উঠতে পার্‌চিনে—কাল এর পরামর্শ করা যাবে।" খাজাঞ্চি যখন বিদায় লইতে উঠিলেন তখন অম্বিকা তাঁহার ইস্তফাপত্র চাহিয়া লইলেন।

অন্তঃপুরে আসিয়া অম্বিকা ইন্দ্রাণীকে সকল কথা বিস্তারিত জানাইয়া কহিলেন—বিনোদের এ অবস্থায় ত আমি কাজ ছেড়ে দিতে পারিনে।

ইন্দ্রাণী অনেকক্ষণ প্রস্তরমূর্ত্তির মত স্থির হইয়া রহিল। অবশেষে অন্তরের সমস্ত বিরোধদ্বন্দ্ব সবলে দলন করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—"না, এখন ছাড়তে পার না।"

তাহার পরে কোথায় টাকা কোথায় টাকা করিয়া সন্ধান পড়িয়া গেল—যথেষ্ট পরিমাণে টাকা আর জুটে না। অন্তঃপুর হইতে গহনাগুলি সংগ্রহ করিবার জন্য অম্বিকা বিনোদকে পরামর্শ দিলেন। ইতিপূর্ব্বে ব্যবসা উপলক্ষে বিনোদ সে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কখন কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এবারে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া, অনেক কাঁদিয়া কাটিয়া, অনেক দীনতা স্বীকার করিয়া গহনাগুলি ভিক্ষা চাহিলেন। নয়নতারা কিছুতেই দিলেন না;—তিনি মনে করিলেন, তাঁহার চারিদিক হইতে সকলি খসিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে; এখন এই গহনাগুলি তাঁহার একমাত্র শেষ অবলম্বনস্থল—এবং ইহা তিনি অন্তিম আগ্রহ সহকারে প্রাণপণে চাপিয়া ধরিলেন।

যখন কোথা হইতেও কোন টাকা পাওয়া গেল না, তখন ইন্দ্রাণীর প্রতিহিংসা-ভ্রূকুটির উপরে একটা তীব্র আনন্দের জ্যোতিঃ পতিত হইল। সে তাহার স্বামীর হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "তোমার যাহা কর্ত্তব্য তাহা ত করিয়াছ এখন তুমি ক্ষান্ত হও, যাহা হইবার তা হউক।"

স্বামীর অবমাননায় উদ্দীপ্ত সতীর রোষানল এখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই, দেখিয়া অম্বিকা মনে মনে হাসিলেন। বিপদের দিনে অসহায় বালকের ন্যায় বিনোদ তাঁহার উপরে এমন একান্ত নির্ভর করিয়াছে যে, তাহার প্রতি তাঁহার দয়ার উদ্রেক হইয়াছে—এখন তাহাকে তিনি কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারেন না। তিনি মনে করিতেছিলেন, তাঁহার নিজের বিষয় আবদ্ধ রাখিয়া টাকা উঠাইবার চেষ্টা করিবেন। কিন্তু ইন্দ্রাণী তাঁহাকে মাথার দিব্য দিয়া বলিল, "ইহাতে আর তুমি হাত দিতে পারিবে না!"

অম্বিকাচরণ বড় ইতস্ততের মধ্যে পড়িয়া ভাবিতে বসিয়া গেলেন। তিনি ইন্দ্রাণীকে আস্তে আস্তে বুঝাইবার যতই চেষ্টা করিতে লাগিলেন ইন্দ্রাণী কিছুতেই তাঁহাকে কথা কহিতে দিল না। অবশেষে অম্বিকা কিছু বিমর্ষ হইয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন।

তখন ইন্দ্রাণী লোহার সিন্দুক খুলিয়া তাহার সমস্ত গহনা একটি বৃহৎ থালায় স্তূপাকার করিল এবং সেই গুরুভার থালাটি বহুকষ্টে দুই হস্তে তুলিয়া ঈষৎ হাসিয়া তাহার স্বামীর পায়ের কাছে রাখিল।

পিতামহের একমাত্র স্নেহের ধন ইন্দ্রাণী পিতামহের নিকট হইতে জন্মাবধি বৎসরে বৎসরে বহুমূল্য অলঙ্কার উপহার পাইয়া আসিয়াছে; মিতাচারী স্বামীরও জীবনের অধিকাংশ সঞ্চয় এই সন্তানহীন রমণীর ভাণ্ডারে অলঙ্কাররূপে রূপান্তরিত হইয়াছে। সেই সমস্ত স্বর্ণ মাণিক্য স্বামীর নিকট উপস্থিত করিয়া ইন্দ্রাণী

কহিল, "আমার এই গহনাগুলি দিয়া আমার পিতামহের দত্ত দান উদ্ধার করিয়া আমি পুনর্ব্বার তাঁহার প্রভুবংশকে দান করিব।"

এই বলিয়া সে সজল চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মস্তক নত করিয়া কল্পনা করিল, তাহার সেই বিরলশুভ্রকেশধারী, শান্তস্নেহ-হাস্যময়, ধী-প্রদীপ্ত উজ্জ্বলগৌরকান্তি বৃদ্ধ পিতামহ এই মুহূর্ত্তে এখানে উপস্থিত আছেন, এবং তাহার নত মস্তকে শীতল স্নেহহস্ত রাখিয়া তাহাকে নীরবে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন।

বাঁকাগাড়ি পরগণা পুনশ্চ ক্রয় হইয়া গেল, তখন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া গতভূষণা ইন্দ্রাণী আবার নয়নতারার অন্তঃপুরে নিমন্ত্রণে গমন করিল; আর তাহার মনে কোন অপমান বেদনা রহিল না।

ঠাকুর্দ্দা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নয়নজোড়ের জমিদারেরা এককালে বাবু বলিয়া বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন। তখনকার কালের বাবুয়ানার আদর্শ বড় সহজ ছিল না। এখন যেমন রাজা রায়বাহাদুর খেতাব অর্জ্জন করিতে অনেক খানা নাচ ঘোড়দৌড় এবং সেলাম সুপারিশের শ্রাদ্ধ করিতে হয়, তখনও সাধারণের নিকট হইতে বাবু উপাধি লাভ করিতে বিস্তর দুঃসাধ্য তপশ্চরণ করিতে হইত।

আমাদের নয়নজোড়ের বাবুরা পাড় ছিঁড়িয়া ফেলিয়া ঢাকাই কাপড় পরিতেন, কারণ পাড়ের কর্কশতায় তাঁহাদের সুকোমল বাবুয়ানা ব্যথিত হইত। তাঁহারা লক্ষ টাকা দিয়া বিড়ালশাবকের বিবাহ দিতেন এবং কথিত আছে, একবার কোন উৎসব উপলক্ষে রাত্রিতে দিন করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া অসংখ্য দীপ জ্বালাইয়া সূর্য্যকিরণের অনুকরণে তাঁহারা সাঁচ্চা রূপার জরি উপর হইতে বর্ষণ করাইয়াছিলেন।

ইহা হইতেই সকলে বুঝিবেন সেকালে বাবুদের বাবুয়ানা বংশানুক্রমে স্থায়ী হইতে পারিত না। বহু-বর্ত্তিকা-বিশিষ্ট প্রদীপের মত নিজের তৈল নিজে অল্পকালের ধূমধামেই নিঃশেষ করিয়া দিত।

আমাদের কৈলাসচন্দ্র রায় চৌধুরী সেই প্রখ্যাতযশ নয়ন-জোড়ের একটি নির্ব্বাপিত বাবু। ইনি যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তৈল তখন প্রদীপের তলদেশে আসিয়া ঠেকিয়াছিল;—ইহার পিতার মৃত্যু হইলে পর নয়নজোড়ের বাবুয়ানা গোটাকতক অসাধারণ শ্রাদ্ধশান্তিতে অন্তিম দীপ্তি প্রকাশ করিয়া হঠাৎ নিবিয়া গেল। সমস্ত বিষয় আশয় ঋণের দায়ে বিক্রয় হইল—যে অল্প অবশিষ্ট রহিল তাহাতে পূর্ব্বপুরুষের খ্যাতি রক্ষা করা অসম্ভব।

সেইজন্য নয়নজোড় ত্যাগ করিয়া পুত্রকে সঙ্গে লইয়া কৈলাস বাবু কলিকাতায় আসিয়া বাস করিলেন—পুত্রটিও একটি কন্যামাত্র রাখিয়া এই হতগৌরব সংসার পরিত্যাগ করিয়া পরলোক গমন করিলেন।

আমরা তাঁহার কলিকাতার প্রতিবেশী। আমাদের ইতিহাসটা তাঁহাদের হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত। আমার পিতা নিজের চেষ্টায় ধন উপার্জ্জন করিয়াছিলেন; তিনি কখনও হাঁটুর নিম্নে কাপড় পরিতেন না, কড়াক্রান্তির হিসাব রাখিতেন, এবং বাবু উপাধি লাভের জন্য তাঁহার লালসা ছিল না। সে জন্য আমি তাঁহার একমাত্র পুত্র তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ আছি। আমি যে লেখা পড়া শিখিয়াছি এবং নিজের প্রাণ ও মান রক্ষার উপযোগী যথেষ্ট অর্থ বিনা চেষ্টায় প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহাই আমি পরম গৌরবের বিষয় বলিয়া জ্ঞান করি—শূন্য ভাণ্ডারে পৈতৃক বাবুয়ানার উজ্জ্বল ইতিহাসের অপেক্ষা লোহার সিন্দুকের মধ্যে পৈতৃক কোম্পানির

কাগজ আমার নিকট অনেক বেশী মূল্যবান্ বলিয়া মনে হয়।

বোধ করি, সেই কারণেই, কৈলাস বাবু তাঁহাদের পূর্ব্ব-গৌরবের ফেল্-করা ব্যাঙ্কের উপর যখন দেদার লম্বাচৌড়া চেক্ চালাইতেন তখন তাহা আমার এত অসহ্য ঠেকিত। আমার মনে হইত, আমার পিতা স্বহস্তে অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন বলিয়া কৈলাসবাবু বুঝি মনে মনে আমাদের প্রতি অবজ্ঞা অনুভব করিতেছেন। আমি রাগ করিতাম এবং ভাবিতাম অবজ্ঞার যোগ্য কে? যে লোক সমস্ত জীবন কঠোর ত্যাগস্বীকার করিয়া, নানা প্রলোভন অতিক্রম করিয়া, লোকমুখের তুচ্ছ খ্যাতি অবহেলা করিয়া, অশ্রান্ত এবং সতর্ক বুদ্ধিকৌশলে সমস্ত প্রতিকূল বাধা প্রতিহত করিয়া একটী একটী রৌপ্যের স্তরে সম্পদের একটি সমুচ্চ পিরামিড্ একাকী স্বহস্তে নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন, তিনি হাঁটুর নীচে কাপড় পরিতেন না বলিয়া যে কম লোক ছিলেন তাহা নয়!

তখন বয়স অল্প ছিল সেই জন্য এইরূপ তর্ক করিতাম রাগ করিতাম—এখন বয়স বেশি হইয়াছে এমন মনে করি, ক্ষতি কি! আমার ত বিপুল বিষয় আছে, আমার কিসের অভাব? যাহার কিছু নাই, সে যদি অহঙ্কার করিয়া সুখী হয়, তাহাতে আমার ত শিকি পয়সার লোকসান নাই, বরং সে বেচারার সান্ত্বনা আছে।

ইহাও দেখা গিয়াছে আমি ব্যতীত আর কেহ কৈলাস বাবুর উপর রাগ করিত না। কারণ এত বড় নিরীহ লোক সচারাচর

দেখা যায় না। ক্রিয়াকর্ম্মে সুখে দুঃখে প্রতিবেশীদের সহিত তাঁহার সম্পূর্ণ যোগ ছিল। ছেলে হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলকেই দেখা হইবামাত্র তিনি হাসিমুখে প্রিয় সম্ভাষণ করিতেন—যেখানে যাহার যে কেহ আছে সকলেরই কুশলসংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া তবে তাঁহার শিষ্টতা বিরাম লাভ করিত। এই জন্য কাহারও সহিত তাঁহার দেখা হইলে একটা সুদীর্ঘ প্রশ্নোত্তরমালার সৃষ্টি হইত; ভাল ত? শশি ভাল আছে? আমাদের বড় বাবু ভাল আছেন? মধুর ছেলেটির জ্বর হয়েছিল শুনেছিলুম সে এখন ভাল আছে ত? হরিচরণ বাবুকে অনেককাল দেখিনি তাঁর অসুখ বিসুখ কিছু হয় নি? তোমাদের রাখালের খবর কি? বাড়ীর এঁয়ারা সকলে ভাল আছেন? ইত্যাদি।

লোকটি ভারি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কাপড় চোপড় অধিক ছিল না, কিন্তু মেরজাইটি চাদরটি জামাটি, এমন কি, বিছানায় পাতিবার একটি পুরাতন র‍্যাপার, বালিশের ওয়াড়, একটি ক্ষুদ্র সতরঞ্চ সমস্ত স্বহস্তে রৌদ্রে দিয়া ঝাড়িয়া দড়িতে খাটাইয়া ভাঁজ করিয়া আলনায় তুলিয়া পরিপাটি করিয়া রাখিতেন। যখনি তাঁহাকে দেখা যাইত তখনি মনে হইত যেন তিনি সুসজ্জিত প্রস্তুত হইয়া আছেন। অল্পস্বল্প সামান্য আস্‌বাবেও তাঁহার ঘরদ্বার সমুজ্জ্বল হইয়া থাকিত। মনে হইত যেন তাঁহার আরও অনেক আছে।

ভৃত্যাভাবে অনেক সময় ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া তিনি নিজের হস্তে অতি পরিপাটি করিয়া ধুতি কোঁচাইতেন এবং

চাদর ও জামার আস্তিন বহুযত্নে ও পরিশ্রমে "গিলে" করিয়া রাখিতেন তাঁহার বড় বড় জমিদারী বহুমূল্যের বিষয়সম্পত্তি লোপ পাইয়াছে, কিন্তু একটি বহুমূল্য গোলাপপাশ, আতরদান, একটি সোনার রেকাবি, একটি রূপার আল্‌বোলা, একটি বহুমূল্য সাল ও সেকেলে জামাযোড়া ও পাগড়ি দারিদ্র্যের গ্রাস হইতে বহুচেষ্টায় তিনি রক্ষা করিয়াছিলেন। কোন একটা উপলক্ষ উপস্থিত হইলে এইগুলি বাহির হইত এবং নয়নজোড়ের জগদ্বিখ্যাত বাবুদের গৌরব রক্ষা হইত।

এদিকে কৈলাসবাবু মাটির মানুষ হইলেও কথায় যে অহঙ্কার করিতেন সেটা যেন পূর্ব্বপুরুষদের প্রতি কর্ত্তব্য বোধে করিতেন; সকল লোকেই তাহাতে প্রশ্রয় দিত এবং বিশেষ আমোদ বোধ করিত।

পাড়ার লোকে তাঁহাকে ঠাকুর্দ্দামশাই বলিত এবং তাঁহার ওখানে সর্ব্বদা বিস্তর লোক সমাগম হইত; কিন্তু দৈন্যাবস্থায় পাছে তাঁহার তামাকের খরচাটা গুরুতর হইয়া উঠে এই জন্য প্রায়ই পাড়ার কেহ না কেহ দুই এক সের তামাক কিনিয়া লইয়া গিয়া তাঁহাকে বলিত, ঠাকুর্দ্দামশায় একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ দেখি, ভাল গয়ার তামাক পাওয়া গেছে।

ঠাকুর্দ্দামশায় দুই এক টান টানিয়া বলিতেন, বেশ ভাই, বেশ তামাক। অমনি সেই উপলক্ষে ষাট পঁয়ষট্টি টাকা ভরির তামাকের গল্প পাড়িতেন; এবং জিজ্ঞাসা করিতেন সে তামাক কাহারও আস্বাদ করিয়া দেখিবার ইচ্ছা আছে কি না?

সকলেই জানিত যে যদি কেহ ইচ্ছা করে তবে নিশ্চয় চাবির সন্ধান পাওয়া যাইবে না অথবা অনেক অন্বেষণের পর প্রকাশ পাইবে যে পুরাতন ভৃত্য গণেশ বেটা কোথায় যে কি রাখে তাহার আর ঠিকানা নাই—গণেশও বিনা প্রতিবাদে সমস্ত অপবাদ স্বীকার করিয়া লইত। এই জন্য সকলেই একবাক্যে বলিত, ঠাকুর্দ্দামশায় কাজ নেই, সে তামাক আমাদের সহ্য হবে না, আমাদের এই ভাল।

শুনিয়া ঠাকুর্দ্দা দ্বিরক্তি না করিয়া ঈষৎ হাস্য করিতেন। সকলে বিদায় লইবার কালে বৃদ্ধ হঠাৎ বলিয়া উঠিতেন, সে যেন হল, তোমরা কবে আমার এখানে খাবে বল দেখি ভাই?

অমনি সকলে বলিত, সে একটা দিন ঠিক করে দেখা যাবে।

ঠাকুর্দ্দা মহাশয় বলিতেন, সেই ভাল, একটু বৃষ্টি পড়ুক, ঠাণ্ডা হোক্, নইলে এ গুরু ভোজনটা কিছু নয়।

যখন বৃষ্টি পড়িত তখন ঠাকুর্দ্দাকে কেহ তাঁহার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া দিত না—বরঞ্চ কথা উঠিলে সকলে বলিত, এই বৃষ্টি বাদলটা না ছাড়িলে সুবিধে হচ্চে না। ক্ষুদ্র বাসাবাড়িতে বাস করাটা তাঁহার পক্ষে ভাল দেখাইতেছে না এবং কষ্টও হইতেছে এ কথা তাঁহার বন্ধুবান্ধব সকলেই তাঁহার সমক্ষে স্বীকার করিত, অথচ কলিকাতায় কিনিবার উপযুক্ত বাড়ি খুঁজিয়া পাওয়া যে কত কঠিন, সে বিষয়েও কাহারও সন্দেহ ছিল না—এমন কি আজ ছয় সাত বৎসর সন্ধান করিয়া ভাড়া লইবার মত একটা বড় বাড়ি পাড়ার কেহ দেখিতে পাইল না—অবশেষে

ঠাকুর্দ্দা মশাই বলিতেন, "তা হোক্ ভাই, তোমাদের কাছাকাছি আছি এই আমার সুখ, নয়নজোড়ে বড় বাড়ি ত প'ড়েই আছে কিন্তু সেখানে কি মন টেকে?"

আমার বিশ্বাস, ঠাকুর্দ্দাও জানিতেন যে, সকলে তাঁহার অবস্থা জানে, এবং যখন তিনি ভূতপূর্ব্ব নয়নজোড়কে বর্ত্তমান বলিয়া ভান করিতেন এবং অন্য সকলেও তাহাতে যোগ দিত তখন তিনি মনে মনে বুঝিতেন যে, পরস্পরের এই ছলনা কেবল পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ্দ্যবশতঃ।

কিন্তু আমার বিষম বিরক্তি বোধ হইত। অল্প বয়সে পরের নিরীহ গর্ব্বও দমন করিতে ইচ্ছা করে এবং সহস্র গুরুতর অপরাধের তুলনায় নির্ব্বুদ্ধিতাই সর্ব্বাপেক্ষা অসহ্য বোধ হয়। কৈলাস বাবু ঠিক নির্ব্বোধ ছিলেন না, কাজে কর্ম্মে তাঁহার সহায়তা এবং পরামর্শ সকলেই প্রার্থনীয় জ্ঞান করিত। কিন্তু নয়নজোড়ের গৌরব প্রকাশ সম্বন্ধে তাঁহার কিছুমাত্র কাণ্ডজ্ঞান ছিল না! সকলে তাঁহাকে ভালবাসিয়া এবং আমোদ করিয়া তাঁহার কোন অসম্ভব কথাতেই প্রতিবাদ করিত না বলিয়া তিনি আপনার কথার পরিমাণ রক্ষা করিতে পারিতেন না। অন্য লোকেও যখন আমোদ করিয়া অথবা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য নয়নজোড়ের কীর্ত্তিকলাপ সম্বন্ধে বিপরীত মাত্রায় অত্যুক্তি প্রয়োগ করিত, তিনি অকাতরে সমস্ত গ্রহণ করিতেন এবং স্বপ্নেও সন্দেহ করিতেন না যে, অন্য কেহ এ সকল কথা লেশ মাত্র অবিশ্বাস করিতে পারে।

আমার এক এক সময় ইচ্ছা করিত, বৃদ্ধ যে মিথ্যা দুর্গ অবলম্বন করিয়া বাস করিতেছে এবং মনে করিতেছে ইহা চিরস্থায়ী, সেই দুর্গটি দুই তোপে সর্ব্বসমক্ষে উড়াইয়া দিই। একটা পাখীকে সুবিধামত ডালের উপর বসিয়া থাকিতে দেখিলেই শিকারীর ইচ্ছা করে তাহাকে গুলি বসাইয়া দিতে, পাহাড়ের গায়ে একটা প্রস্তর পতনোন্মুখ থাকিতে দেখিলেই বালকের ইচ্ছা করে এক লাথি মারিয়া তাহাকে গড়াইয়া ফেলিতে—যে জিনিষটা প্রতি মুহূর্ত্তে পড়ি-পড়ি করিতেছে অথচ কোন একটা কিছুতে সংলগ্ন হইয়া আছে, তাহাকে ফেলিয়া দিলেই তবে যেন তাহার সম্পূর্ণতা সাধন এবং দর্শকের মনের তৃপ্তিলাভ হয়। কৈলাস বাবুর মিথ্যা এতই সরল, তাহার ভিত্তি এতই দুর্ব্বল, তাহা ঠিক সত্য বন্দুকের লক্ষ্যের সাম্‌নে এমনি বুক ফুলাইয়া নৃত্য করিত যে, তাহাকে মুহূর্ত্তের মধ্যে বিনাশ করিবার জন্য একটি আবেগ উপস্থিত হইত—কেবল নিতান্ত আলস্যবশতঃ এবং সর্ব্বজনসম্মত প্রথার অনুসরণ করিয়া সে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতাম না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

নিজের অতীত মনোভাব বিশ্লেষণ করিয়া যতটা মনে পড়ে তাহাতে বোধ করি, কৈলাস বাবুর প্রতি আমার আন্তরিক

বিদ্বেষের আর একটি গূঢ় কারণ ছিল। তাহা একটু বিবৃত করিয়া বলা আবশ্যক।

আমি বড়মানুষের ছেলে হইয়াও যথাকালে এম্, এ, পাস করিয়াছি, যৌবন সত্ত্বেও কোন প্রকার কুসংসর্গ কুৎসিত আমোদে যোগ দিই নাই, এবং অভিভাবকের মৃত্যুর পরে স্বয়ং কর্ত্তা হইয়াও আমার স্বভাবের কোন প্রকার বিকৃতি উপস্থিত হয় নাই। তাহা ছাড়া চেগারাটা এমন যে, তাহাকে আমি নিজ মুখে সুশ্রী বলিলে অহঙ্কার হইতে পারে কিন্তু মিথ্যাবাদ হয় না।

অতএব বাঙ্গলা দেশে ঘট্‌কালির হাটে আমার দাম যে অত্যন্ত বেশী তাহাতে আর সন্দেহ নাই—এই হাটে আমার সেই দাম আমি পূরা আদায় করিয়া লইব, এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। ধনী পিতার পরম রূপবতী একমাত্র বিদূষী কন্যা আমার কল্পনার আদর্শরূপে বিরাজ করিতেছিল।

দশ হাজার টাকা পণের প্রস্তাব করিয়া দেশ বিদেশ হইতে আমার সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। আমি অবিচলিতচিত্তে নিক্তি ধরিয়া তাহাদের যোগ্যতা ওজন করিয়া লইতেছিলাম, কোনটাই আমার সমযোগ্য বোধ হয় নাই। অবশেষে ভবভূতির ন্যায় আমার ধারণা হইয়াছিল যে,—

কি জানি জন্মিতে পারে মম সমতুল,
অসীম সময় আছে, বসুধা বিপুল।

কিন্তু বর্ত্তমান কালে এবং ক্ষুদ্র বঙ্গদেশে সেই অসম্ভব দুর্লভ পদার্থ জন্মিয়াছে কি না সন্দেহ।

কন্যাদায়গ্রস্তগণ প্রতিনিয়ত নানা ছন্দে আমার স্তবস্তুতি এবং বিবিধোপচারে আমার পূজা করিতে লাগিল। কন্যা পছন্দ হউক্ বা না হউক, এই পূজা আমার মন্দ লাগিল না। ভাল ছেলে বলিয়া কন্যার পিতৃগণের এই পূজা আমার উচিতপ্রাপ্য স্থির করিয়াছিলাম। শাস্ত্রে পড়া যায় দেবতা বর দিন আর না দিন্, যথাবিধি পূজা না পাইলে বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন। নিয়মিত পূজা পাইয়া আমার মনে সেইরূপ অত্যুচ্চ দেবভাব জন্মিয়াছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম, ঠাকুর্দ্দা মশায়ের একটি পৌত্রী ছিল। তাহাকে অনেকবার দেখিয়াছি কিন্তু কখনও রূপবতী বলিয়া ভ্রম হয় নাই। সুতরাং তাহাকে বিবাহ করিবার কল্পনাও আমার মনে উদিত হয় নাই। কিন্তু ইহা ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম যে কৈলাস বাবু, লোকমারফৎ অথবা স্বয়ং, পৌত্রীটিকে অর্ঘ্য দিবার মানসে আমার পূজার বোধন করিতে আসিবেন, কারণ, আমি ভাল ছেলে। কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না।

শুনিতে পাইলাম, আমার কোন বন্ধুকে তিনি বলিয়াছিলেন, নয়নজোড়ের বাবুরা কখনও কোন বিষয়ে অগ্রসর হইয়া কাহারও নিকটে প্রার্থনা করে নাই—কন্যা যদি চিরকুমারী হইয়া থাকে তথাপি সে কুলপ্রথা তিনি ভঙ্গ করিতে পারিবেন না।

শুনিয়া আমার বড় রাগ হইল। সে রাগ অনেক দিন পর্য্যন্ত আমার মনের মধ্যে ছিল—কেবল ভাল ছেলে বলিয়াই চুপচাপ করিয়াছিলাম।

যেমন বজ্রের সঙ্গে বিদ্যুৎ থাকে, তেমনি আমার চরিত্রে

রাগের সঙ্গে সঙ্গে একটা কৌতুকপ্রিয়তা জড়িত ছিল। বৃদ্ধকে শুদ্ধমাত্র নিপীড়ন করা আমার দ্বারা সম্ভব হইত না—কিন্তু একদিন হঠাৎ এমন একটা কৌতুকাবহ প্ল্যান্ মাথায় উদয় হইল, যে, সেটা কাজে খাটাইবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বৃদ্ধকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য নানা লোকে নানা মিথ্যা কথার সৃজন করিত। পাড়ার একজন পেন্সনভোগী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ প্রায় বলিতেন, ঠাকুর্দ্দা, ছোটলাটের সঙ্গে যখনি দেখা হয় তিনি নয়নজোড়ের বাবুদের খবর না নিয়ে ছাড়েন না—সাহেব বলেন, বাঙ্গলাদেশে, বর্দ্ধমানের রাজা এবং নয়নজোড়ের বাবু, এই দুটি মাত্র যথার্থ বনেদী বংশ আছে।

ঠাকুর্দ্দা ভারি খুসি হইতেন—এবং ভূতপূর্ব্ব ডেপুটি বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে অন্যান্য কুশলসংবাদের সহিত জিজ্ঞাসা করিতেন—ছোটলাট সাহেব ভাল আছেন? তাঁর মেমসাহেব ভাল আছেন? তাঁর পুত্রকন্যারা সকলেই ভাল আছেন? সাহেবের সহিত শীঘ্র একদিন সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন এমন ইচ্ছাও প্রকাশ করিতেন। কিন্তু ভূতপূর্ব্ব ডেপুটি নিশ্চয় জানিতেন, নয়নজোড়ের বিখ্যাত চৌঘুড়ি প্রস্তুত হইয়া দ্বারে আসিতে আসিতে বিস্তর ছোট লাট এবং বড় লাট বদল হইয়া যাইবে।

আমি একদিন প্রাতঃকালে গিয়া কৈলাস বাবুকে আড়ালে ডাকিয়া লইয়া চুপি চুপি বলিলাম—ঠাকুর্দ্দা, কাল লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের লেভিতে গিয়েছিলুম। তিনি নয়নজোড়ের বাবুদের কথা পাড়াতে আমি বল্লুম নয়নজোড়ের কৈলাস বাবু কলকাতাতেই

আছেন, শুনে, ছোট লাট এতদিন দেখা করতে আসেন নি বলে ভারি দুঃখিত হলেন—বলে দিলেন আজই দুপুর বেলা তিনি গোপনে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আস্‌বেন।

আর কেহ হইলে কথাটার অসম্ভবতা বুঝিতে পারিত এবং আর কাহারও সম্বন্ধে হইলে কৈলাস বাবুও এ কথায় হাস্য করিতেন কিন্তু নিজের সম্বন্ধীয় বলিয়া এ সংবাদ তাঁহার লেশমাত্র অবিশ্বাস্য বোধ হইল না।—শুনিয়া যেমন খুসি হইলেন তেমনি অস্থির হইয়া উঠিলেন—কোথায় বসাইতে হইবে কি করিতে হইবে, কেমন করিয়া অভ্যর্থনা করিবেন—কি উপায়ে নয়নজোড়ের গৌরব রক্ষিত হইবে কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না। তাহা ছাড়া তিনি ইংরাজি জানেন না, কথা চালাইবেন কি করিয়া সেও এক সমস্যা।

আমি বলিলাম, "সে জন্য ভাবনা নাই, তাঁহার সঙ্গে এক জন করিয়া দোভাষী থাকে; কিন্তু ছোটলাট সাহেবের বিশেষ ইচ্ছা, আর কেহ যেন উপস্থিত না থাকে।

মধ্যাহ্নে পাড়ার অধিকাংশ লোক যখন আপিসে গিয়াছে এবং অবশিষ্ট অংশ দ্বার রুদ্ধ করিয়া নিদ্রামগ্ন, তখন কৈলাস বাবুর বাসার সম্মুখে এক জুড়ি আসিয়া দাঁড়াইল।

তক্‌মা-পরা চাপ্‌রাসি তাঁহাকে খবর দিল ছোটলাট সাহেব আয়া! ঠাকুর্দ্দা প্রাচীনকাল-প্রচলিত শুভ্র জামাযোড়া এবং পাগ্‌ড়ি পরিয়া প্রস্তুত হইয়াছিলেন তাঁহার পুরাতন ভৃত্য গণেশটিকেও তাঁহার নিজের ধুতি চাদর জামা পরাইয়া ঠিকঠাক

করিয়া রাখিয়াছিলেন। ছোটলাটের আগমন সংবাদ শুনিয়াই হাঁপাইতে হাঁপাইতে কাঁপিতে কাঁপিতে ছুটিয়া দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন—এবং সন্নতদেহে বারম্বার সেলাম করিতে করিতে ইংরাজবেশধারী আমার এক প্রিয়বয়স্যকে ঘরে লইয়া গেলেন।

সেখানে চৌকির উপরে তাঁহার একমাত্র বহুমূল্য শালটি পাতিয়া রাখিয়াছিলেন তাহারই উপর কৃত্রিম ছোটলাটকে বসাইয়া উর্দ্দুভাষায় এক অতি বিনীত সুদীর্ঘ বক্তৃতা পাঠ করিলেন, এবং নজরের স্বরূপে স্বর্ণ রেকাবীতে তাঁহাদের বহু-কষ্টরক্ষিত কুলক্রমাগত এক আস্‌রফির মালা ধরিলেন। প্রাচীন ভৃত্য গণেশ গোলাপপাশ এবং আতরদান লইয়া উপস্থিত ছিল!

কৈলাশ বাবু বারম্বার আক্ষেপ করিতে লাগিলেন যে, তাঁহাদের নয়নজোড়ের বাড়িতে হজুর বাহাদুরের পদধূলি পড়িলে তাঁহাদের যথাসাধ্য যথোচিত আতিথ্যের আয়োজন করিতে পারিতেন—কলিকাতায় তিনি প্রবাসী—এখানে তিনি জলহীন মীনের ন্যায় সর্ব্ব বিষয়েই অক্ষম—ইত্যাদি।

আমার বন্ধু দীর্ঘ হ্যাট্ সমেত অত্যন্ত গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িতে লাগিলেন। ইংরাজি কায়দা-অনুসারে এরূপ স্থলে মাথায় টুপি না থাকিবার কথা কিন্তু আমার বন্ধু ধরা পড়িবার ভয়ে যথাসম্ভব আচ্ছন্ন থাকিবার চেষ্টায় টুপি খোলেন নাই। কৈলাসবাবু এবং তাঁহার গর্ব্বান্ধ প্রাচীন ভৃত্যটি ছাড়া আর সকলেই মুহূর্ত্তের মধ্যে বাঙ্গালীর এই ছদ্মবেশ ধরিতে পারিত।

দশমিনিট কাল ঘাড় নাড়িয়া আমার বন্ধু গাত্রোত্থান করিলেন এবং পূর্ব্বশিক্ষামত চাপ্‌রাসিগণ সোনার রেকাবীসুদ্ধ আসরফির মালা, চৌকি হইতে সেই শাল, এবং ভৃত্যের হাত হইতে গোলাপপাশ এবং আতরদান সংগ্রহ করিয়া ছদ্মবেশীর গাড়িতে তুলিয়া দিল—কৈলাস বাবু বুঝিলেন ইহাই ছোটলাটের প্রথা। আমি গোপনে এক পাশের ঘরে লুকাইয়া দেখিতেছিলাম এবং রুদ্ধ হাস্যাবেশে আমার পঞ্জর বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইতেছিল।

অবশেষে কিছুতে আর থাকিতে না পারিয়া ছুটিয়া কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তী এক ঘরের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিলাম—এবং সেখানে হাসির উচ্ছ্বাস উন্মুক্ত করিয়া দিয়া হঠাৎ দেখি, একটি বালিকা তক্তপোষের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে।

আমাকে হঠাৎ ঘরে প্রবেশ করিয়া হাসিতে দেখিয়া সে তৎক্ষণাৎ তক্তা ছাড়িয়া দাঁড়াইল—এবং অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে রোষের গর্জ্জন আনিয়া আমার মুখের উপর সজল বিপুল কৃষ্ণচক্ষের সুতীক্ষ্ণ বিদ্যুৎ বর্ষণ করিয়া কহিল—"আমার দাদামশায় তোমাদের কি করেছেন—কেন তোমরা তাঁহাকে ঠকাতে এসেচ—কেন এসেচ তোমরা"—অবশেষে আর কোন কথা জুটিল না—বাক্‌রুদ্ধ হইয়া মুখে কাপড় দিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

কোথায় গেল আমার হাস্যাবেগ! আমি যে কাজটি করিয়াছি তাহার মধ্যে কৌতুক ছাড়া আর যে কিছু ছিল এতক্ষণ তাহা আমার মাথায় আসে নাই—হঠাৎ দেখিলাম অত্যন্ত কোমল স্থানে অত্যন্ত কঠিন আঘাত করিয়াছি; হঠাৎ আমার

কৃতকার্য্যের বীভৎস নিষ্ঠুরতা আমার সম্মুখে দেদীপ্যমান হইয়া উঠিল—লজ্জায় এবং অনুতাপে পদাহত কুকুরের ন্যায় ঘর হইতে নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেলাম। বৃদ্ধ আমার কাছে কি দোষ করিয়াছিল? তাহার নিরীহ অহঙ্কার ত কখন কোন প্রাণীকে আঘাত করে নাই! আমার অহঙ্কার কেন এমন হিংস্রমূর্ত্তি ধারণ করিল?

তাহা ছাড়া আর একটি বিষয়ে আজ হঠাৎ দৃষ্টি খুলিয়া গেল। এতদিন আমি কুসুমকে, কোন অবিবাহিত পাত্রের প্রসন্ন দৃষ্টিপাতের প্রতীক্ষায় সংরক্ষিত পণ্য-পদার্থের মত দেখিতাম—ভাবিতাম, আমি পছন্দ করি নাই বলিয়া ও পড়িয়া আছে, দৈবাৎ যাহার পছন্দ হইবে ও তাহারই হইবে। আজ দেখিলাম এই গৃহকোণে, ঐ বালিকমূর্ত্তির অন্তরালে একটি মানব হৃদয় আছে। তাহার নিজের সুখ দুঃখ অনুরাগ বিরাগ লইয়া একটি অন্তঃকরণ একদিকে অজ্ঞেয় অতীত আর একদিকে অভাবনীয় ভবিষ্যৎ নামক দুই অনন্ত রহস্যরাজ্যের দিকে পূর্ব্বে পশ্চিমে প্রসারিত হইয়া রহিয়াছে। যে মানুষের মধ্যে হৃদয় আছে সে কি কেবল পণের টাকা এবং নাক চোখের পরিমাণ মাপিয়া পছন্দ করিয়া লইবার যোগ্য?

সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইল না। পরদিন প্রত্যূষে বৃদ্ধের সমস্ত অপহৃত বহুমূল্য দ্রব্যগুলি লইয়া চোরের ন্যায় চুপি চুপি ঠাকুর্দ্দার বাসায় গিয়া প্রবেশ করিলাম—ইচ্ছা ছিল, কাহাকেও কিছু না বলিয়া গোপনে চাকরের হস্তে সমস্ত দিয়া আসিব।

চাকরকে দেখিতে না পাইয়া ইতস্ততঃ করিতেছি এমন সময় অদূরবর্ত্তী ঘরে বৃদ্ধের সহিত বালিকার কথোপকথন শুনিতে পাইলাম। বালিকা সুমিষ্ট সস্নেহ স্বরে জিজ্ঞাসা করিতেছিল, "দাদা মশায়, কাল লাট সাহেব তোমাকে কি বল্লেন?" ঠাকুর্দ্দা অত্যন্ত হর্ষিত চিত্তে লাট সাহেবের মুখে প্রাচীন নয়নজোড় বংশের বিস্তর কাল্পনিক গুণানুবাদ বসাইতেছিলেন। বালিকা তাহাই শুনিয়া মহোৎসাহ প্রকাশ করিতেছিল।

বৃদ্ধ অভিভাবকের প্রতি মাতৃহৃদয়া এই ক্ষুদ্র বালিকার সকরুণ ছলনায় আমার দুই চক্ষে জল ছল্ ছল্ করিয়া আসিল। অনেকক্ষণ চুপ্ করিয়া বসিয়া রহিলাম—অবশেষে ঠাকুর্দ্দা তাঁহার কাহিনী সমাপন করিয়া চলিয়া আসিলে আমার প্রতারণার বমালগুলি লইয়া বালিকার নিকট উপস্থিত হইলাম এবং নিঃশব্দে তাহার সম্মুখে সমস্ত রাখিয়া বাহিরে চলিয়া আসিলাম।

বর্ত্তমান কালের প্রথানুসারে অন্যদিন বৃদ্ধকে দেখিয়া কোন প্রকার অভিবাদন করিতাম না—আজ তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। বৃদ্ধ নিশ্চয় মনে ভাবিলেন, গতকল্য ছোট লাট তাঁহার বাড়িতে আসাতেই সহসা তাঁহার প্রতি আমার ভক্তির উদ্রেক হইয়াছে। তিনি পুলকিত হইয়া শতমুখে ছোটলাটের গল্প বানাইয়া বলিতে লাগিলেন—আমিও কোন প্রতিবাদ না করিয়া তাহাতে যোগ দিলাম। বাহিরের অন্য লোক যাহারা শুনিল তাহারা এ কথাটাকে আদ্যোপান্ত গল্প বলিয়া স্থির করিল, এবং সকৌতুকে বৃদ্ধের সহিত সকল কথায় সায় দিয়া গেল।

সকলে উঠিয়া গেলে আমি অত্যন্ত সলজ্জ মুখে দীনভাবে বৃদ্ধের নিকট একটি প্রস্তাব করিলাম। বলিলাম, যদিও নয়নজোড়ের বাবুদের সহিত আমাদের বংশমর্য্যাদার তুলনাই হইতে পারে না, তথাপি—

প্রস্তাবটা শেষ হইবামাত্র বৃদ্ধ আমাকে বক্ষে আলিঙ্গন করিয়া ধরিলেন, এবং আনন্দবেগে বলিয়া উঠিলেন—আমি গরীব—আমার যে এমন সৌভাগ্য হবে তা আমি জানতুম না ভাই—আমার কুসুম অনেক পুণ্য করেছে তাই তুমি আজ ধরা দিলে!" বলিতে বলিতে বৃদ্ধের চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

বৃদ্ধ, আজ এই প্রথম, তাঁহার মহিমান্বিত পূর্ব্বপুরুষদের প্রতি কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া স্বীকার করিলেন যে, তিনি গরীব, স্বীকার করিলেন যে আমাকে লাভ করিয়া নয়নজোড় বংশের গৌরব হানি হয় নাই। আমি যখন বৃদ্ধকে অপদস্থ করিবার জন্য চক্রান্ত করিতেছিলাম তখন বৃদ্ধ আমাকে পরম সৎপাত্র জানিয়া একান্তমনে কামনা করিতেছিলেন।

স্বর্ণমৃগ।

আদ্যনাথ এবং বৈদ্যনাথ চক্রবর্ত্তী দুই সরিক। উভয়ের মধ্যে বৈদ্যনাথের অবস্থাই কিছু খারাপ। বৈদ্যনাথের বাপ মহেশচন্দ্রের বিষয়বুদ্ধি আদৌ ছিল না, তিনি দাদা শিবনাথের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকিতেন। শিবনাথ ভাইকে প্রচুর স্নেহ দিয়া তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার বিষয়সম্পত্তি সমস্ত আত্মসাৎ করিয়া লন। কেবল খানকতক কোম্পানির কাগজ অবশিষ্ট থাকে। জীবনসমুদ্রে সেই কাগজ ক'খানি বৈদ্যনাথের একমাত্র অবলম্বন।

শিবনাথ বহু অনুসন্ধানে তাঁহার পুত্র আদ্যনাথের সহিত এক ধনীর একমাত্র কন্যার বিবাহ দিয়া বিষয়-বৃদ্ধির আর একটি সুযোগ করিয়া রাখিয়াছেন। মহেশচন্দ্র একটি সপ্তকন্যাভারগ্রস্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণের প্রতি দয়া করিয়া এক পয়সা পণ না লইয়া তাহার জ্যেষ্ঠা কন্যাটির সহিত পুত্রের বিবাহ দেন। সাতটি কন্যাকেই যে ঘরে লন নাই তাহার কারণ, তাঁহার একটিমাত্র পুত্র এবং ব্রাহ্মণও সেরূপ অনুরোধ করে নাই। তবে, তাহাদের বিবাহের উদ্দেশে সাধ্যাতিরিক্ত অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন।

পিতার মৃত্যুর পর বৈদ্যনাথ তাঁহার কাগজ কয়খানি লইয়া সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ও সন্তুষ্টচিত্তে ছিলেন। কাজকর্ম্মের কথা তাঁহার মনেও উদয় হইত না কাজের মধ্যে তিনি গাছের ডাল কাটিয়া

বসিয়া বসিয়া বহুযত্নে ছড়ি তৈরি করিতেন। রাজ্যের বালক এবং যুবকগণ তাঁহার নিকট ছড়ির জন্য উমেদার হইত, তিনি দান করিতেন। ইহা ছাড়া বদান্যতার উত্তেজনায় ছিপ ঘুড়ি লাঠাই নির্ম্মাণ করিতেও তাঁহার বিস্তর সময় যাইত। যাহাতে বহুযত্নে বহুকাল ধরিয়া চাঁচাছোলার আবশ্যক, অথচ সংসারের উপকারিতা দেখিলে যাহা সে পরিমাণে পরিশ্রম ও কালব্যয়ের অযোগ্য, এমন একটা হাতের কাজ পাইলে তাঁহার উৎসাহের সীমা থাকে না।

(পাড়ায় যখন দলাদলি এবং চক্রান্ত লইয়া বড় বড় পবিত্র বঙ্গীয় চণ্ডীমণ্ডপ ধূমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিতেছে তখন বৈদ্যনাথ একটি কলম-কাটা ছুরি এবং একখণ্ড গাছের ডাল লইয়া প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্ন এবং আহার ও নিদ্রার পর হইতে সায়াহ্নকাল পর্য্যন্ত নিজের দাওয়াটিতে একাকী অতিবাহিত করিতেছেন এমন প্রায় দেখা যাইত।)

ষষ্ঠীর প্রসাদে শত্রুর মুখে যথাক্রমে ছাই দিয়া বৈদ্যনাথের দুইটি পুত্র এবং একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করিল।

গৃহিণী মোক্ষদাসুন্দরীর অসন্তোষ প্রতিদিন বাড়িয়া উঠিতেছে। আদ্যনাথের ঘরে যেরূপ সমারোহ বৈদ্যনাথের ঘরে কেন সেরূপ না হয়! ও বাড়ির বিন্ধ্যবাসিনীর যেমন গহনাপত্র, বেনারসী সাড়ি, কথাবার্ত্তার ভঙ্গী এবং চালচলনের গৌরব মোক্ষদার যে ঠিক তেমনটা হইয়া উঠে না, ইহা অপেক্ষা যুক্তিবিরুদ্ধ ব্যাপার আর কি হইতে পারে! অথচ একই ত পরিবার! ভাইয়ের বিষয়

বঞ্চনা করিয়া লইয়াই ত উহাদের এত উন্নতি ! যত শোনে ততই মোক্ষদার হৃদয়ে নিজের শ্বশুরের প্রতি এবং শ্বশুরের একমাত্র পুত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা এবং অবজ্ঞা আর ধরে না ! নিজগৃহের কিছুই তাঁহার ভাল লাগে না। সকলি অসুবিধা এবং মানহানিজনক। শয়নের খাটটা মৃতদেহ বহনেরও যোগ্য নয়, যাহার সাতকুলে কেহ নাই এমন একটা অনাথ চাম্‌চিকেশাবকও এই জীর্ণ প্রাচীরে বাস করিতে চাহে না এবং গৃহসজ্জা দেখিলে ব্রহ্মচারী পরমহংসের চখেও জল আসে। এ সকল অত্যুক্তির প্রতিবাদ করা পুরুষের ন্যায় কাপুরুষজাতির পক্ষে অসম্ভব সুতরাং বৈদ্যনাথ বাহিরের দাওয়ায় বসিয়া দ্বিগুণ মনোযোগের সহিত ছড়ি চাঁচিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

কিন্তু মৌনব্রত বিপদের একমাত্র পরিত্রাণ নহে। এক একদিন স্বামীর শিল্পকার্য্যে বাধা দিয়া গৃহিণী তাঁহাকে অন্তঃপুরে আহ্বান করিয়া আনিতেন।

অত্যন্ত গম্ভীরভাবে অন্যদিকে চাহিয়া বলিতেন "গোয়ালার দুধ বন্ধ করিয়া দাও !"

বৈদ্যনাথ কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া নম্রভাবে বলিতেন "দুধটা—বন্ধ করিলে কি চলিবে ?—ছেলেরা খাইবে কি ?"

গৃহিণী উত্তর করিতেন, "আমানি ।"

আবার কোনদিন ইহার বিপরীত ভাব দেখা যাইত—গৃহিণী বৈদ্যনাথকে ডাকিয়া বলিতেন, "আমি জানি না। যা' করিতে হয় তুমি কর ।"

বৈদ্যনাথ ম্লানমুখে জিজ্ঞাসা করিতেন, "কি করিতে হইবে ?'

স্ত্রী বলিতেন, "এ মাসের মত বাজার করিয়া আন" বলিয়া এমন একটা ফর্দ্দ দিতেন যাহাতে রাজসূয় যজ্ঞ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইতে পারিত।

বৈদ্যনাথ যদি সাহসপূর্ব্বক প্রশ্ন করিতেন, "এত কি আবশ্যক আছে ?"

উত্তর শুনিতেন, "তবে ছেলেগুলা না খাইতে পাইয়া মরুক এবং আমিও যাই, তাহা হইলে তুমি একলা বসিয়া খুব শস্তায় চালাইতে পারিবে।"

এইরূপে ক্রমে ক্রমে বৈদ্যনাথ বুঝিতে পারিলেন ছড়ি চাঁচিয়া আর চলে না। একটা কিছু উপায় করা চাই। চাকরি করা অথবা ব্যবসা করা বৈদ্যনাথের পক্ষে দুরাশা। অতএব কুবেরের ভাণ্ডারে প্রবেশ করিবার একটা সংক্ষেপ রাস্তা আবিষ্কার করা চাই।

একদিন রাত্রে বিছানায় শুইয়া কাতরভাবে প্রার্থনা করিলেন, "হে মা জগদম্বে, স্বপ্নে যদি একটা দুঃসাধ্য রোগের পেটেণ্ট ঔষধ বলিয়া দাও, কাগজে বিজ্ঞাপন লিখিবার ভার আমি লইব !"

সে রাত্রে স্বপ্নে দেখিলেন তাঁহার স্ত্রী তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া "বিধবাবিবাহ করিব" বলিয়া একান্ত পণ করিয়া বসিয়াছেন। অর্থাভাব সত্ত্বে উপযুক্ত গহনা কোথায় পাওয়া যাইবে বলিয়া বৈদ্যনাথ উক্ত প্রস্তাবে আপত্তি করিতেছেন ; বিধবার গহনা আবশ্যক করে না বলিয়া পত্নী আপত্তি খণ্ডন করিতেছেন।

তাহার কি একটা চূড়ান্ত জবাব আছে বলিয়া তাঁহার মনে হইতেছে অথচ কিছুতেই মাথায় আসিতেছে না, এমন সময় নিদ্রাভঙ্গ হইয়া দেখিলেন সকাল হইয়াছে ; এবং কেন যে তাঁহার স্ত্রীর বিধবাবিবাহ হইতে পারে না তাহার সদুত্তর তৎক্ষণাৎ মনে পড়িয়া গেল এবং সে জন্য বোধ করি কিঞ্চিৎ দুঃখিত হইলেন।

প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া একাকী বসিয়া ঘুড়ির লখ্ তৈরি করিতেছেন এমন সময় এক সন্ন্যাসী জয়ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া দ্বারে আগত হইল। সেই মুহূর্ত্তেই বিদ্যুতের মত বৈদ্যনাথ ভাবী ঐশ্বর্য্যের উজ্জল মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। সন্ন্যাসীকে প্রচুর পরিমাণে আদর অভ্যর্থনা ও আহার্য্য যোগাইলেন। অনেক সাধ্যসাধনার পর জানিতে পারিলেন সন্ন্যাসী সোনা তৈরি করিতে পারে এবং সে বিদ্যা তাঁহাকে দান করিতেও অসম্মত হইল না।

গৃহিণীও নাচিয়া উঠিলেন। যকৃতের বিকার উপস্থিত হইলে লোকে যেমন সমস্ত হলুদবর্ণ দেখে, তিনি সেইরূপ পৃথিবীময় সোনা দেখিতে লাগিলেন। কল্পনা-কারিকরের দ্বারা শয়নের খাট, গৃহসজ্জা এবং গৃহপ্রাচীর পর্য্যন্ত সোনায় মণ্ডিত করিয়া মনে মনে বিন্ধ্যবাসিনীকে নিমন্ত্রণ করিলেন।

সন্ন্যাসী প্রতিদিন দুইসের করিয়া দুগ্ধ এবং দেড় সের করিয়া মোহনভোগ খাইতে লাগিল এবং বৈদ্যনাথের কোম্পানির কাগজ দোহন করিয়া অজস্র রৌপ্যরস নিঃসৃত করিয়া লইল।

ছিপ ছড়ি লাঠাইয়ের কাঙালরা বৈদ্যনাথের রুদ্ধদ্বারে নিস্ফল

আঘাত করিয়া চলিয়া যায়। ঘরে ছেলেগুলো যথাসময়ে খাইতে পায় না, পড়িয়া গিয়া কপাল ফুলায়, কাঁদিয়া আকাশ ফাটাইয়া দেয়, কর্ত্তা গৃহিণী কাহারো ভ্রূক্ষেপ নাই। নিস্তব্ধভাবে অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে বসিয়া কটাহের দিকে চাহিয়া উভয়ের চোখে পল্লব নাই, মুখে কথা নাই। তৃষিত একাগ্রনেত্রে অবিশ্রান্ত অগ্নিশিখার প্রতিবিম্ব পড়িয়া চোখের মণি যেন স্পর্শমণির গুণ প্রাপ্ত হইল। দৃষ্টিপথ সায়াহ্নের সূর্য্যাস্তপথের মত জ্বলন্ত প্রলেপে রাঙা হইয়া উঠিল।

দুখানা কোম্পানির কাগজ এই স্বর্ণ-অগ্নিতে আহুতি দেওয়ার পর একদিন সন্ন্যাসী আশ্বাস দিল, "কাল সোনার রং ধরিবে।"

সেদিন রাত্রে কাহারো ঘুম হইল না; স্ত্রীপুরুষে মিলিয়া সুবর্ণপুরী নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন। তৎসম্বন্ধে মাঝে মাঝে উভয়ের মধ্যে মতভেদ এবং তর্কও উপস্থিত হইয়াছিল কিন্তু আনন্দ আবেগে তাহার মীমাংসা হইতে বিলম্ব হয় নাই—পরস্পর পরস্পরের খাতিরে নিজ নিজ মত কিছু কিছু পরিত্যাগ করিতে অধিক ইতস্ততঃ করেন নাই সে রাত্রে দাম্পত্য একীকরণ এত ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল।

পরদিন আর সন্ন্যাসীর দেখা নাই। চারিদিক হইতে সোনার রং ঘুচিয়া গিয়া সূর্য্যকিরণ পর্য্যন্ত অন্ধকার হইয়া দেখা দিল। ইহার পর হইতে শয়নের খাট গৃহসজ্জা এবং গৃহপ্রাচীর চতুর্গুণ দারিদ্র্য এবং জীর্ণতা প্রকাশ করিতে লাগিল।

এখন হইতে গৃহকার্য্যে বৈদ্যনাথ কোন একটা সামান্য মত

প্রকাশ করিতে গেলে গৃহিণী তীব্রমধুর স্বরে বলেন,"বুদ্ধির পরিচয় অনেক দিয়াছ এখন কিছুদিন ক্ষান্ত থাক!" বৈদ্যনাথ একেবারে নিবিয়া যায়।

মোক্ষদা এমনি একটা শ্রেষ্ঠতার ভাব ধারণ করিয়াছে যেন এই স্বর্ণমরীচিকায় সে নিজে এক মুহূর্ত্তের জন্যও আশ্বস্ত হয় নাই।

অপরাধী বৈদ্যনাথ স্ত্রীকে কিঞ্চিৎ সন্তুষ্ট করিবার জন্য বিবিধ উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। একদিন একটি চতুষ্কোণ মোড়কে গোপন উপহার লইয়া স্ত্রীর নিকট গিয়া প্রচুর হাস্যবিকাশ পূর্ব্বক সাতিশয় চতুরতার সহিত ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, "কি আনিয়াছি বল দেখি!

স্ত্রী কৌতূহল গোপন করিয়া উদাসীনভাবে কহিলেন, "কেমন করিয়া বলিব! আমি ত আর 'জান' নহি!"

বৈদ্যনাথ অনাবশ্যক কালব্যয় করিয়া প্রথমে দড়ির গাঠ অতি ধীরে ধীরে খুলিলেন তার পর ফুঁ দিয়া কাগজের ধুলা ঝাড়িলেন, তাহার পর অতি সাবধানে এক এক ভাঁজ করিয়া কাগজের মোড়ক খুলিয়া আর্টষ্টুডিয়োর রংকরা দশমহাবিদ্যার ছবি বাহির করিয়া আলোর দিকে ফিরাইয়া গৃহিণীর সম্মুখে ধরিলেন।

গৃহিণীর তৎক্ষণাৎ বিন্ধ্যবাসিনীর শয়নকক্ষের বিলাতী তেলের ছবি মনে পড়িল—অপর্য্যাপ্ত অবজ্ঞার স্বরে কহিলেন, "আ মরে' যাই! এ তোমার বৈঠকখানায় রাখিয়া বসিয়া বসিয়া নিরীক্ষণ কর গে। এ আমার কাজ নাই।" বিমর্ষ বৈদ্যনাথ বুঝিলেন অন্যান্য অনেক ক্ষমতার সহিত স্ত্রীলোকের মন

যোগাইবার দুরূহ ক্ষমতা হইতেও বিধাতা তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়াছেন।

এদিকে দেশে যত দৈবজ্ঞ আছে মোক্ষদা সকলকে হাত দেখাইলেন, কোষ্টী দেখাইলেন। সকলেই বলিল, তিনি সধবাবস্থায় মরিবেন। কিন্তু সেই পরমানন্দময় পরিণামের জন্য তিনি একান্ত ব্যগ্র ছিলেন না, অতএব ইহাতেও তাঁহার কৌতূহল নিবৃত্তি হইল না।

শুনিলেন তাঁহার সন্তানভাগ্য ভাল, পুত্রকন্যায় তাঁহার গৃহ অবিলম্বে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা আছে; শুনিয়া তিনি বিশেষ প্রফুল্লতা প্রকাশ করিলেন না।

অবশেষে একজন গণিয়া বলিল বৎসরখানেকের মধ্যে যদি বৈদ্যনাথ দৈব ধন প্রাপ্ত না হন, তাহা হইলে গণক তাহার পাঁজি-পুঁথি সমস্তই পুড়াইয়া ফেলিবে। গণকের এইরূপ নিদারুণ পণ শুনিয়া মোক্ষদার মনে আর তিলমাত্র অবিশ্বাসের কারণ রহিল না।

গণৎকার ত প্রচুর পারিতোষিক লইয়া বিদায় হইয়াছেন, কিন্তু বৈদ্যনাথের জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিল। ধন উপার্জ্জনের কতকগুলি সাধারণ প্রচলিত পথ আছে, যেমন চাষ, চাকরি ব্যবসা, চুরি এবং প্রতারণা। কিন্তু দৈব ধন উপার্জ্জনেরর সেরূপ নির্দ্দিষ্ট কোন উপায় নাই। এই জন্য মোক্ষদা বৈদ্যনাথকে যতই উৎসাহ দেন এবং ভর্ৎসনা করেন বৈদ্যনাথ ততই কোন দিকে রাস্তা দেখিতে পান না। কোন্‌খানে খুঁড়িতে আরম্ভ করিবেন

কোন্ পুকুরে ডুবারি নামাইবেন, বাড়ির কোন প্রাচীরটা ভাঙ্গিতে হইবে, কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারেন না।

মোক্ষদা নিতান্ত বিরক্ত হইয়া স্বামীকে জানাইলেন যে, পুরুষমানুষের মাথায় যে মস্তিষ্কের পরিবর্ত্তে এতটা গোময় থাকিতে পারে তাহা তাঁহার পূর্ব্বে ধারণা ছিল না।

বলিলেন "একটু নড়িয়া চড়িয়া দেখ। হাঁ করিয়া বসিয়া থাকিলে কি আকাশ হইতে টাকা বৃষ্টি হইবে ?"

কথাটা সঙ্গত বটে, এবং বৈদ্যনাথের একান্ত ইচ্ছাও তাই, কিন্তু কোন্ দিকে নড়িবেন কিসের উপর চড়িবেন তাহা যে কেহ বলিয়া দেয় না! অতএব দাওয়ায় বসিয়া বৈদ্যনাথ আবার ছড়ি চাঁচিতে লাগিলেন।

এদিকে আশ্বিন মাসে দুর্গোৎসব নিকটবর্ত্তী হইল। চতুর্থীর দিন হইতেই ঘাটে নৌকা আসিয়া লাগিতে লাগিল। প্রবাসীরা দেশে ফিরিয়া আসিতেছে। ঝুড়িতে মানকচু কুমড়া শুষ্ক নারিকেল টিনের বাক্সের মধ্যে ছেলেদের জন্য জুতা ছাতা কাপড় এবং প্রেয়সীর জন্য এসেন্স সাবান নূতন গল্পের বহি এবং সুবাসিত নারিকেল তৈল।

মেঘমুক্ত আকাশে শরতের সূর্য্যকিরণ উৎসবের হাস্যের মত ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, পক্কোন্মুখ ধান্যক্ষেত্র থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিতেছে, বর্ষাধৌত সতেজ তরুপল্লব নব শীতবায়ুতে সির্ সির্ করিয়া উঠিতেছে—এবং তসরের চায়নাকোট পরিয়া কাঁধে একটী

পাকান চাদর ঝুলাইয়া ছাতি মাথায় প্রত্যাগত পথিকেরা মাঠের পথ দিয়া ঘরের মুখে চলিয়াছে।

বৈদ্যনাথ বসিয়া বসিয়া তাই দেখে এবং তাহার হৃদয় হইতে দীর্ঘনিশ্বাস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। নিজের নিরানন্দ গৃহের সহিত বাঙ্গলা দেশের সহস্র গৃহের মিলনোৎসবের তুলনা করে, এবং মনে মনে বলে, "বিধাতা কেন আমাকে এমন অকর্ম্মণ্য করিয়া সৃজন করিয়াছে !"—

ছেলেরা ভোরে উঠিয়াই প্রতিমা নির্ম্মাণ দেখিবার জন্য আদ্যনাথের বাড়ির প্রাঙ্গণে গিয়া হাজির ছিল। খাবারবেলা হইলে দাসী তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক গ্রেফ্‌তার করিয়া লইয়া আসিল। তখন বৈদ্যনাথ বসিয়া বসিয়া এই বিশ্বব্যাপী উৎসবের মধ্যে নিজের জীবনের নিস্ফলতা স্মরণ করিতেছিলেন। দাসীর হাত হইতে ছেলে দুটিকে উদ্ধার করিয়া কোলের কাছে ঘনিষ্ঠভাবে টানিয়া বড়টিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হাঁরে অবু, এবার পূজোর সময় কি চাস্ বল্ দেখি।"

অবিনাশ তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল "একটা নৌকো দিয়ো বাবা !"

ছোটটিও মনে করিল, বড় ভাইয়ের চেয়ে কোন বিষয়ে ন্যূন হওয়া কিছু নয়, কহিল "আমাকেও একটা নৌকো দিয়ো বাবা।"

বাপের উপযুক্ত ছেলে ! একটা অকর্ম্মণ্য কারুকার্য্য পাইলে আর কিছু চাহে না। বাপ বলিলেন, "আচ্ছা।"

এদিকে যথাকালে পূজার ছুটিতে কাঁশী হইতে মোক্ষদার এক খুড়া বাড়ি কিরিয়া আসিলেন। তিনি ব্যবসায়ে উকীল। মোক্ষদা কিছুদিন ঘন ঘন তাঁহার বাড়ী যাতায়াত করিলেন।

অবশেষে একদিন স্বামীকে আসিয়া বলিলেন, "ওগো, তোমাকে কাশী যাইতে হইতেছে!"

বৈদ্যনাথ সহসা মনে করিলেন, বুঝি তাঁহার মৃত্যুকাল উপস্থিত, গণক কোষ্ঠী হইতে আবিষ্কার করিয়াছে; সহধর্ম্মিণী সেই সন্ধান পাইয়া তাঁহার সদ্গতি করিবার যুক্তি করিতেছেন।

পরে শুনিলেন, এইরূপ জনশ্রুতি, যে কাশীতে একটি বাড়ি আছে সেখানে গুপ্তধন মিলিবার কথা, সেই বাড়ি কিনিয়া তাহার ধন উদ্ধার করিয়া আনিতে হইবে।

বৈদ্যনাথ বলিলেন—কি সর্ব্বনাশ। আমি কাশী যাইতে পারিব না!"

বৈদ্যনাথ কখনও ঘর ছাড়িয়া কোথাও যান নাই। গৃহস্থকে কি করিয়া ঘরছাড়া করিতে হয় প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ লিখিতেছেন, স্ত্রীলোকের সে সম্বন্ধে "অশিক্ষিতপটুত্ব" আছে। মোক্ষদা মুখের কথায় ঘরের মধ্যে যেন লঙ্কার ধোঁয়া দিতে পারিতেন, কিন্তু তাহাতে হতভাগ্য বৈদ্যনাথ কেবল চোখের জলে ভাসিয়া যাইত, কাশী যাইবার নাম করিত না।

দিন দুই তিন গেল। বৈদ্যনাথ বসিয়া বসিয়া কতকগুলা কাষ্ঠখণ্ড কাটিয়া কুঁদিয়া জোড়া দিয়া দুইখানি খেলার নৌকা তৈার করিলেন। তাহাতে মাস্তুল বসাইলেন, কাপড় কাটিয়া

পাল আঁটিয়া দিলেন; লাল শালুর নিশান উড়াইলেন, হাল ও দাঁড় বসাইয়া দিলেন। একটি পুতুল কর্ণধার এবং আরোহীও ছাড়িলেন না। তাহাতে বহু যত্ন এবং আশ্চর্য্য নিপুণতা প্রকাশ করিলেন। সে নৌকা দেখিয়া অসহ্য চিত্তচাঞ্চল্য না জন্মে এমন সংযতচিত্ত বালক সম্প্রতি পাওয়া দুর্লভ। অতএব বৈদ্যনাথ সপ্তমীর পূর্ব্বরাত্রে যখন নৌকা দুটি লইয়া ছেলেদের হাতে দিলেন তাহারা আনন্দে নাচিয়া উঠিল। একেত নৌকার খোলটাই যথেষ্ট, তাহাতে আবার হাল আছে, দাঁড় আছে, মাস্তুল আছে, পাল আছে, আবার যথাস্থানে মাঝি বসিয়া, ইহাই তাহাদের সমধিক বিস্ময়ের কারণ হইল।

ছেলেদের আনন্দকলরবে আকৃষ্ট হইয়া মোক্ষদা আসিয়া দরিদ্র পিতার পূজার উপহার দেখিলেন।

দেখিয়া, রাগিয়া কাঁদিয়া কপালে করাঘাত করিয়া খেলেনা দুটো কাড়িয়া জান্‌লার বাহিরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। সোনার হার গেল, সাটিনের জামা গেল, জরির টুপি গেল, শেষে কিনা হতভাগ্য মনুষ্য দুইখানা খেলানা দিয়া নিজের ছেলেকে প্রতারণা করিতে আসিয়াছে! তাও আবার দুই পয়সা ব্যয় নাই, নিজের হাতে নির্ম্মাণ!

ছোট ছেলে ত উর্দ্ধশ্বাসে কাঁদিতে লাগিল, "বোকা ছেলে" বলিয়া তাহাকে মোক্ষদা ঠাস্ করিয়া চড়াইয়া দিলেন।

বড় ছেলেটি বাপের মুখের দিকে চাহিয়া নিজের দুঃখ

ভুলিয়া গেল। উল্লাসের ভাণমাত্র করিয়া কহিল, "বাবা, আমি কাল ভোরে গিয়ে কুড়িয়ে নিয়ে আস্‌ব।"

বৈদ্যনাথ তাহার পরদিন কাশী যাইতে সম্মত হইলেন। কিন্তু টাকা কোথায়! তাঁহার স্ত্রী গহনা বিক্রয় করিয়া টাকা সংগ্রহ করিলেন। বৈদ্যনাথের পিতামহীর আমলের গহনা, এমন খাঁটি সোনা এবং ভারী গহনা আজকালকার দিনে পাওয়াই যায় না।

বৈদ্যনাথের মনে হইল তিনি মরিতে যাইতেছেন। ছেলেদের কোলে করিয়া চুম্বন করিয়া সাশ্রুনেত্রে বাড়ি হইতে বাহির হইলেন। তখন মোক্ষদাও কাঁদিতে লাগিলেন।

কাশীর বাড়িওয়ালা বৈদ্যনাথের খুড়শ্বশুরের মক্কেল। বোধ করি সেই কারণে বাড়ি খুব চড়া দামেই বিক্রয় হইল। বৈদ্যনাথ একাকী বাড়ি দখল করিয়া বসিলেন। একেবারে নদীর উপরেই বাড়ি। ভিত্তি ধৌত করিয়া নদীস্রোত প্রবাহিত হইতেছে।

রাত্রে বৈদ্যনাথের গা ছম্‌ ছম্‌ করিতে লাগিল। শূন্য গৃহে শিয়রের কাছে প্রদীপ জ্বালাইয়া চাদর মুড়ি দিয়া শয়ন করিলেন।

কিন্তু কিছুতেই নিদ্রা হয় না। গভীর রাত্রে যখন সমস্ত কোলাহল থামিয়া গেল তখন কোথা হইতে একটা ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ শুনিয়া বৈদ্যনাথ চমকিয়া উঠিলেন। শব্দ মৃদু কিন্তু পরিষ্কার। যেন পাতালে বলিরাজের ভাণ্ডারে কোষাধ্যক্ষ বসিয়া বসিয়া টাকা গণনা করিতেছে।

বৈদ্যনাথের মনে ভয় হইল, কৌতূহল হইল এবং সেই সঙ্গে দুর্জ্জয় আশার সঞ্চার হইল। কম্পিতহস্তে প্রদীপ লইয়া ঘরে ঘরে ফিরিলেন। এঘরে গেলে মনে হয় শব্দ ওঘর হইতে আসিতেছে—ওঘরে গেলে মনে হয় এঘর হইতে আসিতেছে। বৈদ্যনাথ সমস্ত রাত্রি কেবলই এঘর ওঘর করিলেন। দিনের বেলা সেই পাতালভেদী শব্দ অন্যান্য শব্দের সহিত মিশিয়া গেল, আর তাহাকে চিনা গেল না।

রাত্রি দুই তিন প্রহরের সময় যখন জগৎ নিদ্রিত হইল তখন আবার সেই শব্দ জাগিয়া উঠিল। বৈদ্যনাথের চিত্ত নিতান্ত অস্থির হইল। শব্দ লক্ষ্য করিয়া কোন্ দিকে যাইবেন ভাবিয়া পাইলেন না। মরুভূমির মধ্যে জলের কল্লোল শোনা যাইতেছে অথচ কোন্ দিক্ হইতে আসিতেছে নির্ণয় হইতেছে না; ভয় হইতেছে পাছে একবার ভুল পথ অবলম্বন করিলে গুপ্ত নির্ঝরিণী একেবারে আয়ত্তের অতীত হইয়া যায়; তৃষিত পথিক স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া প্রাণপণে কান খাড়া করিয়া থাকে, এদিকে তৃষ্ণা উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠে—বৈদ্যনাথের সেই অবস্থা হইল।

বহুদিন অনিশ্চিত অবস্থাতেই কাটিয়া গেল। কেবল অনিদ্রা এবং বৃথা আশ্বাসে তাঁহার সন্তোষস্নিগ্ধ মুখে ব্যগ্রতার তীব্রভাব রেখাঙ্কিত হইয়া উঠিল। কোটরনিবিষ্ট চকিতনেত্রে মধ্যাহ্নের মরুবালুকার মত একটা জ্বালা প্রকাশ পাইল।

অবশেষে একদিন দ্বিপ্রহরে সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করিয়া ঘরের

মেঝেময় শাবল ঠুকিয়া শব্দ করিতে লাগিলেন। একটি পার্শ্ববর্ত্তী ছোট কুঠরির মেঝের মধ্য হইতে ফাঁপা আওয়াজ দিল।

রাত্রি নিষুপ্ত হইলে পর বৈদ্যনাথ একাকী বসিয়া সেই মেঝে খনন করিতে লাগিলেন। যখন রাত্রি প্রভাত প্রায়, তখন ছিদ্রখনন সম্পূর্ণ হইল।

বৈদ্যনাথ দেখিলেন নীচে একটা ঘরের মত আছে—কিন্তু সেই রাত্রের অন্ধকারে তাহার মধ্যে নির্ব্বিচারে পা নাগাইয়া দিতে সাহস করিলেন না। গর্ত্তের উপর বিছানা চাপা দিয়া শয়ন করিলেন। কিন্তু শব্দ এমনি পরিস্ফুট হইয়া উঠিল যে ভয়ে সেখান হইতে উঠিয়া আসিলেন—অথচ গৃহ অরক্ষিত রাখিয়া দ্বার ছাড়িয়া দূরে যাইতে প্রবৃত্তি হইল না। লোভ এবং ভয় দুই দিক হইতে দুই হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল। রাত কাটিয়া গেল।

আজ দিনের বেলাও শব্দ শুনা যায়। ভৃত্যকে ঘরের মধ্যে ঢুকিতে না দিয়া বাহিরে আহারাদি করিলেন। আহরান্তে ঘরে ঢুকিয়া দ্বারে চাবি লাগাইয়া দিলেন।

দুর্গানাম উচ্চারণ করিয়া গহ্বরমুখ হইতে বিছানা সরাইয়া ফেলিলেন। জলের ছল্‌ছল্‌ এবং ধাতুদ্রব্যের ঠংঠং খুব পরিষ্কার শুনা গেল।

ভয়ে ভয়ে গর্ত্তের কাছে আস্তে আস্তে মুখ লইয়া গিয়া দেখিলেন অনতি উচ্চ কক্ষের মধ্যে জলের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে—অন্ধকারে আর বিশেষ কিছু দেখিতে পাইলেন না।

একটা বড় লাঠি নামাইয়া দেখিলেন জল এক হাঁটুর অধিক নহে। একটি দিয়াশালাই ও বাতি লইয়া সেই অগভীর গৃহের মধ্যে অনায়াসে লাফাইয়া পড়িলেন। পাছে এক মুহূর্ত্তে সমস্ত আশা নিবিয়া যায় এইজন্য বাতি জ্বালাইতে হাত কাঁপিতে লাগিল। অনেকগুলি দেশালাই নষ্ট করিয়া অবশেষে বাতি জ্বলিল।

দেখিলেন, একটি মোটা লোহার শিকলিতে একটি বৃহৎ তাঁবার কলসী বাঁধা রহিয়াছে, এক একবার জলের স্রোত প্রবল হয় এবং শিকলি কলসীর উপর পড়িয়া শব্দ করিতে থাকে।

বৈদ্যনাথ জলের উপর ছন্‌ছন্‌ শব্দ করিতে করিতে তাড়াতাড়ি সেই কলসীর কাছে উপস্থিত হইলেন। গিয়া দেখিলেন কলসী শূন্য।

তথাপি নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না—দুই হস্তে কলসী তুলিয়া খুব করিয়া ঝাঁকানি দিলেন। ভিতরে কিছুই নাই। উপুড় করিয়া ধরিলেন। কিছুই পড়িল না। দেখিলেন কলসীর গলা ভাঙ্গা। যেন এককালে এই কলসীর মুখ সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল কে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে।

তখন বৈদ্যনাথ জলের মধ্যে দুই হস্ত দিয়া পাগলের মত হাতড়াইতে লাগিলেন। কর্দ্দমস্তরের মধ্যে হাতে কি একটা ঠেকিল, তুলিয়া দেখিলেন মড়ার মাথা—সেটাও একবার কানের কাছে লইয়া ঝাঁকাইলেন—ভিতরে কিছুই নাই। ছুড়িয়া ফেলিয়া

দিলেন। অনেক খুঁজিয়া নরকঙ্কালের অস্থি ছাড়া আর কিছুই পাইলেন না।

দেখিলেন নদীর দিকে দেয়ালের এক জায়গা ভাঙ্গা; সেইখান দিয়া জল প্রবেশ করিতেছে, এবং তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী যে ব্যক্তির কোষ্ঠীতে দৈবধনলাভ লেখা ছিল, সেও সম্ভবত এই ছিদ্র দিয়া প্রবেশ করিয়াছিল।

অবশেষে সম্পূর্ণ হতাশ হইয়া "মা" বলিয়া মস্ত একটা মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন—প্রতিধ্বনি যেন অতীত কালের আরো অনেক হতাশ্বাস ব্যক্তির নিশ্বাস একত্রিত করিয়া ভীষণ গাম্ভীর্য্যের সহিত পাতাল হইতে স্তনিত হইয়া উঠিল।

সর্ব্বাঙ্গে জলকাদা মাখিয়া বৈদ্যনাথ উপরে উঠিলেন।

জনপূর্ণ কোলাহলময় পৃথিবী তাঁহার নিকটে আদ্যোপান্ত মিথ্যা এবং সেই শৃঙ্খলবদ্ধ ভগ্নঘটের মত শূন্য বোধ হইল।

আবার যে জিনিষপত্র বাঁধিতে হইবে, টিকিট কিনিতে হইবে, গাড়ি চড়িতে হইবে, বাড়ি ফিরিতে হইবে, স্ত্রীর সহিত বাক্‌বিতণ্ডা করিতে হইবে, জীবন প্রতিদিন বহন করিতে হইবে সে তাঁহার অসহ্য বলিয়া বোধ হইল। ইচ্ছা হইল নদীর জীর্ণ পাড়ের মত ঝুপ করিয়া ভাঙ্গিয়া জলে পড়িয়া যান।

কিন্তু তবু সেই জিনিষপত্র বাঁধিলেন, টিকিট কিনিলেন, এবং গড়িও চড়িলেন।

এবং একদিন শীতের সায়াহ্নে বাড়ির দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। আশ্বিন মাসে শরতের প্রাতঃকালে দ্বারের কাছে

বসিয়া বৈদ্যনাথ অনেক প্রবাসীকে বাড়ি ফিরিতে দেখিয়াছেন, এবং দীর্ঘশ্বাসের সহিত মনে মনে এই বিদেশ হইতে দেশে ফিরিবার সুখের জন্য লালায়িত হইয়াছেন—তখন আজিকার সন্ধ্যা স্বপ্নেরও অগম্য ছিল।

বাড়িতে প্রবেশ করিয়া প্রাঙ্গণের কাষ্ঠাসনে নির্ব্বোধের মত বসিয়া রহিলেন, অন্তঃপুরে গেলেন না। সর্ব্বপ্রথমে ঝি তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দকোলাহল বাধাইয়া দিল, ছেলেরা ছুটিয়া আসিল, গৃহিণী ডাকিয়া পাঠাইলেন।

বৈদ্যনাথের যেন একটা ঘোর ভাঙ্গিয়া গেল, আবার যেন তাঁহার সেই পূর্ব্বসংসারে জাগিয়া উঠিলেন।

শুষ্কমুখে ম্লানহাস্য লইয়া একটা ছেলেকে কোলে করিয়া একটা ছেলের হাত ধরিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

তখন ঘরে প্রদীপ জ্বালান হইয়াছে এবং যদিও রাত হয় নাই তথাপি শীতের সন্ধ্যা, রাত্রির মত নিস্তব্ধ হইয়া আসিয়াছে।

বৈদ্যনাথ খানিকক্ষণ কিছু বলিলেন না, তার পর মৃদুস্বরে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন আছ ?"

স্ত্রী তাহার কোন উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইল ?"

বৈদ্যনাথ নিরুত্তরে কপালে আঘাত করিলেন। মোক্ষদার মুখ ভারি শক্ত হইয়া উঠিল।

ছেলেরা প্রকাণ্ড একটা অকল্যাণের ছায়া দেখিয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া গেল। ঝির কাছে গিয়া বলিল, "সেই নাপিতের গল্প বল্।" বলিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

রাত হইতে লাগিল কিন্তু দুজনের মুখে একটি কথা নাই। বাড়ির মধ্যে কি একটা যেন ছম্‌ছম্ করিতে লাগিল এবং মোক্ষদার ঠোঁট দুটি ক্রমশই বজ্রের মত আঁটিয়া আসিল।

অনেকক্ষণ পরে মোক্ষদা কোন কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে শয়নগৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন।

বৈদ্যনাথ চুপ করিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। চৌকিদার প্রহর হাঁকিয়া গেল। শ্রান্ত পৃথিবী অকাতর নিদ্রায় মগ্ন হইয়া রহিল। আপনার আত্মীয় হইতে আরম্ভ করিয়া অনন্ত আকাশের নক্ষত্র পর্য্যন্ত কেহই এই লাঞ্ছিত ভগ্ননিদ্র বৈদ্যনাথকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিল না।

অনেক রাত্রে, বোধ করি কোন স্বপ্ন হইতে জাগিয়া বৈদ্য-নাথের বড় ছেলেটি শয্যা ছাড়িয়া আস্তে আস্তে বারেন্দায় আসিয়া ডাকিল, "বাবা!"

তখন তাহার বাবা সেখানে নাই। অপেক্ষাকৃত ঊর্দ্ধকণ্ঠে রুদ্ধদ্বারের বাহির হইতে ডাকিল, "বাবা!" কিন্তু কোন উত্তর পাইল না।

আবার ভয়ে ভয়ে বিছানায় গিয়া শয়ন করিল।

পূর্ব্বপ্রথানুসারে ঝি সকালবেলায় তামাক সাজিয়া তাঁহাকে খুঁজিল, কোথাও দেখিতে পাইল না। বেলা হইলে প্রতিবেশিগণ গৃহপ্রত্যাগত বান্ধবের খোঁজ লইতে আসিল, কিন্তু বৈদ্যনাথের সহিত সাক্ষাৎ হইল না।

প্রতিবেশিনী।

আমার প্রতিবেশিনী বালবিধবা। যেন শরতের শিশিরাশ্রুপ্লুত শেফালির মত বৃন্তচ্যুত,—কোন বাসরগৃহের ফুলশয্যার জন্য সে নহে, সে কেবল দেবপূজার জন্যই উৎসর্গ-করা।

তাহাকে আমি মনে মনে পূজা করিতাম। তাহার প্রতি আমার মনের ভাবটা যে কি ছিল পূজা ছাড়া তাহা অন্য কোন সহজ ভাষায় প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি না—পরের কাছে ত নয়ই, নিজের কাছেও না!

আমার অন্তরঙ্গ প্রিয়বন্ধু নবীনমাধব, সেও কিছু জানিত না। এইরূপে এই যে আমার গভীরতম আবেগটিকে গোপন করিয়া নির্ম্মল করিয়া রাখিয়াছিলাম ইহাতে আমি কিছু গর্ব্ব অনুভব করিতাম।

কিন্তু মনের বেগ পার্ব্বতী নদীর মত, নিজের জন্মশিখরে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে চাহে না। কোন একটা উপায়ে বাহির হইবার চেষ্টা করে। অকৃতকার্য্য হইলে বক্ষের মধ্যে বেদনার সৃষ্টি করিতে থাকে। তাই ভাবিতেছিলাম, কবিতায় ভাব প্রকাশ করিব কিন্তু কুণ্ঠিতা লেখনী কিছুতেই অগ্রসর হইতে চাহিল না।

পরমাশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঠিক এই সময়েই আমার বন্ধু

নবীনমাধবের অকস্মাৎ বিপুলবেগে কবিতা লিখিবার ঝোঁক আসিল; যেন হঠাৎ ভূমিকম্পের মত।

সে বেচারার এরূপ দৈববিপত্তি পূর্ব্বে কখন হয় নাই; সুতরাং সে এই অভিনয় আন্দোলনের জন্য লেশমাত্র প্রস্তুত ছিল না। তাহার হাতের কাছে ছন্দ মিল কিছুরই জোগাড় ছিল না, তবু সে দমিল না দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। কবিতা যেন বৃদ্ধ বয়সের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর মত তাহাকে পাইয়া বসিল। নবীনমাধব ছন্দ মিল সম্বন্ধে সহায়তা ও সংশোধনের জন্য আমার শরণাপন্ন হইল।

কবিতার বিষয়গুলি নূতন নহে; অথচ পুরাতনও নহে। অর্থাৎ তাহাকে চিরনূতনও বলা যায়, চিরপুরাতন বলিলেও চলে! প্রেমের কবিতা, প্রিয়তমার প্রতি। আমি তাহাকে একটা ঠেলা দিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কে হে, ইনি কে?

নবীন হাসিয়া কহিল—এখনো সন্ধান পাই নাই!

নবীন রচয়িতার সহায়তাকার্য্যে আমি অত্যন্ত আরাম পাইলাম। নবীনের কাল্পনিক প্রিয়তমার প্রতি আমার রুদ্ধ আবেগ প্রয়োগ করিলাম। শাবকহীন মুরগি যেমন হাঁসের ডিম পাইলেও বুক পাতিয়া তা দিতে বসে, হতভাগ্য আমি তেমনি নবীনমাধবের ভাবের উপরে হৃদয়ের সমস্ত উত্তাপ দিয়া চাপিয়া বসিলাম। আনাড়ির লেখা এমনি প্রবল বেগে সংশোধন করিতে লাগিলাম যে প্রায় পনেরো আনা আমারি লেখা দাঁড়াইল।

নবীন বিস্মিত হইয়া বলে—ঠিক এই কথাই আমি বলিতে চাই কিন্তু বলিতে পারি না! অথচ তোমার এ সব ভাব জোগায় কোথা হইতে?

আমি কবির মত উত্তর করি—কল্পনা হইতে। কারণ, সত্য নীরব, কল্পনাই মুখরা। সত্যঘটনা ভাবস্রোতকে পাথরের মত চাপিয়া থাকে, কল্পনাই তাহার পথ মুক্ত করিয়া দেয়।

নবীন গম্ভীর মুখে একটুখানি ভাবিয়া কহিল,—তাই ত দেখিতেছি! ঠিক বটে!—আবার খানিকক্ষণ ভাবিয়া বলিল—ঠিক্ ঠিক্!

পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমার ভালবাসার মধ্যে একটি কাতর সঙ্কোচ ছিল, তাই নিজের জবানীতে কোনমতে লিখিতে পারিলাম না। নবীনকে পর্দ্দার মধ্যে মাঝখানে রাখিয়া তবেই আমার লেখনী মুখ খুলিতে পারিল। লেখাগুলো যেন রসে ভরিয়া উত্তাপে ফাটিয়া উঠিতে লাগিল!

নবীন বলিল, এত তোমারি লেখা! তোমারি নামে বাহির করি।

আমি কহিলাম,—বিলক্ষণ! এ তোমারি লেখা—আমি সামান্য একটু বদল করিয়াছি মাত্র!

ক্রমে নবীনেরও সেইরূপ ধারণা জন্মিল!

জ্যোতির্বিদ্ যেমন নক্ষত্রোদয়ের অপেক্ষায় আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকে, আমিও যে তেমনি মাঝে মাঝে আমাদের পাশের বাড়ির বাতায়নের দিকে চাহিয়া দেখিতাম সে কথা

অস্বীকার করিতে পারি না। মাঝে মাঝে ভক্তের সেই ব্যাকুল দৃষ্টিক্ষেপ সার্থকও হইত। সেই কর্ম্মযোগনিরতা ব্রহ্মচারিণীর সৌম্য মুখশ্রী হইতে শান্তস্নিগ্ধ জ্যোতি প্রতিবিম্বিত হইয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে আমার সমস্ত চিত্তক্ষোভ দমন করিয়া দিত।

কিন্তু সেদিন সহসা এ কি দেখিলাম! আমার চন্দ্রলোকেও কি এখনো অগ্ন্যুৎপাত আছে? সেখানকার জনশূন্য সমাধিমগ্ন গিরিগুহার সমস্ত বহ্নিদাহ এখনো সম্পূর্ণ নির্ব্বাণ হইয়া যায় নাই কি?

সে দিন বৈশাখ মাসের অপরাহ্ণে ঈশান কোণে মেঘ ঘনাইয়া আসিতেছিল। সেই আসন্ন ঝঞ্ঝার মেঘবিচ্ছুরিত রুদ্রদীপ্তিতে আমার প্রতিবেশিনী জানালায় একাকিনী দাঁড়াইয়াছিল। সে দিন তাহার শূন্যনিবিষ্ট ঘনকৃষ্ণ দৃষ্টির মধ্যে কি সুদূর প্রসারিত নিবিড় বেদনা দেখিতে পাইলাম!

আছে, আমার ঐ চন্দ্রালোকে এখনো উত্তাপ আছে! এখনো সেখানে উষ্ণ নিঃশ্বাস সমীরিত। দেবতার জন্য মানুষ নহে, মানুষের জন্যই সে! তাহার সেই দুটি চক্ষুর বিশাল ব্যাকুলতা সেদিনকার সেই ঝড়ের আলোকে ব্যগ্র পাখীর মত উড়িয়া চলিয়াছিল। স্বর্গের দিকে নহে—মানব হৃদয়নীড়ের দিকে।

সেই উৎসুক আকাঙ্ক্ষা-উদ্দীপ্ত দৃষ্টিপাতটি দেখার পর হইতে অশান্ত চিত্তকে সুস্থির করিয়া রাখা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হইল। তখন কেবল পরের কাঁচা কবিতা সংশোধন করিয়া তৃপ্তি হয় না—একটা যে-কোনপ্রকার কাজ করিবার জন্য চঞ্চলতা জন্মিল।

তখন সংকল্প করিলাম, বাঙ্গালা দেশে বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিবার জন্য আমার সমস্ত চেষ্টা প্রয়োগ করিব। কেবল বক্তৃতা ও লেখা নহে, অর্থ সাহায্য করিতেও অগ্রসর হইলাম।

নবীন আমার সঙ্গে তর্ক করিতে লাগিল। সে বলিল—চিরবৈধব্যের মধ্যে একটি পবিত্র শান্তি আছে, একাদশীর ক্ষীণ জ্যোৎস্নালোকিত সমাধিভূমির মত একটি বিরাট রমণীয়তা আছে; বিবাহের সম্ভাবনামাত্রেই কি সেটা ভাঙ্গিয়া যায় না?

এ সব কবিত্বের কথা শুনিলেই আমার রাগ হইত। দুর্ভিক্ষে যে লোক জীর্ণ হইয়া মরিতেছে তাহার কাছে আহারপুষ্ট লোক যদি খাদ্যের স্থূলত্বের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়া ফুলের গন্ধ এবং পাখীর গান দিয়া মুমূর্ষুর পেট ভরাইতে চাহে তাহা হইলে সে কেমন হয়?

আমি রাগিয়া কহিলাম,—দেখ নবীন, আর্টিষ্ট লোকে বলে, দৃশ্য হিসাবে পোড়ো বাড়ির বড় একটি সৌন্দর্য্য আছে। কিন্তু বাড়িটাকে কেবল ছবির হিসাবে দেখিলে চলে না, তাহাতে বাস করিতে হয়—অতএব আর্টিষ্ট্ যাহাই বলুন মেরামত আবশ্যক। বৈধব্য লইয়া তুমি ত দূর হইতে দিব্য কবিত্ব করিতে চাও—কিন্তু তাহার মধ্যে একটি আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ মানবহৃদয় আপনার বিচিত্র বেদনা লইয়া বাস করিতেছে সেটা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

মনে করিয়াছিলাম নবীনমাধবকে কোনমতেই দলে টানিতে পারিব না—সেদিন সেই জন্যই কিছু অতিরিক্ত উষ্মার সহিত কথা কহিয়াছিলাম। কিন্তু হঠাৎ দেখিলাম, আমার বক্তৃতা অবসানে

নবীনমাধব একটিমাত্র গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আমার সমস্ত কথা মানিয়া লইল; বাকি আরও অনেক ভাল ভাল কথা বলিবার অবকাশই দিল না!

সপ্তাহখানেক পরে নবীন আসিয়া কহিল, তুমি যদি সাহায্য কর আমি একটি বিধবাবিবাহ করিতে প্রস্তুত আছি।

এম্‌নি খুসি হইলাম—নবীনকে বুকে টানিয়া কোলাকুলি করিলাম, কহিলাম যত টাকা লাগে আমি দিব। তখন নবীন তাহার ইতিহাস বলিল।

বুঝিলাম তাহার প্রিয়তমা কাল্পনিক নহে। কিছুকাল ধরিয়া একটি বিধবা নারীকে সে দূর হইতে ভাল বাসিত, কাহারও কাছে তাহা প্রকাশ করে নাই। যে মাসিকপত্রে নবীনের ওরফে আমার কবিতা বাহির হইত সেই পত্রগুলি যথা স্থানে গিয়া পৌঁছিত। কবিতাগুলি ব্যর্থ হয় নাই। বিনা সাক্ষাৎকারে চিত্ত আকর্ষণের এই এক উপায় আমার বন্ধু বাহির করিয়াছিলেন।

কিন্তু নবীন বলেন তিনি চক্রান্ত করিয়া এই সকল কৌশল অবলম্বন করেন নাই। এমন কি, তাঁহার বিশ্বাস ছিল বিধবা পড়িতে জানেন না। বিধবার ভাইয়ের নামে কাগজগুলি বিনা স্বাক্ষরে বিনা মূল্যে পাঠাইয়া দিতেন। এ কেবল মনকে সান্ত্বনা দিবার একটা পাগ্‌লামি মাত্র। মনে হইত দেবতার উদ্দেশে পুষ্পাঞ্জলি দান করা গেল, তিনি জানুন্ বা না জানুন্, গ্রহণ করুন্ বা নাই করুন্।

নানা ছুতায় বিধবার ভাইয়ের সঙ্গে নবীন যে বন্ধুত্ব করিয়া

লইয়াছিলেন নবীন বলেন তাহারও মধ্যে কোন উদ্দেশ্য ছিল না। যাহাকে ভালবাসা যায় তাহার নিকটবর্ত্তী আত্মীয়ের সঙ্গ মধুর বোধ হয়।

অবশেষে ভাইয়ের কঠিন পীড়া উপলক্ষে ভগিনীর সহিত কেমন করিয়া সাক্ষাৎ হয় সে সুদীর্ঘ কথা। কবির সহিত কবিতার অবলম্বিত বিষয়টির প্রত্যক্ষ পরিচয় হইয়া কবিতা সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়া গেছে। আলোচনা যে, কেবল ছাপান কবিতা কয়টির মধ্যেই বদ্ধ ছিল তাহাও নহে।

সম্প্রতি আমার সহিত তর্কে পরাস্ত হইয়া নবীন সেই বিধবার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিবাহের প্রস্তাব করিয়া বসিয়াছে। প্রথমে কিছুতেই সম্মতি পায় নাই। নবীন তখন আমার মুখের সমস্ত যুক্তিগুলি প্রয়োগ করিয়া এবং তাহার সহিত নিজের চোখের দুই চা'র ফোঁটা জল মিশাইয়া তাহাকে সম্পূর্ণ হার মানাইয়াছে। এখন বিধবার অভিভাবক পিসে কিছু টাকা চায়।

আমি বলিলাম—এখনি লও!

নবীন বলিল, তাহা ছাড়া বিবাহের পর প্রথম মাস পাঁচ ছয় বাবা নিশ্চয় আমার মাসহারা বন্ধ করিয়া দিবেন, তখনকার মত উভয়ের খরচ চালাইবার জোগাড় করিয়া দিতে হইবে। আমি কথাটি না কহিয়া চেক্ লিখিয়া দিলাম। বলিলাম—এখন তাঁহার নামটি বল। আমার সঙ্গে যখন কোন প্রতিযোগিতা নাই তখন পরিচয় দিতে ভয় করিয়োনা, তোমার গা ছুঁইয়া শপথ করিতেছি

আমি তাঁহার নামে কবিতা লিখিব না, এবং যদি লিখি তাঁহার ভাইকে না পাঠাইয়া তোমার কাছে পাঠাইয়া দিব!

নবীন কহিল—আরে, সে জন্য আমি ভয় করি না। বিধবা বিবাহের লজ্জায় তিনি অত্যন্ত কাতর—তাই তোমাদের কাছে তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে তিনি অনেক করিয়া নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু এখন আর ঢাকিয়া রাখা মিথ্যা।—তিনি তোমারই প্রতিবেশিনী, ১৯ নম্বরে থাকেন।

হৃৎপিণ্ডটা যদি লোহার বয়লার হইত ত এক চমকে ধক্ করিয়া ফাটিয়া যাইত। জিজ্ঞাসা করিলাম, বিধবা বিবাহে তাঁহার অমত নাই?

নবীন হাসিয়া কহিল, সম্প্রতি ত নাই!

আমি কহিলাম—কেবল কবিতা পড়িয়াই তিনি মুগ্ধ?

নবীন কহিল—কেন, আমার সেই কবিতাগুলি ত মন্দ হয় নাই?

আমি মনে মনে কহিলাম—ধিক্!

ধিক্ কাহাকে? তাঁহাকে, না আমাকে, না বিধাতাকে? কিন্তু ধিক্!

অনধিকার প্রবেশ।

একদা প্রাতঃকালে পথের ধারে দাঁড়াইয়া এক বালক আর এক বালকের সহিত একটি অসমসাহসিক অনুষ্ঠান সম্বন্ধে বাজি রাখিয়াছিল। ঠাকুরবাড়ির মাধবী-বিতান হইতে ফুল তুলিয়া আনিতে পারিবে কি না ইহাই লইয়া তর্ক। একটি বালক বলিল পারিব, আর একটি বালক বলিল কখনই পারিবে না!

কাজটি শুনিতে সহজ অথচ করিতে কেন সহজ নহে তাহার বৃত্তান্ত আর একটু বিস্তারিত করিয়া বলা আবশ্যক।

পরলোকগত মাধবচন্দ্র তর্কবাচস্পতির বিধবা স্ত্রী জয়কালী দেবী এই রাধানাথ জীউর মন্দিরের অধিকারিণী। অধ্যাপক মহাশয় টোলে যে তর্কবাচস্পতি উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন পত্নীর নিকটে একদিনের জন্যও সে উপাধি সপ্রমাণ করিতে পারেন নাই। কোন কোন পণ্ডিতের মতে উপাধির সার্থকতা ঘটিয়াছিল, কারণ, তর্ক এবং বাক্য সমস্তই তাঁহার পত্নীর অংশে পড়িয়াছিল, তিনি পতিরূপে তাহার সম্পূর্ণ ফলভোগ করিয়াছিলেন।

সত্যের অনুরোধে বলিতে হইবে জয়কালী অধিক কথা কহিতেন না—কিন্তু অনেক সময় দুটি কথায়, এমন কি, নীরবে অতি বড় প্রবল মুখবেগও বন্ধ করিয়া দিতে পারিতেন।

জয়কালী দীর্ঘাকার, দৃঢ়শরীর, তীক্ষ্ণনাসা, প্রখরবুদ্ধি স্ত্রীলোক। তাঁহার স্বামী বর্ত্তমানে তাঁহাদের দেবত্র সম্পত্তি নষ্ট হইবার জো হইয়াছিল। বিধবা তাহার সমস্ত বাকি বকেয়া আদায়, সীমা সরহদ্দ স্থির এবং বহুকালের বেদখল উদ্ধার করিয়া সমস্ত পরিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রাপ্য হইতে কেহ তাঁহাকে এক কড়ি বঞ্চিত করিতে পারিত না।

এই স্ত্রীলোকটির প্রকৃতির মধ্যে বহুল পরিমাণে পৌরুষের অংশ থাকাতে তাঁহার যথার্থ সঙ্গী কেহ ছিল না। স্ত্রীলোকেরা তাঁহাকে ভয় করিত। পরনিন্দা, ছোট কথা বা নাকীকান্না তাঁহার অসহ্য ছিল। পুরুষেরাও তাঁহাকে ভয় করিত; কারণ, পল্লিবাসী ভদ্রপুরুষদের চণ্ডীমণ্ডপগত অগাধ আলস্যকে তিনি এক প্রকার নীরব ঘৃণাপূর্ণ তীক্ষ্ণ কটাক্ষের দ্বারা ধিক্কার করিয়া যাইতে পারিতেন যাহা তাঁহাদের স্থূল জড়ত্ব ভেদ করিয়াও অন্তরে প্রবেশ করিত।

প্রবলরূপে ঘৃণা করিবার এবং সে ঘৃণা প্রবলরূপে প্রকাশ করিবার অসাধারণ ক্ষমতা এই প্রৌঢ়া বিধবাটির ছিল। বিচারে যাহাকে অপরাধী করিতেন তাহাকে তিনি কথায় এবং বিনা কথায়, ভাবে এবং ভঙ্গীতে একেবারে দগ্ধ করিয়া যাইতে পারিতেন।

পল্লীর সমস্ত ক্রিয়াকর্ম্মে বিপদে সম্পদে তাঁহার নিরলস হস্ত ছিল। সর্ব্বত্রই তিনি নিজের একটি গৌরবের স্থান বিনা চেষ্টায় অতি সহজেই অধিকার করিয়া লইতেন। যেখানে তিনি উপস্থিত থাকিতেন সেখানে তিনিই যে, সকলের প্রধানপদে, সে সম্বন্ধে

তাঁহার নিজের অথবা উপস্থিত কোন ব্যক্তির মনে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকিত না।

রোগীর সেবায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন, কিন্তু রোগী তাঁহাকে যমের মত ভয় করিত। পথ্য বা নিয়মের লেশমাত্র লঙ্ঘন হইলে তাঁহার ক্রোধানল রোগের তাপ অপেক্ষা রোগীকে অধিক উত্তপ্ত করিয়া তুলিত।

এই দীর্ঘাকার কঠিন বিধবাটি বিধাতার কঠোর নিয়মদণ্ডের ন্যায় পল্লীর মস্তকের উপর উদ্যত ছিলেন; কেহ তাঁহাকে ভালবাসিতে অথবা অবহেলা করিতে সাহস করিত না। পল্লীর সকলের সঙ্গেই তাঁহার যোগ ছিল অথচ তাঁহার মত অত্যন্ত একাকিনী কেহ ছিল না।

বিধবা নিঃসন্তান ছিলেন। পিতৃমাতৃহীন দুইটি ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহার গৃহে মানুষ হইত। পুরুষ অভিভাবক অভাবে তাহাদের যে কোন প্রকার শাসন ছিল না এবং স্নেহান্ধ পিসিমার আদরে তাহারা যে নষ্ট হইয়া যাইতেছিল এমন কথা কেহ বলিতে পারিত না। তাহাদের মধ্যে বড়টির বয়স আঠারো হইয়াছিল। মাঝে মাঝে তাহার বিবাহের প্রস্তাবও আসিত এবং পরিণয়বন্ধন সম্বন্ধে বালকটির চিত্তও উদাসীন ছিল না। কিন্তু পিসিমা তাহার সেই সুখবাসনায় একদিনের জন্যও প্রশ্রয় দেন নাই। অন্য স্ত্রীলোকের ন্যায় কিশোর নবদম্পতির নব প্রেমোদ্গমদৃশ্য তাঁহার কল্পনায় অত্যন্ত উপভোগ্য মনোরম বলিয়া প্রতীত হইত না। বরং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বিবাহ করিয়া অন্য ভদ্র গৃহস্থের ন্যায়

আলস্যভরে বসিয়া পত্নীর আদরে প্রতিদিন স্ফীত হইতে থাকিবে এ সম্ভাবনা তাঁহার নিকট নিরতিশয় হেয় বলিয়া প্রতীত হইত। তিনি কঠিন ভাবে বলিতেন, পুলিন আগে উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করুক্ তার পরে বধূ ঘরে আনিবে। পিসিমার মুখের সেই কঠোর বাক্যে প্রতিবেশিনীদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত।

ঠাকুরবাড়িটি জয়কালীর সর্ব্বাপেক্ষা যত্নের ধন ছিল। ঠাকুরের শয়ন বসন স্নানাহারের তিলমাত্র ত্রুটি হইতে পারিত না। পূজক ব্রাহ্মণ দুটি দেবতার অপেক্ষা এই একটি মানবীকে অনেক বেশি ভয় করিত। পূর্ব্বে এক সময় ছিল যখন দেবতার বরাদ্দ দেবতা পুরা পাইতেন না। কারণ, পূজক ঠাকুরের আর একটি পূজার প্রতিমা গোপন মন্দিরে ছিল। তাহার নাম ছিল নিস্তারিণী। গোপনে ঘৃত দুগ্ধ ছানা ময়দার নৈবেদ্য স্বর্গে নরকে ভাগাভাগি হইয়া যাইত। কিন্তু আজ-কাল জয়কালীর শাসনে পূজার ষোলআনা অংশই ঠাকুরের ভোগে আসিতেছে, উপদেবতা-গণকে অন্যত্র জীবিকার অন্য উপায় অন্বেষণ করিতে হইয়াছে।

বিধবার যত্নে ঠাকুরবাড়ির প্রাঙ্গণটি পরিষ্কার তক্‌তক্ করিতেছে—কোথাও একটি তৃণমাত্র নাই। একপার্শ্বে মঞ্চ অবলম্বন করিয়া মাধবীলতা উঠিয়াছে, তাহার শুষ্কপত্র পড়িবামাত্র জয়কালী তাহা তুলিয়া লইয়া বাহিরে ফেলিয়া দেন। ঠাকুরবাড়িতে পারিপাট্য পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার কিছুমাত্র ব্যাঘাত হইলে বিধবা তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না। পাড়ার ছেলেরা পূর্ব্বে লুকাচুরি খেলা উপলক্ষে এই প্রাঙ্গণের প্রান্তে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ

করিত এবং মধ্যে মধ্যে পাড়ার ছাগশিশু আসিয়া মাধবীলতার বল্কলাংশ কিছু কিছু ভক্ষণ করিয়া যাইত। এখন আর সে সুযোগ নাই। পর্ব্বকাল ব্যতীত অন্য দিনে ছেলেরা প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে পাইত না এবং ক্ষুধাতুর ছাগশিশুকে দণ্ডাঘাত খাইয়াই দ্বারের নিকট হইতে তারস্বরে আপন অজ-জননীকে আহ্বান করিতে করিতে ফিরিতে হইত।

অনাচারী ব্যক্তি পরমাত্মীয় হইলেও দেবালয়ের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে পাইত না। জয়কালীর একটি যবনকরপক্ক-কুক্কুটমাংসলোলুপ ভগিনীপতি আত্মীয় সন্দর্শন উপলক্ষে গ্রামে উপস্থিত হইয়া মন্দির-অঙ্গণে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিয়াছিলেন, জয়কালী তাহাতে ত্বরিত ও তীব্র আপত্তি প্রকাশ করাতে সহোদরা ভগিনীর সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল। এই দেবালয় সম্বন্ধে বিধবার এতই অতিরিক্ত অনাবশ্যক সতর্কতা ছিল যে, সাধারণের নিকট তাহা অনেকটা বাতুলতারূপে প্রতীয়মান হইত।

জয়কালী আর সর্ব্বত্রই কঠিন উন্নত স্বতন্ত্র, কেবল এই মন্দিরের সম্মুখে তিনি পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। এই বিগ্রহটির নিকট তিনি একান্তরূপে জননী পত্নী দাসী—ইহার কাছে তিনি সতর্ক, সুকোমল, সুন্দর এবং সম্পূর্ণ অবনম্র। এই প্রস্তরের মন্দির এবং প্রস্তরের মূর্ত্তিটি তাঁহার নিগূঢ় নারীস্বভাবের একমাত্র চরিতার্থতার বিষয় ছিল। ইহাই তাঁহার স্বামী পুত্র, তাঁহার সমস্ত সংসার।

ইহা হইতেই পাঠকেরা বুঝিবেন যে, যে বালকটি মন্দিরপ্রাঙ্গণ হইতে মাধবীমঞ্জরী আহরণ করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল তাহার সাহসের সীমা ছিল না। সে জয়কালীর কনিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র নলিন্। সে তাহার পিসিমাকে ভাল করিয়াই জানিত তথাপি তাহার দুর্দ্দান্ত প্রকৃতি শাসনের বশ হয় নাই। যেখানে বিপদ সেখানেই তাহার একটা আকর্ষণ ছিল, এবং যেখানে শাসন সেখানেই লঙ্ঘন করিবার জন্য তাহার চিত্ত চঞ্চল হইয়া থাকিত। জনশ্রুতি আছে বাল্যকালে তাহার পিসিমার স্বভাবটিও এইরূপ ছিল।

জয়কালী:তখন মাতৃস্নেহমিশ্রিত ভক্তির সহিত ঠাকুরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দালানে বসিয়া একমনে মালা জপিতেছিলেন।

বালকটি নিঃশব্দপদে পশ্চাৎ হইতে আসিয়া মাধবীতলায় দাঁড়াইল। দেখিল নিম্নশাখার ফুলগুলি পূজার জন্য নিঃশেষিত হইয়াছে। তখন অতি ধীরে ধীরে সাবধানে মঞ্চে আরোহণ করিল। উচ্চশাখায় দুটি একটি বিকচোন্মুখ কুঁড়ি দেখিয়া যেমন সে শরীর এবং বাহু প্রসারিত করিয়া তুলিতে যাইবে অমনি সেই প্রবল চেষ্টার ভরে জীর্ণ মঞ্চ সশব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িল। আশ্রিত লতা এবং বালক একত্রে ভূমিসাৎ হইল।

জয়কালী তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রটির কীর্ত্তি দেখিলেন। সবলে বাহু ধরিয়া তাহাকে মাটি হইতে তুলিলেন। আঘাত তাহার যথেষ্ট লাগিয়াছিল—কিন্তু সে আঘাতকে শাস্তি বলা যায় না, কারণ, তাহা অজ্ঞান জড়ের

আঘাত। সেই জন্য পতিত বালকের ব্যথিত দেহে জয়কালীর সজ্ঞান শাস্তির মুহুর্মুহু সবলে বর্ষিত হইতে লাগিল। বালক একবিন্দু অশ্রুপাত না করিয়া নীরবে সহ্য করিল। তখন তাহার পিসিমা তাহাকে টানিয়া লইয়া ঘরের মধ্যে রুদ্ধ করিলেন। তাহার সেদিনকার বৈকালিক আহার নিষিদ্ধ হইল।

আহার বন্ধ হইল শুনিয়া দাসী মোক্ষদা কাতরকণ্ঠে ছলছলনেত্রে বালককে ক্ষমা করিতে অনুনয় করিল। জয়কালীর হৃদয় গলিল না। ঠাকুরাণীর অজ্ঞাতসারে গোপনে ক্ষুধিত বালককে কেহ যে খাদ্য দিবে বাড়িতে এমন দুঃসাহসিক কেহ ছিল না।

বিধবা মঞ্চসংস্কারের জন্য লোক ডাকিতে পাঠাইয়া পুনর্ব্বার মালাহস্তে দালানে আসিয়া বসিলেন। মোক্ষদা কিছুক্ষণ পরে সভয়ে নিকটে আসিয়া কহিল, ঠাকুরমা, কাকাবাবু ক্ষুধায় কাঁদিতেছেন তাঁহাকে কিছু দুধ আনিয়া দিব কি?

জয়কালী অবিচলিত মুখে কহিলেন, "না।" মোক্ষদা ফিরিয়া গেল। অদূরবর্ত্তী কুটীরের গৃহ হইতে নলিনের করুণ ক্রন্দন ক্রমে ক্রোধের গর্জ্জনে পরিণত হইয়া উঠিল—অবশেষে অনেকক্ষণ পরে তাহার কাতরতার শ্রান্ত উচ্ছ্বাস থাকিয়া থাকিয়া জপনিরতা পিসিমার কানে আসিয়া ধ্বনিত হইতে লাগিল।

নলিনের আর্ত্তকণ্ঠ যখন পরিশ্রান্ত ও মৌনপ্রায় হইয়া আসিয়াছে এমন সময়ে আর একটি জীবের ভীত কাতর ধ্বনি নিকটে ধ্বনিত হইতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে ধাবমান মনুষ্যের

দূরবর্ত্তী চীৎকারশব্দ মিশ্রিত হইয়া মন্দিরের সম্মুখস্থ পথে একটা তুমুল কলরব উত্থিত হইল।

সহসা প্রাঙ্গণের মধ্যে একটা পদশব্দ শোনা গেল। জয়কালী পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন ভূপর্য্যন্ত মাধবীলতা আন্দোলিত হইতেছে।

সরোষকণ্ঠে ডাকিলেন, "নলিন্!"

কেহ উত্তর দিল না। বুঝিলেন অবাধ্য নলিন বন্দীশালা হইতে কোন ক্রমে পলায়ন করিয়া পুনরায় তাঁহাকে রাগাইতে আসিয়াছে!

তখন অত্যন্ত কঠিনভাবে অধরের উপরে ওষ্ঠ চাপিয়া বিধবা প্রাঙ্গণে নামিয়া আসিলেন।

লতাকুঞ্জের নিকট পুনরায় ডাকিলেন—নলিন্!

উত্তর পাইলেন না। শাখা তুলিয়া দেখিলেন, একটা অত্যন্ত মলিন শূকর প্রাণভয়ে ঘন পল্লবের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে।

যে লতাবিতান এই ইষ্টক প্রাচীরের মধ্যে বৃন্দাবিপিনের সংক্ষিপ্ত প্রতিরূপ; যাহার বিকসিত কুসুমমঞ্জরীর সৌরভ গোপীবৃন্দের সুগন্ধি নিশ্বাস স্মরণ করাইয়া দেয় এবং কালিন্দীতীরবর্ত্তী সুখবিহারের সৌন্দর্য্যস্বপ্ন জাগ্রত করিয়া তোলে—বিধবার সেই প্রাণাধিক যত্নের সুপবিত্র নন্দনভূমিতে অকস্মাৎ এই বীভৎস ব্যাপার ঘটিল।

পূজারি ব্রাহ্মণ লাঠিহস্তে তাড়া করিয়া আসিল।

জয়কালী তৎক্ষণাৎ নামিয়া আসিয়া তাহাকে নিষেধ করিলেন। এবং দ্রুতবেগে ভিতর হইতে মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন।

অনতিকাল পরেই সুরাপানে উন্মত্ত ডোমের দল মন্দিরের দ্বারে উপস্থিত হইয়া তাহাদের বলির পশুর জন্য চীৎকার করিতে লাগিল।

জয়কালী রুদ্ধদ্বারের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া কহিলেন, যা বেটারা ফিরে যা! আমার মন্দির অপবিত্র করিস্‌নে!

ডোমের দল ফিরিয়া গেল। জয়কালী ঠাকুরাণী যে তাঁহার রাধানাথ জীউর মন্দিরের মধ্যে অশুচি জন্তুকে আশ্রয় দিবেন ইহা তাহারা প্রায় প্রত্যক্ষ দেখিয়াও বিশ্বাস করিতে পারিল না।

এই সামান্য ঘটনায় নিখিল জগতের সর্ব্বজীবের মহাদেবতা পরম প্রসন্ন হইলেন কিন্তু ক্ষুদ্র পল্লীর সমাজনামধারী অতি ক্ষুদ্র দেবতাটি নিরতিশয় সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

ত্যাগ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ফাল্গুনের প্রথম পূর্ণিমায় আম্রমুকুলের গন্ধ লইয়া নব বসন্তের বাতাস বহিতেছে। পুষ্করিণীর তীরের একটি পুরাতন লিচু গাছের ঘন পল্লবের মধ্য হইতে একটি নিদ্রাহীন অশ্রান্ত পাপিয়ার গান মুখুয্যেদের বাড়ির একটি নিদ্রাহীন শয়নগৃহের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিতেছে। হেমন্ত কিছু চঞ্চল ভাবে কখন তার স্ত্রীর এক গুচ্ছ চুল খোঁপা হইতে বিশ্লিষ্ট করিয়া লইয়া আঙুলে জড়াইতেছে, কখন তাহার বালাতে চুড়িতে সংঘাত করিয়া ঠং ঠং শব্দ করিতেছে, কখন তাহার মাথার ফুলের মালাটা টানিয়া স্বস্থানচ্যুত করিয়া তাহার মুখের উপর আনিয়া ফেলিতেছে। সন্ধ্যাবেলাকার নিস্তব্ধ ফুলের গাছটিকে সচেতন করিয়া তুলিবার জন্য বাতাস যেমন একবার এপাশ হইতে একবার ওপাশ হইতে একটু আধটু নাড়াচাড়া করিতে থাকে, হেমন্তের কতকটা সেই ভাব।

কিন্তু কুসুম সম্মুখের চন্দ্রালোকপ্লাবিত অসীম শূন্যের মধ্যে দুই নেত্রকে নিমগ্ন করিয়া দিয়া স্থির হইয়া বসিয়া আছে। স্বামীর চাঞ্চল্য তাহাকে স্পর্শ করিয়া প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া যাইতেছে।

অবশেষে হেমন্ত কিছু অধীর ভাবে কুসুমের দুই হাত নাড়া দিয়া বলিল "কুসুম তুমি আছ কোথায়। তোমাকে যেন একটা মস্ত দূরবীণ কষিয়া বিস্তর ঠাহর করিয়া বিন্দুমাত্র দেখা যাইবে এম্‌নি দূরে গিয়া পড়িয়াছ! আমার ইচ্ছা, তুমি আজ একটু কাছাকাছি এস। দেখ দেখি কেমন চমৎকার রাত্রি!"

কুসুম শূন্য হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া স্বামীর মুখের দিকে রাখিয়া কহিল—"এই জ্যোৎস্না রাত্রি এই বসন্তকাল সমস্ত এই মুহূর্ত্তে মিথ্যা হইয়া ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে এমন একটা মন্ত্র আমি জানি।"

হেমন্ত বলিল, "যদি জান ত সেটা উচ্চারণ করিয়া কাজ নাই। বরং এমন যদি কোন মন্ত্র জানা থাকে যাহাতে সপ্তাহের মধ্যে তিনটে চারটে রবিবার আসে কিম্বা রাত্রিটা বিকাল পাঁচটা সাড়ে পাঁচটা পর্য্যন্ত টিকিয়া যায়, ত তাহা শুনিতে রাজি আছি।" বলিয়া কুসুমকে আর একটু টানিয়া লইতে চেষ্টা করিল। কুসুম সে আলিঙ্গনপাশে ধরা না দিয়া কহিল —"আমার মৃত্যুকালে তোমাকে যে কথাটা বলিব মনে করিয়াছিলাম আজ তাহা বলিতে ইচ্ছা করিতেছে। আজ মনে হইতেছে তুমি আমাকে যত শাস্তি দাও না কেন আমি বহন করিতে পারিব।"

শাস্তি সম্বন্ধে জয়দেব হইতে শ্লোক আওড়াইয়া হেমন্ত একটা রসিকতা করিবার উদ্যোগ করিতেছিল। এমন সময়ে শোনা গেল একটা ক্রুদ্ধ চটি জুতার চটাচট্ শব্দ নিকটবর্ত্তী হইতেছে।

হেমন্তের পিতা হরিহর মুখুয্যের পরিচিত পদশব্দ। হেমন্ত শশব্যস্ত হইয়া উঠিল।

হরিহর দ্বারের নিকটে দাঁড়াইয়া ক্রুদ্ধ গর্জ্জনে কহিল "হেমন্ত, বৌকে এখনি বাড়ি হইতে দূর করিয়া দাও।" হেমন্ত স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিল, স্ত্রী কিছুই বিস্ময় প্রকাশ করিল না, কেবল দুই হাতের মধ্যে কাতরে মুখ লুকাইয়া আপনার সমস্ত বল এবং ইচ্ছা দিয়া আপনাকে যেন লুপ্ত করিয়া দিতে চেষ্টা করিল। দক্ষিণে বাতাসে পাপিয়ার স্বর ঘরে প্রবেশ করিতে লাগিল, কাহারো কানে গেল না। পৃথিবী এমন অসীম সুন্দর অথচ এত সহজেই সমস্ত বিকল হইয়া যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

হেমন্ত বাহির হইতে ফিরিয়া আসিয়া স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, "সত্য কি?"

স্ত্রী কহিল, "সত্য।"

"এতদিন বল নাই কেন?"

"অনেক বার বলিতে চেষ্টা করিয়াছি বলিতে পারি নাই। আমি বড় পাপিষ্ঠা।"

"তবে আজ সমস্ত খুলিয়া বল।"

কুসুম গম্ভীর দৃঢ়স্বরে সমস্ত বলিয়া গেল—যেন অটল চরণে ধীর গতিতে আগুনের মধ্যে দিয়া চলিয়া গেল, কতখানি দগ্ধ হইতেছিল কেহ বুঝিতে পারিল না। সমস্ত শুনিয়া হেমন্ত উঠিয়া গেল।

কুসুম বুঝিল, যে স্বামী চলিয়া গেল, সে স্বামীকে আর ফিরিয়া পাইবে না। কিছু আশ্চর্য্য মনে হইল না; এ ঘটনাও যেন অন্যান্য দৈনিক ঘটনার মত অত্যন্ত সহজ ভাবে উপস্থিত হইল; মনের মধ্যে এমন একটা শুষ্ক অসাড়তার সঞ্চার হইয়াছে। কেবল পৃথিবীকে এবং ভালবাসাকে আগাগোড়া মিথ্যা এবং শূন্য বলিয়া মনে হইল। এমন কি, হেমন্তের সমস্ত অতীত ভালবাসার কথা স্মরণ করিয়া অত্যন্ত নীরস কঠিন নিরানন্দ হাসি একটা খরধার নিষ্ঠুর ছুরির মত তাহার মনের একধার হইতে আর একধার পর্য্যন্ত একটি দাগ রাখিয়া দিয়া গেল। বোধ করি সে ভাবিল, যে ভালবাসাকে এতখানি বলিয়া মনে হয়, এত আদর, এত গাঢ়তা, যাহার তিলমাত্র বিচ্ছেদ এমন মর্ম্মান্তিক, যাহার মুহূর্ত্তমাত্র মিলন এমন নিবিড়ানন্দময়; যাহাকে অসীম অনন্ত বলিয়া মনে হয়, জন্মজন্মান্তরেও যাহার অবসান কল্পনা করা যায় না—সেই ভালবাসা এই! এইটুকুর উপর নির্ভর! সমাজ যেমনি একটু আঘাত করিল অমনি অসীম ভালবাসা চূর্ণ হইয়া এক মুষ্টি ধূলি হইয়া গেল! হেমন্ত কম্পিতস্বরে এই কিছুপূর্ব্বে কানের কাছে বলিতেছিল "চমৎকার রাত্রি!" সে রাত্রি ত এখনও শেষ হয় নাই; এখনো সেই পাপিয়া ডাকিতেছে, দক্ষিণের বাতাস

মশারি কাঁপাইয়া যাইতেছে, এবং জ্যোৎস্না সুখশ্রান্ত সুপ্ত সুন্দরীর মত বাতায়নবর্ত্তী পালঙ্কের এক প্রান্তে নিলীন হইয়া পড়িয়া আছে। সমস্তই মিথ্যা! ভালবাসা আমার অপেক্ষাও মিথ্যাবাদিনী মিথ্যাচারিণী!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রভাতেই অনিদ্রাশুষ্ক হেমন্ত পাগলের মত হইয়া প্যারিশঙ্কর ঘোষালের বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইল। প্যারিশঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, "কিহে বাপু, কি খবর!"

হেমন্ত মস্ত একটা আগুনের মত যেন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে জ্বলিতে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "তুমি আমাদের জাতি নষ্ট করিয়াছ, সর্ব্বনাশ করিয়াছ— তোমাকে ইহার শাস্তি ভোগ করিতে হইবে"—বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

প্যারিশঙ্কর ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "আর তোমরা আমার জাতি রক্ষা করিয়াছ আমার সমাজ রক্ষা করিয়াছ, আমার পিঠে হাত বুলাইয়া দিয়াছ! আমার প্রতি তোমাদের বড় যত্ন, বড় ভালবাসা।"

হেমন্তের ইচ্ছা হইল সেই মুহূর্ত্তেই প্যারিশঙ্করকে ব্রহ্মতেজে ভস্ম করিয়া দিতে কিন্তু সেই তেজে সে নিজেই জ্বলিতে

লাগিল, প্যারিশঙ্কর দিব্য সুস্থ নিরাময় ভাবে বসিয়া রহিল।

হেমন্ত ভগ্নকণ্ঠে বলিল, "আমি তোমার কি করিয়াছিলাম।"

প্যারিশঙ্কর কহিল, "আমি জিজ্ঞাসা করি, আমার একটিমাত্র কন্যা ছাড়া আর সন্তান নাই, আমার সেই কন্যা তোমার বাপের কাছে কি অপরাধ করিয়াছিল! তুমি তখন ছোট ছিলে, তুমি হয়ত জান না—ঘটনাটা তবে মন দিয়া শোন। ব্যস্ত হইয়ো না, বাপু, ইহার মধ্যে বিস্তর কৌতুক আছে।

"আমার জামাতা নবকান্ত আমার কন্যার গহনা চুরি করিয়া যখন পলাইয়া বিলাতে গেল, তখন তুমি শিশু ছিলে। তাহার পর পাঁচ বৎসর বাদে সে যখন বারিষ্টার হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিল তখন পাড়ায় যে একটা গোলমাল বাধিল তোমার বোধ করি কিছু কিছু মনে থাকিতে পারে। কিম্বা তুমি না জানিতেও পার, তুমি তখন কলিকাতার স্কুলে পড়িতে। তোমার বাপ গ্রামের দলপতি হইয়া বলিলেন—মেয়েকে যদি স্বামীগৃহে পাঠান অভিপ্রায় থাকে তবে সে মেয়েকে আর ঘরে লইতে পারিবে না। আমি তাঁহাকে হাতে পায়ে ধরিয়া বলিলাম, দাদা এ যাত্রা তুমি আমাকে ক্ষমা কর। আমি ছেলেটিকে গোবর খাওয়াইয়া প্রায়শ্চিত্ত করাইতেছি তোমরা তাহাকে জাতে তুলিয়া লও। তোমার বাপ কিছুতেই রাজি হইলেন না, আমিও আমার একমাত্র মেয়েকে ত্যাগ করিতে পারিলাম না। জাত ছাড়িয়া দেশ ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিয়া ঘর করিলাম। এখানে আসিয়াও আপদ

মিটিল না। আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের যখন বিবাহের সমস্ত আয়োজন করিয়াছি তোমার বাপ কন্যাকর্ত্তাদের উত্তেজিত করিয়া সে বিবাহ ভাঙ্গিয়া দিলেন। আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম যদি ইহার প্রতিশোধ না লই তবে আমি ব্রাহ্মণের ছেলে নহি।—এইবার কতকটা বুঝিতে পারিয়াছ—কিন্তু আর একটু সবুর কর—সমস্ত ঘটনাটি শুনিলে খুসী হইবে—ইহার মধ্যে একটু রস আছে।

"তুমি যখন কালেজে পড়িতে তোমার বাসার পাশেই বিপ্রদাস চাটুয্যের বাড়ি ছিল। বেচারা এখন মারা গিয়াছে। চাটুয্যে মহাশয়ের বাড়িতে কুসুম নামে একটি শৈশববিধবা অনাথা কায়স্থকন্যা আশ্রিতভাবে থাকিত। মেয়েটি বড় সুন্দরী—বুড়ো ব্রাহ্মণ কালেজের ছেলেদের দৃষ্টিপথ হইতে তাহাকে সম্বরণ করিয়া রাখিবার জন্য কিছু দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু বুড়ো মানুষকে ফাঁকি দেওয়া একটি মেয়ের পক্ষে কিছুই শক্ত নহে। মেয়েটি প্রায়ই কাপড় শুকাইতে দিতে ছাতে উঠিত এবং তোমারও বোধ করি ছাতে না উঠিলে পড়া মুখস্থ হইত না। পরস্পরের ছাত হইতে তোমাদের কোনরূপ কথাবার্ত্তা হইত কি না সে তোমরাই জান, কিন্তু মেয়েটির ভাবগতিক দেখিয়া বুড়ার মনেও সন্দেহ হইল। কারণ, কাজকর্ম্মে তাহার ক্রমিক ভুল হইতে দেখা গেল এবং তপস্বিনী গৌরীর মত দিন দিন সে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিতে লাগিল। এক এক দিন সন্ধ্যাবেলায় সে বুড়ার সম্মুখেই অকারণে অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিত না।

"অবশেষে বুড়া আবিষ্কার করিল ছাতে তোমাদের মধ্যে

সময়ে অসময়ে নীরব দেখা সাক্ষাৎ চলিয়া থাকে—এমন কি কালেজ কামাই করিয়াও মধ্যাহ্নে চিলের ঘরের ছায়ায় ছাতের কোণে তুমি বই হাতে করিয়া বসিয়া থাকিতে; নির্জ্জনে অধ্যয়নে সহসা তোমার এত উৎসাহ জন্মিয়াছিল। বিপ্রদাস যখন আমার কাছে পরামর্শ জানিতে আসিল আমি কহিলাম, খুড়ো, তুমি ত অনেক দিন হইতে কাশী যাইবার মানস করিয়াছ, মেয়েটিকে আমার কাছে রাখিয়া তীর্থবাস করিতে যাও আমি তাহার ভার লইতেছি।

"বিপ্রদাস তীর্থে গেল। আমি মেয়েটিকে শ্রীপতি চাটুযোর বাসায় রাখিয়া তাহাকেই মেয়ের বাপ বলিয়া চালাইলাম। তাহার পর যাহা হইল তোমার জানা আছে। তোমার কাছে আগাগোড়া সব কথা খোলসা করিয়া বলিয়া বড় আনন্দ লাভ করিলাম। এ যেন একটি গল্পের মত। ইচ্ছা আছে সমস্তটি লিখিয়া একটি বই করিয়া ছাপাইব। আমার লেখা আসে না। আমার ভাইপোটা শুনিতেছি একটু আধটু লেখে—তাহাকে দিয়া লেখাইবার মানস আছে। কিন্তু তোমাতে তাহাতে মিলিয়া লিখিলে সব চেয়ে ভাল হয়, কারণ, গল্পের উপসংহারটি আমার ভাল জানা নাই।"

হেমন্ত প্যারিশঙ্করের এই শেষ কথাগুলিতে বড় একটা কান না দিয়া কহিল "কুসুম এই বিবাহে কোন আপত্তি করে নাই ?"

প্যারিশঙ্কর কহিল, "আপত্তি ছিল কি না বোঝা ভারি শক্ত। জান ত, বাপু, মেয়েমানুষের মন; যখন 'না' বলে তখন 'হাঁ' বুঝিতে হয়। প্রথমে ত দিনকতক নূতন বাড়িতে আসিয়া

তোমাকে না দেখিতে পাইয়া কেমন পাগলের মত হইয়া গেল। তুমিও দেখিলাম কোথা হইতে সন্ধান পাইয়াছ; প্রায়ই বই হাতে করিয়া কালেজে যাত্রা করিয়া তোমার পথ ভুল হইত—এবং শ্রীপতির বাসার সম্মুখে আসিয়া কি যেন খুঁজিয়া বেড়াইতে; ঠিক যে প্রেসিডেন্সি কালেজের রাস্তা খুঁজিতে তাহা বোধ হইত না, কারণ ভদ্রলোকের বাড়ির জানলার ভিতর দিয়া কেবল পতঙ্গ এবং উন্মাদ যুবকদের হৃদয়ের পথ ছিল মাত্র। দেখিয়া শুনিয়া আমার বড় দুঃখ হইল। দেখিলাম, তোমার পড়ার বড়ই ব্যাঘাত হইতেছে এবং মেয়েটির অবস্থাও সঙ্কটাপন্ন।

"একদিন কুসুমকে ডাকিয়া লইয়া কহিলাম—বাছা, আমি বুড়মানুষ, আমার কাছে লজ্জা করিবার আবশ্যক নাই—তুমি যাহাকে মনে মনে প্রার্থনা কর আমি জানি। ছেলেটিও মাটি হইবার যো হইয়াছে। আমার ইচ্ছা তোমাদের মিলন হয়। শুনিবামাত্র কুসুম একেবারে বুক ফাটিয়া কাঁদিয়া উঠিল এবং ছুটিয়া পালাইয়া গেল। এমনি করিয়া প্রায় মাঝে মাঝে সন্ধ্যাবেলায় শ্রীপতির বাড়ি গিয়া কুসুমকে ডাকিয়া তোমার কথা পাড়িয়া ক্রমে তাহার লজ্জা ভাঙ্গিলাম। অবশেষে প্রতিদিন ক্রমিক আলোচনা করিয়া তাহাকে বুঝাইলাম যে, বিবাহ ব্যতীত পথ দেখি না। তাহা ছাড়া মিলনের আর কোন উপায় নাই। কুসুম, "কহিল কেমন করিয়া হইবে?" আমি কহিলাম, তোমাকে কুলীনের মেয়ে বলিয়া চালাইয়া দিব। অনেক তর্কের পর সে এ বিষয়ে তোমার মত জানিতে কহিল। আমি কহিলাম, ছেলেটা

একে ক্ষেপিয়া যাইবার যো হইয়াছে, তাহাকে আবার এ সকল গোলমালের কথা বলিবার আবশ্যক কি? কাজটা বেশ নিরাপত্তে নিশ্চিন্তে নিষ্পন্ন হইয়া গেলেই সকল দিকে সুখের হইবে। বিশেষতঃ এ কথা যখন কখনও প্রকাশ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই তখন বেচারাকে কেন গায়ে পড়িয়া চিরজীবনের মত অসুখী করা!—

"কুসুম বুঝিল, কি বুঝিল না, আমি বুঝিতে পারিলাম না। কখন কাঁদে কখন চুপ করিয়া থাকে। অবশেষে আমি যখন বলি, তবে কাজ নাই, তখন আবার সে অস্থির হইয়া উঠে। এইরূপ অবস্থায় শ্রীপতিকে দিয়া তোমাকে বিবাহের প্রস্তাব পাঠাই। দেখিলাম সম্মতি দিতে তোমার তিলমাত্র বিলম্ব হইল না। তখন বিবাহের সমস্ত ঠিক হইল।

"বিবাহের অনতিপূর্ব্বে কুসুম এম্‌নি বাঁকিয়া দাঁড়াইল তাহাকে আর কিছুতেই বাগাইতে পারি না। সে আমার হাতে পায়ে ধরে, বলে ইহাতে কাজ নাই জ্যাঠামশায়। আমি বলিলাম, কি সর্ব্বনাশ, সমস্ত স্থির হইয়া গেছে, এখন কি বলিয়া ফিরাইব!—কুসুম বলে তুমি রাষ্ট্র করিয়া দাও আমার হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছে, আমাকে এখান হইতে কোথাও পাঠাইয়া দাও!—আমি বলিলাম তাহা হইলে ছেলেটির দশা কি হইবে! তাহার বহুদিনের আশা কাল পূর্ণ হইবে বলিয়া সে স্বর্গে চড়িয়া বসিয়াছে, আজ আমি হঠাৎ তাহাকে তোমার মৃত্যুসংবাদ পাঠাইব! আবার তাহার পরদিন তোমাকে তাহার মৃত্যুসংবাদ পাঠাইতে হইবে, এবং

সেই দিন সন্ধ্যাবেলায় আমার কাছে তোমার মৃত্যুসংবাদ আসিবে। আমি কি এই বুড়া বয়সে স্ত্রীহত্যা ব্রহ্মহত্যা করিতে বসিয়াছি!

"তাহার পর শুভলগ্নে শুভবিবাহ সম্পন্ন হইল—আমি আমার একটা কর্ত্তব্যদায় হইতে অব্যাহতি পাইয়া বাঁচিলাম। তাহার পর কি হইল তুমি জান।"

হেমন্ত কহিলেন "আমাদের যাহা করিবার তাহা ত করিলেন আবার কথাটা প্রকাশ করিলেন কেন?"

প্যারিশঙ্কর কহিলেন, "দেখিলাম তোমার ছোট ভগ্নীর বিবাহের সমস্ত স্থির হইয়া গেছে। তখন মনে মনে ভাবিলাম, একটা ব্রাহ্মণের জাত মারিয়াছি কিন্তু সে কেবল কর্ত্তব্যবোধে। আবার আর একটা ব্রাহ্মণের জাত মারা পড়ে, আমার কর্ত্তব্য এটা নিবারণ করা। তাই তাহাদের চিঠি লিখিয়া দিলাম। বলিলাম, হেমন্ত যে শূদ্রের কন্যা বিবাহ করিয়াছে তাহার প্রমাণ আছে।"

হেমন্ত বহুকষ্টে ধৈর্য্য সম্বরণ করিয়া কহিল—"এই যে মেয়েটিকে আমি পরিত্যাগ করিব, ইহার দশা কি হইবে? আপনি ইহাকে আশ্রয় দিবেন?

প্যারিশঙ্কর কহিলেন "আমার যাহা কাজ তাহা আ করিয়াছি, এখন পরের পরিত্যক্ত স্ত্রীকে পোষণ করা আমার কর্ম্ম নহে। ওরে! হেমন্ত বাবুর জন্য বরফ দিয়া এক গ্লাস ডাবের জল লইয়া আয়, আর পান আনিস্!"

হেমন্ত এই সুশীতল আতিথ্যের জন্য অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী। অন্ধকার রাত্রি। পাখী ডাকিতেছে না। পুষ্করিণীর ধারের লিচু গাছটি কালো চিত্রপটের উপর গাঢ়তর কালির দাগের মত লেপিয়া গেছে। কেবল দক্ষিণের বাতাস এই অন্ধকারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, যেন তাহাকে নিশিতে পাইয়াছে। আর আকাশের তারা নির্নিমেষ সতর্ক নেত্রে প্রাণপণে অন্ধকার ভেদ করিয়া কি একটা রহস্য আবিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত আছে।

শয়নগৃহে দীপ জ্বালা হয় নাই। হেমন্ত বাতায়নের কাছে খাটের উপরে বসিয়া সম্মুখের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া আছে। কুসুম ভূমিতলে দুই হাতে তাহার পা জড়াইয়া পায়ের উপর মুখ রাখিয়া পড়িয়া আছে। সময় যেন স্তম্ভিত সমুদ্রের মত স্থির হইয়া আছে। যেন অনন্ত নিশীথিনার উপর অদৃষ্ট চিত্রকর এই একটি চিরস্থায়ী ছবি আঁকিয়া রাখিয়াছে—চারিদিকে প্রলয়, মাঝখানে একটি বিচারক, এবং তাহার পায়ের কাছে একটি অপরাধিনী।

আবার চটিজুতার শব্দ হইল। হরিহর মুখুয্যে দ্বারের কাছে আসিয়া বলিলেন—"অনেকক্ষণ হইয়া গিয়াছে আর সময় দিতে পারি না। মেয়েটাকে ঘর হইতে দূর করিয়া দাও!"—

কুসুম এই স্বর শুনিবামাত্র একবার মুহূর্ত্তের মত চিরজীবনের সাধ মিটাইয়া হেমন্তের দুই পা দ্বিগুণতর আবেগে চাপিয়া ধরিল—চরণ চুম্বন করিয়া পায়ের ধুলা মাথায় লইয়া পা ছাড়িয়া দিল।

হেমন্ত উঠিয়া গিয়া পিতাকে বলিল—"আমি স্ত্রীকে ত্যাগ করিব না।"

হরিহর গর্জ্জিয়া উঠিয়া কহিল—"জাত খোয়াইবি?"

হেমন্ত কহিল, "আমি জাত মানি না।"

"তবে তুইসুদ্ধ দূর হইয়া যা!"

যুগান্তর।

শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত। প্রসিদ্ধ সমাজিক উপন্যাস। দ্বিতীয় সংস্করণ মূল্য ১।০। ইহাতে প্রাচীন হিন্দুসমাজের একটি চমৎকার নিখুঁত চিত্র আলেখ্যবৎ বর্ণিত হইয়াছে। পড়িতে পড়িতে মুগ্ধ হইতে হয়, ছাপা, কাগজ, বাঁধাই পরিষ্কার।

আরব্যোপন্যাস।

শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, এম, এ, সম্পাদিত। মূল্য দুই টাকা, ডাকমাশুল তিন আনা। সুন্দর রঙ্গীন কালিতে মুদ্রিত বহু চিত্রসম্বলিত এই শিশুপাঠ্য পুস্তকখানি সর্ব্বত্রই যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছে। এই পুস্তকখানি বালক বালিকাগণ পাইলে আহ্লাদে উৎফুল্ল হইবে।

একটি বসন্তপ্রাতের প্রস্ফুটিত

সকুরা পুষ্প।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিবৃত জাপানী গল্প। দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য ৸০ আনা। বাহ্যদৃশ্য মনোহর। বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন। ইহাতে জাপানবাসীদিগের অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ ও দেশহিতৈষণার বিচিত্র কাহিনী মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে।

হস্তলিপি লিখন-প্রণালী।

শ্রীশিবরতন মিত্র প্রণীত। মূল্য চারি আনা মাত্র। অভিনব সরল বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ছেলেদিগকে অসংযুক্ত ও সংযুক্ত বর্ণপরিচয়, ধারাপাত ও লিখন-শিক্ষা দিবার অত্যুৎকৃষ্ট পুস্তক। আমোদের সহিত ৪।৫ দিন মধ্যে সমগ্র বর্ণমালা অনায়াসে লিখিতে শিখিবে—আর দাগা বুলাইয়া ছেলেদের সময় নষ্ট হইবে না। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের হস্তাক্ষর টানা-লেখার আদর্শস্বরূপ একটি সমগ্র পৃষ্ঠব্যাপী প্রতিলিপিতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রায় ৩৫০ টি ব্লক দ্বারা সুশোভিত এবং উৎকৃষ্ট

কাগজে নানাবিধ রঙ্গীন কালীতে মুদ্রিত। শিশুগণ পাইলে আহ্লাদে উৎফুল্ল হইবে। কি সংবাদপত্র, কি সুধীসমাজ, সর্ব্বত্র বহুল প্রশংসিত।

বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবক।

শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র সঙ্কলিত। সমগ্র গ্রন্থের অগ্রিম মূল্য ৪৷৷০ টাকা। এই গ্রন্থখানি বঙ্গভাষার পরলোকগত যাবতীয় (চতুর্দ্দশ শতাধিক) সাহিত্য-সেবকগণের বর্ণানুক্রমিক সচিত্র চরিতাভিধান। বঙ্গভাষায় সম্পূর্ণ নূতন। সর্ব্বত্রই বহুল প্রশংসিত। ৪৫০ পৃষ্ঠায় 'ব' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। অবশিষ্ট শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারগণের সুন্দর সুন্দর হাফ্‌টোন ছবি আছে।

'ইহা বঙ্গসাহিত্যে চিরস্থায়ী কীর্ত্তি স্বরূপ প্রতিষ্ঠা পাইবে।' শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বি, এ।

'সুন্দর গ্রন্থ—বঙ্গসাহিত্য আলোকিত করিতেছে'—অঃ জষ্টিস্ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি, এল।

শকুন্তলা ।৵০।

ক্ষীরের পুতুল ।৵০।

রাজস্থানে গল্প ॥০।

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। মনোরম শিশুপাঠ্য এই তিনখানি পুস্তক কলাসম্মত বহু চিত্রভূষিত, সুদৃশ্য ও সুমুদ্রিত। আবালবৃদ্ধবনিতার উপভোগ ও আনন্দের সামগ্রী।

চরিত্রগঠন।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস-প্রণীত। শিশুপাঠ্য সুন্দর পুস্তক মূল্য আট আনা মাত্র।

গল্পগুচ্ছ

(পঞ্চম ভাগ)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রণীত

মূল্য ১৲ এক টাকা

সূচী

১। নষ্টনীড় ১
২। কর্ম্মফল ৯৪
৩। গুপ্তধন ১৫৫
৪। মাষ্টার মশায় ১৮৪

—০—

বর্ণানুক্রমিক সূচী

বিষয়	খণ্ড	পত্রাঙ্ক
অতিথি	(৩)	৪১
অধ্যাপক	(৩)	৯২
অনধিকার প্রবেশ	(৪)	১৭৮
আপদ	(৪)	৪১
উদ্ধার	(২)	৮৪
উলুখড়ের বিপদ	(১)	১৪৩
একটি আষাঢ়ে গল্প	(১)	১০৫
এক রাত্রি	(২)	১৭১
কঙ্কাল	(২)	৫৫
কর্ম্মফল	(৫)	৯৪
কাবুলিওয়ালা	(২)	১৩২
ক্ষুধিত পাষাণ	(১)	১৪৭
খাতা	(২)	১৮৩
খোকাবাবু	(২)	১
গুপ্তধন	(৫)	১৫৫
ছুটি	(২)	৯১
জয় পরাজয়	(৪)	৯১
জীবিত না মৃত	(১)	১
ঠাকুর্দ্দা	(৪)	১৩৩
ডিটেক্‌টিভ	(৩)	২৫
তারাপ্রসন্নের কীর্ত্তি	(৪)	২০
ত্যাগ	(৪)	১৮৭
দানপ্রতিদান	(২)	২১২
দালিয়া	(২)	৩৯
দিদি	(৪)	১
দুরাশা	(৩)	১
দুর্ব্বুদ্ধি	(৪)	৩৩
দৃষ্টিদান	(৩)	১৭৫

বিষয়	খণ্ড	পত্রাঙ্ক
দেনাপাওনা	(২)	২৭
নষ্টনীড়	(৫)	১
নিশীথে	(৪)	৬৯
পোষ্টমাষ্টার	(২)	১৬
প্রতিবেশিনী	(৪)	১৭০
প্রতিহিংসা	(৪)	১০৮
প্রায়শ্চিত্ত	(১)	৫৬
ফেল্	(১)	২১৭
বিচারক	(১)	৯২
ব্যবধান	২)	১৬১
মণি-হারা	(৩)	১৪৭
মধ্যবর্ত্তিনী	(১)	১২০
মহামায়া	(২)	১০৯
মানভঞ্জন	(২)	১৯৩
মাষ্টার মশায়	(৫)	১৮৪
মুক্তির উপায়	(২)	৬৯
মেঘ ও রৌদ্র	(১)	১৭০
যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ	(১)	৪৬
রাজটীকা	(৩)	১২৬
রামকানাইয়ের নির্ব্বুদ্ধিতা	(২)	১২৩
শাস্তি	(৩)	৭৩
শুভদৃষ্টি	(১)	২৫
সুভা	(১)	৮০
সদর ও অন্দর	(২)	১৫৩
সমস্যা পূরণ	(১)	৩৪
সমাপ্তি	(৩)	২১৩
সম্পত্তি সমর্পণ	(২)	১৪৭
সম্পাদক	(৪)	৬১
স্বর্ণমৃগ	(৩)	১৫০

—০—

গল্পগুচ্ছ।

নষ্টনীড়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ভূপতির কাজ করিবার কোন দরকার ছিল না। তাঁহার টাকা যথেষ্ট ছিল, এবং দেশটাও গরম। কিন্তু গ্রহবশত তিনি কাজের লোক হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন! এই জন্য তাঁহাকে একটা ইংরাজি খবরের কাগজ বাহির করিতে হইল। ইহার পরে সময়ের দীর্ঘতার জন্য তাঁহাকে আর বিলাপ করিতে হয় নাই।

ছেলেবেলা হইতেই তাঁহার ইংরাজি লিখিবার এবং বক্তৃতা দিবার সখ ছিল। কোন প্রকার প্রয়োজন না থাকিলেও ইংরাজি খবরের কাগজে তিনি চিঠি লিখিতেন, এবং বক্তব্য না থাকিলেও সভাস্থলে দু'কথা না বলিয়া ছাড়িতেন না।

তাঁহার মত ধনী লোককে দলে পাইবার জন্য রাষ্ট্রনৈতিক দলপতিরা অজস্র স্তুতিবাদ করাতে নিজের ইংরাজি রচনাশক্তি সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা যথেষ্ট পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল।

অবশেষে তাঁহার উকীল শ্যালক উমাপতি ওকালতি ব্যবসায়ে হতোদ্যম হইয়া ভগিনীপতিকে কহিল,—ভূপতি তুমি একটা ইংরাজি খবরের কাগজ বাহির কর! তোমার যে রকম অসাধারণ—ইত্যাদি।

ভূপতি উৎসাহিত হইয়া উঠিল। পরের কাগজে পত্র প্রকাশ করিয়া গৌরব নাই,—নিজের কাগজে স্বাধীন কলমটাকে পূরাদমে ছুটাইতে পারিবে। ভগিনীপতিকে সহকারী করিয়া নিতান্ত অল্প বয়সেই ভূপতি সম্পাদকের গদীতে আরোহণ করিল।

অল্প বয়সে সম্পাদকী নেশা এবং রাজনৈতিক নেশা অত্যন্ত জোর করিয়া ধরে। ভূপতিকে মাতাইয়া তুলিবার লোকও ছিল অনেক।

এইরূপে সে যতদিন কাগজ লইয়া ভোর হইয়াছিল, ততদিনে তাহার বালিকা বধূ চারুলতা ধীরে ধীরে যৌবনে পদার্পণ করিল। খবরের কাগজের সম্পাদক এই মস্ত খবরটি ভাল করিয়া টের পাইল না। ভারত গবর্ণমেণ্টের সীমান্ত নীতি ক্রমশই স্ফীত হইয়া সংযমের বন্ধন বিদীর্ণ করিবার দিকে যাইতেছে ইহাই তাহার প্রধান লক্ষ্যের বিষয় ছিল।

ধনী গৃহে চারুলতার কোন কর্ম্ম ছিল না। ফলপরিণামহীন

ফুলের মত পরিপূর্ণ অনাবশ্যকতার মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠাই তাহার চেষ্টাশূন্য দীর্ঘ দিনরাত্রির একমাত্র কাজ ছিল। তাহার কোন অভাব ছিল না।

এমন অবস্থার সুযোগ পাইলে বধূ স্বামীকে লইয়া অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করিয়া থাকে, দাম্পত্য লীলার সীমান্ত নীতি সংসারের সমস্ত সীমা লঙ্ঘন করিয়া সময় হইতে অসময়ে এবং বিহিত হইতে অবিহিতে গিয়া উত্তীর্ণ হয়। চারুলতার সে সুযোগ ছিল না। কাগজের আবরণ ভেদ করিয়া স্বামীকে অধিকার করা তাহার পক্ষে দুরূহ হইয়াছিল।

যুবতী স্ত্রীর প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া কোন আত্মীয়া তাহাকে ভর্ৎসনা করিলে ভূপতি একবার সচেতন হইয়া কহিল—তাইত চারুর একজন কেউ সঙ্গিনী থাকা উচিত, ও বেচারার কিছুই করিবার নাই!

শ্যালক উমাপতিকে কহিল—তোমার স্ত্রীকে আমাদের এখানে আনিয়া রাখ না—সমবয়সী স্ত্রীলোক কেহ কাছে নাই, চারুর নিশ্চয়ই ভারি ফাঁকা ঠেকে।

স্ত্রীসঙ্গের অভাবই চারুর পক্ষে অত্যন্ত শোকাবহ—সম্পাদক এইরূপ বুঝিল এবং শ্যালকজায়া মন্দাকিনীকে বাড়িতে আনিয়া সে নিশ্চিন্ত হইল।

যে সময়ে স্বামী স্ত্রী, প্রেমোন্মেষের প্রথম অরুণালোকে পরস্পরের কাছে অপরূপ মহিমায় চিরনূতন বলিয়া প্রতিভাত হয় দাম্পত্যের সেই স্বর্ণপ্রভামণ্ডিত প্রত্যূষকাল অচেতন অবস্থায়

কখন অতীত হইয়া গেল কেহ জানিতে পারিল না। নূতনত্বের স্বাদ না পাইয়াই উভয়ে উভয়ের কাছে পুরাতন পরিচিত অভ্যস্ত হইয়া গেল।

লেখা পড়ার দিকে চারুলতার একটা স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল বলিয়া তাহার দিনগুলা নিতান্ত বোঝা হইয়া উঠে নাই। সে নিজের চেষ্টায় নানাকৌশলে পড়িবার বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিল। ভূপতির পিস্‌তুত ভাই অমল থার্ড ইয়ারে পড়িতেছিল, চারুলতা তাহাকে ধরিয়া পড়া করিয়া লইত, এই কর্ম্মটুকু আদায় করিয়া লইবার জন্য অমলের অনেক আবদার তাহাকে সহ্য করিতে হইত! তাহাকে প্রায়ই হোটেলে খাইবার খোরাকী এবং ইংরাজি সাহিত্যগ্রন্থ কিনিবার খরচা যোগাইতে হইত। অমল মাঝে মাঝে বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইত, সেই যজ্ঞ সমাধার ভার গুরুদক্ষিণার স্বরূপ চারুলতা নিজে গ্রহণ করিত। ভূপতি চারুলতার প্রতি কোন দাবী করিত না, কিন্তু সামান্য একটু পড়াইয়া পিস্‌তুত ভাই অমলের দাবীর অন্ত ছিল না। তাহা লইয়া চারুলতা প্রায় মাঝে মাঝে কৃত্রিম কোপ এবং বিদ্রোহ প্রকাশ করিত; কিন্তু কোন একটা লোকের কোন কাজে আসা এবং স্নেহের উপদ্রব সহ্য করা তাহার পক্ষে অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল।

অমল কহিল, বৌঠান, আমাদের কালেজের রাজবাড়ির জামাই বাবু রাজ-অন্তঃপুরের খাস্‌ হাতের বুননি কার্পেটের জুতো পরে আসে, আমার ত সহ্য হয় না,—এক জোড়া কার্পেটের জুতো চাই, নইলে কোন মতেই পদমর্য্যাদা রক্ষা করতে পারচিনে!

চারু। হাঁ, তাই বই কি! আমি বসে' বসে' তোমার জুতো সেলাই করে মরি! দাম দিচ্চি বাজার হতে কিনে আনগে যাও!

অমল বলিল—সেটি হচ্চে না!

চারু জুতা সেলাই করিতে জানে না, এবং অমলের কাছে সে কথা স্বীকার করিতেও চাহে না। অমল চায়—সংসারে সেই একমাত্র প্রার্থীর প্রার্থনা রক্ষা না করিয়া সে থাকিতে পারে না। অমল যে সময় কালেজে যাইত সেই সময়ে সে লুকাইয়া বহু যত্নে কার্পেটের শেলাই শিখিতে লাগিল। এবং অমল নিজে যখন তাহার জুতার দরবার সম্পূর্ণ ভুলিয়া বসিয়াছে এমন সময় এক দিন সন্ধ্যাবেলায় চারু তাহাকে নিমন্ত্রণ করিল।

গ্রীষ্মের সময় ছাদের উপর আসন করিয়া অমলের আহারের জায়গা করা হইয়াছে। বালি উড়িয়া পড়িবার ভয়ে পিতলের ঢাকনায় থালা ঢাকা রহিয়াছে। অমল কালেজের বেশ পরিত্যাগ করিয়া মুখ ধুইয়া ফিট্‌ফাট্ হইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল।

অমল আসনে বসিয়া ঢাকা খুলিল, দেখিল—থালায় এক জোড়া নূতন বাঁধানো পশমের জুতা সাজানো রহিয়াছে! চারুলতা উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল।

জুতা পাইয়া অমলের আশা আরো বাড়িয়া উঠিল। এখন গলাবন্ধ চাই, রেশমের রুমালে ফুলকাটা পাড় শেলাই করিয়া দিতে হইবে, তাহার বাহিরের ঘরে বসিবার বড় কেদারায় তেলের দাগ নিবারণের জন্য একটা কাজ করা আবরণ আবশ্যক।

প্রত্যেকবারেই চারুলতা আপত্তি প্রকাশ করিয়া কলহ করে এবং প্রত্যেকবারেই বহু যত্নে বহু স্নেহে সৌখীন অমলের সখ মিটাইয়া দেয়! অমল মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করে, বৌঠান কত দূর হইল।

চারুলতা মিথ্যা করিয়া বলে, কিছুই হয় নি! কখনো বলে, সে আমার মনেই ছিল না।

কিন্তু অমল ছাড়িবার পাত্র নয়! প্রতিদিন স্মরণ করাইয়া দেয় এবং আবদার করে। নাছোড়বান্দা অমলের সেই সকল উপদ্রব উদ্রেক করাইয়া দিবার জন্যই চারু ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়া বিরোধের সৃষ্টি করে এবং হঠাৎ একদিন তাহার প্রার্থনা পূরণ করিয়া দিয়া কৌতুক দেখে।

ধনীর সংসারে চারুকে আর কাহারো জন্য কিছু করিতে হয় না—কেবল অমল তাহাকে কাজ না করাইয়া ছাড়ে না। এই সকল ছোট খাটো সখের খাটুনিতেই তাহার হৃদয়বৃত্তির চর্চ্চা এবং চরিতার্থতা হইত।

ভূপতির অন্তঃপুরে যে একখণ্ড জমি পড়িয়া ছিল তাহাকে বাগান বলিলে অনেকটা অত্যুক্তি করা হয়। সেই বাগানের প্রধান বনস্পতি ছিল একটা বিলাতী আমড়া গাছ।

এই ভূখণ্ডের উন্নতি সাধনের জন্য চারু এবং অমলের মধ্যে একটা কমিটি বসিয়াছে। উভয়ে মিলিয়া কিছুদিন হইতে ছবি আঁকিয়া প্ল্যান করিয়া মহা উৎসাহে এই জমিটার উপরে একটা বাগানের কল্পনা ফলাও করিয়া তুলিয়াছে।

অমল বলিল, বৌঠান, আমাদের এই বাগানে সেকালের রাজকন্যার মত তোমাকে নিজের হাতে গাছে জল দিতে হবে।

চারু কহিল, আর ঐ পশ্চিমের কোণটাতে একটা কুঁড়ে তৈরি করে নিতে হবে, হরিণের বাচ্ছা থাক্‌বে।

অমল কহিল, আর একটি ছোটখাট ঝিলের মত কর্‌তে হবে তাতে হাঁস চর্‌বে।

চারু সে প্রস্তাবে উৎসাহিত হইয়া কহিল, আর তাতে নীলপদ্ম দেব, আমার অনেক দিন থেকে নীলপদ্ম দেখবার সাধ আছে।

অমল কহিল, সেই ঝিলের উপর একটি সাঁকো বেঁধে দেওয়া যাবে, আর ঘাটে একটি বেশ ছোট ডিঙ্গি থাক্‌বে।

চারু কহিল, ঘাট অবশ্য সাদা মার্ব্বেলের হবে!

অমল পেন্সিল কাগজ লইয়া রুল কাটিয়া কম্পাস ধরিয়া মহা আড়ম্বরে বাগানের একটা ম্যাপ আঁকিল।

উভয়ে মিলিয়া দিনে দিনে কল্পনার সংশোধন পরিবর্ত্তন করিতে করিতে বিশ পঁচিশখানা নূতন ম্যাপ আঁকা হইল।

ম্যাপ খাড়া হইলে কত খরচ হইতে পারে তাহার একটা এষ্টিমেট্‌ তৈরি হইতে লাগিল। প্রথমে সংকল্প ছিল—চারু নিজের বরাদ্দ মাসহারা হইতে ক্রমে ক্রমে বাগান তৈরি করিয়া তুলিবে, ভূপতি ত বাড়িতে কোথায় কি হইতেছে তাহা চাহিয়া দেখে না, বাগান তৈরি হইলে তাহাকে সেখানে নিমন্ত্রণ করিয়া আশ্চর্য্য করিয়া দিবে; সে মনে করিবে আলাদিনের প্রদীপের সাহায্যে জাপান দেশ হইতে একটা আস্ত বাগান তুলিয়া আনা হইয়াছে!

কিন্তু এষ্টিমেট যথেষ্ট কম করিয়া ধরিলেও চারুর সঙ্গতিতে কুলায় না।" অমল তখন পুনরায় ম্যাপ পরিবর্ত্তন করিতে বসিল। কহিল—তা হলে বৌঠান, ঐ ঝিলটা বাদ দেওয়া যাক্।

চারু কহিল, না না, ঝিল বাদ দিলে কিছুতেই চল্‌বে না, ওতে আমার নীলপদ্ম থাক্‌বে।

অমল কহিল, তোমার হরিণের ঘরে টালির ছাদ নাই দিলে। ওটা অমনি একটা সাদা সিধে খোড়ো চাল করলেই হবে।

চারু অত্যন্ত রাগ করিয়া কহিল—তাহলে আমার ওঘরে দরকার নেই—ও থাক্!

মরিশস্ হইতে লবঙ্গ, কর্ণাট হইতে চন্দন এবং সিংহল হইতে দারচিনির চারা আনাইবার প্রস্তাব ছিল, অমল তাহার পরিবর্ত্তে মাণিকতলা হইতে সাধারণ দিশি ও বিলাতী গাছের নাম করিতেই চারু মুখ ভার করিয়া বসিল, কহিল—তাহলে আমার বাগানে কাজ নেই!

এষ্টিমেট কমাইবার এরূপ প্রথা নয়। এষ্টিমেটের সঙ্গে সঙ্গে কল্পনাকে খর্ব্ব করা চারুর পক্ষে অসাধ্য এবং অমল মুখে যাহাই বলুক তাহারও সেটা রুচিকর নয়।

অমল কহিল—তবে বৌঠান তুমি দাদার কাছে বাগানের কথাটা পাড়—তিনি নিশ্চয় টাকা দেবেন।

চারু কহিল—না, তাঁকে বল্লে মজা কি হল! আমরা দুজনে বাগান তৈরি করে তুল্‌ব। তিনি ত সাহেব বাড়িতে ফরমাস

দিয়ে ইডেন্ গার্ডেন্ বানিয়ে দিতে পারেন—তা'হলে আমাদের প্ল্যানের কি হবে ?

আমড়া গাছের ছায়ায় বসিয়া চারু এবং অমল অসাধ্য সংকল্পের কল্পনাসুখ বিস্তার করিতেছিল। চারুর ভাজ মন্দা দোতলা হইতে ডাকিয়া কহিল, এত বেলায় বাগানে তোরা কি কর্‌চিস্ ?

চারু কহিল, পাকা আমড়া খুঁজ্‌চি।

লুব্ধ মন্দা কহিল, পাস্ যদি আমার জন্যে আনিস্।

চারু হাসিল, অমল হাসিল। তাহাদের সমস্ত সঙ্কল্পগুলির প্রধান সুখ এবং গৌরব এই ছিল যে, সেগুলি তাহাদের দুজনের মধ্যেই আবদ্ধ। মন্দার আর যা কিছু গুণ থাক্—কল্পনা ছিল না, সে এ সকল প্রস্তাবের রস গ্রহণ করিবে কি করিয়া ? সে এই দুই সভ্যের সকল প্রকার কমিটি হইতে একেবারে বর্জ্জিত।

অসাধ্য বাগানের এষ্টিমেটও কমিল না, কল্পনাও কোন অংশে হার মানিতে চাহিল না। সুতরাং আমড়াতলার কমিটি এই ভাবেই কিছুদিন চলিল। বাগানে যেখানে ঝিল হইবে, যেখানে হরিণের ঘর হইবে, যেখানে পাথরের বেদী হইবে, অমল সেখানে চিহ্ন কাটিয়া রাখিল।

তাহাদের সংকল্পিত বাগানে এই আমড়াতলার চারদিক কিভাবে বাঁধাইতে হইবে অমল একটি ছোট কোদাল লইয়া তাহারই দাগ কাটিতেছিল—এমন সময় চারু গাছের ছায়ায় বসিয়া বলিল, অমল তুমি যদি লিখতে পারতে তাহলে বেশ হত।

অমল জিজ্ঞাসা করিল,—কেন বেশ হত?

চারু। তাহলে আমাদের এই বাগানের বর্ণনা করে তোমাকে দিয়ে একটা গল্প লেখাতুম। এই ঝিল, এই হরিণের ঘর, এই আমড়াতলার সমস্তই তাতে থাক্‌ত,—আমরা দুজনে ছাড়া কেউ বুঝতে পারত না, বেশ মজা হত! অমল তুমি একবার লেখবার চেষ্টা করে দেখ না, নিশ্চয় তুমি পারবে।

অমল কহিল—আচ্ছা, যদি লিখতে পারি ত আমাকে কি দেবে? চারু কহিল, তুমি কি চাও?

অমল কহিল, আমার মশারির চালে আমি নিজে লতা এঁকে দেব, সেইটে তোমাকে আগাগোড়া রেশম দিয়ে কাজ ক'রে দিতে হবে।

চারু কহিল—তোমার সমস্ত বাড়াবাড়ি! মশারির চালে আবার কাজ!

মশারি জিনিষটাকে একটা শ্রীহীন কারাগারের মত রাখার বিরুদ্ধে অমল অনেক কথা বলিল। সে কহিল সংসারের পনেরো আনা লোকের যে সৌন্দর্য্যবোধ নাই এবং কুশ্রীতা তাহাদের কাছে কিছুমাত্র পীড়াকর নহে ইহাই তাহার প্রমাণ।

চারু সেকথা তৎক্ষণাৎ মনে মনে মানিয়া লইল এবং আমাদের এই দুটি লোকের নিভৃত কমিটি যে সেই পনেরো আনার অন্তর্গত নহে ইহা মনে করিয়া সে খুসি হইল।

কহিল, আচ্ছা বেশ, আমি মশারির চাল তৈরি করে দেব, তুমি লেখ।

অমল রহস্যপূর্ণভাবে কহিল, তুমি কি মনে কর আমি লিখতে পারিনে ?

চারু অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া কহিল—তবে নিশ্চয় তুমি কিছু লিখেছ, আমাকে দেখাও !

অমল। আজ থাক্ বৌঠান !

চারু : না আজই দেখাতে হবে—মাথা খাও, তোমার লেখা নিয়ে এসগে !

চারুকে তাহার লেখা শোনাইবার অতি ব্যগ্রতাতেই অমলকে এত দিন বাধা দিতেছিল। পাছে চারু না বোঝে, পাছে তাহার ভাল না লাগে, এ সঙ্কোচ সে তাড়াইতে পারিতেছিল না।

আজ খাতা আনিয়া একটুখানি লাল হইয়া একটুখানি কাশিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। চারু গাছের গুঁড়িতে হেলান্ দিয়া ঘাসের উপর পা ছড়াইয়া শুনিতে লাগিল।

প্রবন্ধের বিষয়টা ছিল, "আমার খাতা !" অমল লিখিয়াছিল—হে আমার শুভ্রখাতা, আমার কল্পনা এখনো তোমাকে স্পর্শ করে নাই। সূতিকাগৃহে ভাগ্যপুরুষ প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে শিশুর ললাটপট্টের ন্যায় তুমি নির্ম্মল, তুমি রহস্যময়। যে দিন তোমার শেষ পৃষ্ঠার শেষ ছত্রে উপসংহার লিখিয়া দিব, সে দিন আজ কোথায় ! তোমার এই শুভ্র শিশু পত্রগুলি সেই চিরদিনের জন্য মসীচিহ্নিত সমাপ্তির কথা আজ স্বপ্নেও কল্পনা করিতেছে না !—ইত্যাদি অনেকখানি লিখিয়াছিল।

চারু তরুচ্ছায়ায় বসিয়া স্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিল। পড়া শেষ

হইলে ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল—তুমি আবার লিখতে পার না!

সে দিন সেই গাছের তলায় অমল সাহিত্যের মাদকরস প্রথম পান করিল;—সাকী ছিল নবীনা, রসনাও ছিল নবীন এবং অপরাহ্নের আলোক দীর্ঘ ছায়াপাতে রহস্যময় হইয়া আসিয়াছিল।

চারু বলিল, অমল গোটাকতক আমড়া পেড়ে নিয়ে যেতে হবে, নইলে মন্দাকে কি হিসেব দেব?

মূঢ় মন্দাকে তাহাদের পড়াশুনা এবং আলোচনার কথা বলিতে প্রবৃত্তিই হয় না, সুতরাং আমড়া পাড়িয়া লইয়া যাইতে হইল।

—o—
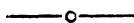
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বাগানের সংকল্প তাহাদের অন্যান্য অনেক সংকল্পের ন্যায় সীমাহীন কল্পনাক্ষেত্রের মধ্যে কখন্ হারাইয়া গেল তাহা অমল এবং চারু লক্ষ্যও করিতে পারিল না।

এখন অমলের লেখাই তাহাদের আলোচনা ও পরামর্শের প্রধান বিষয় হইয়া উঠিল। অমল আসিয়া বলে—বৌঠান, একটা বেশ চমৎকার ভাব মাথায় এসেছে।

চারু উৎসাহিত হইয়া উঠে, বলে,—চল আমাদের দক্ষিণের বারান্দায়,—এখানে এখনি মন্দা পান সাজ্‌তে আস্‌বে।

চারু কাশ্মীরী বারান্দায় একটি জীর্ণ বেতের কেদারায় আসিয়া বসে এবং অমল রেলিংয়ের নীচেকার উচ্চ অংশের উপর বসিয়া পা ছড়াইয়া দেয়।

অমলের লিখিবার বিষয়গুলি প্রায়ই সুনির্দ্দিষ্ট নহে—তাহা পরিষ্কার করিয়া বলা শক্ত। গোলমাল করিয়া সে যাহা বলিত তাহা স্পষ্ট বুঝা কাহারো সাধ্য নহে। অমল নিজেই বারবার বলিত, বৌঠান, তোমাকে ভাল বোঝাতে পারচিনে!

চারু বলিত, না, আমি অনেকটা বুঝতে পেরেছি, তুমি এইটে লিখে ফেল—দেরি কোরো না।

সে খানিকটা বুঝিয়া খানিকটা না বুঝিয়া অনেকটা কল্পনা করিয়া অনেকটা অমলের ব্যক্ত করিবার আবেগের দ্বারা উত্তেজিত হইয়া মনের মধ্যে কি একটা খাড়া করিয়া তুলিত, তাহাতেই সে সুখ পাইত এবং আগ্রহে অধীর হইয়া উঠিত।

চারু সেইদিন বিকালেই জিজ্ঞাসা করিত, কতটা লিখলে?

অমল বলিত, এরি মধ্যে কি লেখা যায়?

চারু পরদিন সকালে ঈষৎ কলহের স্বরে জিজ্ঞাসা করিত—কই তুমি সেটা লিখলে না?

অমল বলিত—রোস, আর একটু ভাবি!

চারু রাগ করিয়া বলিত—তবে যাও!

বিকালে সেই রাগ ঘনীভূত হইয়া চারু যখন কথা বন্ধ করিবার জো করিত, তখন অমল লেখা কাগজের একটা অংশ রুমাল বাহির করিবার ছলে পকেট হইতে একটুখানি বাহির করিত।

মুহূর্ত্তে চারুর মৌন ভাঙ্গিয়া গিয়া সে বলিয়া উঠিত—ঐ যে তুমি লিখেছ! আমাকে ফাঁকি! দেখাও!

অমল বলিত—এখনো শেষ হয়নি, আর একটু লিখে শোনাব!

চারু। না, এখনি শোনাতে হবে!

অমল এখনি শোনাইবার জন্যই ব্যস্ত—কিন্তু চারুকে কিছুক্ষণ কাড়াকাড়ি না করাইয়া সে শোনাইত না। তারপরে অমল কাগজখানি হাতে করিয়া বসিয়া প্রথমটা একটুখানি পাতা ঠিক করিয়া লইত, পেন্সিল লইয়া দুই এক জায়গায় দু'টা একটা সংশোধন করিতে থাকিত, ততক্ষণ চারুর চিত্ত পুলকিত কৌতূহলে জলভারনত মেঘের মত সেই কাগজ কয়খানির দিকে ঝুঁকিয়া রহিত!

অমল দুইচারি প্যারাগ্রাফ যখন যাহা লেখে তাহা যতটুকুই হোক্ চারুকে সদ্য সদ্য শোনাইতে হয়। বাকি অলিখিত অংশটুকু আলোচনা এবং কল্পনায় উভয়ের মধ্যে মথিত হইতে থাকে।

এতদিন দুজনে আকাশ-কুসুমের চয়নে নিযুক্ত ছিল এখন কাব্যকুসুমের চাষ আরম্ভ হইয়া উভয়ে আর সমস্তই ভুলিয়া গেল।

একদিন অপরাহ্ণে অমল কালেজ হইতে ফিরিলে তাহার পকেটটা কিছু অতিরিক্ত ভরা বলিয়া বোধ হইল। অমল যখন বাড়িতে প্রবেশ করিল তখনি চারু অন্তঃপুরের গবাক্ষ হইতে তাহার পকেটের পূর্ণতার প্রতি লক্ষ্য করিয়াছিল।

অমল অন্যদিন কালেজ হইতে ফিরিয়া বাড়ির ভিতরে আসিতে দেরি করিত না, আজ সে তাহার ভরা পকেট লইয়া বাহিরের ঘরে প্রবেশ করিল, শীঘ্র আসিবার নাম করিল না।

চারু অন্তঃপুরের সীমান্তদেশে আসিয়া অনেকবার তালি দিল, কেহ শুনিল না। চারু কিছু রাগ করিয়া তাহার বারান্দায় মন্মথ দত্তের এক বই হাতে করিয়া পড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

মন্মথ দত্ত নূতন গ্রন্থকার। তাহার লেখার ধরণ অনেকটা অমলেরই মত এই জন্য অমল তাহাকে কখন প্রশংসা করিত না; মাঝে মাঝে চারুর কাছে তাহার লেখা বিকৃত উচ্চারণে পড়িয়া বিদ্রূপ করিত—চারু অমলের নিকট হইতে সে বই কাড়িয়া লইয়া অবজ্ঞাভরে দূরে ফেলিয়া দিত।

আজ যখন অমলের পদশব্দ শুনিতে পাইল তখন সেই মন্মথ দত্তের "কলকণ্ঠ" নামক বই মুখের কাছে তুলিয়া ধরিয়া চারু অত্যন্ত একাগ্রভাবে পড়িতে আরম্ভ করিল।

অমল বারান্দায় প্রবেশ করিল, চারু লক্ষ্যও করিল না। অমল কহিল—কি বৌঠান, কি পড়া হচ্চে?

চারুকে নিরুত্তর দেখিয়া অমল চৌকির পিছনে আসিয়া বইটা দেখিল। কহিল—মন্মথ দত্তর গলগণ্ড!

চারু কহিল, আঃ বিরক্ত কোরো না, আমাকে পড়তে দাও! পিঠের কাছে দাঁড়াইয়া অমল ব্যঙ্গস্বরে পড়িতে লাগিল, আমি তৃণ, ক্ষুদ্র তৃণ;—ভাই রক্তাম্বর রাজবেশধারী অশোক, আমি তৃণমাত্র! আমার ফুল নাই, আমার ছায়া নাই, আমার মস্তক আমি

আকাশে তুলিতে পারি না, বসন্তের কোকিল আমাকে আশ্রয় করিয়া কুহু স্বরে জগৎ মাতায় না—তবু ভাই অশোক, তোমার ঐ পুষ্পিত উচ্চশাখা হইতে তুমি আমাকে উপেক্ষা করিও না—তোমার পায়ে পড়িয়া আছি আমি তৃণ, তবু আমাকে তুচ্ছ করিও না!

অমল এইটুকু বই হইতে পড়িয়া তারপরে বিদ্রূপ করিয়া বানাইয়া বলিতে লাগিল—আমি কলার কাঁদি, কাঁচকলার কাঁদি, ভাই কুষ্মাণ্ড, ভাই গৃহচালবিহারী কুষ্মাণ্ড, আমি নিতান্তই কাঁচকলার কাঁদি!

চারু কৌতূহলের তাড়নায় রাগ রাখিতে পারিল না—হাসিয়া উঠিয়া বই ফেলিয়া দিয়া কহিল—তুমি ভারি হিংসুকে, নিজের লেখা ছাড়া কিছু পছন্দ হয় না!

অমল কহিল—তোমার ভারি উদারতা, তৃণটি পেলেও গিলে খেতে চাও!

চারু। আচ্ছা মশায়, ঠাট্টা করতে হবে না—পকেটে কি আছে বের করে ফেল!

অমল। কি আছে আন্দাজ কর!

অনেকক্ষণ চারুকে বিরক্ত করিয়া অমল পকেট হইতে 'সরোরুহ' নামক বিখ্যাত মাসিক পত্র বাহির করিল।

চারু দেখিল কাগজে অমলের সেই "খাতা" নামক প্রবন্ধটি বাহির হইয়াছে।

চারু দেখিয়া চুপ করিয়া রহিল। অমল মনে করিয়াছিল

তাহার বৌঠান খুব খুসি হইবে। কিন্তু খুসির বিশেষ কোন লক্ষণ না দেখিয়া বলিল—সরোরুহ পত্রে যে সে লেখা বের হয় না।

অমল এটা কিছু বেশী বলিল। যে কোন প্রকার চলনসই লেখা পাইলে সম্পাদক ছাড়েন না। কিন্তু অমল চারুকে বুঝাইয়া দিল, সম্পাদক বড়ই কড়া লোক, এক শো প্রবন্ধের মধ্যে একটা বাছিয়া লন।

শুনিয়া চারু খুসি হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল কিন্তু খুসি হইতে পারিল না। কিসে যে সে মনের মধ্যে আঘাত পাইল তাহা বুঝিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল—কোন সঙ্গত কারণ বাহির হইল না।

অমলের লেখা অমল এবং চারু দুজনের সম্পত্তি। অমল লেখক এবং চারু পাঠক। তাহার গোপনতাই তাহার প্রধান রস। সেই লেখা সকলে পড়িবে এবং অনেকেই প্রশংসা করিবে ইহাতে চারুকে যে কেন এতটা পীড়া দিতেছিল তাহা সে ভাল করিয়া বুঝিল না।

কিন্তু লেখকের আকাঙ্ক্ষা একটিমাত্র পাঠকে অধিক দিন মেটে না। অমল তাহার লেখা ছাপাইতে আরম্ভ করিল। প্রশংসাও পাইল।

মাঝে মাঝে ভক্তের চিঠিও আসিতে লাগিল। অমল সেগুলি তাহার বৌঠানকে দেখাইত। চারু তাহাতে খুসিও হইল কষ্টও পাইল। এখন অমলকে লেখায় প্রবৃত্ত করাইবার জন্য একমাত্র তাহারই উৎসাহ ও উত্তেজনার প্রয়োজন রহিল না। অমল মাঝে

মাঝে কদাচিৎ নাম-স্বাক্ষরবিহীন রমণীর চিঠিও পাইতে লাগিল। তাহা লইয়া চারু তাহাকে ঠাট্টা করিত কিন্তু সুখ পাইত না। হঠাৎ তাহাদের কমিটির রুদ্ধদ্বার খুলিয়া বাঙ্গালা দেশের পাঠক-মণ্ডলী তাহাদের দুজনকার মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল।

ভূপতি একদিন অবসর কালে কহিল, তাইত চারু, আমাদের অমল যে এমন ভাল লিখিতে পারে তা'ত আমি জানতুম না।

ভূপতির প্রশংসায় চারু খুসি হইল। অমল ভূপতির আশ্রিত, কিন্তু অন্য আশ্রিতদের সহিত তাহার অনেক প্রভেদ আছে এ কথা তাহার স্বামী বুঝিতে পারিলে চারু যেন গর্ব্ব অনুভব করে। তাহার ভাবটা এই যে, অমলকে কেন যে আমি এতটা স্নেহ আদর করি এত দিনে তোমরা তাহা বুঝিলে—আমি অনেক দিন আগেই অমলের মর্য্যাদা বুঝিয়াছিলাম, অমল কাহারো অবজ্ঞার পাত্র নহে।

চারু জিজ্ঞাসা করিল, তুমি তার লেখা পড়েছ?

ভূপতি কহিল—হাঁ—না, ঠিক পড়িনি। সময় পাই নি। কিন্তু আমাদের নিশিকান্ত পড়ে খুব প্রশংসা করছিল। সে বাঙ্গালা লেখা বেশ বোঝে।

ভূপতির মনে অমলের প্রতি একটি সম্মানের ভাব জাগিয়া উঠে ইহা চারুর একান্ত ইচ্ছা।

—o—

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

উমাপদ ভূপতিকে তাহার কাগজের সঙ্গে অন্য পাঁচ রকম উপহার দিবার কথা বুঝাইতেছিল। উপহারে যে কি করিয়া

লোকসান কাটাইয়া লাভ হইতে পারে তাহা ভূপতি কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছিল না।

চারু একবার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই উমাপদকে দেখিয়া চলিয়া গেল। আবার কিছুক্ষণ ঘুরিয়া ফিরিয়া ঘরে আসিয়া দেখিল দুই জনে হিসাব লইয়া তর্কে প্রবৃত্ত।

উমাপদ চারুর অধৈর্য্য দেখিয়া কোন ছুতা করিয়া বাহির হইয়া গেল। ভূপতি হিসাব লইয়া মাথা ঘুরাইতে লাগিল।

চারু ঘরে ঢুকিয়া বলিল, এখনো বুঝি তোমার কাজ শেষ হল না। দিন রাত ঐ একখানা কাগজ নিয়ে যে তোমার কি করে' কাটে আমি তাই ভাবি!

ভূপতি হিসাব সরাইয়া রাখিয়া একটুখানি হাসিল। মনে মনে ভাবিল, বাস্তবিক চারুর প্রতি আমি মনোযোগ দিবার সময়ই পাই না, বড় অন্যায়। ও বেচারার পক্ষে সময় কাটাইবার কিছুই নাই।

ভূপতি স্নেহস্বরে কহিল—আজ যে তোমার পড়া নেই! মাষ্টারটি বুঝি পালিয়েছেন? তোমার পাঠশালার সব উল্টো নিয়ম—ছাত্রীটি পুঁথিপত্র নিয়ে প্রস্তুত, মাষ্টার পলাতক! আজ কাল অমল তোমাকে আগেকার মত নিয়মিত পড়ায় বলে ত বোধ হয় না।

চারু কহিল—আমাকে পড়িয়ে অমলের সময় নষ্ট করা কি উচিত? অমলকে তুমি বুঝি একজন সামান্য প্রাইভেট টিউটার পেয়েছ?

ভূপতি চারুর কটিদেশ ধরিয়া কাছে টানিয়া কহিল—এটা কি সামান্য প্রাইভেট টিউটারি হল? তোমার মত বৌঠানকে যদি পড়াতে পেতুম তা হলে—

চারু। ইস্ ইস্ তুমি আর বোলো না! স্বামী হয়েই রক্ষে নেই ত আরো কিছু!

ভূপতি ঈষৎ একটু আহত হইয়া কহিল, আচ্ছা, কাল থেকে আমি নিশ্চয় তোমাকে পড়াব। তোমার বইগুলো আন দেখি, কি তুমি পড় একবার দেখে নিই।

চারু। ঢের হয়েছে, তোমার আর পড়াতে হবে না! এখনকার মত তোমার খবরের কাগজের হিসাবটা একটু রাখবে? এখন আর কোন দিকে মন দিতে পারবে কিনা বল?

ভূপতি কহিল—নিশ্চয় পারব। এখন তুমি আমার মনকে যেদিকে ফেরাতে চাও সেই দিকেই ফিরবে!

চারু। আচ্ছা বেশ, তা হলে অমলের এই লেখাটা একবার পড়ে দেখ কেমন চমৎকার হয়েছে। সম্পাদক অমলকে লিখেছে এই লেখা পড়ে' নবগোপাল বাবু তাকে বাঙ্গালার রাস্কিন্ নাম দিয়েছেন।

শুনিয়া ভূপতি কিছু সঙ্কুচিত ভাবে কাগজ খানা হাতে করিয়া লইল। খুলিয়া দেখিল, লেখাটির নাম "আষাঢ়ের চাঁদ।" গত দুই সপ্তাহ ধরিয়া ভূপতি ভারতগবর্ণমেণ্টের বজেট সমালোচনা লইয়া বড় বড় অঙ্কপাত করিতেছিল, সেই সকল অঙ্ক বহুপদ কীটের মত তাহার মস্তিষ্কের নানা বিবরের মধ্যে সঞ্চরণ করিয়া

ফিরিতেছিল—এমন সময়ে হঠাৎ বাঙ্গালা ভাষায় "আষাঢ়ের চাঁদ" প্রবন্ধ আগাগোড়া পড়িবার জন্য তাহার মন প্রস্তুত ছিল না। প্রবন্ধটিও নিতান্ত ছোট নহে।

লেখাটা এইরূপে সুরু হইয়াছে—"আজ কেন আষাঢ়ের চাঁদ সারারাত মেঘের মধ্যে এমন করিয়া লুকাইয়া বেড়াইতেছে! যেন স্বর্গলোক হইতে সে কি চুরি করিয়া আনিয়াছে, যেন তাহার কলঙ্ক ঢাকিবার স্থান নাই। ফাল্গুন মাসে যখন আকাশের একটি কোণেও মুষ্টিপরিমাণ মেঘ ছিল না তখন ত জগতের চক্ষের সম্মুখে সে নির্লজ্জের মত উন্মুক্ত আকাশে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছিল—আর আজ তাহার সেই ঢল ঢল হাসিখানি—শিশুর স্বপ্নের মত, প্রিয়ার স্মৃতির মত, সুরেশ্বরী শচীর অলকবিলম্বিত মুক্তার মালার মত—"

ভূপতি মাথা চুলকাইয়া কহিল—বেশ লিখেছে! কিন্তু আমাকে কেন?—এ সব কবিত্ব কি আমি বুঝি?

চারু সঙ্কুচিত হইয়া ভূপতির হাত হইতে কাগজ খানা কাড়িয়া কহিল—তুমি তবে কি বোঝ?

ভূপতি কহিল—আমি সংসারের লোক, আমি মানুষ বুঝি।

চারু কহিল—মানুষের কথা বুঝি সাহিত্যের মধ্যে লেখে না?

ভূপতি। ভুল লেখে। তা ছাড়া মানুষ যখন সশরীরে বর্ত্তমান তখন বানানো কথার মধ্যে তাকে খুঁজে বেড়াবার দরকার?

বলিয়া চারুলতার চিবক ধরিয়া কহিল—এই যেমন আমি

তোমাকে বুঝি,—কিন্তু সে জন্য কি মেঘনাদবধ কবিকঙ্কণ চণ্ডী আগাগোড়া পড়ার দরকার আছে?

ভূপতি কাব্য বোঝে না বলিয়া অহঙ্কার করিত। কিন্তু তবু অমলের লেখা ভাল করিয়া না পড়িয়াও তাহার প্রতি মনে মনে ভূপতির একটা শ্রদ্ধা ছিল। ভূপতি ভাবিত, বলিবার কথা কিছুই নাই অথচ এত কথা অনর্গল বানাইয়া বলা সে ত আমি মাথা কুটিয়া মরিলেও পারিতাম না। অমলের পেটে যে এত ক্ষমতা ছিল তাহা কে জানিত?

ভূপতি নিজের রসজ্ঞতা অস্বীকার করিত কিন্তু সাহিত্যের প্রতি তাহার কৃপণতা ছিল না। দরিদ্র লেখক তাহাকে ধরিয়া পড়িলে বই ছাপিবার খরচ ভূপতি দিত, কেবল বিশেষ করিয়া বলিয়া দিত আমাকে যেন উৎসর্গ করা না হয়। বাঙ্গালা ছোট বড় সমস্ত সাপ্তাহিক এবং মাসিক পত্র, খ্যাত অখ্যাত পাঠ্য অপাঠ্য সমস্ত বই সে কিনিত। বলিত একে পড়ি না, তারপরে যদি না কিনি, তবে পাপও করিব প্রায়শ্চিত্তও হইবে না। পড়িত না বলিয়াই মন্দ বইয়ের প্রতি তাহার লেশমাত্র বিদ্বেষ ছিল না, সেই জন্য তাহার বাঙ্গালা লাইব্রেরী গ্রন্থে পরিপূর্ণ ছিল।

অমল ভূপতির ইংরাজি প্রুফ সংশোধন কার্য্যে সাহায্য করিত—কোন একটা কাপির দুর্ব্বোধ্য হস্তাক্ষর দেখাইয়া লইবার জন্য সে একতাড়া কাগজ পত্র লইয়া ঘরে ঢুকিল।

ভূপতি হাসিয়া কহিল, অমল, তুমি আষাঢ়ের চাঁদ আর ভাদ্র মাসের পাকা তালের উপর যত খুসি লেখ আমি তাতে কোন

আপত্তি করিনে—আমি কারো স্বাধীনতায় হাত দিতে চাইনে—কিন্তু আমার স্বাধীনতায় কেন হস্তক্ষেপ? সেগুলো আমাকে না পড়িয়ে ছাড়বেন না, তোমার বৌঠানের একি অত্যাচার?

অমল হাসিয়া কহিল, তাই ত বৌঠান—আমার লেখাগুলো নিয়ে তুমি যে দাদাকে জুলুম করবার উপায় বের করবে এমন জান্‌লে আমি লিখতুম না।

সাহিত্যরসে বিমুখ ভূপতির কাছে আনিয়া তাহার অত্যন্ত দরদের লেখাগুলিকে অপদস্থ করাতে অমল মনে মনে চারুর উপর রাগ করিল এবং চারু তৎক্ষণাৎ তাহা বুঝিতে পারিয়া বেদনা পাইল। কথাটাকে অন্যদিকে লইয়া যাইবার জন্য ভূপতিকে কহিল—তোমার ভাইটিকে একটি বিয়ে দিয়ে দাও দেখি তা'হলে আর লেখার উপদ্রব সহ্য কর্‌তে হবে না।

ভূপতি কহিল—এখনকার ছেলেরা আমাদের মত নির্ব্বোধ নয়! তাদের যত কবিত্ব লেখায়, কাজের বেলায় সেয়ানা! কই তোমার দেওরকে ত বিয়ে কর্‌তে রাজি করাতে পার্‌লে না!

চারু চলিয়া গেলে ভূপতি অমলকে কহিল, অমল, আমাকে এই কাগজের হাঙ্গামে থাক্‌তে হয়, চারু বেচারা বড় একলা পড়েছে। কোন কাজকর্ম্ম নেই, মাঝে মঝে আমার এই লেখবার ঘরে উঁকি মেরে চলে যায়। কি ক'রব বল। তুমি অমল ওকে একটু পড়াশুনোয় নিযুক্ত রাখ্‌তে পার্‌লে ভাল হয়। মাঝে মাঝে চারুকে যদি ইংরাজি কাব্য থেকে তর্জ্জমা করে শোনাও তা'হলে ওর উপকারও হয় ভালও লাগে। চারুর সাহিত্যে বেশ রুচি আছে!

অমল কহিল, তা আছে। বৌঠান যদি আরো একটু পড়াশুনো করেন তা হলে আমার বিশ্বাস উনি নিজে বেশ ভাল লিখ্‌তে পার্‌বেন ?

ভূপতি হাসিয়া কহিল, ততটা আশা করিনে, কিন্তু চারু বাঙ্গালা লেখার ভালমন্দ আমার চেয়ে ঢের বুঝতে পারে।

অমল। ওঁর কল্পনাশক্তি বেশ আছে, স্ত্রীলোকের মধ্যে এমন দেখা যায় না।

ভূপতি। পুরুষের মধ্যেও কম দেখা যায়—তার সাক্ষী আমি। আচ্ছা তুমি তোমার বৌঠাকরুণকে যদি গড়ে তুল্‌তে পার আমি তোমাকে পারিতোষিক দেব।

অমল। কি দেবে শুনি!

ভূপতি। তোমার বৌঠাকরুণের জুড়ি একটি খুঁজে পেতে এনে দেব।

অমল। আবার তাকে নিয়ে পড়তে হবে! চিরজীবন কি গড়ে তুল্‌তেই কাটাব ?

দুটি ভাই আজ-কালকার ছেলে—কোন কথা তাহাদের মুখে বাধে না।

—*—

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পাঠকসমাজে প্রতিপত্তি লাভ করিয়া অমল এখন মাথা তুলিয়া উঠিয়াছে। আগে সে স্কুলের ছাত্রটির মত থাকিত এখন সে যেন

সমাজের গণ্যমান্য মানুষের মত হইয়া উঠিয়াছে। মাঝে মাঝে সভায় সাহিত্য-প্রবন্ধ পাঠ করে—সম্পাদক ও সম্পাদকের দূত তাহার ঘরে আসিয়া বসিয়া থাকে, তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ায়, নানা সভার সভ্য ও সভাপতি হইবার জন্য তাহার নিকট অনুরোধ আসে, ভূপতির ঘরে দাসদাসী আত্মীয়স্বজনের চক্ষে তাহার প্রতিষ্ঠাস্থান অনেকটা উপরে উঠিয়া গেছে।

মন্দাকিনী এতদিন তাহাকে বিশেষ একটা কেহ বলিয়া মনে করে নাই। অমল ও চারুর হাস্যালাপ আলোচনাকে সে ছেলেমানুষী বলিয়া উপেক্ষা করিয়া পান সাজিত ও ঘরের কাজ কর্ম্ম করিত—নিজেকে সে উহাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং সংসারের পক্ষে আবশ্যক বলিয়াই জানিত।

অমলের পান খাওয়া অপরিমিত ছিল। মন্দার উপর পান সাজিবার ভার থাকাতে সে পানের অযথা অপব্যয়ে বিরক্ত হইত। অমলে চারুতে ষড়যন্ত্র করিয়া মন্দার পানের ভাণ্ডার প্রায়ই লুঠ করিয়া আনা তাহাদের একটা আমোদের মধ্যে ছিল। কিন্তু এই সৌখীন চোর দুটির চৌর্য্য-পরিহাস মন্দার কাছে আমোদজনক বোধ হইত না।

আসল কথা, একজন আশ্রিত অন্য আশ্রিতকে প্রসন্ন চক্ষে দেখে না। অমলের জন্য মন্দাকে যেটুকু গৃহকর্ম্ম অতিরিক্ত করিতে হইবে সেটুকুতে সে যেন কিছু অপমান বোধ করিত। চারু অমলের পক্ষপাতী ছিল বলিয়া মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিত না, কিন্তু অমলকে অবহেলা করিবার চেষ্টা তাহার সর্ব্বদাই

ছিল। সুযোগ পাইলেই দাসদাসীদের কাছেও গোপনে অমলের নামে খোঁচা দিতে সে ছাড়িত না। তাহারাও যোগ দিত।

কিন্তু অমলের যখন অভ্যুত্থান আরম্ভ হইল তখন মন্দার একটু চমক লাগিল। সে অমল এখন আর নাই। এখন তাহার সঙ্কুচিত নম্রতা একেবারে ঘুচিয়া গেছে, অপরকে অবজ্ঞা করিবার অধিকার এখন যেন তাহারই হাতে। সংসারে প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া যে পুরুষ অসংশয়ে অকুণ্ঠিতভাবে নিজেকে প্রচার করিতে পারে, যে লোক একটা নিশ্চিত অধিকার লাভ করিয়াছে, সেই সমর্থ পুরুষ সহজেই নারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে। মন্দা যখন দেখিল অমল চারিদিক হইতেই শ্রদ্ধা পাইতেছে তখন সেও অমলের উচ্চ মস্তকের দিকে মুখ তুলিয়া চাহিল। অমলের তরুণ মুখে নবগৌরবের গর্ব্বোজ্জ্বলদীপ্তি মন্দার চক্ষে মোহ আনিল, সে যেন অমলকে নূতন করিয়া দেখিল।

এখন আর পান চুরি করিবার প্রয়োজন রহিল না। অমলের খ্যাতিলাভে চারুর এই আর একটা লোকসান; তাহাদের ষড়যন্ত্রের কৌতুকবন্ধনটুকু বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল, পান এখন অমলের কাছে আপনি আসিয়া পড়ে, কোন অভাব হয় না।

তাহা ছাড়া, তাহাদের দুই জনে গঠিত দল হইতে মন্দাকিনীকে নানা কৌশলে দূরে রাখিয়া তাহারা যে আমোদ বোধ করিত তাহাও নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে। মন্দাকে তফাতে রাখা কঠিন হইল। অমল যে মনে করিবে চারুই তাহার একমাত্র বন্ধু ও সমজদার ইহা মন্দার ভাল লাগিত না। পূর্ব্বকৃত অবহেলা

সে সুদে আসলে শোধ দিতে উদ্যত। সুতরাং অমলে চারুতে মুখামুখি হইলেই মন্দা কোন ছলে মাঝখানে আসিয়া ছায়া ফেলিয়া গ্রহণ লাগাইয়া দিত। হঠাৎ মন্দার এই পরিবর্ত্তন লইয়া চারু তাহার অসাক্ষাতে যে পরিহাস করিবে সে অবসর টুকু পাওয়া শক্ত হইল।

মন্দার এই অনাহূত প্রবেশ চারুর কাছে যত বিরক্তিকর বোধ হইত অমলের কাছে ততটা বোধ হয় নাই একথা বলা বাহুল্য। বিমুখ রমণীর মন ক্রমশ তাহার দিকে যে ফিরিতেছে ইহাতে ভিতরে ভিতরে সে একটা আগ্রহ অনুভব করিতেছিল।

কিন্তু চারু যখন দূর হইতে মন্দাকে দেখিয়া তীব্র মৃদুস্বরে বলিত, "ঐ আস্‌চেন"—তখন অমলও বলিত, "তাইত, জ্বালালে দেখ্‌চি!" পৃথিবীর অন্য সকল সঙ্গের প্রতি অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করা তাহাদের একটা দস্তুর ছিল, অমল সে হঠাৎ কি বলিয়া ছাড়ে! অবশেষে মন্দাকিনী নিকটবর্ত্তিনী হইলে অমল যেন বলপূর্ব্বক সৌজন্য করিয়া বলিত, "তার পরে, মন্দা বৌঠান, আজ তোমার পানের বাটায় বাটপাড়ির লক্ষণ কিছু দেখ্‌লে!"

মন্দা। যখন চাইলেই পাও, ভাই, তখন চুরি করবার দরকার।

অমল। চেয়ে পাওয়ার চেয়ে তাতে সুখ বেশী।

মন্দা। তোমরা কি পড়্‌ছিলে পড় না ভাই! থাম্‌লে কেন? পড়া শুন্‌তে আমার বেশ লাগে!

ইতিপূর্ব্বে পাঠানুরাগের জন্য খ্যাতি অর্জ্জন করিতে মন্দার কিছুমাত্র চেষ্টা দেখা যায় নাই, কিন্তু "কালোহি বলবত্তরঃ"।

চারুর ইচ্ছা নহে অরসিকা মন্দার কাছে অমল পড়ে, অমলের ইচ্ছা মন্দাও তাহার লেখা শোনে।

চারু। অমল কমলাকান্তের দপ্তরের সমালোচনা লিখে এনেচে, সে কি তোমার—

মন্দা। হলেমই বা মূর্খ—তবু, শুন্‌লে কি একেবারেই বুঝ্‌তে পারিনে?

তখন আর একদিনের কথা অমলের মনে পড়িল। চারুতে মন্দাতে বিন্তি খেলিতেছে, সে তাহার লেখা হাতে করিয়া খেলা সভায় প্রবেশ করিল। চারুকে শুনাইবার জন্য সে অধীর, খেলা ভাঙ্গিতেছে না দেখিয়া সে বিরক্ত। অবেশেষে বলিয়া উঠিল, তোমরা তবে খেল বৌঠান, আমি অখিল বাবুকে লেখাটা শুনিয়ে আসিগে!

চারু অমলের চাদর চাপিয়া কহিল, আঃ বোস না, যাও কোথায়?—বলিয়া তাড়াতাড়ি হারিয়া খেলা শেষ করিয়া দিল।

মন্দা বলিল—তোমাদের পড়া আরম্ভ হবে বুঝি? তবে আমি উঠি!

চারু ভদ্রতা করিয়া কহিল, কেন, তুমিও শোন না ভাই!

মন্দা। না ভাই, আমি তোমাদের ওসব ছাই পাঁশ কিছুই বুঝিনে—আমার কেবল ঘুম পায়! বলিয়া সে অকালে খেলাভঙ্গে উভয়ের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেল।

সেই মন্দা আজ কমলাকান্তের সমালোচনা শুনিবার জন্য উৎসুক। অমল কহিল, তা বেশত, মন্দা বৌঠান, তুমি শুন্‌বে

সে ত আমার সৌভাগ্য!—বলিয়া পাত উল্টাইয়া আবার গোড়া হইতে পড়িবার উপক্রম করিল, লেখার আরম্ভে সে অনেকটা পরিমাণ রস ছড়াইয়াছিল, সেটুকু বাদ দিয়া পড়িতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না।

চারু তাড়াতাড়ি বলিল, ঠাকুরপো, তুমি যে বলেছিলে জাহ্নবী লাইব্রেরী থেকে পুরোণো মাসিক পত্র কতকগুলো এনে দেবে!

অমল। সে ত আজ নয়।

চারু। আজই ত। বেশ! ভুলে গেছ বুঝি!

অমল। ভুলব কেন? তুমি যে বলেছিলে—

চারু। আচ্ছা বেশ, এনো না! তোমরা পড়—আমি যাই, পরেশকে লাইব্রেরীতে পাঠিয়ে দিইগে!—বলিয়া চারু উঠিয়া পড়িল!

অমল বিপদ আশঙ্কা করিল। মন্দা মনে মনে বুঝিল এবং মুহূর্ত্তের মধ্যেই চারুর প্রতি তাহার মন বিষাক্ত হইয়া উঠিল। চারু চলিয়া গেলে অমল যখন উঠিবে কি না ভাবিয়া ইতস্তত করিতেছিল মন্দা ঈষৎ হাসিয়া কহিল, যাও ভাই, মান ভাঙ্গাওগে—চারু রাগ করেছে। আমাকে লেখা শোনালে মুস্কিলে পড়বে!

ইহার পরে অমলের পক্ষে ওঠা অত্যন্ত কঠিন। অমল চারুর প্রতি কিছু রুষ্ট হইয়া কহিল—কেন, মুস্কিল কিসের?—বলিয়া লেখা বিস্তৃত করিয়া ধরিয়া পড়িবার উপক্রম করিল।

মন্দা দুই হাতে তাহার লেখা আচ্ছাদন করিয়া বলিল—কাজ নেই ভাই পোড়ো না!

বলিয়া, যেন অশ্রু সম্বরণ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

চারু নিমন্ত্রণে গিয়াছিল! মন্দা ঘরে বসিয়া চুলের দড়ি বিনাইতেছিল। "বৌঠান" বলিয়া অমল ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। মন্দা নিশ্চয় জানিত যে, চারুর নিমন্ত্রণ যাওয়ার সংবাদ অমলের অগোচর ছিল না, হাসিয়া কহিল, আহা অমল বাবু, কাকে খুঁজতে এসে কার দেখা পেলে? এম্‌নি তোমার অদৃষ্ট! অমল কহিল—বাঁ দিকের বিচালিও যেমন ডান দিকের বিচালিও ঠিক তেমনি, গর্দ্দভের পক্ষে দুই সমান আদরের!—বলিয়া সেই খানে বসিয়া গেল।

অমল। মন্দা বৌঠান, তোমাদের দেশের গল্প বল আমি শুনি।

লেখার বিষয় সংগ্রহ করিবার জন্য অমল সকলের সব কথা কৌতূহলের সহিত শুনিত। সেই কারণে মন্দাকে এখন সে আর পূর্ব্বের ন্যায় সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিত না! মন্দার মনস্তত্ত্ব মন্দার ইতিহাস এখন তাহার কাছে ঔৎসুক্যজনক। কোথায় তাহার জন্মভূমি, তাহাদের গ্রামটি কিরূপ, ছেলে বেলা কেমন করিয়া কাটিত, বিবাহ হইল কবে, ইত্যাদি সকল কথাই সে খুঁটিয়া খুঁটিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। মন্দার ক্ষুদ্র জীবনবৃত্তান্ত সম্বন্ধে এত কৌতূহল কেহ কখনও প্রকাশ করে নাই। মন্দা আনন্দে নিজের কথা বকিয়া যাইতে লাগিল, মাঝে মাঝে কহিল কি বক্‌চি তার ঠিক নাই!

অমল উৎসাহ দিয়া কহিল—না, আমার বেশ লাগ্‌চে বলে যাও! মন্দার বাপের এক কাণা গোমস্তা ছিল, সে তাহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করিয়া এক একদিন অভিমানে অনশন-ব্রত গ্রহণ করিত, অবশেষে ক্ষুধার জ্বালায় মন্দাদের বাড়িতে কিরূপে গোপনে আহার করিতে আসিত এবং দৈবাৎ এক দিন স্ত্রীর কাছে কিরূপে ধরা পড়িয়াছিল সেই গল্প যখন হইতেছে এবং অমল মনোযোগের সহিত শুনিতে শুনিতে সকৌতুকে হাসিতেছে এমন সময় চারু ঘরের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল।

গল্পের সূত্র ছিন্ন হইয়া গেল। তাহার আগমনে হঠাৎ একটা জমাট সভা ভাঙ্গিয়া গেল, চারু তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারিল।

অমল জিজ্ঞাসা করিল, বৌঠান এত সকাল সকাল ফিরে এলে যে!

চারু কহিল—তাইত দেখ্‌ছি! বেশী সকাল সকালই ফিরেছি—বলিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল।

অমল কহিল, ভালই করেচ, বাঁচিয়েচ আমাকে। আমি ভাবছিলুম, কখন্ না জানি ফিরবে! মন্মথ দত্তর "সন্ধ্যার পাখী" বলে নূতন বইটা তোমাকে পড়ে শোনাব বলে এনেছি!

চারু। এখন থাক্ আমার কাজ আছে!

অমল। কাজ থাকে ত আমাকে হুকুম কর আমি করে দিচ্চি।

চারু জানিত অমল আজ বই কিনিয়া আনিয়া তাহাকে শুনাইতে আসিবে; চারু ঈর্ষা জন্মাইবার জন্য, মন্মথর লেখার

প্রচুর প্রশংসা করিবে এবং অমল সেই বইটাকে বিকৃত করিয়া পড়িয়া বিদ্রূপ করিতে থাকিবে। এই সকল কল্পনা করিয়াই অধৈর্য্যবশত সে অকালে নিমন্ত্রণ গৃহের সমস্ত অনুনয় বিনয় লঙ্ঘন করিয়া অসুখের ছুতায় গৃহে চলিয়া আসিতেছে। এখন বার বার মনে করিতেছে, সেখানে ছিলাম ভাল, চলিয়া আসা অন্যায় হইয়াছে!

মন্দাও ত কম বেহায়া নয়! একলা অমলের সহিত এক ঘরে বসিয়া দাঁত বাহির করিয়া হাসিতেছে! লোকে দেখিলে কি বলিবে? কিন্তু মন্দাকে একথা লইয়া ভর্ৎসনা করা চারুর পক্ষে বড় কঠিন। কারণ মন্দা যদি তাহারই দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া জবাব দেয়! কিন্তু সে হইল এক, আর এ হইল এক! সে অমলকে রচনায় উৎসাহ দেয়, অমলের সঙ্গে সাহিত্যালোচনা করে, কিন্তু মন্দার ত সে উদ্দেশ্য আদবেই নয়। মন্দা নিঃসন্দেহই সরল যুবককে মুগ্ধ করিবার জন্য জাল বিস্তার করিতেছে। এই ভয়ঙ্কর বিপদ হইতে বেচারা অমলকে রক্ষা করা তাহারই কর্ত্তব্য। অমলকে এই মায়াবিনীর মৎলব কেমন করিয়া বুঝাইবে? বুঝাইলে তাহার প্রলোভনের নিবৃত্তি না হইয়া যদি উল্টা হয়।

বেচরা দাদা। তিনি তাঁহার স্বামীর কাগজ লইয়া দিন রাত খাটিয়া মরিতেছেন, আর মন্দা কিনা কোণটিতে বসিয়া অমলকে ভুলাইবার জন্য আয়োজন করিতেছে। দাদা বেশ নিশ্চিন্ত আছেন। মন্দার উপরে তাঁর অগাধ বিশ্বাস। এ সকল ব্যাপার চারু কি করিয়া স্বচক্ষে দেখিয়া স্থির থাকিবে। ভারি অন্যায়।

কিন্তু আগে অমল বেশ ছিল—যে দিন হইতে লিখিতে আরম্ভ করিয়া নাম করিয়াছে সেই দিন হইতেই যত অনর্থ দেখা যাইতেছে। চারুই ত তাহার লেখার গোড়া। কুক্ষণে সে অমলকে রচনায় উৎসাহ দিয়াছিল। এখন কি আর অমলের পরে তাহার পূর্ব্বের মত জোর খাটিবে? এখন অমল পাঁচ জনের আদরের স্বাদ পাইয়াছে অতএব এক জনকে বাদ দিলে তাহার আসে যায় না।

চারু স্পষ্টই বুঝিল, তাহার হাত হইতে গিয়া পাঁচজনের হাতে পড়িয়া অমলের সমূহ বিপদ! চারুকে অমল এখন ঠিক সমকক্ষ বলিয়া জানে না—চারুকে সে ছাড়াইয়া গেছে। এখন সে লেখক, চারু পাঠক। ইহার প্রতিকার করিতেই হইবে।

আহা, সরল অমল, মায়াবিনী মন্দা, বেচারা দাদা!

—০—

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সে দিন আষাঢ়ের নবীন মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন। ঘরের মধ্যে অন্ধকার ঘনীভূত হইয়াছে বলিয়া চারু তাহার খোলা জানালার কাছে একান্ত ঝুঁকিয়া পড়িয়া কি একটা লিখিতেছে।

অমল কখন্ নিঃশব্দ পদে পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল তাহা সে জানিতে পারিল না। বাদ্‌লার স্নিগ্ধ আলোকে চারু লিখিয়া গেল অমল পড়িতে লাগিল। পাশে অমলেরই দুই একটা ছাপানো লেখা খোলা পড়িয়া আছে; চারুর কাছে সেই গুলিই রচনার একমাত্র আদর্শ।

"তবে যে বল তুমি লিখ্‌তে পার না!" হঠাৎ অমলের কণ্ঠ শুনিয়া চারু অত্যন্ত চমকিয়া উঠিল, তাড়াতাড়ি খাতা লুকাইয়া ফেলিল—কহিল, তোমার ভারি অন্যায়।

অমল। কি অন্যায় করেছি?

চারু। লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছিলে কেন?

অমল। প্রকাশ্যে দেখ্‌তে পাইনে বলে।

চারু তাহার লেখা ছিঁড়িয়া ফেলিবার উপক্রম করিল। অমল ফস করিয়া তাহার হাত হইতে খাতা কাড়িয়া লইল। চারু কহিল, তুমি যদি পড় তোমার সঙ্গে জন্মের মত আড়ি।

অমল। যদি পড়তে বারণ কর তা'হলে তোমার সঙ্গে জন্মের মত আড়ি।

চারু। আমার মাথা খাও ঠাকুরপো, পোড়ো না।

অবশেষে চারুকেই হার মানিতে হইল। কারণ অমলকে তাহার লেখা দেখাইবার জন্য মন ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল, অথচ দেখাইবার বেলায় যে তাহার এত লজ্জা করিবে তাহা সে ভাবে নাই! অমল যখন অনেক অনুনয় করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল তখন লজ্জায় চারুর হাত পা বরফের মত হিম হইয়া গেল। কহিল, আমি পান নিয়ে আসিগে। বলিয়া তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে পান সাজিবার উপলক্ষ করিয়া চলিয়া গেল।

অমল পড়া সাঙ্গ করিয়া চারুকে গিয়া কহিল, চমৎকার হয়েছে।

চারু পানে খয়ের দিতে ভুলিয়া কহিল, যাও, আর ঠাট্টা কর্‌তে হবে না! দাও, আমার খাতা দাও!

অমল কহিল, খাতা এখন দেব না, লেখাটা কপি করে নিয়ে কাগজে পাঠাব!

চারু। হাঁ, কাগজে পাঠাবে বৈকি! সে হবে না।

চারু ভারি গোলমাল করিতে লাগিল। অমলও কিছুতে ছাড়িল না। সে যখন বার বার শপথ করিয়া কহিল কাগজে দিবার উপযুক্ত হইয়াছে তখন চারু যেন নিতান্ত হতাশ হইয়া কহিল, তোমার সঙ্গে ত পেরে ওঠ্‌বার যো নেই! যেটা ধরবে সে আর কিছুতেই ছাড়বে না!

অমল কহিল, দাদাকে একবার দেখাতে হবে।

শুনিয়া চারু পান সাজা ফেলিয়া আসন হইতে বেগে উঠিয়া পড়িল, খাতা কাড়িবার চেষ্টা করিয়া কহিল,—না, তাঁকে শোনাতে পাবে না! তাঁকে যদি আমার লেখার কথা বল তা'হলে আমি আর এক অক্ষর লিখব না।

অমল। বৌঠান তুমি ভারি ভুল বুঝ্‌চ! দাদা মুখে যাই বলুন তোমার লেখা দেখ্‌লে খুব খুসি হবেন!

চারু। তা হোক্‌, আমার খুসিতে কাজ নেই!

চারু প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছিল সে লিখিবে অমলকে আশ্চর্য্য করিয়া দিবে, মন্দার সহিত তাহার যে অনেক প্রভেদ এ কথা প্রমাণ না করিয়া সে ছাড়িবে না। এ কয় দিন বিস্তর লিখিয়া সে ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে। যাহা লিখিতে যায় তাহা নিতান্ত অমলের লেখার মত হইয়া উঠে—মিলাইতে গিয়া দেখে এক একটা অংশ অমলের রচনা হইতে প্রায় অবিকল উদ্ধৃত হইয়া আসিয়াছে।

সেই গুলিই ভাল, বাকিগুলা কাঁচা। দেখিলে অমল নিশ্চয়ই মনে মনে হাসিবে, ইহাই কল্পনা করিয়া চারু সে সকল লেখা কুটি কুটি করিয়া ছিঁড়িয়া পুকুরের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছে, পাছে তাহার একটা খণ্ডও দৈবাৎ অমলের হাতে আসিয়া পড়ে।

প্রথমে সে লিখিয়াছিল, "শ্রাবণের মেঘ"। মনে করিয়াছিল, ভাবাশ্রুজলে অভিষিক্ত খুব একটা নূতন লেখা লিখিয়াছি। হঠাৎ চেতনা পাইয়া দেখিল জিনিষটা অমলের "আষাঢ়ের চাঁদ"এর এপিঠ ওপিঠ মাত্র। অমল লিখিয়াছেন, ভাই চাঁদ তুমি মেঘের মধ্যে চোরের মত লুকাইয়া বেড়াইতেছ কেন—চারু লিখিয়াছিল, সখী কাদম্বিনী, হঠাৎ কোথা হইতে আসিয়া তোমার নীলাঞ্চলের তলে চাঁদকে চুরি করিয়া পলায়ন করিতেছ, ইত্যাদি।

কোন মতেই অমলের গণ্ডি এড়াইতে না পারিয়া অবশেষে চারু রচনার বিষয় পরিবর্ত্তন করিল। চাঁদ, মেঘ, শেফালি, বউ-কথা-কও এ সমস্ত ছাড়িয়া সে "কালীতলা" বলিয়া একটা লেখা লিখিল। তাহাদের গ্রামে ছায়ায় অন্ধকার পুকুরটির ধারে কালীর মন্দির ছিল—সেই মন্দিরটি লইয়া তাহার বাল্যকালের কল্পনা ভয় ঔৎসুক্য, সেই সম্বন্ধে তাহার বিচিত্র স্মৃতি, সেই জাগ্রত ঠাকুরাণীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে গ্রামে চিরপ্রচলিত প্রাচীন গল্প—এই সমস্ত লইয়া সে একটি লেখা লিখিল। তাহার আরম্ভ ভাগ অমলের লেখার ছাঁদে কাব্যাড়ম্বরপূর্ণ হইয়াছিল, কিন্তু খানিকটা অগ্রসর হইতেই তাহার লেখা সহজেই সরল এবং পল্লীগ্রামের ভাষা, ভঙ্গী, আভাসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

এই লেখাটা অমল কাড়িয়া লইয়া পড়িল। তাহার মনে হইল গোড়ার দিকটা বেশ সরস হইয়াছে, কিন্তু কবিত্ব শেষ পর্য্যন্ত রক্ষিত হয় নাই। যাহা হউক প্রথম রচনার পক্ষে লেখিকার উদ্যম প্রশংসনীয়।

চারু কহিল, ঠাকুরপো, এস আমরা একটা মাসিক কাগজ বের করি। কি বল!

অমল। অনেকগুলি রৌপ্যচক্র না হলে সে কাগজ চলবে কি করে?

চারু। আমাদের এ কাগজে কোন খরচ নেই। ছাপা হবে না ত—হাতের অক্ষরে লিখব। তাতে তোমার আমার ছাড়া আর কারো লেখা বেরবে না, কাউকে পড়তে দেওয়া হবে না। কেবল দু'কপি করে বের হবে—একটি তোমার জন্যে একটি আমার জন্যে।

কিছু দিন পূর্ব্বে হইলে অমল এ প্রস্তাবে মাতিয়া উঠিত, এখন গোপনতার উৎসাহ তাহার চলিয়া গেছে। এখন দশজনকে উদ্দেশ না করিয়া কোন রচনায় সে সুখ পায় না। তবু সাবেক কালের ঠাট বজায় রাখিবার জন্য উৎসাহ প্রকাশ করিল। কহিল, সে বেশ মজা হবে!

চারু কহিল, কিন্তু প্রতিজ্ঞা করতে হবে, আমাদের কাগজ ছাড়া আর কোথাও তুমি লেখা বের করতে পারবে না!

অমল। তা'হলে সম্পাদকরা যে মেরেই ফেলবে।

চারু। আর আমার হাতে বুঝি মারের অস্ত্র নেই?

সেই রূপ কথা হইল। দুই সম্পাদক, দুই লেখক এবং দুই পাঠকে মিলিয়া কমিটি বসিল। অমল কহিল, কাগজের নাম দেওয়া যাক চারুপাঠ। চারু কহিল, না, এর নাম অমলা।

এই নূতন বন্দোবস্তে চারু মাঝের কয় দিনের দুঃখ বিরক্তি ভুলিয়া গেল। তাহাদের মাসিক পত্রটিতে ত মন্দার প্রবেশ করিবার কোন পথ নাই এবং বাহিরের লোকেরও প্রবেশের দ্বার রুদ্ধ।

—০—

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ভূপতি একদিন আসিয়া কহিল, চারু তুমি যে লেখিকা হয়ে উঠবে পূর্ব্বে এমন ত কোন কথা ছিল না!

চারু চমকিয়া লাল হইয়া উঠিয়া কহিল, আমি লেখিকা! কে বল্লে তোমাকে! কখ্খনো না!

ভূপতি। বামাল সুদ্ধ গ্রেফ্তার। প্রমাণ হাতে হাতে! বলিয়া ভূপতি একখণ্ড সরোরুহ বাহির করিল। চারু দেখিল যে সকল লেখা সে তাহাদের গুপ্ত সম্পত্তি মনে করিয়া নিজেদের হস্তলিখিত মাসিক পত্রে সঞ্চয় করিয়া রাখিতেছিল তাহাই লেখক লেখিকার নামসুদ্ধ সরোরুহে প্রকাশ হইয়াছে।

কে যেন তাহার খাঁচার বড় সাধের পোষা পাখীগুলিকে দ্বার খুলিয়া উড়াইয়া দিয়াছে এমনি তাহার মনে হইল। ভূপতির নিকট ধরা পড়িবার লজ্জা ভুলিয়া গিয়া বিশ্বাসঘাতী অমলের উপর তাহার মনে মনে অত্যন্ত রাগ হইতে লাগিল।

"আর এইটে দেখ দেখি!" বলিয়া বিশ্ববন্ধু খবরের কাগজ খুলিয়া ভূপতি চারুর সম্মুখে ধরিল। তাহাতে "হাল্ বাঙ্গালা লেখার ঢং" বলিয়া একটা প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে।

চারু হাত দিয়া ঠেলিয়া দিয়া কহিল, এ পড়ে আমি কি করব! তখন অমলের উপর অভিমানে আর কোন দিকে সে মন দিতে পারিতেছিল না! ভূপতি জোর করিয়া কহিল, একবার পড়ে' দেখই না!

চারু অগত্যা চোখ বুলাইয়া গেল। আধুনিক কোন কোন লেখকশ্রেণীর ভাবাড়ম্বরে পূর্ণ গদ্য লেখাকে গালি দিয়া লেখক খুব কড়া প্রবন্ধ লিখিয়াছে। তাহার মধ্যে অমল এবং মন্মথ দত্তর লেখার ধারাকে সমালোচক তীব্র উপহাস করিয়াছে—এবং তাহারই সঙ্গে তুলনা করিয়া নবীনা লেখিকা শ্রীমতী চারুবালার ভাষার অকৃত্রিম সরলতা, অনায়াস সরসতা এবং চিত্ররচনা-নৈপুণ্যের বহুল প্রশংসা করিয়াছে। লিখিয়াছে এইরূপ রচনা-প্রণালীর অনুকরণ করিয়া সফলতা লাভ করিলে তবেই অমল কোম্পানির নিস্তার, নচেৎ তাহারা সম্পূর্ণ ফেল করিবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই!

ভূপতি হাসিয়া কহিল—এ'কেই বলে গুরুমারা বিদ্যে!

চারু তাহার লেখার এই প্রশংসায় এক একবার খুসি হইতে গিয়া তৎক্ষণাৎ পীড়িত হইতে লাগিল। তাহার মন যেন কোন মতেই খুসি হইতে চাহিল না! প্রশংসার লোভনীয় সুধাপাত্র মুখের কাছ পর্য্যন্ত আসিতেই ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতে লাগিল।

সে বুঝিতে পারিল, তাহার লেখা কাগজে ছাপাইয়া অমল হঠাৎ তাহাকে বিস্মিত করিয়া দিবার সঙ্কল্প করিয়াছিল। অবশেষে ছাপা হইলে পর স্থির করিয়াছিল কোন একটা কাগজে প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা বাহির হইলে দুইটা এক সঙ্গে দেখাইয়া চারুর রোষ-শান্তি ও উৎসাহ বিধান করিবে। যখন প্রশংসা বাহির হইল তখন অমল কেন আগ্রহের সহিত তাহাকে দেখাইতে আসিল না? এ সমালোচনায় অমল আঘাত পাইয়াছে এবং চারুকে ইহা দেখাইতে চাহে না বলিয়াই এ কাগজগুলি সে একেবারে গোপন করিয়া গেছে। চারু আরামের জন্য অতি নিভৃতে যে একটি ক্ষুদ্র সাহিত্যনীড় রচনা করিতেছিল হঠাৎ প্রশংসা-শিলাবৃষ্টির একটা বড় রকমের শিলা আসিয়া সেটাকে একেবারে স্খলিত করিবার জো করিল। চারুর ইহা একেবারেই ভাল লাগিল না।

ভূপতি চলিয়া গেলে চারু তাহার শোবার ঘরের খাটে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল—সম্মুখে সরোরুহ এবং বিশ্ববন্ধু খোলা পড়িয়া আছে।

খাতা হাতে অমল চারুকে সহসা চকিত করিয়া দিবার জন্য পশ্চাৎ হইতে নিঃশব্দ পদে প্রবেশ করিল। কাছে আসিয়া দেখিল, বিশ্ববন্ধুর সমালোচনা খুলিয়া চারু নিমগ্ন চিত্তে বসিয়া আছে!

পুনরায় নিঃশব্দ পদে অমল বাহির হইয়া গেল। "আমাকে গালি দিয়া চারুর লেখাকে প্রশংসা করিয়াছে বলিয়া আনন্দে চারুর আর চৈতন্য নাই!" মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার সমস্ত চিত্ত যেন তিক্তস্বাদ হইয়া উঠিল। চারু যে মূর্খের সমালোচনা পড়িয়া

নিজেকে আপন গুরুর চেয়ে মস্ত মনে করিয়াছে ইহা নিশ্চয় স্থির করিয়া অমল চারুর উপর ভারি রাগ করিল! চারুর উচিত ছিল কাগজখানা টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া আগুনে ছাই করিয়া পুড়াইয়া ফেলা!

চারুর উপর রাগ করিয়া অমল মন্দার ঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়া সশব্দে ডাকিল—মন্দা-বৌঠান!

মন্দা। এস ভাই এস! না চাইতেই যে দেখা পেলুম! আজ আমার কি ভাগ্যি!

অমল। আমার নূতন লেখা তুই একটা শুন্‌বে?

মন্দা। কত দিন থেকে শোনাব শোনাব করে আশা দিয়ে রেখেছ কিন্তু শোনাও না ত! কাজ নেই ভাই, আবার কে কোন্ দিক থেকে রাগ করে বস্‌লে তুমিই বিপদে পড়বে—আমার কি!

অমল কিছু তীব্রস্বরে কহিল—রাগ করবেন কে! কেনই বা রাগ করবেন! আচ্ছা সে দেখা যাবে, তুমি এখন শোনই ত!

মন্দা যেন অত্যন্ত আগ্রহে তাড়াতাড়ি সংযত হইয়া বসিল। অমল সুর করিয়া সমারোহের সহিত পড়িতে আরম্ভ করিল।

অমলের লেখা মন্দার পক্ষে নিতান্তই বিদেশী, তাহার মধ্যে কোথাও সে কোন কিনারা দেখিতে পায় না। সেই জন্যই সমস্ত মুখে আনন্দের হাসি আনিয়া অতিরিক্ত ব্যগ্রতার ভাবে সে শুনিতে লাগিল। উৎসাহে অমলের কণ্ঠ উত্তরোত্তর উচ্চ হইয়া উঠিল।

সে পড়িতেছিল—অভিমন্যু যেমন গর্ভবাসকালে কেবল ব্যূহে প্রবেশ করিতে শিখিয়াছিল, ব্যূহ হইতে নির্গমন শেখে নাই—নদীর স্রোত সেইরূপ গিরিদরীর পাষাণ জঠরের মধ্যে থাকিয়া কেবল সম্মুখেই চলিতে শিখিয়াছিল পশ্চাতে ফিরিতে শেখে নাই! হায় নদীর স্রোত, হায় যৌবন, হায় কাল, হায় সংসার, তোমরা কেবল সম্মুখেই চলিতে পার—যে পথে স্মৃতির স্বর্ণমণ্ডিত উপলখণ্ড ছড়াইয়া আস, সে পথে আর কোনদিন ফিরিয়া যাও না! মানুষের মনই কেবল পশ্চাতের দিকে চায়, অনন্ত জগৎসংসার সেদিকে ফিরিয়াও তাকায় না!

এমন সময় মন্দার দ্বারের কাছে একটি ছায়া পড়িল, সে ছায়া মন্দা দেখিতে পাইল। কিন্তু যেন দেখে নাই এইরূপ ভাণ করিয়া অনিমেষ দৃষ্টিতে অমলের মুখের দিকে চাহিয়া নিবিড় মনোযোগের সহিত পড়া শুনিতে লাগিল।

ছায়া তৎক্ষণাৎ সরিয়া গেল।

চারু অপেক্ষা করিয়াছিল অমল আসিলেই তাহার সম্মুখে বিশ্ববন্ধু কাগজটাকে যথোচিত লাঞ্ছিত করিবে, এবং প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিয়া তাহাদের লেখা মাসিক পত্রে বাহির করিয়াছে বলিয়া অমলকেও ভর্ৎসনা করিবে।

অমলের আসিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তবু তাহার দেখা নাই। চারু একটা লেখা ঠিক করিয়া রাখিয়াছে; অমলকে শুনাইবার ইচ্ছা; তাহাও পড়িয়া আছে!

এমন সময়ে কোথা হইতে অমলের কণ্ঠস্বর শুনা যায়! এ যেন

মন্দার ঘরে! শরবিদ্ধের মত সে উঠিয়া পড়িল। পায়ের শব্দ না করিয়া সে দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। অমল যে লেখা মন্দাকে শুনাইতেছে এখনো চারু তাহা শোনে নাই। অমল পড়িতেছিল—মানুষের মনই কেবল পশ্চাতের দিকে চায়—অনন্ত জগৎসংসার সে দিকে ফিরিয়াও তাকায় না!

চারু যেমন নিঃশব্দে আসিয়াছিল, তেমন নিঃশব্দে আর ফিরিয়া যাইতে পারিল না। আজ পরে পরে দুই তিনটা আঘাতে তাহাকে একেবারে ধৈর্য্যচ্যুত করিয়া দিল। মন্দা যে এক বর্ণও বুঝিতেছে না এবং অমল যে নিতান্ত নির্ব্বোধ মূঢ়ের মত তাহাকে পড়িয়া শুনাইয়া তৃপ্তিলাভ করিতেছে এ কথা তাহার চীৎকার করিয়া বলিয়া আসিতে ইচ্ছা করিল। কিন্তু না বলিয়া সক্রোধে পদশব্দে তাহা প্রচার করিয়া আসিল। শয়ন-গৃহে প্রবেশ করিয়া চারু দ্বার সশব্দে বন্ধ করিল।

অমল ক্ষণকালের জন্য পড়ায় ক্ষান্ত দিল। মন্দা হাসিয়া চারুর উদ্দেশে ইঙ্গিত করিল। অমল মনে মনে কহিল, বৌঠানের এ কি দৌরাত্ম্য! তিনি কি ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন আমি তাঁহারই ক্রীতদাস! তাঁহাকে ছাড়া আর কাহাকেও পড়া শুনাইতেও পারিব না! এ যে ভয়ানক জুলুম! এই ভাবিয়া সে আরো উচ্চৈঃস্বরে মন্দাকে পড়িয়া শুনাইতে লাগিল।

পড়া হইয়া গেলে চারুর ঘরের সম্মুখ দিয়া সে বাহিরে চলিয়া গেল। একবার চাহিয়া দেখিল ঘরের দ্বার রুদ্ধ।

চারু পদশব্দে বুঝিল, অমল তাহার ঘরের সম্মুখ দিয়া চলিয়া

গেল—একবারো থামিল না। রাগে ক্ষোভে তাহার কান্না আসিল না। নিজের নূতন-লেখা খাতা খানি বাহির করিয়া তাহার প্রত্যেক পাতা বসিয়া বসিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া স্তূপাকার করিল। হায় কি কুক্ষণেই এই সমস্ত লেখালেখি আরম্ভ হইয়াছিল!

—০—

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যার সময় বারান্দার টব হইতে জুঁইফুলের গন্ধ আসিতেছিল। ছিন্ন মেঘের ভিতর দিয়া স্নিগ্ধ আকাশে তারা দেখা যাইতেছিল। আজ চারু চুল বাঁধে নাই, কাপড় ছাড়ে নাই। জান্‌লার কাছে অন্ধকারে বসিয়া আছে, মৃদু বাতাসে আস্তে আস্তে তাহার খোলা চুল উড়াইতেছে, এবং তাহার চোখ দিয়া এমন ঝর্‌ঝর্ করিয়া কেন জল বহিয়া যাইতেছে তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিতেছে না।

এমন সময় ভূপতি ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার মুখ অত্যন্ত ম্লান, হৃদয় ভারাক্রান্ত। ভূপতির আসিবার সময় এখন নহে। কাগজের জন্য লিখিয়া প্রুফ দেখিয়া অন্তঃপুরে আসিতে প্রায়ই তাহার বিলম্ব হয়। আজ সন্ধ্যার পরেই যেন কোন সান্ত্বনা-প্রত্যাশায় চারুর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল।

ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছিল না। খোলা জানালার ক্ষীণ আলোকে ভূপতি চারুকে বাতায়নের কাছে অস্পষ্ট দেখিতে পাইল; ধীরে ধীরে পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। পদশব্দ শুনিতে

পাইয়াও চারু মুখ ফিরাইল না—মূর্ত্তিটির মত স্থির হইয়া কঠিন হইয়া বসিয়া রহিল।

ভূপতি কিছু আশ্চর্য্য হইয়া ডাকিল—চারু!

ভূপতির কণ্ঠস্বরে সচকিত হইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল! ভূপতি আসিয়াছে সে তাহা মনে করে নাই। ভূপতি চারুর মাথার চুলের মধ্যে আঙ্গুল বুলাইতে বুলাইতে স্নেহার্দ্র কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—অন্ধকারে তুমি যে একলাটি বসে আছ চারু? মন্দা কোথায় গেল?

চারু যেমনটি আশা করিয়াছিল আজ সমস্ত দিন তাহার কিছুই হইল না। সে নিশ্চয় স্থির করিয়াছিল অমল আসিয়া ক্ষমা চাহিবে—সে জন্য প্রস্তুত হইয়া সে প্রতীক্ষা করিতেছিল। এমন সময় ভূপতির অপ্রত্যাশিত কণ্ঠস্বরে সে যেন আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না—একেবারে কাঁদিয়া ফেলিল।

ভূপতি ব্যস্ত হইয়া ব্যথিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—চারু, কি হয়েছে চারু!

কি হইয়াছে তাহা বলা শক্ত। এমনি কি হয়েছে! বিশেষ ত কিছুই হয় নাই! অমল নিজের নূতন লেখা প্রথমে তাহাকে না শুনাইয়া মন্দাকে শুনাইয়াছে, এ কথা লইয়া ভূপতির কাছে কি নালিশ করিবে! শুনিলে কি ভূপতি হাসিবে না? এই তুচ্ছ ব্যাপারের মধ্যে গুরুতর নালিশের বিষয় যে কোন্ খানে লুকাইয়া আছে তাহা খুঁজিয়া বাহির করা চারুর পক্ষে অসাধ্য। অকারণে সে যে কেন এত অধিক কষ্ট পাইতেছে ইহাই

সম্পূর্ণ বুঝিতে না পারিয়া তাহার কষ্টের বেদনা আরও বাড়িয়া উঠিয়াছে ।

ভূপতি । বল না, চারু, তোমার কি হয়েছে ! আমি কি তোমার উপর কোন অন্যায় করেছি ? তুমি ত জানই, কাজের ঝঞ্ঝাট নিয়ে আমি কি রকম ব্যতিব্যস্ত হয়ে আছি, যদি তোমার মনে কোন আঘাত দিয়ে থাকি সে আমি ইচ্ছে করে দিইনি ।

ভূপতি এমন বিষয়ে প্রশ্ন করিতেছে যাহার একটিও জবাব দিবার নাই, সেই জন্য চারু ভিতরে ভিতরে অধীর হইয়া উঠিল, মনে হইতে লাগিল ভূপতি এখন তাহাকে নিষ্কৃতি দিয়া ছাড়িয়া গেলে সে বাঁচে ।

ভূপতি দ্বিতীয় বার কোন উত্তর না পাইয়া পুনর্ব্বার স্নেহসিক্ত স্বরে কহিল, আমি সর্ব্বদা তোমার কাছে আসতে পারিনে চারু, সে জন্যে আমি অপরাধী, কিন্তু আর হবে না ! এখন থেকে দিন-রাত কাগজ নিয়ে থাক্‌ব না ।—আমাকে তুমি যতটা চাও ততটাই পাবে ।

চারু অধীর হইয়া বলিল—সে জন্যে নয় ।

ভূপতি কহিল—তবে কি জন্যে ?—বলিয়া খাটের উপর বসিল।

চারু বিরক্তির স্বর গোপন করিতে না পারিয়া কহিল—সে এখন থাক্ রাত্রে বল্‌ব ।

ভূপতি মুহূর্ত্তকাল স্তব্ধ থাকিয়া কহিল, আচ্ছা এখন থাক ! বলিয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেল । তাহার নিজের একটা কি কথা বলিবার ছিল, সে আর বলা হইল না !

ভূপতি যে একটা ক্ষোভ পাইয়া গেল চারুর কাছে তাহা অগোচর রহিল না। মনে হইল ফিরিয়া ডাকি। কিন্তু ডাকিয়া কি কথা বলিবে? অনুতাপে তাহাকে বিদ্ধ করিল, কিন্তু কোন প্রতিকার সে খুঁজিয়া পাইল না।

রাত্রি হইল। চারু আজ সবিশেষ যত্ন করিয়া ভূপতির রাত্রের আহার সাজাইল এবং নিজে পাখা হাতে করিয়া বসিয়া রহিল।

এমন সময় শুনিতে পাইল মন্দা উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছে—ব্রজ, ব্রজ!—ব্রজ চাকর সাড়া দিলে জিজ্ঞাসা করিল—অমল বাবুর খাওয়া হয়েছে কি?—ব্রজ উত্তর করিল, হয়েছে! মন্দা কহিল, খাওয়া হয়ে গেছে অথচ পান নিয়ে গেলিনে যে!—মন্দা ব্রজকে অত্যন্ত তিরস্কার করিতে লাগিল!

এমন সময়ে ভূপতি অন্তঃপুরে আসিয়া আহারে বসিল,—চারু পাখা করিতে লাগিল।

চারু আজ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, ভূপতির সঙ্গে প্রফুল্ল স্নিগ্ধভাবে নানা কথা কহিবে! কথাবার্ত্তা আগে হইতে ভাবিয়া প্রস্তুত হইয়া বসিয়াছিল। কিন্তু মন্দার কণ্ঠস্বরে তাহার বিস্তৃত আয়োজন সমস্ত ভাঙ্গিয়া দিল, আহার কালে ভূপতিকে সে একটী কথাও বলিতে পারিল না। ভূপতিও অত্যন্ত বিমর্ষ অন্যমনস্ক হইয়াছিল। সে ভাল করিয়া খাইল না, চারু একবার কেবল জিজ্ঞাসা করিল, কিছু খাচ্চ না যে!

ভূপতি প্রতিবাদ করিয়া কহিল, কেন? কম খাইনি ত!

শয়ন-ঘরে উভয়ে একত্র হইলে ভূপতি কহিল, আজ রাত্রে তুমি কি বল্‌বে বলেছিলে!

চারু কহিল, দেখ কিছু দিন থেকে মন্দার ব্যবহার আমার ভাল বোধ হচ্চে না। ওকে এখানে রাখ্‌তে আমার আর সাহস হয় না!

ভূপতি। কেন, কি করেছে।

চারু। অমলের সঙ্গে ও এমনি ভাবে চলে, যে, সে দেখলে লজ্জা হয়! ভূপতি হাসিয়া উঠিয়া কহিল, হাঁঃ তুমি পাগল হয়েছ! অমল ছেলে মানুষ, সেদিনকার ছেলে—

চারু। তুমি ত ঘরের খবর কিছুই রাখ না, কেবল বাইরের খবর কুড়িয়ে বেড়াও! যাই হোক্ বেচারা দাদার জন্যে আমি ভাবি! তিনি কখন খেলেন না খেলেন মন্দা তার কোন খোঁজও রাখে না, অথচ অমলের পান থেকে চূণ খসে গেলেই চাকরবাকর-দের সঙ্গে বকাবকি করে অনর্থ করে।

ভূপতি। তোমরা মেয়েরা কিন্তু ভারি সন্দিগ্ধ তা বল্‌তে হয়! চারু রাগিয়া বলিল, আচ্ছা, বেশ, আমরা সন্দিগ্ধ কিন্তু বাড়িতে আমি এ সমস্ত বেহায়াপনা হতে দেব না, তা বলে রাখ্‌চি!

চারুর এই সমস্ত অমূলক আশঙ্কায় ভূপতি মনে মনে হাসিল, খুসিও হইল। গৃহ যাহাতে পবিত্র থাকে, দাম্পত্যধর্ম্মে আনুমানিক কাল্পনিক কলঙ্কও লেশমাত্র স্পর্শ না করে এজন্য সাধ্বী স্ত্রীদের যে অতিরিক্ত সতর্কতা, যে সন্দেহাকুল দৃষ্টিক্ষেপ, তাহার মধ্যে একটি মাধুর্য্য এবং মহত্ত্ব আছে।

ভূপতি শ্রদ্ধায় এবং স্নেহে চারুর ললাট চুম্বন করিয়া কহিল, এ নিয়ে আর কোন গোল করবার দরকার হবে না। উমাপদ ময়মনসিংহে প্র্যাক্‌টিস্ কর্‌তে যাচ্চে, মন্দাকেও সঙ্গে নিয়ে যাবে।

অবশেষে নিজের দুশ্চিন্তা এবং এই সকল অপ্রীতিকর আলোচনা দূর করিয়া দিবার জন্য ভূপতি টেবিল হইতে একটা খাতা তুলিয়া লইয়া কহিল—তোমার লেখা আমাকে শোনাওনা চারু!

চারু খাতা কাড়িয়া লইয়া কহিল—এ তোমার ভাল লাগবে না, তুমি ঠাট্টা কর্‌বে!

ভূপতি এই কথায় কিছু ব্যথা পাইল—কিন্তু তাহা গোপন করিয়া হাসিয়া কহিল—আচ্ছা, আমি ঠাট্টা করব না, এম্‌নি স্থির হয়ে শুন্‌ব যে তোমার ভ্রম হবে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি!

কিন্তু ভূপতি আমল পাইল না—দেখিতে দেখিতে খাতাপত্র নানা আবরণ আচ্ছাদনের মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

নবম পরিচ্ছেদ।

সকল কথা ভূপতি চারুকে বলিতে পারে নাই। উমাপদ ভূপতির কাগজখানির কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিল। চাঁদা আদায়, ছাপাখানা ও বাজারের দেনা শোধ, চাকরদের বেতন দেওয়া এ সমস্তই উমাপদের উপর ভার ছিল।

ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন কাগজওয়ালার নিকট হইতে উকিলের চিঠি পাইয়া ভূপতি আশ্চর্য্য হইয়া গেল। ভূপতির নিকট হইতে তাহাদের ২৭০০ টাকা পাওনা জানাইয়াছে। ভূপতি উমাপদকে

ডাকিয়া কহিল, এ কি ব্যাপার? এ টাকা ত আমি তোমাকে দিয়ে দিয়েছি। কাগজের দেনা চার পাঁচ শোর বেশি ত হবার কথা নয়।

উমাপদ কহিল, নিশ্চয় এরা ভুল করে করেছে।

কিন্তু আর চাপা রহিল না। কিছুকাল হইতে উমাপদ এইরূপ ফাঁকি দিয়া আসিতেছে। কেবল কাগজ সম্বন্ধে নহে, ভূপতির নামে উমাপদ বাজারে অনেক দেনা করিয়াছে। গ্রামে সে যে একটি পাকা বাড়ি নির্ম্মাণ করিতেছে তাহার মালমসলার কতক ভূপতির নামে লিখাইয়াছে, অধিকাংশই কাগজের টাকা হইতে শোধ করিয়াছে।

যখন নিতান্তই ধরা পড়িল—তখন সে রুক্ষ স্বরে কহিল—আমি ত আর নিরুদ্দেশ হচ্চিনে! কাজ করে আমি ক্রমে ক্রমে শোধ দেব—তোমার সিকি পয়সার দেনা যদি বাকি থাকে তবে আমার নাম উমাপদ নয়।

তাহার নামের ব্যত্যয়ে ভূপতির কোন সান্ত্বনা ছিল না। অর্থের ক্ষতিতে ভূপতি তত ক্ষুণ্ণ হয় নাই, কিন্তু অকস্মাৎ এই বিশ্বাসঘাতকতায় সে যেন ঘর হইতে শূন্যের মধ্যে পা ফেলিল।

সেইদিন সে অকালে অন্তঃপুরে গিয়াছিল। পৃথিবীতে একটা যে নিশ্চয় বিশ্বাসের স্থান আছে সেইটে ক্ষণকালের জন্য অনুভব করিয়া আসিতে তাহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়াছিল। চারু তখন নিজের দুঃখে সন্ধ্যাদীপ নিবাইয়া জানালার কাছে অন্ধকারে বসিয়াছিল।

উমাপদ পর দিনেই ময়মনসিংহে যাইতে প্রস্তুত। বাজারের পাওনাদাররা খবর পাইবার পূর্ব্বেই সে সরিয়া পড়িতে চায়। ভূপতি ঘৃণাপূর্ব্বক উমাপদর সহিত কথা কহিল না—ভূপতির সেই মৌনাবস্থা উমাপদ সৌভাগ্য বলিয়া জ্ঞান করিল।

অমল আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মন্দাবৌঠান, একি ব্যাপার? জিনিষপত্র গোছাবার ধুম যে?

মন্দা। আর ভাই, যেতে ত হবেই! চিরকাল কি থাক্‌ব?

অমল। যাচ্চ কোথায়?

মন্দা। দেশে।

অমল। কেন? এখানে অসুবিধাটা কি হল?

মন্দা। অসুবিধে আমার কি বল? তোমাদের পাঁচ জনের সঙ্গে ছিলুম সুখেই ছিলুম! কিন্তু অন্যের অসুবিধে হতে লাগ্‌ল যে!—বলিয়া চারুর ঘরের দিকে কটাক্ষ করিল!

অমল গম্ভীর হইয়া চুপ করিয়া রহিল। মন্দা কহিল—ছি ছি কি লজ্জা! বাবু কি মনে করলেন।

অমল একথা লইয়া আর অধিক আলোচনা করিল না! এটুকু স্থির করিল, চারু তাহাদের সম্বন্ধে দাদার কাছে এমন কথা বলিয়াছে যাহা বলিবার নহে।

অমল বাড়ি হইতে বাহির হইয়া রাস্তায় বেড়াইতে লাগিল। তাহার ইচ্ছা হইল এ বাড়িতে আর ফিরিয়া না আসে। দাদা যদি বৌঠানের কথায় বিশ্বাস করিয়া তাহাকে অপরাধী মনে করিয়া থাকেন তবে মন্দা যে পথে গিয়াছে তাহাকেও সেই পথে

যাইতে হয়। মন্দাকে বিদায় এক হিসাবে অমলের প্রতিও নির্ব্বাসনের আদেশ—সেটা কেবল মুখ ফুটিয়া বলা হয় নাই মাত্র। ইহার পরে কর্ত্তব্য খুব সুস্পষ্ট—আর এক দণ্ডও এখানে থাকা নয়! কিন্তু দাদা যে তাহার সম্বন্ধে কোন প্রকার অন্যায় ধারণা মনে মনে পোষণ করিয়া রাখিবেন সে হইতেই পারে না। এত দিন তিনি অক্ষুণ্ণ বিশ্বাসে তাহাকে ঘরে স্থান দিয়া পালন করিয়া আসিতেছেন, সে বিশ্বাসে যে অমল কোন অংশে আঘাত দেয় নাই সে কথা দাদাকে না বুঝাইয়া সে কেমন করিয়া যাইবে?

ভূপতি তখন আত্মীয়ের কৃতঘ্নতা, পাওনাদারের তাড়না, উচ্ছৃঙ্খল হিসাবপত্র এবং শূন্য তহবিল লইয়া মাথায় হাত দিয়া ভাবিতেছিল। তাহার এই শুষ্ক মনোদুঃখের কেহ দোসর ছিল না—চিত্তবেদনা এবং ঋণের সঙ্গে একলা দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিবার জন্য ভূপতি প্রস্তুত হইতেছিল।

এমন সময় অমল ঝড়ের মত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। ভূপতি নিজের অগাধ চিন্তার মধ্য হইতে হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া চাহিল। কহিল, খবর কি অমল?—অকস্মাৎ মনে হইল অমল বুঝি আর একটা কি গুরুতর দুঃসংবাদ লইয়া আসিল।

অমল কহিল—দাদা, আমার উপরে তোমার কি কোন রকম সন্দেহের কারণ হয়েছে?

ভূপতি আশ্চর্য্য হইয়া কহিল—তোমার উপরে সন্দেহ! মনে মনে ভাবিল, সংসার যেরূপ দেখিতেছি তাহাতে কোনদিন অমলকেও সন্দেহ করিব আশ্চর্য্য নাই।

অমল। বৌঠান কি আমার চরিত্র সম্বন্ধে তোমার কাছে কোন রকম দোষারোপ করেচেন?

ভূপতি ভাবিল—ওঃ এই ব্যাপার! বাঁচা গেল! স্নেহের অভিমান! সে মনে করিয়াছিল, সর্ব্বনাশের উপর বুঝি আর একটা কিছু সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে, কিন্তু গুরুতর সঙ্কটের সময়েও এই সকল তুচ্ছ বিষয়ে কর্ণপাত করিতে হয়! সংসার এদিকে সাঁকোও নাড়াইবে অথচ সেই সাঁকোর উপর দিয়া তাহার শাকের আঁটিগুলো পার করিয়া দিবার জন্য তাগিদ করিতেও ছাড়িবে না।

অন্যসময় হইলে ভূপতি অমলকে পরিহাস করিত, কিন্তু আজ তাহার সে প্রফুল্লতা ছিল না। সে বলিল, পাগল হয়েছ না কি?

অমল আবার জিজ্ঞাসা করিল—বৌঠান কিছু বলেন নি?

ভূপতি। তোমাকে ভালবাসেন বলে যদি কিছু বলে থাকেন তাতে রাগ করবার কোন কারণ নেই।

অমল। কাজ কর্ম্মের চেষ্টায় এখন আমার অন্যত্র যাওয়া উচিত:

ভূপতি ধমক দিয়া কহিল—অমল, তুমি কি ছেলেমানুষী করচ তার ঠিক নেই! এখন পড়া শুনো কর, কাজকর্ম্ম পরে হবে।

অমল বিমর্ষ মুখে চলিয়া আসিল, ভূপতি তাহার কাগজের গ্রাহকদের মূল্য প্রাপ্তির তালিকার সহিত তিন বৎসরের জমা খরচের হিসাব মিলাইতে বসিয়া গেল।

—*—

দশম পরিচ্ছেদ।

অমল স্থির করিল বৌঠানের সঙ্গে মোকাবিলা করিতে হইবে, এ কথাটার শেষ না করিয়া ছাড়া হইবে না। বৌঠানকে যে সকল শক্ত শক্ত কথা শুনাইবে মনে মনে তাহা আবৃত্তি করিতে লাগিল।

মন্দা চলিয়া গেলে চারু সংকল্প করিল অমলকে সে নিজে হইতে ডাকিয়া পাঠাইয়া তাহার রোষ শান্তি করিবে। কিন্তু একটা লেখার উপলক্ষ করিয়া ডাকিতে হইবে। অমলেরই একটা লেখার অনুকরণ করিয়া "অমাবস্যার আলো" নামে সে একটা প্রবন্ধ ফাঁদিয়াছে। চারু এটুকু বুঝিয়াছে যে তাহার স্বাধীন ছাঁদের লেখা অমল পছন্দ করে না।

পূর্ণিমা তাহার সমস্ত আলোক প্রকাশ করিয়া ফেলে বলিয়া চারু তাহার নূতন রচনায় পূর্ণিমাকে অত্যন্ত ভর্ৎসনা করিয়া লজ্জা দিতেছে। লিখিতেছে—অমাবস্যার অতলস্পর্শ অন্ধকারের মধ্যে ষোলকলা চাঁদের সমস্ত আলোক স্তরে স্তরে আবদ্ধ হইয়া আছে, তাহার এক রশ্মিও হারাইয়া যায় নাই—তাই পূর্ণিমার উজ্জ্বলতা অপেক্ষা অমাবস্যার কালিমা পরিপূর্ণতর—ইত্যাদি। অমল নিজের সকল লেখাই সকলের কাছে প্রকাশ করে এবং চারু তাহা করে না—পূর্ণিমা অমাবস্যার তুলনার মধ্যে কি সেই কথাটার আভাস আছে?

এদিকে এই পরিবারের তৃতীয় ব্যক্তি ভূপতি কোন আসন্ন

ঋণের তাগিদ হইতে মুক্তি লাভের জন্য তাহার পরম বন্ধু মতিলালের কাছে গিয়াছিল।

মতিলালকে সঙ্কটের সময় ভূপতি কয়েক হাজার টাকা ধার দিয়াছিল—সে দিন অত্যন্ত বিব্রত হইয়া সেই টাকাটা চাহিতে গিয়াছিল। মতিলাল স্নানের পর গা খুলিয়া পাখার হাওয়া লাগাইতেছিল এবং একটা কাঠের বাক্সর উপর কাগজ মেলিয়া অতি ছোট অক্ষরে সহস্র দুর্গা নাম লিখিতেছিল; ভূপতিকে দেখিয়া অত্যন্ত হৃদ্যতার স্বরে কহিল, এস এস—আজ কাল ত তোমার দেখাই পাবার জো নেই।

মতিলাল টাকার কথা শুনিয়া আকাশ পাতাল চিন্তা করিয়া কহিল, কোন্ টাকার কথা বল্চ? এর মধ্যে তোমার কাছ থেকে কিছু নিয়েছি না কি?

ভূপতি সাল তারিখ স্মরণ করাইয়া দিলে মতিলাল কহিল, ওঃ, সেটা ত অনেক দিন হল তামাদি হয়ে গেছে!

ভূপতির চক্ষে তাহার চতুর্দ্দিকের চেহারা সমস্ত যেন বদল হইয়া গেল। সংসারের যে অংশ হইতে মুখস্ খসিয়া পড়িল সে দিকটা দেখিয়া আতঙ্কে ভূপতির শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল! হঠাৎ বন্যা আসিয়া পড়িলে ভীত ব্যক্তি যেখানে সকলের চেয়ে উচ্চচূড়া দেখে সেইখানে যেমন ছুটিয়া যায়, সংশয়াক্রান্ত বহিঃসংসার হইতে ভূপতি তেমনি বেগে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল, মনে মনে কহিল আর যাই হোক্ চারু ত আমাকে বঞ্চনা করিবে না।

চারু তখন খাটে বসিয়া কোলের উপর বালিশ এবং বালিশের উপর খাতা রাখিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া একমনে লিখিতেছিল। ভূপতি যখন নিতান্ত তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল তখনি তাহার চেতনা হইল, তাড়াতাড়ি তাহার খাতাটা পায়ের নীচে চাপিয়া বসিল।

মনে যখন বেদনা থাকে তখন অল্প আঘাতেই গুরুতর ব্যথা বোধ হয়। চারু এমন অনাবশ্যক সত্বরতার সহিত তাহার লেখা গোপন করিল দেখিয়া ভূপতির মনে বাজিল।

ভূপতি ধীরে ধীরে খাটের উপর চারুর পাশে বসিল। চারু তাহার রচনাস্রোতে অনপেক্ষিত বাধা পাইয়া এবং ভূপতির কাছে হঠাৎ খাতা লুকাইবার ব্যস্ততায় অপ্রতিভ হইয়া কোন কথাই জোগাইয়া উঠিতে পারিল না।

সে দিন ভূপতির নিজের কিছু দিবার বা কহিবার ছিল না। সে রিক্তহস্তে চারুর নিকটে প্রার্থী হইয়া আসিয়াছিল। চারুর কাছ হইতে আশঙ্কাধর্ম্মী ভালবাসার একটা কোন প্রশ্ন একটা কিছু আদর পাইলেই তাহার ক্ষতযন্ত্রণায় ঔষধ পড়িত। কিন্তু “হ্যাদে লক্ষ্মী হৈল লক্ষ্মীছাড়া”, এক মুহূর্ত্তের প্রয়োজনে প্রীতিভাণ্ডারের চাবি চারু যেন কোন খানে খুঁজিয়া পাইল না! উভয়ের সুকঠিন মৌনে ঘরের নীরবতা অত্যন্ত নিবিড় হইয়া আসিল।

খানিকক্ষণ নিতান্ত চুপচাপ থাকিয়া ভূপতি নিশ্বাস ফেলিয়া খাট ছাড়িয়া উঠিল এবং ধীরে ধীরে বাহিরে চলিয়া আসিল।

সেই সময় অমল বিস্তর শক্ত শক্ত কথা মনের মধ্যে বোঝাই করিয়া লইয়া চারুর ঘরে দ্রুতপদে আসিতেছিল, পথের মধ্যে অমল

ভূপতির অত্যন্ত শুষ্ক বিবর্ণ মুখ দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া থামিল, জিজ্ঞাসা করিল, দাদা, তোমার অসুখ করেছে ?

অমলের স্নিগ্ধস্বর শুনিবামাত্র হঠাৎ ভূপতির সমস্ত হৃদয় তাহার অশ্রুরাশি লইয়া বুকের মধ্যে যেন ফুলিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ কোন কথা বাহির হইল না। সবলে আত্মসম্বরণ করিয়া ভূপতি আর্দ্রস্বরে কহিল, কিছু হয়নি—অমল! এবারে কাগজে তোমার কোন লেখা বেরচ্চে কি ?

অমল শক্ত শক্ত কথা যাহা সঞ্চয় করিয়াছিল তাহা কোথায় গেল ? তাড়াতাড়ি চারুর ঘরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বৌঠান, দাদার কি হয়েছে বল দেখি ?

চারু কহিল, কই তা'ত কিছু বুঝ্‌তে পারলুম না। অন্য কাগজে বোধ হয় ওঁর কাগজকে গাল দিয়া থাকবে !

অমল মাথা নাড়িল।

না ডাকিতেই অমল আসিল এবং সহজভাবে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিয়া দিল দেখিয়া চারু অত্যন্ত আরাম পাইল। একেবারেই লেখার কথা পাড়িল—কহিল, আজ আমি "অমাবস্যার আলো" বলে একটা লেখা লিখ্‌ছিলুন আর একটু হলেই তিনি সেটা দেখে' ফেল্‌ছিলেন।

চারু নিশ্চয় স্থির করিয়াছিল, তাহার নূতন লেখাটা দেখিবার জন্য অমল পীড়াপীড়ি করিবে। সেই অভিপ্রায়ে খাতা খানা একটু নাড়াচাড়াও করিল। কিন্তু অমল একবার তীব্রদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চারুর মুখের দিকে চাহিল—কি বুঝিল কি ভাবিল জানি

না। চকিত হইয়া উঠিয়া পড়িল। পর্ব্বতপথে চলিতে চলিতে হঠাৎ এক সময়ে মেঘের কুয়াশা কাটিবামাত্র পথিক যেন চমকিয়া দেখিল সে সহস্র হস্ত গভীর গহ্বরের মধ্যে পা বাড়াইতে যাইতে-ছিল! অমল কোন কথা না বলিয়া একেবারে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

চারু অমলের এই অভূতপূর্ব্ব ব্যবহারের কোন তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিল না।

—০—

একাদশ পরিচ্ছেদ।

পর দিন ভূপতি আবার অসময়ে শয়ন ঘরে আসিয়া চারুকে ডাকাইয়া আনাইল। কহিল—চারু, অমলের বেশ একটি ভাল বিবাহের প্রস্তাব এসেছে।

চারু অন্যমনস্ক ছিল। কহিল—ভাল কি এসেছে?

ভূপতি। বিয়ের সম্বন্ধ।

চারু। কেন, আমাকে কি পছন্দ হল না?

ভূপতি উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। কহিল—তোমাকে পছন্দ হল কি না সে কথা এখনো অমলকে জিজ্ঞাসা করা হয় নি! যদিই বা হয়ে থাকে আমার ত একটা ছোটখাট দাবী আছে, সে আমি ফস্ করে ছাড়চিনে!

চারু! আঃ কি বক্‌চ তার ঠিক নেই! তুমি যে বল্লে তোমার বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে।—চারুর মুখ লাল হইয়া উঠিল।

ভূপতি। তা'হলে কি ছুটে তোমাকে খবর দিতে আস্তুম? বকশিষ পাবার ত আশা ছিল না!

চারু। অমলের সম্বন্ধ এসেছে? বেশত। তা হলে আর দেরি কেন?

ভূপতি। বর্দ্ধমানের উকীল রঘুনাথ বাবু তাঁর মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দিয়া অমলকে বিলেত পাঠাতে চান।

চারু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—বিলেত?

ভূপতি। হাঁ বিলেত!

চারু। অমল বিলেত যাবে? বেশ মজা ত? বেশ হয়েছে, ভালই হয়েছে। তা তুমি তাকে একবার বলে দেখ।

ভূপতি। আমি বলবার আগে তুমি তাকে একবার ডেকে বুঝিয়ে বল্লে ভাল হয় না?

চারু। আমি ত তিন হাজার বার বলেছি। সে আমার কথা রাখে না। আমি তাকে বল্‌তে পারব না।

ভূপতি। তোমার কি মনে হয় সে কর্‌বে না?

চারু। আরো ত অনেকবার চেষ্টা দেখা গেছে, কোন মতে ত রাজি হয় নি।

ভূপতি। কিন্তু এবারকার এ প্রস্তাবটা তার পক্ষে ছাড়া উচিত হবে না। আমার অনেক দেনা হয়ে গেছে, অমলকে আমি ত আর সে রকম করে আশ্রয় দিতে পারব না।

ভূপতি অমলকে ডাকিয়া পাঠাইল। অমল আসিলে তাহাকে বলিল—বর্দ্ধমানের উকিল রঘুনাথ বাবুর মেয়ের সঙ্গে তোমার

বিয়ের প্রস্তাব এসেছে। তাঁর ইচ্ছে বিবাহ দিয়ে তোমাকে বিলেত পাঠিয়ে দেবেন। তোমার কি মত?

অমল কহিল—তোমার যদি অনুমতি থাকে আমার এতে কোন অমত নেই।

অমলের কথা শুনিয়া উভয়ে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। সে যে বলিবামাত্রই রাজি হইবে এ কেহ মনে করে নাই।

চারু তীব্রস্বরে ঠাট্টা করিয়া কহিল—দাদার অনুমতি থাক্‌লেই উনি মত দেবেন! কি আমার কথার বাধ্য ছোট ভাই! দাদার পরে ভক্তি এতদিন কোথায় ছিল ঠাকুরপো?

অমল উত্তর না দিয়া একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিল।

অমলের নিরুত্তরে চারু যেন তাহাকে চেতাইয়া তুলিবার জন্য দ্বিগুণতর ঝাঁজের সঙ্গে বলিল—তার চেয়ে বল না কেন, নিজের ইচ্ছে গেছে! এতদিন ভাণ করে থাক্‌বার কি দরকার ছিল যে বিয়ে করতে চাও না? পেটে ক্ষিদে মুখে লাজ!

ভূপতি উপহাস করিয়া কহিল—অমল তোমার খাতিরেই এতদিন ক্ষিদে চেপে রেখেছিল—পাছে ভাজের কথা শুনে তোমার হিংসে হয়!

চারু এই কথায় লাল হইয়া উঠিয়া কোলাহল করিয়া বলিতে লাগিল—হিংসে! তা বইকি! কখ্‌খনো আমার হিংসে হয় না। ওরকম করে বলা তোমার ভারি অন্যায়।

ভূপতি। ঐ দেখ! নিজের স্ত্রীকে ঠাট্টাও কর্‌তে পারব না।

চারু। না, ওরকম ঠাট্টা আমার ভাল লাগে না!

ভূপতি। আচ্ছা, গুরুতর অপরাধ করেছি। মাপ কর! যা হোক্ বিয়ের প্রস্তাবটা তা'হলে স্থির?

অমল কহিল—হাঁ!

চারু। মেয়েটি ভাল কি মন্দ তাও বুঝি একবার দেখ্‌তে যাবারও তর্ সইল না! তোমার যে এমন দশা হয়ে এসেছে তা ত একটু আভাসেও প্রকাশ কর নি!

ভূপতি। অমল, মেয়ে দেখ্‌তে চাও ত তার বন্দোবস্ত করি। খবর নিয়েছি মেয়েটি সুন্দরী।

অমল। না, দেখবার দরকার দেখিনে!

চারু। ওর কথা শোন কেন! সে কি হয়? কনে না দেখে বিয়ে হবে? ও না দেখতে চায় আমরা ত দেখে নেব!

অমল। না দাদা, ঐ নিয়ে মিথ্যে দেরি করবার দরকার দেখি নে।

চারু। কাজ নেই বাপু—দেরি হলে বুক ফেটে যাবে! তুমি টোপর মাথায় দিয়ে এখনি বেরিয়ে পড়! কি জানি, তোমার সাত রাজার ধন মাণিকটিকে যদি আর কেউ কেড়ে নিয়ে যায়!

অমলকে চারু কোন ঠাট্টাতেই কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারিল না।

চারু। বিলেত পালাবার জন্যে তোমার মনটা বুঝি দৌড়চ্চে? কেন, এখানে আমরা তোমাকে মারছিলুম না ধরছিলুম? হ্যাটকোট পরে সাহেব না সাজ্‌লে এখনকার ছেলেদের মন ওঠে

না। ঠাকুরপো, বিলেত থেকে ফিরে এসে আমাদের মত কালা আদ্‌মিদের চিন্‌তে পারবে ত?

অমল কহিল—তা'হলে আর বিলেত যাওয়া কি কর্‌তে?

ভূপতি হাসিয়া কহিল—কালরূপ ভোলবার জন্যেই ত সাত সমুদ্র পেরনো! তা ভয় কি চারু, আমরা রইলুম, কালোর ভক্তের অভাব হবে না।

ভূপতি খুসি হইয়া তখনি বর্দ্ধমানে চিঠি লিখিয়া পাঠাইল। বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ইতিমধ্যে কাগজখানা তুলিয়া দিতে হইল। ভূপতি খরচ আর জোগাইয়া উঠিতে পারিল না। লোকসাধারণ নামক একটা বিপুল নির্ম্মল পদার্থের যে সাধনায় ভূপতি দীর্ঘকাল দিন রাত্রি একান্ত মনে নিযুক্ত ছিল সেটা এক মুহূর্ত্তে বিসর্জ্জন দিতে হইল। ভূপতির জীবনের সমস্ত চেষ্টা যে অভ্যস্ত পথে গত বারো বৎসর অবিচ্ছেদে চলিয়া আসিতেছে সেটা হঠাৎ এক জায়গায় যেন জলের মাঝখানে আসিয়া পড়িল। ইহার জন্য ভূপতি কিছুমাত্র প্রস্তুত ছিল না। অকস্মাৎ বাধা প্রাপ্ত তাহার এতদিনকার সমস্ত উদ্যমকে সে কোথায় ফিরাইয়া লইয়া যাইবে? তাহারা যেন উপবাসী অনাথ শিশুসন্তানদের মত ভূপতির মুখের দিকে চাহিল, ভূপতি তাহাদিগকে আপন অন্তঃপুরে করুণাময়ী শুশ্রূষাপরায়ণা নারীর কাছে আনিয়া দাঁড় করাইল।

নারী তখন কি ভাবিতেছিল? সে মনে মনে বলিতেছিল—একি আশ্চর্য্য! অমলের বিবাহ হইবে সে ত খুব ভালই! কিন্তু এতকাল পরে আমাদের ছাড়িয়া পরের ঘরে বিবাহ করিয়া বিলাত চলিয়া যাইবে, ইহাতে তাহার মনে একবারো একটু খানির জন্য দ্বিধাও জন্মিল না? এত দিন ধরিয়া তাহাকে যে আমরা এত যত্ন করিয়া রাখিলাম, আর যেম্‌নি বিদায় লইবার একটু খানি ফাঁক পাইল অমনি কোমর বাঁধিয়া প্রস্তুত হইল, যেন এত দিন সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিল! অথচ মুখে কতই মিষ্ট, কতই ভালবাসা! মানুষকে চিনিবার জো নাই! কে জানিত যে লোক এত লিখিতে পারে তাহার হৃদয় কিছু মাত্র নাই!

নিজের হৃদয়-প্রাচুর্য্যের সহিত তুলনা করিয়া চারু অমলের শূন্য হৃদয়কে অত্যন্ত অবজ্ঞা করিতে অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। ভিতরে ভিতরে নিয়ত একটা বেদনার উদ্বেগ তপ্ত শূলের মত তাহার অভিমানকে ঠেলিয়া ঠেলিয়া তুলিতে লাগিল।

অমল আজ বাদে কাল চলিয়া যাইবে তবু এ কয় দিন তাহার দেখা নাই। আমাদের মধ্যে যে পরস্পর একটা মনান্তর হইয়াছে সেটা মিটাইয়া লইবার আর অবসরও হইল না। চারু প্রতিক্ষণে মনে করে অমল আপনি আসিবে—তাহাদের এতদিনকার খেলা-ধূলা এমন করিয়া ভাঙ্গিবে না, কিন্তু অমল আর আসেই না! অবশেষে যখন যাত্রার দিন অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল, তখন চারু নিজেই অমলকে ডাকিয়া পাঠাইল।

অমল বলিল—আর একটু পরে যাচ্ছি। চারু তাহাদের সেই

বারান্দার চৌকিটাতে গিয়া বসিল। সকাল বেলা হইতে ঘন মেঘ করিয়া গুমট হইয়া আছে—চারু তাহার খোলা চুল এলো করিয়া মাথায় জড়াইয়া একটা হাতপাখা লইয়া ক্লান্ত দেহে অল্প অল্প বাতাস করিতে লাগিল।

অত্যন্ত দেরি হইল। ক্রমে তাহার হাতপাখা আর চলিল না। রাগ, দুঃখ, অধৈর্য্য তাহার বুকের ভিতরে ফুঠিয়া উঠিল। মনে মনে বলিল—নাই আসিল অমল, তাতেই বা কি!—কিন্তু তবু পদশব্দ মাত্রেই তাহার মন দ্বারের দিকে ছুটিয়া যাইতে লাগিল!

দূর গির্জ্জায় এগারোটা বাজিয়া গেল। স্নানান্তে এখনি ভূপতি খাইতে আসিবে! এখনো আধ ঘণ্টা সময় আছে, এখনো অমল যদি আসে! যেমন করিয়া হোক্ তাহাদের কয়দিনকার নীরব ঝগড়া আজ মিটাইয়া ফেলিতেই হইবে—অমলকে এমন ভাবে বিদায় দেওয়া যাইতে পারে না! এই সমবয়সী দেওর-ভাজের মধ্যে যে চিরন্তন মধুর সম্বন্ধটুকু আছে—অনেক ভাব আড়ি অনেক স্নেহের দৌরাত্ম্য অনেক বিশ্রব্ধ সুখালোচনায় বিজড়িত একটি চিরচ্ছায়াময় লতাবিতান—অমল সে কি আজ ধূলায় লুটাইয়া দিয়া বহু দিনের জন্য বহুদূরে চলিয়া যাইবে? একটু পরিতাপ হইবে না? তাহার তলে কি শেষ জলও সিঞ্চন করিয়া যাইবে না,—তাহাদের অনেক দিনের দেওর-ভাজ সম্বন্ধের শেষ অশ্রুজল!

আধঘণ্টা প্রায় অতীত হয়। এলো খোঁপা খুলিয়া খানিকটা চুলের গুচ্ছ চারু দ্রুতবেগে আঙ্গুলে জড়াইতে এবং খুলিতে

লাগিল। অশ্রু সম্বরণ করা আর যায় না! চাকর আসিয়া কহিল —মাঠাকরুণ, বাবুর জন্যে ডাব বের করে দিতে হবে।

চারু আঁচল হইতে ভাঁড়ারের চাবি খুলিয়া ঝন্ করিয়া চাকরের পায়ের কাছে ফেলিয়া দিল—সে আশ্চর্য্য হইয়া চাবি লইয়া চলিয়া গেল।

চারুর বুকের কাছ হইতে কি একটা ঠেলিয়া কণ্ঠের কাছে উঠিয়া আসিতে লাগিল।

যথাসময়ে ভূপতি সহাস্য মুখে খাইতে আসিল। চারু পাখা-হাতে আহার-স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিল, অমল ভূপতির সঙ্গে আসিয়াছে। চারু তাহার মুখের দিকে চাহিল না।

অমল জিজ্ঞাসা করিল—বৌঠান, আমাকে ডাকৃচ ?

চারু কহিল—না, এখন আর দরকার নেই।

অমল। তা হলে আমি যাই, আমার আবার অনেক গোছাবার আছে।

চারু তখন দীপ্তচক্ষে একবার অমলের মুখের দিকে চাহিল—কহিল, যাও!

অমল চারুর মুখের দিকে একবার চাহিয়া চলিয়া গেল।

আহারান্তে ভূপতি কিছুক্ষণ চারুর কাছে বসিয়া থাকে। আজ দেনাপাওনা হিসাবপত্রের হাঙ্গামে ভূপতি অত্যন্ত ব্যস্ত,—তাই আজ অন্তঃপুরে বেশিক্ষণ থাকিতে পারিবে না বলিয়া কিছু ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল,—আজ আর আমি বেশিক্ষণ বস্‌তে পার্‌চিনে—আজ অনেক ঝঞ্ঝাট।

চারু বলিল, তা যাও না।

ভূপতি ভাবিল চারু অভিমান করিল। বলিল, তাই বলে যে এখনি যেতে হবে তা নয়—একটু জিরিয়ে যেতে হবে।—বলিয়া বসিল। দেখিল চারু বিমর্ষ হইয়া আছে। ভূপতি অনুতপ্তচিত্তে অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল কিন্তু কোনমতেই কথা জমাইতে পারিল না। অনেকক্ষণ কথোপকথনের বৃথা চেষ্টা করিয়া ভূপতি কহিল—অমল ত কাল চলে যাচ্চে, কিছুদিন তোমার বোধ হয় খুব একলা বোধ হবে।

চারু তাহার কোন উত্তর না দিয়া যেন কি একটা আনিতে চট্ করিয়া অন্য ঘরে চলিয়া গেল। ভূপতি কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বাহিরে প্রস্থান করিল।

চারু আজ অমলের মুখের দিকে চাহিয়া লক্ষ্য করিয়াছিল অমল এই কয়দিনেই অত্যন্ত রোগা হইয়া গেছে—তাহার মুখে তরুণতার সেই স্ফূর্ত্তি একেবারেই নাই। ইহাতে চারু সুখও পাইল বেদনাও বোধ করিল। আসন্ন বিচ্ছেদেই যে অমলকে ক্লিষ্ট করিতেছে চারুর তাহাতে সন্দেহ রহিল না—কিন্তু তবু অমলের এমন ব্যবহার কেন? কেন সে দূরে দূরে পালাইয়া বেড়াইতেছে? বিদায়কালকে কেন সে ইচ্ছাপূর্ব্বক এমন বিরোধতিক্ত করিয়া তুলিতেছে?

বিছানায় শুইয়া ভাবিতে ভাবিতে সে হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া বসিল। হঠাৎ মন্দার কথা মনে পড়িল। যদি এমন হয়, অমল মন্দাকে ভালবাসে। মন্দা চলিয়া গেছে বলিয়াই যদি অমল

এমন করিয়া—ছি! অমলের মন কি এমন হইবে? এত ক্ষুদ্র? এমন কলুষিত? বিবাহিত রমণীর প্রতি তাহার মন যাইবে? অসম্ভব! সন্দেহকে একান্ত চেষ্টায় দূর করিয়া দিতে চাহিল—কিন্তু সন্দেহ তাহাকে সবলে দংশন করিয়া রহিল।

এমনি করিয়া বিদায়কাল আসিল—মেঘ পরিষ্কার হইল না! অমল আসিয়া কম্পিতকণ্ঠে কহিল—বৌঠান, আমার যাবার সময় হয়েছে। তুমি এখন থেকে দাদাকে দেখো! তাঁর বড় সঙ্কটের অবস্থা—তুমি ছাড়া তাঁর আর সান্ত্বনার কোন পথ নেই।

অমল ভূপতির বিষণ্ণ ম্লান ভাব দেখিয়া সন্ধান দ্বারা তাহার দুর্গতির কথা জানিতে পারিয়াছিল। ভূপতি যে কিরূপ নিঃশব্দে আপন দুঃখ দুর্দ্দশার সহিত একলা লড়াই করিতেছে, কাহারো কাছে সাহায্য বা সান্ত্বনা পায় নাই, অথচ আপন আশ্রিত পালিত আত্মীয় স্বজনদিগকে এই প্রলয় সঙ্কটে বিচলিত হইতে দেয় নাই ইহা সে চিন্তা করিয়া চুপ করিয়া রহিল। তারপরে সে চারুর কথা ভাবিল, নিজের কথা ভাবিল—কর্ণমূল লোহিত হইয়া উঠিল—সবেগে বলিল, চুলায় যাক্ আষাঢ়ের চাঁদ আর অমাবস্যার আলো! আমি ব্যারিষ্টার হয়ে এসে দাদাকে যদি সাহায্য কর্ত্তে পারি তবেই আমি পুরুষ মানুষ!

গত রাত্রি সমস্ত রাত জাগিয়া চারু ভাবিয়া রাখিয়াছিল অমলকে বিদায়কালে কি কথা বলিবে,—সহাস্য অভিমান এবং প্রফুল্ল ঔদাসীন্যের দ্বারা মাজিয়া মাজিয়া সেই কথাগুলিকে সে মনে মনে উজ্জ্বল ও শাণিত করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু বিদায়

দিবার সময় চারুর মুখে কোন কথাই বাহির হইল না। সে কেবল বলিল—চিঠি লিখবে ত অমল ?

অমল ভূমিতে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল—চারু ছুটিয়া শয়নঘরে গিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

—o—

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

ভূপতি বর্দ্ধমানে গিয়া অমলের বিবাহ অন্তে তাহাকে বিলাতে রওনা করিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিল।

নানা দিক্ হইতে ঘা খাইয়া বিশ্বাসপরায়ণ ভূপতির মনে বহিঃসংসারের প্রতি একটা বৈরাগ্যের ভাব আসিয়াছিল। সভাসমিতি মেলা মেশা কিছুই তাহার ভাল লাগিত না। মনে হইল এই সব লইয়া আমি এতদিন কেবল নিজেকেই ফাঁকি দিলাম—জীবনের সুখের দিন বৃথা বহিয়া গেল এবং সারভাগ আবর্জ্জনাকুণ্ডে ফেলিলাম।

ভূপতি মনে মনে কহিল—যাক্, কাগজটা গেল, ভালই হইল! মুক্তিলাভ করিলাম। সন্ধ্যার সময় আঁধারের সূত্রপাত দেখিলেই পাখী যেমন করিয়া নীড়ে ফিরিয়া আসে, ভূপতি সেই-রূপ তাহার দীর্ঘদিনের সঞ্চরণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া অন্তঃপুরে চারুর কাছে চলিয়া আসিল। মনে মনে স্থির করিল, বাস্, এখন আর কোথাও নয়—এই খানেই আমার স্থিতি। যে কাগজের জাহাজটা লইয়া সমস্ত দিন খেলা করিতাম, সেটা ডুবিল, এখন ঘরে চলি

বোধ করি ভূপতির একটা সাধারণ সংস্কার ছিল স্ত্রীর উপর অধিকার কাহাকেও অর্জ্জন করিতে হয় না, স্ত্রী ধ্রুবতারার মত নিজের আলো নিজেই জ্বালাইয়া রাখে,—হাওয়ায় নেবে না, তেলের অপেক্ষা রাখে না। বাহিরে যখন ভাঙ্গচুর আরম্ভ হইল তখন অন্তঃপুরে কোনো খিলানে ফাটল ধরিয়াছে কি না তাহা একবার পরখ করিয়া দেখার কথাও ভূপতির মনে স্থান পায় নাই।

ভূপতি সন্ধ্যার সময় বর্দ্ধমান হইতে বাড়ি ফিরিয়া আসিল। তাড়াতাড়ি মুখ ধুইয়া সকাল সকাল খাইল। অমলের বিবাহ ও বিলাত যাত্রার আদ্যোপান্ত বিবরণ শুনিবার জন্য স্বভাবতই চারু একান্ত উৎসুক হইয়া আছে স্থির করিয়া ভূপতি আজ কিছুমাত্র বিলম্ব করিল না। ভূপতি শোবার ঘরে বিছানায় গিয়া শুইয়া গুড়গুড়ির সুদীর্ঘ নল টানিতে লাগিল। চারু এখনো অনুপস্থিত, বোধ করি গৃহকার্য্য করিতেছে। তামাক পুড়িয়া শ্রান্ত ভূপতির ঘুম আসিতে লাগিল। ক্ষণে ক্ষণে ঘুমের ঘোর ভাঙ্গিয়া চমকিয়া জাগিয়া উঠিয়া সে ভাবিতে লাগিল এখনো চারু আসিতেছে না কেন? অবশেষে ভূপতি থাকিতে না পারিয়া চারুকে ডাকিয়া পাঠাইল। ভূপতি জিজ্ঞাসা করিল, চারু, আজ যে এত দেরি করলে?

চারু তাহার জবাবদিহী না করিয়া কহিল, হাঁ, আজ দেরি হয়ে গেল!

চারুর আগ্রহপূর্ণ প্রশ্নের জন্য ভূপতি অপেক্ষা করিয়া রহিল; চারু কোন প্রশ্ন করিল না। ইহাতে ভূপতি কিছু ক্ষুণ্ণ হইল।

তবে কি চারু অমলকে ভালবাসে না? অমল যতদিন উপস্থিত ছিল ততদিন চারু তাহাকে লইয়া আমোদ আহ্লাদ করিল আর যেই চলিয়া গেল অমনি তাহার সম্বন্ধে উদাসীন! এইরূপ বিসদৃশ ব্যবহারে ভূপতির মনে খট্‌কা লাগিল, সে ভাবিতে লাগিল—তবে কি চারুর হৃদয়ের গভীরতা নাই? কেবল সে আমোদ করিতেই জানে, ভালবাসিতে পারে না? মেয়ে মানুষের পক্ষে এরূপ নিরাসক্তভাব ত ভাল নয়!

চারু ও অমলের সখিত্বে ভূপতি আনন্দ বোধ করিত। এই দুই জনের ছেলেমানুষী আড়ি ও ভাব, খেলা ও মন্ত্রণা তাহার কাছে সুমিষ্ট কৌতুকাবহ ছিল; অমলকে চারু সর্ব্বদা যে যত্ন আদর করিত তাহাতে চারুর সুকোমল হৃদয়ালুতার পরিচয় পাইয়া ভূপতি মনে মনে খুসি হইত। আজ আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতে লাগিল, সে সমস্তই কি ভাসা ভাসা, হৃদয়ের মধ্যে তাহার কোন ভিত্তি ছিল না? ভূপতি ভাবিল, চারুর হৃদয় যদি না থাকে তবে কোথায় ভূপতি আশ্রয় পাইবে?

অল্পে অল্পে পরীক্ষা করিবার জন্য ভূপতি কথা পাড়িল, চারু তুমি ভাল ছিলে ত? তোমার শরীর খারাপ নেই?

চারু সংক্ষেপে উত্তর করিল, ভালই আছি।

ভূপতি। অমলের ত বিয়ে চুকে গেল।

এই বলিয়া ভূপতি চুপ করিল। চারু তৎকালোচিত একটা কোন সঙ্গত কথা বলিতে অনেক চেষ্টা করিল—কোন কথাই বাহির হইল না—সে আড়ষ্ট হইয়া শুইয়া রহিল।

ভূপতি স্বভাবতই কখনো কিছু লক্ষ্য করিয়া দেখে না—কিন্তু অমলের বিদায়শোক তাহার নিজের মনে লাগিয়া আছে বলিয়াই চারুর ঔদাসীন্য তাহাকে আঘাত করিল। তাহার ইচ্ছা ছিল সমবেদনায় ব্যথিত চারুর সঙ্গে অমলের কথা আলোচনা করিয়া সে হৃদয়ভার লাঘব করিবে।

ভূপতি। মেয়েটিকে দেখতে বেশ। চারু ঘুমুচ্চ?

চারু কহিল—না।

ভূপতি। বেচারা অমল একলা চলে গেল। যখন তাকে গাড়িতে উঠিয়ে দিলুম, সে ছেলেমানুষের মত কাঁদতে লাগল—দেখে এই বুড়ো বয়সে আমি আর চোখের জল রাখতে পারলুম না। গাড়িতে দুজন সাহেব ছিল, পুরুষমানুষের কান্না দেখে তাদের ভারি আমোদ বোধ হল।

নির্ব্বাণদীপ শয়নঘরে বিছানার অন্ধকারের মধ্যে চারু প্রথমে পাশ ফিরিয়া শুইল, তাহার পর হঠাৎ তাড়াতাড়ি বিছানা ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

ভূপতি চকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, চারু, অসুখ করেছে?

কোন উত্তর না পাইয়া সেও উঠিল। পাশের বারান্দা হইতে চাপা কান্নার শব্দ শুনিতে পাইয়া ত্রস্তপদে গিয়া দেখিল—চারু মাটিতে পড়িয়া উপুড় হইয়া কান্না রোধ করিবার চেষ্টা করিতেছে।

এরূপ দুরন্ত শোকোচ্ছ্বাস দেখিয়া ভূপতি আশ্চর্য্য হইয়া গেল। ভাবিল, চারুকে কি ভুল বুঝিয়াছিলাম! চারুর স্বভাব এতই চাপা যে, আমার কাছেও হৃদয়ের কোন বেদনা প্রকাশ করিতে চাহে

না। যাহাদের প্রকৃতি এইরূপ তাহাদের ভালবাসা সুগভীর এবং তাহাদের বেদনাও অত্যন্ত বেশি। চারুর প্রেম সাধারণ স্ত্রী-লোকদের ন্যায় বাহির হইতে তেমন পরিদৃশ্যমান নহে ভূপতি তাহা মনে মনে ঠাহর করিয়া দেখিল। ভূপতি চারুর ভালবাসার উচ্ছ্বাস কখনো দেখে নাই, আজ বিশেষ করিয়া বুঝিল তাহার কারণ অন্তরের দিকেই চারুর ভালবাসার গোপন প্রসারতা। ভূপতি নিজেও বাহিরে প্রকাশ করিতে অপটু; চারুর প্রকৃতিতেও হৃদয়াবেগের সুগভীর অন্তঃশীলতার পরিচয় পাইয়া সে একটা তৃপ্তি অনুভব করিল।

ভূপতি তখন চারুর পাশে বসিয়া কোন কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। কি করিয়া সান্ত্বনা করিতে হয় ভূপতির তাহা জানা ছিল না—ইহা সে বুঝিল না, শোককে যখন কেহ অন্ধকারে কণ্ঠ চাপিয়া হত্যা করিতে চাহে তখন সাক্ষী বসিয়া থাকিলে ভাল লাগে না।

—o—

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

ভূপতি যখন তাহার খবরের কাগজ হইতে অবসর লইল তখন নিজের ভবিষ্যতের একটা ছবি নিজের মনের মধ্যে আঁকিয়া লইয়াছিল। প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল কোন প্রকার দুরাশা দুশ্চেষ্টায় যাইবে না, চারুকে লইয়া পড়া শুনা, ভালবাসা, এবং প্রতিদিনের ছোটখাট গার্হস্থ্য কর্ত্তব্য পালন করিয়া চলিবে। মনে করিয়াছিল, যে সকল ঘোরো সুখ সব চেয়ে সুলভ অথচ সুন্দর, সর্ব্বদাই

নাড়াচাড়ার যোগ্য অথচ পবিত্র নির্ম্মল, সেই সহজলব্ধ সুখগুলির দ্বারা তাহার জীবনের গৃহকোণটিতে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালাইয়া নিভৃত শান্তির অবতারণা করিবে। হাসি গল্প পরিহাস, পরস্পরের মনোরঞ্জনের জন্য প্রত্যহ ছোটখাটো আয়োজন, ইহাতে অধিক চেষ্টা আবশ্যক হয় না অথচ সুখ অপর্য্যাপ্ত হইয়া উঠে।

কার্য্যকালে দেখিল সহজ সুখ সহজ নহে। যাহা মূল্য দিয়া কিনিতে হয় না তাহা যদি আপনি হাতের কাছে না পাওয়া যায় তবে আর কোনমতেই কোথাও খুঁজিয়া পাইবার উপায় থাকে না।

ভূপতি কোনমতেই চারুর সঙ্গে বেশ করিয়া জমাইয়া লইতে পারিল না। ইহাতে সে নিজেকেই দোষ দিল। ভাবিল বারো বৎসর কেবল খবরের কাগজ লিখিয়া, স্ত্রীর সঙ্গে কি করিয়া গল্প করিতে হয় সে বিদ্যা একেবারে খোয়াইয়াছি। সন্ধ্যাদীপ জ্বালিতেই ভূপতি আগ্রহের সহিত ঘরে যায়,—সে দুই একটা কথা বলে, চারু দুই একটা কথা বলে, তার পরে কি বলিবে, ভূপতি কোনমতেই ভাবিয়া পায় না। নিজের এই অক্ষমতায় স্ত্রীর কাছে সে লজ্জা বোধ করিতে থাকে। স্ত্রীকে লইয়া গল্প করা সে এতই সহজ মনে করিয়াছিল অথচ মূঢ়ের নিকট ইহা এতই শক্ত! সভাস্থলে বক্তৃতা করা ইহার চেয়ে সহজ।

যে সন্ধ্যাবেলাকে ভূপতি হাস্যে কৌতুকে প্রণয়ে আদরে রমণীয় করিয়া কল্পনা করিয়াছিল, সেই সন্ধ্যাবেলা কাটানো তাহাদের পক্ষে সমস্যার স্বরূপ হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ চেষ্টাপূর্ণ

মৌনের পর ভূপতি মনে করে উঠিয়া যাই—কিন্তু উঠিয়া গেলে চারু কি মনে করিবে এই ভাবিয়া উঠিতেও পারে না। বলে, চারু তাস্ খেল্‌বে?—চারু অন্য কোন গতি না দেখিয়া বলে, আচ্ছা! বলিয়া অনিচ্ছাক্রমে তাস পাড়িয়া আনে, নিতান্ত ভুল করিয়া অনায়াসেই হারিয়া যায়—সে খেলায় কোন সুখ থাকে না!

ভূপতি অনেক ভাবিয়া একদিন চারুকে জিজ্ঞাসা করিল—চারু মন্দাকে আনিয়ে নিলে হয় না? তুমি নিতান্ত একলা পড়েচ।

চারু মন্দার নাম শুনিয়াই জ্বলিয়া উঠিল। বলিল—না, মন্দাকে আমার দরকার নেই!

ভূপতি হাসিল। মনে মনে খুসি হইল। সাধ্বীরা যেখানে সতীধর্ম্মের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম দেখে সেখানে ধৈর্য্য রাখিতে পারে না!

বিদ্বেষের প্রথম ধাক্কা সামলাইয়া চারু ভাবিল মন্দা থাকিলে সে হয় ত ভূপতিকে অনেকটা আমোদে রাখিতে পারিবে। ভূপতি তাহার নিকট হইতে যে মনের সুখ চায় সে তাহা কোনমতে দিতে পারিতেছে না ইহা চারু অনুভব করিয়া পীড়া বোধ করিতেছিল। ভূপতি জগৎসংসারের আর সমস্ত ছাড়িয়া একমাত্র চারুর নিকট হইতেই তাহার জীবনের সমস্ত আনন্দ আকর্ষণ করিয়া লইতে চেষ্টা করিতেছে, সেই একাগ্র চেষ্টা দেখিয়া ও নিজের অন্তরের দৈন্য উপলব্ধি করিয়া চারু ভীত হইয়া পড়িয়া-

ছিল। এমন করিয়া কতদিন কিরূপে চলিবে? ভূপতি আর কিছু অবলম্বন করে না কেন? আর একটা খবরের কাগজ চালায় না কেন? ভূপতির চিত্তরঞ্জন করিবার অভ্যাস এ পর্য্যন্ত চারুকে কখনো করিতে হয় নাই, ভূপতি তাহার কাছে কোন সেবা দাবী করে নাই, কোন সুখ প্রার্থনা করে নাই, চারুকে সে সর্ব্বতো-ভাবে নিজের প্রয়োজনীয় করিয়া তোলে নাই; আজ হঠাৎ তাহার জীবনের সমস্ত প্রয়োজন চারুর নিকট চাহিয়া বসাতে সে কোথাও কিছু যেন খুঁজিয়া পাইতেছে না। ভূপতির কি চাই, কি হইলে সে তৃপ্ত হয়, তাহা চারু ঠিকমত জানে না, এবং জানিলেও তাহা চারুর পক্ষে সহজে আয়ত্তগম্য নহে।

ভূপতি যদি অল্পে অল্পে অগ্রসর হইত তবে চারুর পক্ষে হয় ত এত কঠিন হইত না—কিন্তু হঠাৎ একরাত্রে দেউলিয়া হইয়া রিক্ত ভিক্ষাপাত্র পাতিয়া বসাতে সে যেন বিব্রত হইয়াছে!

চারু কহিল—আচ্ছা, মন্দাকে আনিয়ে নাও; সে থাক্‌লে তোমার দেখাশুনোর অনেক সুবিধে হতে পার্‌বে।

ভূপতি হাসিয়া কহিল—আমার দেখাশুনো! কিছু দরকার নেই।

ভূপতি ক্ষুণ্ণ হইয়া ভাবিল, আমি বড় নীরস লোক, চারুকে কিছুতেই আমি সুখী করিতে পারিতেছি না।

এই ভাবিয়া সে সাহিত্য লইয়া পড়িল। বন্ধুরা কখনো বাড়ি আসিলে বিস্মিত হইয়া দেখিত ভূপতি টেনিসন্, বাইরন্, বঙ্কিমের গল্প এই সমস্ত লইয়া আছে। ভূপতির এই অকাল কাব্যানুরাগ

দেখিয়া বন্ধুবান্ধবেরা অত্যন্ত ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতে লাগিল। ভূপতি হাসিয়া কহিল, ভাই, বাঁশের ফুলও ধরে, কিন্তু কখন্ ধরে তার ঠিক নেই।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় শোবার ঘরে বড় বাতি জ্বালাইয়া ভূপতি প্রথমে লজ্জায় একটু ইতস্ততঃ করিল—পরে কহিল, একটা কিছু পড়ে শোনাব?

চারু কহিল, শোনাও না।

ভূপতি। কি শোনাব?

চারু। তোমার যা ইচ্ছে।

ভূপতি চারুর অধিক আগ্রহ না দেখিয়া একটু দমিল। তবু সাহস করিয়া কহিল—টেনিসন্ থেকে একটা কিছু তর্জ্জমা করে তোমাকে শোনাই!

চারু কহিল, শোনাও!

সমস্তই মাটি হইল। সঙ্কোচে ও নিরুৎসাহে ভূপতির পড়া বাধিয়া যাইতে লাগিল, ঠিকমত বাঙ্গালা প্রতিশব্দ জোগাইল না। চারুর শূন্যদৃষ্টি দেখিয়া বোঝা গেল, সে মন দিতেছে না। সেই দীপালোকিত ছোট ঘরটি, সেই সন্ধ্যাবেলাকার নিভৃত অবকাশটুকু তেমন করিয়া ভরিয়া উঠিল না!

ভূপতি আরো দুই একবার এই ভ্রম করিয়া অবশেষে স্ত্রীর সহিত সাহিত্যচর্চ্চার চেষ্টা পরিত্যাগ করিল।

—*—

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

যেমন গুরুতর আঘাতে স্নায়ু অবশ হইয়া যায় এবং প্রথমটা বেদনা টের পাওয়া যায় না, সেইরূপ বিচ্ছেদের আরম্ভকালে অমলের অভাব চারু ভাল করিয়া যেন উপলব্ধি করিতে পারে নাই।

অবশেষে যতই দিন যাইতে লাগিল ততই অমলের অভাবে সাংসারিক শূন্যতার পরিমাপ ক্রমাগতই যেন বাড়িতে লাগিল। এই ভীষণ আবিষ্কারে চারু হতবুদ্ধি হইয়া গেছে। নিকুঞ্জবন হইতে বাহির হইয়া সে হঠাৎ এ কোন্ মরুভূমির মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে—দিনের পর দিন যাইতেছে, মরুপ্রান্তর ক্রমাগতই বাড়িয়া চলিয়াছে। এ মরুভূমির কথা সে কিছুই জানিত না!

ঘুম থেকে উঠিয়াই হঠাৎ বুকের মধ্যে ধক্ করিয়া উঠে—মনে পড়ে অমল নাই। সকালে যখন সে বারান্দায় পান সাজিতে বসে ক্ষণে ক্ষণে কেবলি মনে হয় অমল পশ্চাৎ হইতে আসিবে না। এক এক সময় অন্যমনস্ক হইয়া বেশি পান সাজিয়া ফেলে, সহসা মনে পড়ে বেশি পান খাইবার লোক নাই। যখনই ভাঁড়ার ঘরে পদার্পণ করে মনে উদয় হয় অমলের জন্য জলখাবার দিতে হইবে না। মনের অধৈর্য্যে অন্তঃপুরের সীমান্তে আসিয়া তাহাকে স্মরণ করাইয়া দেয়, অমল কলেজ হইতে আসিবে না। কোন একটা নূতন বই, নূতন লেখা, নূতন খবর, নূতন কৌতুক প্রত্যাশা করিবার নাই, কাহারো জন্য কোন শেলাই করিবার, কোন লেখা লিখিবার, কোন সৌখীন জিনিষ কিনিয়া রাখিবার নাই।

নিজের অসহ্য কষ্টে ও চাঞ্চল্যে চারু নিজে বিস্মিত। মনো-বেদনার অবিশ্রাম পীড়নে তাহার ভয় হইল। নিজে কেবলি প্রশ্ন করিতে লাগিল—কেন? এত কষ্ট কেন হইতেছে? অমল আমার এতই কি যে, তাহার জন্য এত দুঃখ ভোগ করিব! আমার কি হইল, এতদিন পরে আমার একি হইল! দাসী চাকর রাস্তার মুটে মজুরগুলাও নিশ্চিন্ত হইয়া ফিরিতেছে, আমার এমন হইল কেন? ভগবান্ হরি আমাকে এমন বিপদে কেন ফেলিলে?

কেবলি প্রশ্ন করে এবং আশ্চর্য্য হয়, কিন্তু দুঃখের কোন উপশম হয় না! অমলের স্মৃতিতে তাহার অন্তর বাহির এমনি পরিব্যাপ্ত যে, কোথাও সে পালাইবার স্থান পায় না।

ভূপতি কোথায় অমলের স্মৃতির আক্রমণ হইতে তাহাকে রক্ষা করিবে তাহা না করিয়া সেই বিচ্ছেদব্যথিত স্নেহশীল মূঢ় কেবলই অমলের কথাই মনে করাইয়া দেয়!

অবশেষে চারু একেবারে হাল ছাড়িয়া দিল—নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করায় ক্ষান্ত হইল—হার মানিয়া নিজের অবস্থাকে অবিরোধে গ্রহণ করিল। অমলের স্মৃতিকে যত্নপূর্ব্বক হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইল।

ক্রমে এমনি হইয়া উঠিল, একাগ্রচিত্তে অমলের ধ্যান তাহার গোপন গর্ব্বের বিষয় হইল—সেই স্মৃতিই যেন তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠ গৌরব!

গৃহকার্য্যের অবকাশে একটা সময় সে নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইল। সেই সময় নির্জ্জনে গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া তন্ন তন্ন করিয়া অমলের

সহিত তাহার নিজ-জীবনের প্রত্যেক ঘটনা চিন্তা করিত। উপুড় হইয়া পড়িয়া বালিশের উপর মুখ রাখিয়া বারবার করিয়া বলিত—অমল, অমল, অমল! সমুদ্র পার হইয়া যেন শব্দ আসিত—বৌঠান, কি বৌঠান! চারু সিক্তচক্ষু মুদ্রিত করিয়া বলিত—অমল, তুমি রাগ করিয়া চলিয়া গেলে কেন? আমি ত কোন দোষ করি নাই! তুমি যদি ভাল মুখে বিদায় লইয়া যাইতে, তাহা হইলে বোধ হয় আমি এত দুঃখ পাইতাম না। অমল সম্মুখে থাকিলে যেমন কথা হইত চারু ঠিক তেমনি করিয়া কথাগুলি উচ্চারণ করিয়া বলিত। অমল, তোমাকে আমি একদিনও ভুলি নাই! এক দিনও না, এক দণ্ডও না! আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ পদার্থ সমস্ত তুমিই ফুটাইয়াছ, আমার জীবনের সারভাগ দিয়া প্রতিদিন তোমার পূজা করিব।

এইরূপে চারু তাহার সমস্ত ঘরকন্না তাহার সমস্ত কর্ত্তব্যের অন্তঃস্তরের তলদেশে সুরঙ্গ খনন করিয়া সেই নিরালোক নিস্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে অশ্রুমালাসজ্জিত একটি গোপন শোকের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া রাখিল। সেখানে তাহার স্বামী বা পৃথিবীর আর কাহারও কোন অধিকার রহিল না। সেই স্থানটুকু যেমন গোপনতম, তেমনি গভীরতম, তেমনি প্রিয়তম। তাহারই দ্বারে সে সংসারের সমস্ত ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া নিজের অনাবৃত আত্মস্বরূপে প্রবেশ করে এবং সেখান হইতে বাহির হইয়া মুখসখানা আবার মুখে দিয়া পৃথিবীর হাস্যালাপ ও ক্রিয়াকর্ম্মের রঙ্গভূমির মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

এইরূপে মনের সহিত দ্বন্দ্ববিবাদ ত্যাগ করিয়া চারু তাহার বৃহৎ বিষাদের মধ্যে একপ্রকার শান্তিলাভ করিল এবং একনিষ্ঠ হইয়া স্বামীকে ভক্তি ও যত্ন করিতে লাগিল। ভূপতি যখন নিদ্রিত থাকিত চারু তখন ধীরে ধীরে তাহার পায়ের কাছে মাথা রাখিয়া পায়ের ধূলা সীমন্তে তুলিয়া লইত। সেবাশুশ্রূষায় গৃহকর্ম্মে স্বামীর লেশমাত্র ইচ্ছা সে অসম্পূর্ণ রাখিত না। আশ্রিত প্রতিপালিত ব্যক্তিদের প্রতি কোন প্রকার অযত্নে ভূপতি দুঃখিত হইত জানিয়া চারু তাহাদের প্রতি আতিথ্যে তিলমাত্র ত্রুটি ঘটিতে দিত না। এইরূপে সমস্ত কাজকর্ম্ম সারিয়া ভূপতির উচ্ছিষ্ট প্রসাদ খাইয়া চারুর দিন শেষ হইয়া যাইত।

এই সেবা ও যত্নে ভগ্নশ্রী ভূপতি যেন নবযৌবন ফিরিয়া পাইল। স্ত্রীর সহিত পূর্ব্বে যেন তাহার নব বিবাহ হয় নাই, এত দিন পরে যেন হইল। সাজ সজ্জায় হাস্যে পরিহাসে বিকশিত হইয়া সংসারের সমস্ত দুর্ভাবনাকে ভূপতি মনের একপাশে ঠেলিয়া রাখিয়া দিল! রোগ আরামের পর যেমন ক্ষুধা বাড়িয়া উঠে, শরীরে ভোগশক্তির বিকাশকে সচেতন ভাবে অনুভব করা যায়, ভূপতির মনে এতকাল পরে সেইরূপ একটা অপূর্ব্ব এবং প্রবল ভাবাবেশের সঞ্চার হইল। বন্ধুদিগকে, এমন কি, চারুকে লুকাইয়া ভূপতি কেবল কবিতা পড়িতে লাগিল। মনে মনে কহিল, কাগজখানা গিয়া এবং অনেক দুঃখ পাইয়া এতদিন পরে আমি আমার স্ত্রীকে আবিষ্কার করিতে পারিয়াছি!

ভূপতি চারুকে বলিল, চারু তুমি আজকাল লেখা একেবারেই ছেড়ে দিয়েছ কেন!

চারু বলিল, ভারি ত আমার লেখা!

ভূপতি। সত্যি কথা বলচি, তোমার মত অমন বাংলা এখনকার লেখকদের মধ্যে আমি ত আর কারো দেখিনি! বিশ্ববন্ধুতে যা লিখেছিল আমারও ঠিক তাই মত।

চারু। আঃ থাম।

ভূপতি, "এই দেখনা" বলিয়া একখণ্ড সরোরুহ বাহির করিয়া চারু ও অমলের ভাষার তুলনা করিতে আরম্ভ করিল। চারু আরক্তমুখে ভূপতির হাত হইতে কাগজ কাড়িয়া লইয়া অঞ্চলের মধ্যে আচ্ছাদন করিয়া রাখিল।

ভূপতি মনে মনে ভাবিল লেখার সঙ্গী একজন না থাকিলে লেখা বাহির হয় না; রোস, আমাকে লেখাটা অভ্যাস করিতে হইবে; তাহা হইলে ক্রমে চারুরও লেখার উৎসাহ সঞ্চার করিতে পারিব।

ভূপতি অত্যন্ত গোপনে খাতা লইয়া লেখা-অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিল। অভিধান দেখিয়া পুনঃ পুনঃ কাটিয়া, বারবার কাপি করিয়া ভূপতির বেকার অবস্থার দিনগুলি কাটিতে লাগিল। এত কষ্টে এত চেষ্টায় তাহাকে লিখিতে হইতেছে যে, সেই বহু দুঃখের রচনাগুলির প্রতি ক্রমে তাহার বিশ্বাস ও মমতা জন্মিল।

অবশেষে একদিন তাহার লেখা আর একজনকে দিয়া নকল করাইয়া ভূপতি স্ত্রীকে লইয়া দিল। কহিল, আমার এক বন্ধু

নতুন লিখতে আরম্ভ করেছে। আমি ত কিছু বুঝিনে তুমি এক-বার পড়ে দেখ দেখি তোমার কেমন লাগে।

খাতা খানা চারুর হাতে দিয়া সাধ্বসে ভূপতি বাহিরে চলিয়া গেল। সরল ভূপতির এই ছলনাটুকু চারুর বুঝিতে বাকি রহিল না।

পড়িল; লেখার ছাঁদ এবং বিষয় দেখিয়া একটুখানি হাসিল। হায়! চারু তাহার স্বামীকে ভক্তি করিবার জন্য এত আয়োজন করিতেছে, সে কেন এমন ছেলেমানুষী করিয়া পূজার অর্ঘ্য ছড়াইয়া ফেলিতেছে। চারুর কাছে বাহবা আদায় করিবার জন্য তাহার এত চেষ্টা কেন! সে যদি কিছুই না করিত, চারুর মনোযোগ আকর্ষণের জন্য সর্ব্বদাই তাহার যদি প্রয়াস না থাকিত তবে স্বামীর পূজা চারুর পক্ষে সহজসাধ্য হইত। চারুর একান্ত ইচ্ছা, ভূপতি কোন অংশেই নিজকে চারুর অপেক্ষা ছোট না করিয়া ফেলে।

চারু খাতাখানা মুড়িয়া বালিশে হেলান দিয়া দূরের দিকে চাহিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিতে লাগিল। অমলও তাহাকে নূতন লেখা পড়িবার জন্য আনিয়া দিত।

সন্ধ্যাবেলায় উৎসুক ভূপতি শয়নগৃহের সম্মুখবর্ত্তী বারান্দায় ফুলের টব পর্য্যবেক্ষণে নিযুক্ত হইল, কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না।

চারু আপনি বলিল, এ কি তোমার বন্ধুর প্রথম লেখা?

ভূপতি কহিল—হাঁ।

চারু। এত চমৎকার হয়েছে—প্রথম লেখা বলে মনেই হয় না।

ভূপতি অত্যন্ত খুসি হইয়া ভাবিতে লাগিল, বেনামী লেখাটায় নিজের নামজারি করা যায় কি উপায়ে?

ভূপতির খাতা ভয়ঙ্কর দ্রুতগতিতে পূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল। নাম প্রকাশ হইতেও বিলম্ব হইল না।

—০—

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

বিলাত হইতে চিঠি আসিবার দিন কবে এ খবর চারু সর্ব্বদাই রাখিত। প্রথমে এডেন্ হইতে ভূপতির নামে একখানা চিঠি আসিল তাহাতে অমল বৌঠানকে প্রণাম নিবেদন করিয়াছে, সুয়েজ হইতেও ভূপতির চিঠি আসিল, বৌঠান তাহার মধ্যেও প্রণাম পাইল। মাল্টা হইতে যে চিঠি পাওয়া গেল তাহাতেও পুনশ্চ নিবেদনে বৌঠানের প্রণাম আসিল।

চারু অমলের একখানা চিঠিও পাইল না। ভূপতির চিঠিগুলি চাহিয়া লইয়া চারু উল্টিয়া পাল্টিয়া বারবার করিয়া পড়িয়া দেখিল—প্রণাম জ্ঞাপন ছাড়া আর কোথাও তাহার সম্বন্ধে আভাসমাত্রও নাই।

চারু এই কয় দিন যে একটি শান্ত বিষাদের চন্দ্রাতপচ্ছায়ায় আশ্রয় লইয়াছিল অমলের এই উপেক্ষায় তাহা ছিন্ন হইয়া গেল। অন্তরের মধ্যে তাহার হৃৎপিণ্ডটা লইয়া আবার যেন ছেঁড়াছেঁড়ি

আরম্ভ হইল। তাহার সংসারের কর্ত্তব্য-স্থিতির মধ্যে আবার ভূমিকম্পের আন্দোলন জাগিয়া উঠিল।

এখন ভূপতি এক একদিন অর্দ্ধরাত্রে উঠিয়া দেখে চারু বিছানায় নাই। খুঁজিয়া খুঁজিয়া দেখে চারু দক্ষিণের ঘরের জানালায় বসিয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া চারু তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলে, ঘরে আজ যে গরম, তাই একটু বাতাসে এসেছি!

ভূপতি উদ্বিগ্ন হইয়া বিছানায় পাখা টানার বন্দোবস্ত করিয়া দিল, এবং চারুর স্বাস্থ্যভঙ্গ আশঙ্কা করিয়া সর্ব্বদাই তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিল। চারু হাসিয়া বলিত, আমি বেশ আছি, তুমি কেন মিছামিছি ব্যস্ত হও?

এই হাসিটুকু ফুটাইয়া তুলিতে তাহার বক্ষের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিতে হইত।

অমল বিলাতে পৌঁছিল। চারু স্থির করিয়াছিল, পথে তাহাকে স্বতন্ত্র চিঠি লিখিবার যথেষ্ট সুযোগ হয়ত ছিল না, বিলাতে পৌঁছিয়া অমল লম্বা চিঠি লিখিবে। কিন্তু সে লম্বা চিঠি আসিল না।

প্রত্যেক মেল আসিবার দিনে চারু তাহার সমস্ত কাজকর্ম্ম কথাবার্ত্তার মধ্যে ভিতরে ভিতরে ছট্‌ফট্ করিতে থাকিত। পাছে ভূপতি বলে তোমার নামে চিঠি নাই এই জন্য সাহস করিয়া ভূপতিকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারিত না।

এমন অবস্থায় একদিন চিঠি আসিবার দিনে ভূপতি মন্দ-গমনে আসিয়া মৃদুহাস্যে কহিল, একটা জিনিষ আছে দেখ্‌বে?

চারু ব্যস্তসমস্ত চমকিত হইয়া কহিল, কই, দেখাও!

ভূপতি পরিহাসপূর্ব্বক দেখাইতে চাহিল না।

চারু অধীর হইয়া উঠিয়া ভূপতির চাদরের মধ্য হইতে বাঞ্ছিত পদার্থ কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিল। সে মনে মনে ভাবিল, সকাল হইতেই আমার মন বলিতেছে আজ আমার চিঠি আসিবেই—এ কখন ব্যর্থ হইতে পারে না।

ভূপতির পরিহাসস্পৃহা ক্রমেই বাড়িয়া উঠিল—সে চারুকে এড়াইয়া খাটের চারিদিকে ফিরিতে লাগিল।

তখন চারু একান্ত বিরক্তির সহিত খাটের উপর বসিয়া চোখ ছল্‌ছল্‌ করিয়া তুলিল।

চারুর একান্ত আগ্রহে ভূপতি অত্যন্ত খুসি হইয়া চাদরের ভিতর হইতে নিজের রচনার খাতাখানা বাহির করিয়া তাড়াতাড়ি চারুর কোলে দিয়া কহিল—রাগ কোরো না! এই নাও!

—০—

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

অমল যদিও ভূপতিকে জানাইয়াছিল যে, পড়াশুনার তাড়ায় সে দীর্ঘকাল পত্র লিখিতে সময় পাইবে না, তবু দুই এক মেল তাহার পত্র না আসাতে সমস্ত সংসার চারুর পক্ষে কণ্টকশয্যা হইয়া উঠিল।

সন্ধ্যাবেলায় পাঁচ কথার মধ্যে চারু অত্যন্ত উদাসীন ভাবে শান্তস্বরে তাহার স্বামীকে কহিল—আচ্ছা দেখ, বিলেতে একটা টেলিগ্রাফ করে জান্‌লে হয় না অমল কেমন আছে?

ভূপতি কহিল—দুই হপ্তা আগে তার চিঠি পাওয়া গেছে সে এখন পড়ায় ব্যস্ত।

চারু। ওঃ, তবে কাজ নেই। আমি ভাবছিলুম, বিদেশে আছে, যদি ব্যামোস্যামো হয়—বলাও যায় না।

ভূপতি। নাঃ তেমন কোন ব্যামো হলে খবর পাওয়া যেত। টেলিগ্রাফ করাও ত কম খরচা নয়।

চারু। তাই না কি! আমি ভেবেছিলুম বড় জোর একটাকা কি দুটাকা লাগ্‌বে।

ভূপতি। বল কি, প্রায় একশো টাকার ধাক্কা!

চারু। তা'হলে ত কথাই নেই!

দিন দুয়েক পরে চারু ভূপতিকে বলিল, আমার বোন্‌ এখন চুঁচড়োয় আছে, আজ একবার তার খবর নিয়ে আসিতে পার?

ভূপতি। কেন? কোন অসুখ করেছে না কি?

চারু। না, অসুখ না, জানই ত তুমি গেলে তারা কত খুসি হয়!

ভূপতি চারুর অনুরোধে গাড়ি চড়িয়া হাবড়া ষ্টেশন অভিমুখে ছুটিল। পথে একসার গরুরগাড়ি আসিয়া তাহার গাড়ি আটক করিল।

এমন সময় পরিচিত টেলিগ্রাফের হরকরা ভূপতিকে দেখিয়া তাহার হাতে একখানা টেলিগ্রাফ লইয়া দিল। বিলাতের টেলিগ্রাম দেখিয়া ভূপতি ভারি ভয় পাইল। ভাবিল অমলের হয় ত

অসুখ করিয়াছে। ভয়ে ভয়ে খুলিয়া দেখিল টেলিগ্রামে লেখা আছে আমি ভাল আছি!

ইহার অর্থ কি? পরীক্ষা করিয়া দেখিল, ইহা প্রী-পেড্ টেলিগ্রামের উত্তর।

হাওড়া যাওয়া হইল না। গাড়ি ফিরাইয়া ভূপতি বাড়ি আসিয়া স্ত্রীর হাতে টেলিগ্রাম দিল। ভূপতির হাতে টেলিগ্রাম দেখিয়া চারুর মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল!

ভূপতি কহিল, আমি এর মানে কিছুই বুঝ্তে পারচিনে। অনুসন্ধানে ভূপতি মানে বুঝিল। চারু নিজের গহনা বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার করিয়া টেলিগ্রাফ পাঠাইয়াছিল।

ভূপতি ভাবিল, এত করিবার ত দরকার ছিল না! আমাকে একটু অনুরোধ করিয়া ধরিলেই ত আমি টেলিগ্রাফ করিয়া দিতাম, চাকরকে দিয়া গোপনে বাজারে গহনা বন্ধক দিতে পাঠানো— এ ত ভাল হয় নাই!

থাকিয়া থাকিয়া ভূপতির মনে কেবলি এই প্রশ্ন হইতে লাগিল চারু কেন এত বাড়াবাড়ি করিল! একটা অস্পষ্ট সন্দেহ অলক্ষ্য ভাবে তাহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। সে সন্দেহটাকে ভূপতি প্রত্যক্ষভাবে দেখিতে চাহিল না, ভুলিয়া থাকিতে চেষ্টা করিল— কিন্তু বেদনা কোন মতে ছাড়িল না।

—*—

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

অমলের শরীর ভাল আছে, তবু সে চিঠি লেখে না! একেবারে এমন নিদারুণ ছাড়াছাড়ি হইল কি করিয়া? একবার মুখোমুখি এই প্রশ্নটার জবাব লইয়া আসিতে ইচ্ছা হয় কিন্তু মধ্যে সমুদ্র। পার হইবার কোন পথ নাই! নিষ্ঠুর বিচ্ছেদ, নিরুপায় বিচ্ছেদ, সকল প্রশ্ন, সকল প্রতিকারের অতীত বিচ্ছেদ।

চারু আপনাকে আর খাড়া রাখিতে পারে না। কাজকর্ম্ম পড়িয়া থাকে, সকল বিষয়েই ভুল হয়, চাকর বাকর চুরি করে; লোকে তাহার দীনভাব লক্ষ্য করিয়া নানা প্রকার কানাকানি করিতে থাকে, কিছুতেই তার চেতনা মাত্র নাই।

এমনি হইল, হঠাৎ চারু চমকিয়া উঠিত, কথা কহিতে কহিতে তাহাকে কাঁদিবার জন্য উঠিয়া যাইতে হইত, অমলের নাম শুনিবামাত্র তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া যাইত।

অবশেষে ভূপতিও সমস্ত দেখিল, এবং যাহা মুহূর্ত্তের জন্য ভাবে নাই তাহাও ভাবিল—সংসার একেবারে তাহার কাছে বৃদ্ধ শুষ্ক জীর্ণ হইয়া গেল।

মাঝে যে কয় দিন আনন্দের উন্মেষে ভূপতি অন্ধ হইয়াছিল সেই কয় দিনের স্মৃতি তাহাকে লজ্জা দিতে লাগিল। যে অনভিজ্ঞ বানর জহর চেনেনা তাহাকে ঝুঁটা পাথর দিয়া কি এমনি করিয়াই ঠকাইতে হয়!

চারুর যে সকল কথায় আদরে ব্যবহারে ভূপতি ভুলিয়াছিল

সে গুলা মনে আসিয়া তাহাকে "মূঢ়, মূঢ়, মূঢ়," বলিয়া বেত মারিতে লাগিল!

অবশেষে তাহার বহু কষ্টের বহু যত্নের রচনাগুলির কথা যখন মনে উদয় হইল তখন ভূপতি ধরণীকে দ্বিধা হইতে বলিল। অঙ্কুশতাড়িতের মত চারুর কাছে দ্রুতপদে গিয়া ভূপতি কহিল—আমার সেই লেখাগুলো কোথায়?

চারু কহিল, আমার কাছেই আছে।

ভূপতি কহিল—সেগুলো দাও।

চারু তখন ভূপতির জন্য ডিমের কচুরি ভাজিতেছিল, কহিল—তোমার কি এখনই চাই?

ভূপতি কহিল, হাঁ এখনই চাই।

চারু কড়া নামাইয়া রাখিয়া আলমারী হইতে খাতা ও কাগজগুলি বাহির করিয়া আনিল।

ভূপতি অধীরভাবে তাহার হাত হইতে সমস্ত টানিয়া লইয়া খাতা পত্র একেবারে উনানের মধ্যে ফেলিয়া দিল।

চারু ব্যস্ত হইয়া সেগুলা বাহির করিবার চেষ্টা করিয়া কহিল—একি কর্‌লে?

ভূপতি তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া গর্জ্জন করিয়া বলিল—থাক্!

চারু বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সমস্ত লেখা নিঃশেষে পুড়িয়া ভস্ম হইয়া গেল।

চারু বুঝিল। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। কচুরিভাজা অসমাপ্ত রাখিয়া ধীরে ধীরে অন্যত্র চলিয়া গেল।

চারুর সম্মুখে খাতা নষ্ট করিবার সঙ্কল্প ভূপতির ছিল না। কিন্তু ঠিক সাম্‌নেই আগুনটা জ্বলিতেছিল, দেখিয়া কেমন যেন তাহার খুন চাপিয়া উঠিল। ভূপতি আত্মসম্বরণ করিতে না পারিয়া প্রবঞ্চিত নির্ব্বোধের সমস্ত চেষ্টা বঞ্চনাকারিণীর সম্মুখেই আগুনে ফেলিয়া দিল।

সমস্ত ছাই হইয়া গেলে ভূপতির আকস্মিক উদ্দামতা যখন শান্ত হইয়া আসিল, তখন চারু আপন অপরাধের বোঝা বহন করিয়া যেরূপ গভীর বিষাদে নীরব নতমুখে চলিয়া গেল তাহা ভূপতির মনে জাগিয়া উঠিল—সম্মুখে চাহিয়া দেখিল ভূপতি বিশেষ করিয়া ভালবাসে বলিয়াই চারু স্বহস্তে যত্ন করিয়া খাবার তৈরি করিতেছিল।

ভূপতি বারান্দার রেলিঙের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইল। মনে মনে ভাবিতে লাগিল—তাহার জন্য চারুর এই যে সকল অশ্রান্ত চেষ্টা, এই যে সমস্ত প্রাণপণ বঞ্চনা ইহা অপেক্ষা সকরুণ ব্যাপার জগৎসংসারে আর কি আছে? এই সমস্ত বঞ্চনা, এ ত ছলনাকারিণীর হেয় ছলনামাত্র নহে; এই ছলনাগুলির জন্য ক্ষতহৃদয়ের ক্ষতযন্ত্রণা চতুর্গুণ বাড়াইয়া অভাগিনীকে এতদিন প্রতিমুহূর্ত্তে হৃৎপিণ্ড হইতে রক্ত নিষ্পেষণ করিয়া বাহির করিতে হইয়াছে। ভূপতি মনে মনে কহিল—হায় অবলা, হায় দুঃখিনী! দরকার ছিল না, আমার এ সব কিছুই দরকার ছিল না! এতকাল আমি ত ভালবাসা না পাইয়াও পাই নাই বলিয়া জানিতেও পারি নাই—আমার ত কেবল প্রুফ দেখিয়া কাগজ লিখিয়াই

চলিয়া গিয়াছিল—আমার জন্য এত করিবার কোন দরকার ছিল না!

তখন আপনার জীবনকে চারুর জীবন হইতে দূরে সরাইয়া লইয়া,—ডাক্তার যেমন সাংঘাতিক ব্যাধিগ্রস্থ রোগীকে দেখে—ভূপতি তেমনি করিয়া নিঃসম্পর্ক লোকের মত চারুকে দূর হইতে দেখিল। ঐ একটি ক্ষীণশক্তি নারীর হৃদয় কি প্রবল সংসারের দ্বারা চারিদিকে আক্রান্ত হইয়াছে। এমন লোক নাই যাহার কাছে সকল কথা ব্যক্ত করিতে পারে, এমন কথা নহে যাহা ব্যক্ত করা যায়, এমন স্থান নাই যেখানে সমস্ত হৃদয় উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়া সে হাহাকার করিয়া উঠিতে পারে,—অথচ এই অপ্রকাশ্য, অপরিহার্য্য, অপ্রতিবিধেয়, প্রত্যহপুঞ্জীভূত দুঃখভার বহন করিয়া নিতান্ত সহজ লোকের মত, তাহার সুস্থচিত্ত প্রতিবেশিনীদের মত তাহাকে প্রতিদিনের গৃহকর্ম্ম সম্পন্ন করিতে হইতেছে।

ভূপতি তাহার শয়নগৃহে গিয়া দেখিল—জানালার গরাদে ধরিয়া অশ্রুহীন অনিমেষ দৃষ্টিতে চারু বাহিরের দিকে চাহিয়া আছে। ভূপতি আস্তে আস্তে তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল—কিছু বলিল না—তাহার মাথার উপরে হাত রাখিল।

—০—

বিংশ পরিচ্ছেদ।

বন্ধুরা ভূপতিকে জিজ্ঞাসা করিল—ব্যাপারখানা কি? এত ব্যস্ত কেন?

ভূপতি কহিল—খবরের কাগজ—

বন্ধু। আবার খবরের কাগজ? ভিটেমাটি খবরের কাগজে মুড়ে গঙ্গার জলে ফেল্‌তে হবে নাকি?

ভূপতি। না, আর নিজে কাগজ করচিনে।

বন্ধু। তবে?

ভূপতি। মৈশুরে একটা কাগজ বের হবে, আমাকে তার সম্পাদক করেছে।

বন্ধু। বাড়িঘর ছেড়ে একেবারে মৈশুরে যাবে? চারুকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্চ?

ভূপতি। না, মামারা এখানে এসে থাক্‌বেন।

বন্ধু। সম্পাদকী নেশা তোমার আর কিছুতেই ছুট্‌ল না।

ভূপতি। মানুষের যাহোক্ একটা কিছু নেশা চাই।

বিদায়কালে চারু জিজ্ঞাসা করিল—কবে আস্‌বে?

ভূপতি কহিল—তোমার যদি একলা বোধ হয় আমাকে লিখো আমি চলে আস্‌ব।

বলিয়া বিদায় লইয়া ভূপতি যখন দ্বারের কাছ পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিল তখন হঠাৎ চারু ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল, কহিল—আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাও! আমাকে এখানে ফেলে রেখে যেও না!

ভূপতি থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া চারুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মুষ্টি শিথিল হইয়া ভূপতির হাত হইতে চারুর হাত খুলিয়া আসিল। ভূপতি চারুর নিকট হইতে সরিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল।

ভূপতি বুঝিল, অমলের বিচ্ছেদ স্মৃতি যে বাড়িকে বেষ্টন

করিয়া জ্বলিতেছে চারু দাবানলগ্রস্ত হরিণীর মত সে বাড়ি পরিত্যাগ করিয়া পালাইতে চায়। কিন্তু আমার কথা সে একবার ভাবিয়া দেখিল না? আমি কোথায় পালাইব? যে স্ত্রী হৃদয়ের মধ্যে নিয়ত অন্যকে ধ্যান করিতেছে, বিদেশে গিয়াও তাহাকে ভুলিতে সময় পাইব না? নির্জ্জন বন্ধুহীন প্রবাসে প্রত্যহ তাহাকে সঙ্গদান করিতে হইবে? সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া সন্ধ্যায় যখন ঘরে ফিরিব, তখন নিস্তব্ধ শোকপরায়ণা নারীকে লইয়া সেই সন্ধ্যা কি ভয়ানক হইয়া উঠিবে! যাহার অন্তরের মধ্যে মৃতভার, তাহাকে বক্ষের কাছে ধরিয়া রাখা সে আমি কতদিন পারিব! আরো কতবৎসর প্রত্যহ আমাকে এমনি করিয়া বাঁচিতে হইবে! যে আশ্রয় চূর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়া গেছে তাহার ভাঙ্গা ইট্‌কাটগুলা ফেলিয়া যাইতে পারিব না, কাঁধে করিয়া বহিয়া বেড়াইতে হইবে?

ভূপতি চারুকে আসিয়া কহিল—না, সে আমি পারিব না।

মুহূর্ত্তের মধ্যে সমস্ত রক্ত নামিয়া গিয়া চারুর মুখ কাগজের মত শুষ্ক শাদা হইয়া গেল, চারু মুঠা করিয়া খাট চাপিয়া ধরিল।

তৎক্ষণাৎ ভূপতি কহিল, চল, চারু আমার সঙ্গেই চল!

চারু বলিল, না থাক্!
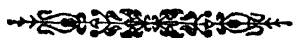
কর্ম্মফল।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আজ সতীশের মাসি সুকুমারী এবং মেসোমশায় শশধরবাবু আসিয়াছেন—সতীশের মা বিধুমুখী ব্যস্তসমস্তভাবে তাঁহাদের অভ্যর্থনায় নিযুক্ত। "এস দিদি, বস! আজ কোন্ পুণ্যে রায়-মশায়ের দেখা পাওয়া গেল! দিদি না আসলে তোমার আর দেখা পাবার জো নেই!"

শশধর। এতেই বুঝবে তোমার দিদির শাসন কি রকম কড়া! দিনরাত্রি চোখে চোখে রাখেন!

সুকুমারী। তাই বটে, এমন রত্ন ঘরে রেখেও নিশ্চিন্ত মনে ঘুমনো যায় না!

বিধুমুখী। নাকডাকার শব্দে!

সুকুমারী। সতীশ, ছি ছি, তুই এ কি কাপড় পরেছিস্? তুই কি এই রকম ধুতি পরে ইস্কুলে যাস্ না কি? বিধু, ওকে যে ফ্রকটা কিনে দিয়েছিলেম, সে কি হল?

বিধুমুখী। সে ও কোন্‌কালে ছিঁড়ে ফেলেছে!

সুকুমারী। তা ত ছিঁড়বেই! ছেলেমানুষের গায়ে এক কাপড় কতদিন টেকে! তা, তাই বলে কি আর নূতন ফ্রক তৈরি করাতে নেই! তোদের ঘরে সকলি অনাসৃষ্টি!

বিধুমুখী। জানই ত দিদি, তিনি ছেলের গায়ে সভ্য কাপড় দেখলেই আগুন হয়ে ওঠেন। আমি যদি না থাকতেম ত তিনি বোধ হয় ছেলেকে দোলাই গায়ে দিয়ে কোমরে ঘুন্‌সি পরিয়ে ইস্কুলে পাঠাতেন—মাগো! এমন সৃষ্টিছাড়া পছন্দও কারো দেখি নি!

সুকুমারী। মিছে না! এক বই ছেলে নয়—একে একটু সাজাতে গোজাতেও ইচ্ছা করে না! এমন বাপও ত দেখি নি! সতীশ, পরশু রবিবার আছে, তুই আমাদের বাড়ি যাস্, আমি তোর জন্য একসুট্ কাপড় র‍্যামজের ওখান হতে আনিয়ে রাখব। আহা ছেলেমানুষের কি সখ্ হয় না!

সতীশ। একসুটে আমার কি হবে মাসিমা! ভাদুড়ি সাহেবের ছেলে আমার সঙ্গে একসঙ্গে পড়ে—সে আমাকে তাদের বাড়িতে পিংপং খেলায় নিমন্ত্রণ করেছে—আমার ত সে রকম বাইরে যাবার মখ্‌মলের কাপড় নেই!

শশধর। তেমন জায়গায় নিমন্ত্রণে না যাওয়াই ভাল সতীশ!

সুকুমারী। আচ্ছা, আচ্ছা, তোমার আর বক্তৃতা দিতে হবে না! ওর যখন তোমার মতন বয়স হবে, তখন—

শশধর। তখন ওকে বক্তৃতা দেবার অন্য লোক হবে, বৃদ্ধ মেসোর পরামর্শ শোনবার অবসর হবে না।

সুকুমারী। আচ্ছা, মশায়, বক্তৃতা করবার অন্য লোক যদি তোমাদের ভাগ্যে না জুটত তবে তোমাদের কি দশা হত বল দেখি!

শশধর। সে কথা বলে লাভ কি! সে অবস্থা কল্পনা করাই ভাল!

সতীশ। (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) না, না, এখানে আনতে হবে না আমি যাচ্চি! (প্রস্থান)

সুকুমারী। সতীশ ব্যস্ত হয়ে পালাল কেন বিধু?

বিধুমুখী। থালায় করে তার জলখাবার আন্‌ছিল কি না, ছেলের তাই তোমাদের সাম্‌নে লজ্জা!

সুকুমারী। আহা, বেচারার লজ্জা হতে পারে! ও সতীশ, শোন্‌ শোন্‌! তোর মেসোমশায় তোকে পেলেটির বাড়ি থেকে আইস্‌ ক্রিম্ খাইয়ে আনবেন, তুই ওঁর সঙ্গে যা! ওগো, যাও না—ছেলেমানুষকে একটু—

সতীশ। মাসিমা, সেখানে কি কাপড় পরে যাব?

বিধুমুখী। কেন, তোর ত চাপকান আছে।

সতীশ। সে বিশ্রী!

সুকুমারী। আর যাই হোক্ বিধু, তোর ছেলে ভাগ্যে পৈতৃক পছন্দটা পায় নি তাই রক্ষা! বাস্তবিক, চাপকান দেখ-লেই খান্‌সামা কিম্বা যাত্রার দলের ছেলে মনে পড়ে! এমন অসভ্য কাপড় আর নেই!

শশধর। এ কথাগুলো—

সুকুমারী। চুপি চুপি বল্‌তে হবে? কেন, ভয় করতে হবে কাকে! মন্মথ নিজের পছন্দমত ছেলেকে সাজ করাবেন আর আমরা কথা কইতেও পাব না!

শশধর। সর্ব্বনাশ! কথা বন্ধ করতে আমি বলি নে! কিন্তু সতীশের সাম্‌নে এ সমস্ত আলোচনা—

সুকুমারী। আচ্ছা আচ্ছা বেশ! তুমি ওকে পেলিটির ওখানে নিয়ে যাও!

সতীশ। না মাসিমা আমি সেখানে চাপকান পরে যেতে পারব না!

সুকুমারী। এই যে মন্মথবাবু আস্‌চেন। এখনি সতীশকে নিয়ে বকাবকি করে ওকে অস্থির করে তুলবেন। ছেলেমানুষ বাপের বকুনির চোটে ওর এক দণ্ড শান্তি নেই। আয় সতীশ, তুই আমার সঙ্গে আয়—আমরা পালাই। (প্রস্থান)।

(মন্মথের প্রবেশ।)

বিধু। সতীশ ঘড়ি ঘড়ি করে কয়দিন আমাকে অস্থির করে তুলেছিল। দিদি তাকে একটা রূপোর ঘড়ি দিয়েছেন—আমি আগে থাকতে বলে রাখলেম, তুমি আবার শুনলে রাগ করবে।

(প্রস্থান)

মন্মথ। আগে থাকতে বলে রাখলেও রাগ করব। শশধর, সে ঘড়িটি তোমাকে নিয়ে যেতে হবে।

শশধর। তুমি ত আচ্ছা লোক! নিয়ে ত গেলেম, শেষকালে বাড়ি গিয়ে জবাবদিহি করবে কে!

মন্মথ। না শশধর, ঠাট্টা নয়, আমি এ সব ভালবাসি নে!

শশধর। ভাল বাস না, কিন্তু সহ্যও করতে হয়—সংসারে এ কেবল তোমার একলারই পক্ষে বিধান নয়!

মন্মথ। আমার নিজের সম্বন্ধে হলে আমি নিঃশব্দে সহ্য করতেম। কিন্তু ছেলেকে আমি মাটি করতে পারি না। যে ছেলে চাবা-মাত্রই-পায়, চাবার পূর্ব্বেই যার অভাব মোচন হতে থাকে সে নিতান্ত দুর্ভাগা। ইচ্ছা দমন করতে না শিখে কেউ কোন কালে সুখী হতে পারে না। বঞ্চিত হয়ে ধৈর্য্যরক্ষা করবার যে বিদ্যা আমি তাই ছেলেকে দিতে চাই, ঘড়ি ঘড়ির চেন জোগাতে চাই নে।

শশধর। সে ত ভাল কথা কিন্তু তোমার ইচ্ছামাত্রই ত সংসারে সমস্ত বাধা তখনি ধূলিসাৎ হবে না। সকলেরই যদি তোমার মত সদ্বুদ্ধি থাকত তা হলে ত কথাই ছিল না ; তা যখন নেই তখন সাধুসঙ্কল্পকেও গায়ের জোরে চালানো যায় না, ধৈর্য্য চাই। স্ত্রীলোকের ইচ্ছার একেবারে উল্টামুখে চলবার চেষ্টা করলে অনেক বিপদে পড়বে—তার চেয়ে পাশ কাটিয়ে একটু ঘুরে গেলে সুবিধামত ফল পাওয়া যায়! বাতাস যখন উল্টা বয় জাহাজের পাল তখন আড় করে রাখতে হয়, নইলে চলা অসম্ভব।

মন্মথ। তাই বুঝি তুমি গৃহিণীর সকল কথাতেই সায় দিয়ে যাও! ভীরু!

শশধর। তোমার মত অসমসাহস আমার নেই। যার ঘর-কন্নার অধীনে চব্বিশঘণ্টা বাস করতে হয় তাঁকে ভয় না করব ত কাকে করব? নিজের স্ত্রীর সঙ্গে বীরত্ব করে লাভ কি? আঘাত করলেও কষ্ট, আঘাত পেলেও কষ্ট। তার চেয়ে তর্কের বেলায়

গৃহিণীর মতকে সম্পূর্ণ অকাট্য বলে স্বীকার করে কাজের বেলায় নিজের মত চালানোই সৎপরামর্শ—গোঁয়ার্ত্তমি করতে গেলেই মুস্কিল বাধে।

মন্মথ। জীবন যদি সুদীর্ঘ হত তবে ধীরে সুস্থে তোমার মতে চলা যেত। পরমায়ু যে অল্প।

শশধর। সেই জন্যই ত ভাই বিবেচনা করে চলতে হয়। সাম্‌নে একটা পাথর পড়লে যে লোক ঘুরে না গিয়া সেটা ডিঙিয়ে পথ সংক্ষেপ করতে চায় বিলম্ব তারই অদৃষ্টে আছে। কিন্তু তোমাকে এ সকল বলা বৃথা—প্রতিদিনই ত ঠেকছ তবু যখন শিক্ষা পাচ্চ না তখন আমার উপদেশে ফল নেই। তুমি এম্নি ভাবে চলতে চাও যেন তোমার স্ত্রী বলে একটা শক্তির অস্তিত্ব নেই—অথচ তিনি যে আছেন সে সম্বন্ধে তোমার লেশমাত্র সন্দেহ থাকবার কোনো কারণ দেখি নে।

—০—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দাম্পত্য কলহে চৈব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া—শাস্ত্রে এইরূপ লেখে। কিন্তু দম্পতিবিশেষে ইহার ব্যতিক্রম ঘটে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা তাহা অস্বীকার করেন না।

মন্মথবাবুর সহিত তাঁহার স্ত্রীর মধ্যে মধ্যে যে বাদ-প্রতিবাদ ঘটিয়া থাকে তাহা নিশ্চয়ই কলহ—তবু তাহার আরম্ভও বহু নহে তাহার ক্রিয়াও লঘু নহে—ঠিক অজাযুদ্ধের সঙ্গে তাহার তুলনা করা চলে না।

কয়েকটি দৃষ্টান্ত দ্বারা এ কথার প্রমাণ হইবে।

মন্মথবাবু কহিলেন—তোমার ছেলেটিকে যে বিলাতী পোষাক পরাতে আরম্ভ করেছ সে আমার পছন্দ নয়।

বিধু কহিলেন—পছন্দ বুঝি একা তোমারই আছে! আজ-কাল ত সকলেই ছেলেদের ইংরেজি কাপড় ধরিয়েছে!

মন্মথ হাসিয়া কহিলেন—সকলের মতেই যদি চলবে তবে সকলকে ছেড়ে একমাত্র আমাকেই বিবাহ করলে কেন?

বিধু। তুমি যদি কেবল নিজের মতেই চলবে তবে একা না থেকে আমাকেই বা তোমার বিবাহ করবার কি দরকার ছিল!

মন্মথ। নিজের মত চালাবার জন্যও যে অন্য লোকের দরকার হয়।

বিধু। নিজের বোঝা বহাবার জন্য ধোবার দরকার হয় গাধাকে—কিন্তু আমি ত আর—

মন্মথ। (জিব কাটিয়া) আরে রাম রাম, তুমি আমার সংসার মরুভূমির আরব ঘোড়া। কিন্তু সে প্রাণিবৃত্তান্তের তর্ক এখন থাক্! তোমার ছেলেটিকে সাহেব করে তুলো না!

বিধু। কেন করব না! তাকে কি চাষা করব!

এই বলিয়া বিধু ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

বিধুর বিধবা জা পাশের ঘরে বসিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মনে করিলেন, স্বামীস্ত্রীতে বিরলে প্রেমালাপ হইয়া গেল।

—০—

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মন্মথ। ওকি ও, তোমার ছেলেটিকে কি মাখিয়েছ?

বিধু। মুর্চ্ছা যেয়ো না, ভয়ানক কিছু নয়—একটুখানি এসেন্স মাত্র। তাও বিলাতি নয়—তোমাদের সাধের দিশি।

মন্মথ। আমি তোমাকে বারবার বলেছি ছেলেদের তুমি এ সমস্ত সৌখিন জিনিষ অভ্যাস করাতে পারবে না।

বিধু। আচ্ছা যদি তোমার আরাম বোধ হয় ত কাল হতে কেরোসিন্ এবং কাষ্টর্ অয়েল্ মাখাব।

মন্মথ। সেও বাজে খরচ হবে। যেটা না হলেও চলে সেটা না অভ্যাস করাই ভাল। কেরোসিন্ ক্যাষ্টর অয়েল্ গায় মাথায় মাখা আমার মতে অনাবশ্যক।

বিধু। তোমার মতে আবশ্যক জিনিষ ক'টা আছে তা ত জানি না, গোড়াতেই আমাকে বোধ হয় বাদ দিয়ে বসতে হয়।

মন্মথ। তোমাকে বাদ দিলে যে বাদ-প্রতিবাদ একেবারেই বন্ধ হবে! এতকালের দৈনিক অভ্যাস হঠাৎ ছাড়লে এ বয়সে হয় ত সহ্য হবে না! যাই হোক্ এ কথা আমি তোমাকে আগে হতে বলে রাখ্‌ছি ছেলেটিকে তুমি সাহেব কর বা নবাব কর বা সাহেবি-নবাবির খিচুড়ি পাকাও তার খরচ আমি জোগাব না। আমার মৃত্যুর পরে সে যা পাবে তাতে তার সখের খরচ কুলবে না।

বিধু। সে আমি জানি! তোমার টাকার উপরে ভরসা রাখলে ছেলেকে কপ্‌নি পরানো অভ্যাস করাতেম!

বিধুর এই অবজ্ঞাবাক্যে মর্ম্মাহত হইয়াও মন্মথ ক্ষণকালের মধ্যে সামলাইয়া লইলেন কহিলেন, আমিও তা জানি! তোমার ভগিনীপতি শশধরের পরেই তোমার ভরসা! তার সন্তান নেই বলে ঠিক করে বসে আছ তোমার ছেলেকেই সে উইলে সমস্ত লিখে পড়ে দিয়ে যাবে। সেই জন্যই যখন তখন ছেলেটাকে ফিরিঙ্গি সাজিয়ে এক গা গন্ধ মাখিয়ে তার মেসোর আদর কাড়বার জন্য পাঠিয়ে দাও! আমি দারিদ্র্যের লজ্জা অনায়াসেই সহ্য করতে পারি, কিন্তু ধনী কুটুম্বের সোহাগযাচনার লজ্জা আমার সহ্য হয় না।

এ কথা মন্মথর মনে অনেকদিন উদয় হইয়াছে—কিন্তু কথাটা কঠোর হইবে বলিয়া এ পর্য্যন্ত কখনো বলেন নাই। বিধু মনে করিতেন স্বামী তাঁহার গূঢ় অভিপ্রায় ঠিক বুঝিতে পারেন নাই, কারণ, স্বামিসম্প্রদায় স্ত্রীর মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে অপরিসীম মূর্খ। কিন্তু মন্মথ যে বসিয়া বসিয়া তাঁহার চাল ধরিতে পারিয়াছেন হঠাৎ জানিতে পারিয়া বিধুর পক্ষে মর্ম্মান্তিক হইয়া উঠিল।

মুখ লাল করিয়া বিধু কহিলেন—ছেলেকে মাসির কাছে পাঠালেও গায়ে সহে না, এত বড় মানী লোকের ঘরে আছি সে ত পূর্ব্বে বুঝতে পারিনি।

এমন সময় বিধবা জা ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিলেন—মেজ বৌ তোদের ধন্য! আজ সতেরো বৎসর হয়ে গেল তবু তোদের কথা ফুরাল না! রাত্রে কুলায় না শেষকালে দিনেও দুইজনে

মিলে ফিস্ ফিস্! তোদের জিবের আগায় বিধাতা এত মধু দিন রাত্রি জোগান কোথা হতে আমি তাই ভাবি! রাগ কোরো না ঠাকুরপো, তোমাদের মধুরালাপে ব্যাঘাত করব না, একবার কেবল দু মিনিটের জন্য মেজ বৌয়ের কাছ হতে শেলাইয়ের প্যাটার্ণটা দেখিয়ে নিতে এসেছি!

—০—

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সতীশ। জেঠাই মা!

জেঠাই মা। কি বাপ্!

সতীশ। আজ ভাদুড়ি সাহেবের ছেলেকে মা চা খাওয়াবেন তুমি যেন সেখানে হঠাৎ গিয়ে পোড়ো না!

জেঠাই মা। আমার যাবার দরকার কি সতীশ!

সতীশ। যদি যাও ত তোমার এ কাপড়ে চলবে না, তোমাকে—

জেঠাই মা। সতীশ, তোর কোন ভয় নেই আমি এই ঘরেই থাকব, যতক্ষণ তোর বন্ধুর চা খাওয়া না হয় আমি বার হব না।

সতীশ। জেঠাই মা, আমি মনে করছি তোমার এই ঘরেই তাকে চা খাওয়াবার বন্দোবস্ত করব। এ বাড়িতে আমাদের যে ঠাসাঠাসি লোক—চা খাবার ডিনার খাবার মত ঘর একটাও খালি পাবার জো নেই! মার শোবার ঘরে সিন্দুক্

ফিন্ধুক্ কত কি রয়েচে, সেখানে কাকেও নিয়ে যেতে লজ্জা করে।

জেঠাই মা। আমার এখানেও ত জিনিষ পত্র—

সতীশ। ওগুলো আজকের মত বার করে দিতে হবে। বিশেষত তোমার এই বঁটি চুপড়ি বারকোশগুলো কোথাও না লুকিয়ে রাখলে চলবে না।

জেঠাই মা। কেন বাবা, ও গুলোতে এত লজ্জা কিসের? তাদের বাড়িতে কি কুটনা কুটবার নিয়ম নাই।

সতীশ। তা জানিনে জেঠাই মা, কিন্তু চা খাবার ঘরে ওগুলো রাখা দস্তুর নয়। এ দেখলে নরেন ভাদুড়ি নিশ্চয় হাসবে, বাড়ি গিয়ে তার বোনদের কাছে গল্প করবে।

জেঠাই মা। শোন একবার ছেলের কথা শোন! বঁটি চুপ্‌ড়ি ত চিরকাল ঘরেই থাকে! তা নিয়ে গল্প করতে ত শুনি নি!

সতীশ। তোমাকে আর এক কাজ করতে হবে জেঠাই মা— আমাদের নন্দকে তুমি যেমন করে পার এখানে ঠেকিয়ে রেখো। সে আমার কথা শুনবে না, খালি গায়ে ফস্ করে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হবে।

জেঠাই মা। তাকে যেন ঠেকালেম কিন্তু তোমার বাবা যখন খালি গায়ে—

সতীশ। সে আমি আগেই মাসিমাকে গিয়ে ধরেছিলেম তিনি বাবাকে আজ পিঠে খাবার নিমন্ত্রণ করেছেন, বাবা এ সমস্ত কিছুই জানেন না!

জেঠাই মা। বাবা সতীশ, যা মন হয় করিস্ কিন্তু আমার ঘরটাতে তোদের ঐ খানাটানাগুলো—

সতীশ। সে ভাল করে সাফ করিয়ে দেব এখন।

—০—

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সতীশ। মা, এমন করে ত চলে না!

বিধু। কেন কি হয়েছে?

সতীশ চাঁদনির কোটট্রাউজার পরে আমার বা'র হতে লজ্জা, করে। সেদিন ভাদুড়ি সাহেবের বাড়ি ইভনিংপার্টি ছিল কয়েকজন বাবু ছাড়া আর সকলেই ড্রেসস্যুট পরে গিয়াছিল, আমি সেখানে এই কাপড়ে গিয়ে ভারি অপ্রস্তুতে পড়েছিলাম। বাবা কাপড়ের জন্য যে সামান্য টাকা দিতে চান তাতে ভদ্রতা রক্ষা হয় না।

বিধু। জান ত সতীশ তিনি যা ধরেন তা কিছুতেই ছাড়েন না! কত টাকা হলে তোমার মনের মত পোষাক হয় শুনি!

সতীশ। একটা মর্ণিংস্যুট আর একটা লাউঞ্জস্যুটে একশো টাকার কাছাকাছি লাগবে। একটা চলনসই ইভনিংড্রেস দেড়শো টাকার কমে কিছুতেই হবে না!

বিধু। বল কি সতীশ! এ ত তিনশো টাকার ধাক্কা। এত টাকা—

সতীশ। মা, ঐ তোমাদের দোষ। এক ফকিরি করতেচাও

সে ভাল, আর যদি ভদ্র সমাজে মিশতে হয় তবে অমন টানাটানি করে চলে না। ভদ্রতা রাখতে গেলে ত খরচ করতে হবে, তার ত কোন উপায় নেই। সুন্দর বনে পাঠিয়ে দাও না কেন সেখানে ড্রেস কোটের দরকার হবে না।

বিধু। তা ত জানি, কিন্তু—আচ্ছা তোমার মেসো ত তোমাকে জন্মদিনের উপহার দিয়ে থাকেন এবারকার জন্য একটা নিমন্ত্রণের পোশাক তাঁর কাছ হতে জোগাড় করে নাওনা। কথায় কথায় তোমার মাসির কাছে একটু আভাস দিলেই হয়।

সতীশ। সে ত অনায়াসেই পারি কিন্তু বাবা যদি টের পান আমি মেসোর কাছ হইতে কাপড় আদায় করেছি তা হলে রক্ষা থাকিবে না।

বিধু। আচ্ছা, সে আমি সামলাতে পারব। (সতীশের প্রস্থান) ভাদুড়ি সাহেবের মেয়ের সঙ্গে যদি সতীশের কোন মতে বিবাহের জোগাড় হয় তা হলেও আমি সতীশের জন্য অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকতে পারি। ভাদুড়ি সাহেব ব্যারিষ্টার মানুষ, বেশ দু দশ টাকা রোজগার করে। ছেলেবেলা হতেই সতীশ ত ওদের বাড়ি আনাগোনা করে, মেয়েটি ত আর পাষাণ নয়, নিশ্চয় আমার সতীশকে পছন্দ করবে! সতীশের বাপ ত এ সব কথা একবার চিন্তাও করেন না, বলতে গেলে আগুন হয়ে ওঠে, ছেলের ভবিষ্যতের কথা আমাকেই সমস্ত ভাবতে হয়।

—০—

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

মিষ্টার ভাদুড়ির বাড়িতে টেনিস্‌ক্ষেত্র।

নলিনী। ও কি সতীশ পালাও কোথায় ?

সতীশ। তোমাদের এখানে টেনিসপার্টি জান্‌তেম না, আমি টেনিসস্যুট পরে আসিনি!

নলিনী। সকল গরুর ত এক রঙের চামড়া হয় না, তোমার না হয় ওরিজিন্যাল বলেই নাম রটবে। আচ্ছা, আমি তোমার সুবিধা করে দিচ্চি। মিষ্টার নন্দী আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে।

নন্দী। অনুরোধ কেন হুকুম বলুন না—আমি আপনারি সেবার্থে!

নলিনী। যদি একবারে অসাধ্য বোধ না করেন ত আজকের মত আপনারা সতীশকে মাপ করবেন—ইনি আজ টেনিসস্যুট পরে আসেন নি।এত বড় শোচনীয় দুর্ঘটনা!

নন্দী। আপনি ওকালতি করলে খুন, জাল, ঘর জালানও মাপ করতে পারি। টেনিস্‌স্যুট না পরে এলে যদি আপনার এত দয়া হয় তবে আমার এই টেনিস্‌স্যুটটা মিষ্টার সতীশকে দান করে তাঁর এই—এটাকে কি বলি! তোমার এটা কি স্যুট সতীশ ?—খিচুড়ী স্যুটই বলা যাক—তা আমি সতীশের এই খিচুড়ী স্যুটটা পরে রোজ এখানে আসব। আমার দিকে যদি স্বর্গের সমস্ত সূর্য্য-চন্দ্রতারা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে তবু লজ্জা করব না।

সতীশ এ কাপড়টা দান করতে যদি তোমার আপত্তি থাকে তবে তোমার দর্জ্জির ঠিকানাটা আমাকে দিয়ো। ফ্যাশানেবল ছাঁটের চেয়ে ভাহুড়ীর দয়া অনেক মূল্যবান্।

নলিনী। শোন, শোন সতীশ, শুনে রাখ। কেবল কাপড়ের ছাঁট নয় মিষ্ট কথার ছাঁদও তুমি মিষ্টার নন্দীর কাছে শিখতে পার। এমন আদর্শ আর পাবে না! বিলাতে ইনি ডিউক্ ডাচেস্ ছাড়া আর কারও সঙ্গে কথাও কন নাই। মিষ্টার নন্দী, আপনাদের সময় বিলাতে বাঙালী ছাত্র কে কে ছিল?

নন্দী। আমি বাঙালীদের সঙ্গে সেখানে মিশিনি।

নলিনী। শুনচ সতীশ! রীতিমত সভ্য হতে গেলে কত সাবধানে থাকতে হয়! তুমি বোধ হয় চেষ্টা করলে পারবে। টেনিস্‌সুট সম্বন্ধে তোমার যে রকম সূক্ষ্ম ধর্ম্মজ্ঞান তাতে আশা হয়। (অন্যত্র গমন)

সতীশ। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) নেলিকে আজ পর্য্যন্ত বুঝতেই পারলেম না। আমাকে দেখে ও বোধ হয় মনে মনে হাসে। আমারও মুস্কিল হয়েছে আমি কিছুতে এখানে এসে সুস্থ মনে থাকতে পারি নে—কেবলি মনে হয় আমার টাইটা বুঝি কলারের উপরে উঠে গেছে, আমার ট্রাউজারে হাঁটুর কাছটায় হয় ত কুঁচ্‌কে আছে। নন্দীর মত কবে আমিও বেশ ঐ রকম অনায়াসে স্ফূর্ত্তির সঙ্গে—

নলিনী। (পুনরায় আসিয়া) কি সতীশ, এখনও যে তোমার মনের খেদ মিট্‌ল না! টেনিস্ কোর্ত্তার শোকে তোমার হৃদয়টা

যে বিদীর্ণ হয়ে গেল! হায়, কোর্ত্তাহারা হৃদয়ের সান্ত্বনা জগতে কোথায় আছে—দর্জ্জির বাড়ি ছাড়া!

সতীশ। আমার হৃদয়টার খবর যদি রাখতে তবে এমন কথা আর বলতে না নেলি!

নলিনী। (করতালি দিয়া) বাহবা! মিষ্টার নন্দীর দৃষ্টান্তে মিষ্ট কথার আমদানি এখনি সুরু হয়েছে! প্রশ্রয় পেলে অত্যন্ত উন্নতি হবে ভরসা হচ্ছে! এস একটু কেক খেয়ে যাবে, মিষ্ট কথার পুরস্কার মিষ্টান্ন।

সতীশ। না আজ আর খাবনা, আমার শরীরটা—

নলিনী। সতীশ, আমার কথা শোন,—টেনিস্ কোর্ত্তার খেদে শরীর নষ্ট কোরো না, খাওয়া দাওয়া একেবারে ছাড়া ভাল নয়। কোর্ত্তা জিনিসটা জগতের মধ্যে সেরা জিনিস সন্দেহ নেই কিন্তু এই তুচ্ছ শরীরটা না হলে সেটা ঝুলিয়ে বেড়াবার সুবিধা হয় না!

—০—

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

শশধর। দেখ মন্মথ সতীশের উপরে তুমি বড় কড়া ব্যবহার আরম্ভ করেছ, এখন ওর প্রতি অতটা শাসন ভাল নয়!

বিধু। বল ত রায় মশায়! আমি ত ওঁকে কিছুতেই বুঝিয়ে পারলেম না!

মন্মথ। ছুটো অপবাদ এক মুহূর্ত্তেই! একজন বল্লেন নির্দ্দয়

আর একজন বল্লেন নির্ব্বোধ! যাঁর কাছে হতবুদ্ধি হয়ে আছি তিনি যা বলেন সহ্য করতে রাজি আছি—তাঁর ভগ্নী যাহা বলবেন তার উপরেও কথা কব না, কিন্তু তাই বলে তাঁর ভগ্নীপতি পর্য্যন্ত সহিষ্ণুতা চলবে না। আমার ব্যবহারটা কি রকম কড়া শুনি!

শশধর। বেচারা সতীশের একটু কাপড়ের সখ আছে, ও পাঁচ জায়গায় মিশতে আরম্ভ করেছে ওকে তুমি চাঁদনীর—

মন্মথ। আমি ত চাঁদনীর কাপড় পরতে বলিনে। ফিরিঙ্গি পোষাক আমার দু চক্ষের বিষ। ধুতি চাদর চাপকান চোগা পরুক কখনো লজ্জা পেতে হবে না।

শশধর। দেখ মন্মথ সতীশ যদি এ বয়সে সখ মিটিয়ে না নিতে পারে তবে বুড়া বয়সে খামকা কি করে বসবে সে আরো বদ্ দেখতে হবে। আর ভেবে দেখ যেটাকে আমরা শিশুকাল হতেই সভ্যতা বলে শিখচি তার আক্রমণ ঠেকাবে কি করে?

মন্মথ। যিনি সভ্য হবেন তিনি সভ্যতার মালমসলা নিজের খরচেই জোগাবেন। যে দিক হতে তোমার সভ্যতা আসছে টাকাটা সে দিক হতে আসছে না, বরং এখান হতে সেই দিকেই যাচ্ছে।

বিধু। রায় মশায়, পেরে উঠবে না—দেশের কথা উঠে পড়লে ওঁকে থামানো যায় না।

শশধর। ভাই মন্মথ, ও সব কথা আমিও বুঝি। কিন্তু ছেলেদের আবদারও ত এড়াতে পারিনে। সতীশ ভাদুড়ি সাহেব-দের সঙ্গে যখন মেশামেশি করচে তখন উপযুক্ত কাপড় না

থাকলে ও বেচারার বড় মুস্কিল। আমি র‍্যাঙ্কিনের বাড়ীতে ওর জন্য—

ভৃত্যের প্রবেশ।

ভৃত্য। সাহেব বাড়ি হতে এই কাপড় এয়েছে।

মন্মথ। নিয়ে যা কাপড়, নিয়ে যা! এখনি নিয়ে যা! (বিধুর প্রতি) দেখ সতীশকে যদি আমি এ কাপড় পরতে দেখি তবে তাকে বাড়িতে থাকতে দেব না মেসে পাঠিয়ে দেব সেখানে সে আপন ইচ্ছামত চলতে পারবে! (দ্রুত প্রস্থান)

শশধর। অবাক কাণ্ড!

বিধু। (সরোদনে) রায় মশায়, তোমাকে কি বলব আমার বেঁচে সুখ নেই। নিজের ছেলের উপর বাপের এমন ব্যবহার কেউ কোথাও দেখেচে!

শশধর। আমার প্রতি ব্যবহারটাও ত ঠিক ভাল হল না। বোধ হয় মন্মথর হজমের গোল হয়েচে। আমার পরামর্শ শোন, তুমি ওকে রোজ সেই একই ডাল ভাত খাইয়ো না। ও যতই বলুক না কেন মাঝে মাঝে মসলাওয়ালা রান্না না হলে মুখে রোচে না, হজমও হয় না। কিছুদিন ওকে ভাল করে খাওয়াও দেখি তার পরে তুমি যা বলবে ও তাই শুনবে। এ সম্বন্ধে তোমার দিদি তোমার চেয়ে ভাল বোঝেন। (প্রস্থান, বিধুর ক্রন্দন)

বিধবা জা। (ঘরে প্রবেশ করিয়া আত্মগত) কখনো কান্না কখনো হাসি—কত রকম যে সোহাগ তার ঠিক নেই—বেশ

আছে (দীর্ঘ নিশ্বাস)। ও মেজ বৌ, গোসাঘরে বসেছিস! ঠাকুরপোকে ডেকে দিই, মানভঞ্জনের পালা হয়ে যাক!

—০—

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

নলিনী। সতীশ, আমি তোমাকে কেন ডেকে পাঠিয়েচি বলি, রাগ কোরো না!

সতীশ। তুমি ডেকেচ বলে রাগ করব আমার মেজাজ কি এতই বদ্?

নলিনী। না ও সব কথা থাক! সকল সময়েই নন্দী সাহেবের চেলাগিরি কোরো না! বল দেখি, আমার জন্মদিনে তুমি আমাকে অমন দামি জিনিস কেন দিলে?

সতীশ। যাঁকে দিয়েচি তাঁর তুলনায় জিনিসটার দাম এমনই কি বেশি!

নলিনী। আবার ফের নন্দীর নকল!

সতীশ। নন্দীর নকল সাধে করি! তার প্রতি যখন ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষপাত—

নলিনী। তবে যাও, তোমার সঙ্গে আর আমি কথা কব না।

সতীশ। আচ্ছা মাপ কর, আমি চুপ করে শুনব।

নলিনী। দেখ সতীশ, মিষ্টার নন্দী আমাকে নির্ব্বোধের মত একটা দামি ব্রেস্‌লেট পাঠিয়েছিলেন, তুমি অমনি

নির্ব্বুদ্ধিতার সুর চড়িয়ে তার চেয়ে দামি একটা নেক্‌লেস্‌ পাঠাতে গেলে কেন?

সতীশ। যে অবস্থায় লোকের বিবেচনাশক্তি থাকে না সে অবস্থাটা তোমার জানা নেই বলে তুমি রাগ করচ নেলি!

নলিনী। আমার সাত জন্মে জেনে কাজ নেই! কিন্তু এ নেক্‌লেস্‌ তোমাকে ফিরে নিয়ে যেতে হবে।

সতীশ। ফিরে দেবে?

নলিনী। দেব। বাহাদুরি দেখাবার জন্য যে দান, আমার কাছে সে দানের কোন মূল্য নেই!

সতীশ। তুমি অন্যায় বলছ নেলি।

নলিনী। আমি কিছুই অন্যায় বলচিনে—তুমি যদি আমাকে একটি ফুল দিতে আমি ঢের বেশি খুসি হতেম। তুমি যখন-তখন প্রায়ই মাঝে-মাঝে আমাকে কিছু না কিছু দামি জিনিস পাঠাতে আরম্ভ করেছ। পাছে তোমার মনে লাগে বলে আমি এতদিন কিছুই বলি নি। কিন্তু ক্রমেই মাত্রা বেড়ে চলেছে আর আমার চুপ করে থাকা উচিত নয়। এই নাও তোমার নেক্‌লেস্‌।

সতীশ। এ নেক্‌লেস্‌ তুমি রাস্তায় টান মেরে ফেলে দাও কিন্তু আমি এ কিছুতেই নেব না।

নলিনী। আচ্ছা সতীশ, আমি ত তোমাকে ছেলেবেলা হতেই জানি, আমার কাছে ভাঁড়িয়োনা। সত্য করে বল, তোমার কি অনেক টাকা ধার হয় নি?

সতীশ। কে তোমাকে বলেচে? নরেন বুঝি?

নলিনী। কেউ বলে নি। আমি তোমার মুখ দেখেই বুঝতে পারি। আমার জন্য তুমি এমন অন্যায় কেন করচ?

সতীশ। সময়বিশেষে লোকবিশেষের জন্য মানুষ প্রাণ দিতে ইচ্ছে করে; আজকালকার দিনে প্রাণ দেবার অবকাশ খুঁজে পাওয়া যায় না—অন্তত ধার করবার দুঃখটুকু স্বীকার করবার যে সুখ তাও কি ভোগ করতে দেবে না? আমার পক্ষে যা দুঃসাধ্য আমি তোমার জন্য তাই করতে চাই নেলি, একেও যদি তুমি নন্দী সাহেবের নকল বল তবে আমার পক্ষে মর্ম্মান্তিক হয়।

নলিনী। আচ্ছা তোমার যা করবার তা ত করেচ—তোমার সেই ত্যাগস্বীকারটুকু আমি নিলেম—এখন এ জিনিসটা ফিরে নাও।

সতীশ। ওটা যদি আমাকে ফিরিয়ে নিতে হয় তবে ঐ নেক্‌লেস্‌টা গলায় ফাঁস লাগিয়ে দম বন্ধ করে আমার পক্ষে মরা ভাল।

নলিনী। দেনা তুমি শোধ করবে কি করে?

সতীশ। মার কাছ হতে টাকা পাব।

নলিনী। ছি ছি, তিনি মনে করবেন আমার জন্যই তাঁর ছেলের দেনা হচ্চে।

সতীশ। সে কথা তিনি কখনই মনে করবেন না, তাঁর ছেলেকে তিনি অনেক দিন হতে জানেন।

নলিনী। আচ্ছা সে যাই হোক তুমি প্রতিজ্ঞা কর এখন হতে

তুমি তামাকে দামি জিনিস দেবে না। বড় জোর ফুলের তোড়ার বেশী আর কিছু দিতে পারবে না।

সতীশ। আচ্ছা সেই প্রতিজ্ঞাই করলেম।

নলিনী। যাক্, এখন তবে তোমার গুরু নন্দী সাহেবের পাঠ আবৃত্তি কর! দেখি স্তুতিবাদ করবার বিদ্যা তোমার কতদূর অগ্রসর হল। আচ্ছা আমার কানের ডগা সম্বন্ধে কি বলিতে পার বল—আমি তোমাকে পাঁচ মিনিট সময় দিলেম।

সতীশ। যা বলব তাতে ঐ ডগাটুকু লাল হয়ে উঠবে।

নলিনী। বেশ বেশ, ভূমিকাটা মন্দ হয়নি। আজকের মত ঐটুকুই থাক বাকিটুকু আর একদিন হবে। এখনি কান ঝাঁ ঝাঁ করতে সুরু হয়েছে।

—০—

নবম পরিচ্ছেদ।

বিধু। আমার উপর রাগ কর যা কর ছেলের উপর কোরো না। তোমার পায়ে ধরি এবারকার মত তার দেনাটা শোধ করে দাও!

মন্মথ। আমি রাগারাগি করচিনে, আমার যা কর্ত্তব্য তা আমাকে করতেই হবে! আমি সতীশকে বার বার বলেচি দেনা করলে শোধবার ভার আমি নেব না। আমার সে কথার অন্যথা হবে না।

বিধু। ওগো এত বড় সত্যপ্রতিজ্ঞ যুধিষ্টির হলে সংসারে চলে না! সতীশের এখন বয়স হয়েচে তাকে জলপানি যা দাও তাতে ধার না করে তাহার চলে কি করে বল দেখি!

মন্মথ। যার যেরূপ সাধ্য তার চেয়ে চাল বড় করলে কারোই চলে না, ফকিরেরও না বাদসারও না।

বিধু। তবে কি ছেলেকে জেলে যেতে দেবে?

মন্মথ। সে যদি যাবার আয়োজন করে এবং তোমরা যদি তার যোগাড় দাও তবে আমি ঠেকিয়ে রাখব কি করে? (প্রস্থান)

শশধরের প্রবেশ।

শশধর। আমাকে এ বাড়ীতে দেখলে মন্মথ ভয় পায়। ভাবে কালো কোর্ত্তা ফরমাস দেবার জন্য ফিতা হাতে তার ছেলের গায়ের মাপ নিতে এসেছি। তাই ক'দিন আসিনি আজ তোমার চিঠি পেয়ে সুকু কান্নাকাটি করে আমাকে বাড়ীছাড়া করেচে।

বিধু। দিদি আসেন নি?

শশধর। তিনি এখনি আসবেন। ব্যাপারটা কি?

বিধু। সবই ত শুনেছ। এখন ছেলেটাকে জেলে না দিলে ওঁর মন সুস্থির হচ্ছে না। র‍্যাঙ্কিন হার্ম্মানের পোষাক তাঁর পছন্দ হল না, জেলখানার কাপড়টাই বোধ হয় তাঁর মতে বেশ সুসভ্য!

শশধর। আর যাই বল, মন্মথকে বোঝাতে যেতে আমি পারব না। তার কথা আমি বুঝি নে আমার কথাও সে বোঝে না, শেষকালে—

বিধু। সে কি আমি জানি নে? তোমরা ত তাঁর স্ত্রী নও যে মাথা হেঁট করে সমস্তই সহ্য করবে! কিন্তু এখন এ বিপদ ঠেকাই কি করে?

শশধর। তোমার হাতে কিছু কি—

বিধু। কিছুই নেই—সতীশের ধার শুধ্‌তে আমার প্রায় সমস্ত গহনাই বাঁধা পড়েছে হাতে কেবল বালাজোড়া আছে।

সতীশের প্রবেশ।

শশধর। কি সতীশ, খরচপত্র বিবেচনা করে কর না এখন কি মুস্কিলে পড়েছ দেখ দেখি!

সতীশ। মুস্কিল ত কিছুই দেখি নে।

শশধর। তবে হাতে কিছু আছে বুঝি! ফাঁস কর নি।

সতীশ। কিছু ত আছেই।

শশধর। কত?

সতীশ। আফিম কেনবার মত।

বিধু। (কাঁদিয়া উঠিয়া) সতীশ, ও কি কথা তুই বলিস আমি অনেক দুঃখ পেয়েছি, আমাকে আর দগ্ধাসনে।

শশধর। ছি ছি সতীশ। এমন কথা যদিবা কখনো মনেও আসে তবু কি মার সামনে উচ্চারণ করা যায়? বড় অন্যায় কথা।

সুকুমারীর প্রবেশ।

বিধু। দিদি সতীশকে রক্ষা কর। ও কোন্ দিন কি করে বসে আমি ত ভয়ে বাঁচি নে। ও যা বলে শুনে আমার গা কাঁপে।

সুকুমারী। ও আবার কি বলে।

বিধু। বলে কিনা আফিম কিনে আনবে।

সুকুমারী। কি সর্ব্বনাশ! সতীশ তামায় গা ছুঁয়ে বল এমন কথা মনেও আনবি নে! চুপ করে রইলি যে! লক্ষ্মী বাপ আমার! তোর মা মাসির কথা মনে করিস্।

সতীশ। জেলে বসে মনে করার চেয়ে এ সমস্ত হাস্যকর ব্যাপার জেলের বাইরে চুকিয়ে ফেলাই ভাল!

সুকুমারী। আমরা থাকতে তোকে জেলে কে নিয়ে যাবে?

সতীশ। পেয়াদা।

সুকুমারী। আচ্ছা সে দেখব কত বড় পেয়াদা; ও গো এই টাকাটা ফেলে দাও না, ছেলে মানুষকে কেন কষ্ট দেওয়া!

শশধর। টাকা ফেলে দিতে পারি কিন্তু মন্মথ আমার মাথায় ইঁট ফেলে না মারে!

সতীশ। মেশোমশায়, সে ইঁট তোমার মাথায় পৌঁছবে না, আমার ঘাড়ে পড়বে। একে একজামিনে ফেল করেছি; তার উপরে দেনা, এর উপরে জেলে যাবার এত বড় সুযোগটা যদি মাটি হয়ে যায় তবে বাবা আমার সে অপরাধ মাপ করবেন না।

বিধু। সত্যি দিদি। সতীশ মেশোর টাকা নিয়েচে শুনলে তিনি বোধ হয় ওকে বাড়ী হতে বার করে দেবেন।

সুকুমারী। তা দিন না! আর কি কোথাও বাড়ি নাই না কি! ও বিধু, সতীশকে তুই আমাকেই দিয়ে দে না! আমার ত ছেলেপুলে নেই, আমি না হয় ওকেই মানুষ করি! কি বলগো।

শশধর। সে ত ভালই। কিন্তু সতীশ যে বাঘের বাচ্ছা, ওকে টানতে গেলে তার মুখ থেকে প্রাণ বাঁচান দায় হবে!

সুকুমারী। বাঘ মশায় ত বাচ্ছাটিকে জেলের পেয়াদার হাতেই সমর্পণ করে দিয়েছেন আমরা যদি তাকে বাঁচিয়ে নিয়ে যাই এখন তিনি কোন কথা বলতে পারবেন না।

শশধর। বাঘিনী কি বলেন, বাচ্ছাই বা কি বলে!

সুকুমারী। যা বলে সে আমি জানি সে কথা আর জিজ্ঞাসা করতে হবে না! তুমি এখন দেনাটা শোধ করে দাও!

বিধু। দিদি।

সুকুমারী। আর দিদি দিদি করে কাঁদতে হবে না! চল্ তোর চুল বেঁধে দিই গে। এমন ছিরি করে তোর ভগ্নীপতির সাম্‌নে বাহির হতে লজ্জা করে না! (শশধর ব্যতীত সকলেরপ্রস্থান)

মন্মথর প্রবেশ।

শশধর। মন্মথ ভাই তুমি একটু বিবেচনা করে দেখ—

মন্মথ। বিবেচনা না করে ত আমি কিছুই করি না।

শশধর। তবে দোহাই তোমার, বিবেচনা একটু খাট কর! ছেলেটাকে কি জেলে দেবে? তাতে কি ওর ভাল হবে?

মন্মথ। ভালমন্দর কথা কেউই শেষ পর্য্যন্ত ভেবে উঠ্‌তে পারে না। কি আমি মোটামুটি এই বুঝি যে, বার-বার সাবধান করে দেওয়ার পরও যদি কেউ অন্যায় করে তবে তার ফলভোগ হতে তাকে কৃত্রিম উপায়ে রক্ষা করা কারও উচিৎ হয় না। আমরা যদি মাঝে পড়ে ব্যর্থ করে না দিতেম তবে প্রকৃতির কঠিন শিক্ষায় মানুষ যথার্থ মানুষ হয়ে উঠ্‌তে পারত।

শশধর। প্রকৃতির কঠোর শিক্ষাই যদি একমাত্র শিক্ষা হত

তবে বিধাতা বাপমায়ের মনে স্নেহটুকু দিতেন না। মন্মথ তুমি যে দিনরাত কর্ম্মফল কর্ম্মফল কর আমি তা সম্পূর্ণ মানি না। প্রকৃতি আমাদের কাছ হতে কর্ম্মফল কড়ায় গণ্ডায় আদায় করে নিতে চায় কিন্তু প্রকৃতির উপরে যিনি কর্ত্তা আছেন তিনি মাঝে পড়ে তার অনেকটাই মহকুপ দিয়ে থাকেন, নইলে কর্ম্মফলের দেনা শুধ্‌তে শুধ্‌তে আমাদের অস্তিত্ব পর্যান্ত বিকিয়ে যেত। বিজ্ঞানের হিসাবে কর্ম্মফল সত্য কিন্তু বিজ্ঞানের উপরেও বিজ্ঞান আছে সেখানে প্রেমের হিসাবে ফলাফল সমস্ত অন্য রকম। কর্ম্মফল নৈসর্গিক—মার্জ্জনাটা তার উপরের কথা।

মন্মথ। যিনি অনৈসর্গিক মানুষ তিনি যা খুসি করবেন, আমি অতি সামান্য নৈসর্গিক, আমি কর্ম্মফল শেষ পর্য্যন্তই মানি!

শশধর। আচ্ছা আমি যদি সতীশের দেনা শোধ করে তাকে খালাস করি তুমি কি করবে?

মন্মথ। আমি তাকে ত্যাগ করব। দেখ সতীশকে আমি যে ভাবে মানুষ করতে চেয়েছিলেন প্রথম হতেই বাধা দিয়ে তোমরা তা ব্যর্থ করেছ। একদিক হতে সংযম আর একদিক হতে প্রশ্রয় পেয়ে সে একেবারেই নষ্ট হয়ে গেছে। ক্রমাগতই ভিক্ষা পেয়ে যদি তার সম্মানবোধ এবং দায়িত্ববোধ চলে যায়, যে কাজের যে পরিমাণ তোমরা যদি মাঝে পড়ে কিছুতেই তাকে তা বুঝতে না দাও তবে তার আশা আমি ত্যাগ করলেম। তোমাদের মতেই তাকে মানুষ কর—দুই নৌকয় পা দিয়েই তাহার বিপদ ঘটেছে!

শশধর। ও কি কথা বলছ মন্মথ—তোমার ছেলে—

মন্মথ। দেখ শশধর নিজের প্রকৃতি ও বিশ্বাসমতেই নিজের ছেলেকে আমি মানুষ করতে পারি, অন্য কোন উপায় ত জানি না। যখন নিশ্চয় দেখ্‌ছি তা কোন মতেই হবার নয় তখন পিতার দায়িত্ব আমি আর রাখব না। আমার যা সাধ্য তার বেশি আমি করতে পারব না!

মন্মথর প্রস্থান।

শশধর। কি করা যায়! ছেলেটাকে ত জেলে দেওয়া যায় না! অপরাধ মনুষের পক্ষে যত সর্ব্বনেশেই হোক্ জেলখানা তার তার চেয়ে ঢের বেশি।

—০—

দশম পরিচ্ছেদ।

ভাদুড়িজায়া! শুনেছ, সতীশের বাপ হঠাৎ মারা গেছে।

মিষ্টার ভাদুড়ি। হাঁ, সে ত শুনেছি!

জায়া। সে যে সমস্ত সম্পত্তি হাঁসপাতালে দিয়ে গেছে, কেবল সতীশের মার জন্য জীবিতকাল পর্য্যন্ত ৭৫ টাকা মাসহারা বরাদ্দ করে গেছে! এখন কি করা যায়!

ভাদুড়ি। এত ভাবনা কেন তোমার?

জায়া। বেশ লোক যা হোক্ তুমি! তোমার মেয়ে যে সতীশকে ভালবাসে সেটা বুঝি তুমি দুই চক্ষু খেয়ে দেখতে পাওনা! তুমি ত ওদের বিবাহ দিতেও প্রস্তুত ছিলে। এখন উপায় কি করবে?

ভাদুড়ি। আমি ত মন্মথর টাকার উপর বিশেষ নির্ভর করিনি।

জায়া। তবে কি ছেলেটির চেহারার উপরেই নির্ভর করে করে বসেছিলে? অন্নবস্ত্রটা বুঝি অনাবশ্যক?

ভাদুড়ি। সম্পূর্ণ আবশ্যক, যিনি যাই বলুন ওর চেয়ে আবশ্যক আর কিছুই নেই। সতীশের একটি মেসো আছে বোধ হয় জান।

জায়া। মেসো ত ঢের লোকেরই থাকে, তাতে ক্ষুধা শান্তি হয় না।

ভাদুড়ি। এই মেসোটি আমার মক্কেল—অগাধ টাকা—লেছেপুলে কিছুই নেই—বয়সও নিতান্ত অল্প নয়। সে ত সতীশকেই পোষ্যপুত্র নিতে চায়।

জায়া। মেসোটি ত ভাল। তা চট্‌পট্‌ নিক্ না। তুমি একটু তাড়া দাও না।

ভাদুড়ি। তাড়া আমাকে দিতে হবে না, তার ঘরের মধ্যেই তাড়া দেবার লোক আছে। সবই প্রায় ঠিকঠাক্ এখন কেবল একটা আইনের খটকা উঠেছে—এক ছেলেকে পোষ্যপুত্র লওয়া যায় কি না—তা ছাড়া সতীশের আবার বয়স হয়ে গেছে।

জায়া। আইন ত তোমাদেরই হাতে—তোমরা চোখ বুজে একটা বিধান দিয়ে দাও না।

ভাদুড়ি। ব্যস্ত হয়ো না—পোষ্যপুত্র না নিলেও অন্য উপায় আছে।

জায়া। আমাকে বাঁচালে! আমি ভাব্‌ছিলেম সম্বন্ধ ভাঙি কি করে! আবার আমাদের নেলি যে রকম জেদালো মেয়ে সে যে কি করে বসত বলা যায় না। কিন্তু তাই বলে গরীবের হাতে ত মেয়ে দেওয়া যায় না। ঐ দেখ তোমার মেয়ে কেঁদে চোখ ফুলিয়েছে। কাল যখন খেতে বসেছিল এমন সময় সতীশের বাপ-মরার খবর পেল অমনি তখনি উঠে চলে গেল।

ভাদুড়ি। কিন্তু নেলি যে সতীশকে ভালবাসে সে ত দেখে মনে হয় না। ওত সতীশকে নাকের জলে চোখের জলে করে। আমি আরো মনে কর্‌তাম নন্দীর উপরেই ওর বেশী টান।

জায়া। তোমার মেয়েটির ঐ স্বভাব—সে যাকে ভালবাসে তাকেই জ্বালাতন করে। দেখনা বিড়াল ছানাটাকে নিয়ে কি কাণ্ডটাই করে! কিন্তু আশ্চর্য্য এই, তবু ত ওকে কেউ ছাড়তে চায় না।

নলিনীর প্রবেশ।

নলিনী। মা, একবার সতীশবাবুর বাড়ি যাবে না? তাঁর মা বোধ হয় খুব কাতর হয়ে পড়েছেন। বাবা, আমি একবার তাঁর কাছে যেতে চাই।

—০—

একাদশ পরিচ্ছেদ।

সতীশ। মা এখেনে আমি যে কত সুখে আছি সে ত আমার কাপড়চোপড় দেখেই বুঝতে পার। কিন্তু মেসোমশায় যতক্ষণ না আমাকে পুষ্যপুত্র গ্রহণ করেন ততক্ষণ নিশ্চিন্ত হতে পারছিনে।

তুমি যে মাসহারা পাও আমার ত তাতে কোন সাহায্য হবে না। অনেক দিন হতে নেবে-নেবে করেও আমাকে পোষ্যপুত্র নিচ্চেন না—বোধ হয় ওঁদের মনে মনে সন্তানলাভের আশা এখনো আছে।

বিধু। (হতাসভাবে) সে আশা সফল হয় বা সতীশ!

সতীশ। অ্যাঁ! বল কি মা!

বিধু। লক্ষণ দেখে ত তাই বোধ হয়!

সতীশ। লক্ষণ অমন অনেক সময় ভুলও ত হয়!

বিধু। না ভুল নয় সতীশ এবার তোর ভাই হবে!

সতীশ। কি যে বল মা, তার ঠিক নেই—ভাই হবেই কে বল্লে! বোন্ হতে পারে না বুঝি!

বিধু। দিদির চেহারা যেরকম হয়ে গেছে নিশ্চয় তাঁর মেয়ে হবে না, ছেলেই হবে। তা ছাড়া ছেলেই হোক্ মেয়েই হোক্ আমাদের পক্ষে সমানই!

সতীশ। এত বয়সের প্রথম ছেলে, ইতিমধ্যে অনেক বিঘ্ন ঘটতে পারে!

বিধু। সতীশ তুই চাক্‌রির চেষ্টা কর্!

সতীশ। অসম্ভব! পাস করতে পারিনি। তা ছাড়া চাকরী কর্‌বার অভ্যাস আমার একেবারে গেছে। কিন্তু যাই বল মা, এ ভারি অন্যায়! আমি ত এতদিনে বাবার সম্পত্তি পেতেম তার থেকে বঞ্চিত হলেম, তার পরে যদি আবার—

বিধু। অন্যায় নয় ত কি সতীশ! এদিকে তোকে ঘরে

এনেছেন, ওদিকে আবার ডাক্তার ডাকিয়ে ওষুধও খাওয়া চলে। নিজের বোনপোর সঙ্গে এ কিরকম ব্যাবহার! শেষকালে দয়াল ডাক্তারের ওষুধ ত খেটে গেল! অস্থির হোস্‌নে সতীশ! একমনে ভগবান্‌কে ডাক্‌--তাঁর কাছে কোন ডাক্তারই লাগে না। তিনি যদি—

সতীশ। আহা তিনি যদি এখনো—! এখনো সময় আছে! মা এঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিৎ কিন্তু যে রকম অন্যায় হল সে ভাব রক্ষা করা শক্ত হয়ে উঠছে! ঈশ্বরের কাছে এঁদের একটা দুর্ঘটনা না প্রার্থনা করে থাকৃতে পারচিনে—তিনি দয়া করে যেন—

বিধু। আহা তাই হোক্, নইলে তোর উপায় কি হবে সতীশ আমি তাই ভাবি। হে ভগবান্ তুমি যেন—

সতীশ। এ যদি না হয় তবে ঈশ্বরকে আমি আর মান্‌বনা! কাগজে নাস্তিকতা প্রচার করব!

বিধু। আরে চুপ্ চুপ্ এখন অমন কথা মুখে আনতে নেই! তিনি দয়াময়, তাঁর দয়া হলে কি না ঘটতে পারে। সতীশ তুই আজ এত ফিট্ ফাট্ সাজ করে কোথায় চলেছিস্? উচুঁ কলার পরে মাথা যে আকাশে গিয়ে ঠেক্‌ল! ঘার হেঁট করবি কি করে?

সতীশ। এমনি করে কলারের জোরে যতদিন মাথা তুলে চল্‌তে পারি চলব তার পরে ঘাড় হেঁট করবার দিন যখন আসবে তখন এগুলো ফেলে দিলেই চলবে। বিশেষ কাজ আছে মা চল্লেম কথাবার্ত্তা পরে হবে। (প্রস্থান)

বিধু। কাজ কোথায় আছে তা জানি! মাগো, ছেলের আর তর্ সয় না! এ বিবাহটা ঘটবেই! আমি জানি আমার সতীশের অদৃষ্টে খারাপ নয়, প্রথমে বিঘ্ন যতই ঘটুক্ শেষ কালটায় ওর ভাল হয়ই এ আমি বরাবর দেখে আসচি! না হবেইবা কেন! আমি ত জ্ঞাতসারে কোন পাপ করিনি—আমি ত সতী স্ত্রী ছিলাম, সেইজন্যে আমার খুব বিশ্বাস হচ্চে দিদির এবারে—!

—০—

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সুকুমারী। সতীশ!

সতীশ। কি মাসিমা!

সুকুমারী। কাল যে তোমাকে খোকার কাপড় কিনে আনাবার জন্য এত করে বল্লেম অপমান বোধ হল বুঝি!

সতীশ। অপমান কিসের মাসিমা! কাল ভাদুড়ি সাহেবের ওখানে আমার নিমন্ত্রণ ছিল তাই—

সুকুমারী। ভাদুড়ি সাহেবের ওখানে তোমার এত ঘন ঘন যাতায়াতের দরকার কি তা ত ভেবে পাইনে। তারা সাহেব মানুষ, তোমার মত অবস্থার লোকের কি তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা সাজে? আমিত শুনলেম তোমাকে তারা আজকাল পোছে না, তবু বুঝি ঐ রঙীন টাইয়ের উপর টাইরিং পরে বিলাতী কার্ত্তিক সেজে তাদের ওখানে আনাগোনা করতেই হবে! তোমার কি একটুও সম্মানবোধ নেই! তাই যদি থাকবে তবে কি কাজকর্ম্মের

কোন চেষ্টা না করে এখানে এমন করে পড়ে থাকতে? তার উপরে আবার একটা কাজ করতে বললে মনে মনে রাগ করা হয় পাছে ওঁকে কেউ বাড়ির সরকার মনে করে ভুল করে! কিন্তু সরকারও ত ভাল—সে খেটে উপার্জ্জন করে খায়!

সতীশ। মাসিমা আমিও হয় ত পারতেম, কিন্তু তুমিইত—

সুকুমারী। তাই বটে! জানি, শেষকালে আমারি দোষ হবে! এখন বুঝচি তোমার বাপ তোমাকে ঠিক চিন্‌তেন! আমি আরো ছেলেমানুষ বলে দয়া করে তোমাকে ঘরে স্থান দিলেম, জেল থেকে বাঁচালেম শেষকালে আমারি ঘত দোষ হল। একেই বলে কৃতজ্ঞতা! আচ্ছা আমারি না হয় দোষ হল, তবু যে ক'দিন এখানে আমাদের অন্ন খাচ্চ দরকার মত দুটো কাজই না হয় করে দিলে। এমন কি কেউ করে না! এতে কি অত্যন্ত অপমান বোধ হয়!

সতীশ। কিছু না, কিছু না, কি করতে হবে বল, আমি এখনি করচি।

. সুকুমারী। খোকার জন্য সাড়ে সাত গজ রেনবো সিল্ক্ চাই—আর একটা সেলার সুট্—(সতীশের প্রস্থানোদ্যম) শোন শোন ওর মাপটা নিয়ে যেয়ো জুতো চাই! (সতীশ প্রস্থানোন্মুখ) অত ব্যস্ত হচ্চ কেন—সবগুলো ভাল করে শুনেই যাও! আজও বুঝি ভাদুড়ি সাহেবের রুটি বিস্কিট খেতে যাবার জন্য প্রাণ ছট্‌ফট্ করচে! খোকার জন্যে ষ্ট্র-হ্যাট্ এনো—আর তার রুমালও এক ডজন চাই! (সতীশের প্রস্থান। তাহাকে

পুনরায় ডাকিয়া) শোন সতীশ আর একটা কথা আছে! শুনলাম তোমার মেসোর কাছ হতে তুমি নূতন সুট্ কেনবার জন্য আমাকে না বলে টাকা চেয়ে নিয়েছ। যখন নিজের সামর্থ্য হবে তখন যত খুসি সাহেবিয়ানা করো, কিন্তু পরের পয়সায় ভাদুড়ি সাহেবদের তাক্ লাগিয়ে দেবার জন্য মেসোকে ফতুর করে দিয়ো না! সে টাকাটা আমাকে ফেরৎ দিয়ো! আজকাল আমাদের বড় টানাটানির সময়!

সতীশ। আচ্ছা এনে দিচ্চি।

সুকুমারী। এখন তুমি দোকানে যাও, সেই টাকা দিয়ে কিনে বাকিটা ফেরৎ দিয়ো। একটা হিসাব রাখ্তে ভুলো না যেন (সতীশের প্রস্থানোদ্যম) শোন সতীশ—এই ক'টা জিনিষ কিন্তে আবার যেন আড়াই টাকা গাড়িভাড়া লাগিয়ে বসো না! ঐ জন্যে তোমাকে কিছু আন্তে বল্তে ভয় করে! দু'পা হেঁটে চল্তে হলেই অমনি তোমার মাথায় মাথায় ভাবনা পড়ে—পুরুষ মানুষ এত বাবু হলেত চলেনা! তোমার বাবা রোজ সকালে নিজে হেঁটে গিয়ে নতুন বাজার হতে মাছ কিনে আন্তেন—মনে আছেত? মুটেকেও তিনি এক পয়সা দেন নাই!

সতীশ। তোমার উপদেশ মনে থাকবে—আমিও দেব না! আজ হতে তোমার এখানে মুটে ভাড়া বেহারার মাইনে যত অল্প লাগে সে দিকে আমার সর্ব্বদাই দৃষ্টি থাকবে!

—০—

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

হরেন। দাদা তুমি অনেক্ষণ ধরে ও কি লিখচ কাকে লিখচ বল না!

সতীশ। যা, যা, তোর সে খবরে কাজ কি, তুই লেখা করগে যা!

হরেন। দেখি না কি লিখচ—আমি আজকাল পড়তে পারি!

সতীশ। হরেন তুই আমাকে বিরক্ত করিস্ নে বল্‌চি—যা তুই!

হরেন। ভয়ে আকার ভা, ল, ভাল, বয়ে আকার বা, সয়ে আকার সা, ভালবাসা। দাদা কি ভালবাসার কথা লিখচ বল না! তুমিও কাঁচা পেয়ারা ভালবাস বুঝি! আমিও বাসি!

সতীশ। আঃ হরেন অত চেঁচাস্‌নে, ভালবাসার কথা আমি লিখিনি।

হরেন। অ্যাঁ! মিথ্যা কথা বল্‌চ! আমি যে পড়্‌লেম ভয়ে আকার ভা, ল, ভাল, বয়ে আকার সয়ে আকার ভালবাসা। আচ্ছা মাকে ডাকি তাঁকে দেখাও!

সতীশ। না, না, মাকে ডাক্‌তে হবে না! লক্ষ্মীটি তুই একটু খেলা করতে যা, আমি এইটে শেষ করি!

হরেন। এটা কি দাদা! এযে ফুলের তোড়া! আমি নেব!

সতীশ। ওতে হাত দিস্‌নে হাত দিস্‌নে ছিঁড়ে ফেল্‌বি!

হরেন। না আমি ছিঁড়ে ফেল্‌ব না, আমাকে দাও না!

সতীশ। খোকা কাল তোকে অনেক তোড়া এনে দেব এটা থাক্!

হরেন। দাদা এটা বেশ, আমি এইটেই নেব!

সতীশ। না, এ আর একজনের জিনিষ আমি তোকে দিতে পারব না।

হরেন। অ্যাঁ, মিথ্যে কথা! আমি তোমাকে লজঞ্চুস্ আনতে বলেছিলেম তুমি সেই টাকায় তোড়া এনেছ—তাই বই কি, আরেকজনের জিনিষ বই কি!

সতীশ। হরেন লক্ষ্মী ভাই তুই একটুখানি চুপ কর, চিঠিখানা শেষ করে ফেলি! কাল তোকে আমি অনেক লজঞ্চুস্ কিনে এনে দেব!

হরেন। আচ্ছা, তুমি কি লিখচ আমাকে দেখাও!

সতীশ। আচ্ছা দেখাব আগে লেখাটা শেষ করি!

হরেন। তবে আমিও লিখি! (শ্লেট লইয়া চীৎকারস্বরে) ভয়ে আকার ভা, ল, ভাল, বয়ে আকার সা ভালবাসা।

শতীশ। চুপ্ চুপ্ অত চীৎকার করিস্‌নে!—
আঃ থাম থাম!

হরেন। তবে আমাকে তোড়াটা দাও!

সতীশ। আচ্ছা নে, কিন্তু খবরদার ছিঁড়িসনে!—ও কি করলি। যা বারণ করলেম তাই! ফুলটা ছিঁড়ে ফেল্লি! এমন বদ্‌ছেলেও ত দেখিনি! (তোড়া কড়িয়া লইয়া চপেটাঘাত করিয়া) লক্ষ্মীছাড়া কোথাকার! যা, এখান থেকে যা বল্‌চি! যা!

(হরেনের চীৎকারস্বরে ক্রন্দন, সতীশের সবেগে প্রস্থান, বিধুমুখীর ব্যস্ত হইয়া প্রবেশ)।

বিধু। সতীশ বুঝি হরেনকে কাঁদিয়েচে দিদি টের পেলে সর্ব্বনাশ হবে! হরেন, বাপ আমার কাঁদিসনে, লক্ষ্মী আমার, সোনা আমার!

হরেন। (সরোদনে) দাদা আমাকে মেরেচে!

বিধু। আচ্ছা আচ্ছা চুপ্ কর চুপ্ কর—আমি দাদাকে খুব করে মারব এখন!

হরেন। দাদা ফুলের তোড়া কেড়ে নিয়ে গেল!

বিধু। আচ্ছা সে আমি তার কাছ থেকে নিয়ে আস্‌চি! (হরেনের ক্রন্দন) এমন ছিঁচকাঁছুনে ছেলেও ত আমি কখনো দেখিনি। দিদি আদর দিয়ে ছেলেটির মাথা খাচ্ছেন। যখন যেটি চায় তখনি সেটি তাকে দিতে হবে। দেখনা, একবারে নবাব পুত্র! ছি ছি নিজের ছেলেকে কি এমনি করেই মাটি করতে হয়! (সতর্জ্জনে) খোকা, চুপ কর বলচি! ঐ হাম্‌দোবুড়ো আসচে! (সুকুমারীর প্রবেশ)।

সুকুমারী। বিধু, ও কি ও! আমার ছেলেকে কি এমনি করেই ভূতের ভয় দেখাতে হয়! আমি চাকরবাকরদের বারণ করে দিয়েচি কেউ ওর কাছে ভূতের কথা বলতে সাহস করে না!—আর তুমি বুঝি মাসি হয়ে ওর এই উপকার করতে বসেচ! কেন বিধু, আমার বাছা তোমার কি অপরাধ করেচে! ওকে তুমি দুটি চক্ষে দেখতে পার না, তা আমি বেশ বুঝেচি! আমি বরাবর

তোমার ছেলেকে পেটের ছেলের মত মানুষ করলেম আর তুমি বুঝি আজ তারই শোধ নিতে এসেচ।

বিধু। (সরোদনে) দিদি এমন কথা বলো না! আমার কাছে আমার সতীশ আর তোমার হরেনে প্রভেদ কি আছে!

হরেন। মা, দাদা আমাকে মেরেচে!

বিধু। ছি ছি খোকা, মিথ্যা বলতে নেই। দাদা তোর এখানে ছিলই না তা মারবে কি করে।

হরেন। বাঃ—দাদা যে এইখানে বসে চিঠি লিখছিল—তাতে ছিল, ভয়ে আকার ভা, ল, ভাল, বয়ে আকার সয়ে আকার, ভালবাসা! মা তুমি আমার জন্যে দাদাকে লজঞ্জুস্ আনতে বলেছিলে, দাদা সেই টাকায় ফুলের তোড়া কিনে এনেছে—তাতেই আমি একটু হাত দিয়েছিলেম বলেই অমনি আমাকে মেরেচে!

সুকুমারী। তোমরা মায়ে পোয়ে মিলে আমার ছেলের সঙ্গে লেগেচ বুঝি! ওকে তোমাদের সহ্য হচ্চে না! ও গেলেই তোমরা বাঁচ! আমি তাই বলি, খোকা রোজ ডাক্তার কব্‌রাজের বোতল বোতল ওষুধ গিলচে তবু দিন দিন এমন রোগা হচ্চে কেন! ব্যাপারখানা আজ বোঝা গেল!

—০—

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

সতীশ। আমি তোমার কাছে বিদায় নিতে এসেছি নেলি!

নলিনী। কেন কোথায় যাবে!

সতীশ। জাহান্নমে।

নলিনী। সে জায়গায় যাবার জন্য কি বিদায় নেবার দরকার হয়? যে লোক সন্ধান জানে সে ত ঘরে বসেই সেখানে যেতে পারে! আজ তোমার মেজাজটা এমন কেন? কলারটা বুঝি ঠিক হালফেশানের হয়নি!

সতীশ। তুমি কি মনে কর আমি কেবল কলারের কথাই দিনরাত্রি চিন্তা করি!

নলিনী। তাইত মনে হয়! সেইজন্যই ত হঠাৎ তোমাকে অত্যন্ত চিন্তাশীলের মত দেখায়!

শতীশ। ঠাট্টা করো না নেলি তুমি যদি আজ আমার হৃদয়টা দেখতে পেতে—

নলিনী। তা হলে ডুমুরের ফুল এবং সাপের পাঁচ পাও দেখতে পেতাম!

সতীশ। আবার ঠাট্টা! তুমি বড় নিষ্ঠুর! সত্যই বলচি নেলি আজ বিদায় নিতে এসেচি।

নলিনী। দোকানে যেতে হবে?

সতীশ। মিনতি করচি নেলি ঠাট্টা করে আমাকে দগ্ধ করো না! আজ আমি চিরদিনের মত বিদায় নেব!

নলিনী। কেন, হঠাৎ সেজন্য তোমার এত বেশি আগ্রহ কেন?

সতীশ। সত্য কথা বলি, আমি যে কত দরিদ্র তা তুমি জাননা!

নলিনী। সেজন্য তোমার ভয় কিসের! আমি ত তোমার কাছে টাকা ধার চাইনি!

সতীশ। তোমার সঙ্গে আমার বিবাহের সম্বন্ধ হয়েছিল—

নলিনী। তাই পালাবে? বিবাহ না হতেই হৃৎকম্প!

সতীশ। আমার অবস্থা জান্‌তে পেরে মিষ্টার ভাদুড়ি আমাদের সম্বন্ধ ভেঙে দিলেন!

নলিনী। অমনি সেই অপমানেই কি নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে হবে! এত বড় অভিমানী লোকের কারো সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখা শোভা পায় না। সাধে আমি তোমার মুখে ভালবাসার কথা শুনলেই ঠাট্টা করে উড়িয়ে দি!

সতীশ। নেলি, তবে কি এখনো আমাকে আশা রাখতে বল!

নলিনী। দোহাই সতীশ, অমন নভেলি ছাঁদে কথা বানিয়ে বলো না, আমার হাসি পায়। আমি তোমাকে আশা রাখতে বলব কেন? আশা যে রাখে সে নিজের গরজেই রাখে, লোকের পরামর্শ শুনে রাখে না!

সতীশ। সে ত ঠিক কথা! আমি জানতে চাই তুমি দারিদ্র্যকে ঘৃণা কর কি না!

নলিনী। খুব করি যদি সে দারিদ্র্য মিথ্যার দ্বারা নিজেকে ঢাকতে চেষ্টা করে!

সতীশ। নেলি, তুমি কি কখনো তোমার চিরকালের অভ্যস্ত আরাম ছেড়ে গরীবের ঘরের লক্ষ্মী হতে পারবে।

নলিনী। নভেলে যে রকম ব্যারামের কথা পড়া যায় সেটা তেমন করে চেপে ধরলে আরাম আপনি ঘরছাড়া হয়।

সতীশ। সে ব্যারামের কোন লক্ষণ কি তোমার—

নলিনী। সতীশ তুমি কখনো কোন পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হতে পারলে না! স্বয়ং নন্দী সাহেবও বোধ হয় অমন প্রশ্ন তুলতেন না। তোমাদের একচুলও প্রশ্রয় দেওয়া চলে না!

সতীশ। তোমাকে আমি আজও চিনতে পারলেম না নেলি!

নলিনী। চিনবে কেমন করে? আমি ত তোমার হাল ফেশানের টাই নই কলার নই—দিন রাত যা নিয়ে ভাব তাই তুমি চেন।

সতীশ। আমি হাত জোড় করে বলচি নেলি তুমি আজ আমাকে এমন কথা বলো না! আমি যে কি নিয়ে ভাবি তা তুমি নিশ্চয় জান—

নলিনী। তোমার সম্বন্ধে আমার অন্তর্দৃষ্টি যে এত প্রখর তাহা এতটা নিঃসংশয়ে স্থির করো না। ঐ বাবা আসচেন। আমাকে এখানে দেখলে তিনি অনর্থক বিরক্ত হবেন আমি যাই! (প্রস্থান)

সতীশ! মিষ্টার ভাতড়ি আমি বিদায় নিতে এসেচি।

ভাদুড়ি। আচ্ছা তবে আজ—

সতীশ। যাবার আগে একটা কথা আছে।

ভাদুড়ি। কিন্তু সময় ত নেই আমি এখন বেড়াতে বের হব।

সতীশ। কিছুক্ষণের জন্য কি সঙ্গে যেতে পারি?

ভাদুড়ি। তুমি যে পার তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু আমি পারব না। সম্প্রতি আমি সঙ্গীর অভাবে তত অধিক ব্যাকুল হয়ে পড়িনি!

—০—

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

শশধর। আঃ কি বল! তুমি কি পাগল হয়েচ না কি?

সুকুমারী। আমি পাগল, না, তুমি চোখে দেখতে পাও না!

শশধর। কোনটাই আশ্চর্য্য নয়, দুটোই সম্ভব। কিন্তু—

সুকুমারী। আমাদের হরেনের জন্ম হতেই দেখনি ও'দের মুখ কেমন হয়ে গেছে! সতীশের ভাবখানা দেখে বুঝতে পার না!

শশধর। আমার অত ভাব বুঝবার ক্ষমতা নেই সে ত তুমি জানই! মন জিনিষটাকে অদৃশ্য পদার্থ বলেই শিশুকাল হতে আমার কেমন একটা সংস্কার বদ্ধমূল হয়ে গেছে! ঘটনা দেখলে তবু কতকটা বুঝতে পারি।

সুকুমারী। সতীশ যখনই আড়ালে পায় তোমার ছেলেকে মারে, আবার বিধুও তার পিছনে পিছনে এসে খোকাকে জুজুর ভয় দেখায়।

শশধর। ঐ দেখ তোমরা ছোট কথাকে বড় করে তোল! যদিই বা সতীশ খোকাকে কখনো—

সুকুমারী। সে তুমি সহ্য করতে পার আমি পারব না—ছেলেকে ত তোমার গর্ভে ধরতে হয়নি!

শশধর। সে কথা আমি অস্বীকার করতে পারব না। এখন তোমার অভিপ্রায় কি শুনি!

সুকুমারী। শিক্ষা সম্বন্ধে তুমি ত বড় বড় কথা বল, একবার তুমি ভেবে দেখ না আমরা হরেনকে যে ভাবে শিক্ষা দিতে চাই তার মাসি তাকে অন্যরূপ শেখায়—সতীশের দৃষ্টান্তটিই বা তার পক্ষে কিরূপ সেটাও ত ভেবে দেখতে হয়।

শশধর। তুমি যখন অত বেশি করে ভাবচ তখন তার উপরে আমার আর ভাববার দরকার কি আছে! এখন কর্ত্তব্য কি বল?

সুকুমারী। আমি বলি সতীশকে তুমি বল, তার মার কাছে থেকে সে এখন কাজ কর্ম্মের চেষ্টা দেখুক। পুরুষমানুষ পরের পয়সায় বাবুগিরি করে সে কি ভাল দেখতে হয়!

শশধর। ওর মা যে টাকা পায় তাতে সতীশের চলবে কি করে?

সুকুমারী। কেন, ওদের বাড়িভাড়া লাগে না, মাসে পঁচাত্তর টাকা কম কি!

শশধর। সতীশের যেরূপ চাল দাঁড়িয়েচে পঁচাত্তর টাকা ত সে চুরুটের ডগাতেই ফুঁকে দিবে! মার গহনাগাঁঠি ছিল সে ত অনেক দিন হল গেছে এখন হবিষ্যান্ন বাঁধা দিয়ে ত দেনা শোধ হবে না!

সুকুমারী। যার সামর্থ্য কম তার অত লম্বা চালেই বা দরকার কি?

শশধর। মন্মথ সেই কথাই বলত। আমরাই ত সতীশকে অন্যরূপ বুঝিয়েছিলেম। এখন ও'কে দোষ দিই কি করে?

সুকুমারী। না—দোষ কি ওর হতে পারে! সব দোষ আমারি! তুমি ত আর কারো কোন দোষ দেখতে পাও না—কেবল আমার বেলাতেই তোমার দর্শনশক্তি বেড়ে যায়!

শশধর। ওগো রাগ কর কেন—আমিও ত দোষী!

সুকুমারী। তা হতে পারে। তোমার কথা তুমি জান। কিন্তু আমি কখনো ওকে এমন কথা বলিনি যে তুমি তোমার মেসোর ঘরে পায়ের উপরে পা দিয়া গোঁফে তা দাও আর লম্বা কেদারায় বসে বসে আমার বাছার উপর বিষদৃষ্টি দিতে থাক!

শশধর। না ঠিক ঐ কথাগুলো তুমি তাকে মাথার দিব্য দিয়ে শপথ করিয়ে নাওনি—অতএব তোমাকে দোষ দিতে পারিনে। এখন কি করতে হবে বল!

সুকুমারী। সে তুমি যা ভাল বোধ কর তাই কর। কিন্তু আমি বলচি সতীশ যতক্ষণ এ বাড়িতে থাকবে আমি খোকাকে কোনমতে বাইরে যেতে দিতে পারব না। ডাক্তার খোকাকে হাওয়া খাওয়াতে বিশেষ করে বলে দিয়েছে—কিন্তু হাওয়া খেতে গিয়ে ও কখন একলা সতীশের নজরে পড়বে সে কথা মনে করলে আমার মন স্থির থাকে না। ও ত আমারই আপন বোনের ছেলে কিন্তু আমি ওকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিশ্বাস করিনে—এ আমি তোমাকে স্পষ্টই বললেম।

সতীশের প্রবেশ।

সতীশ। কাকে বিশ্বাস কর না মাসিমা! আমাকে? আমি তোমার খোকাকে সুযোগ পেলে গলা টিপে মারব এই তোমার ভয়? যদি মারি, তবে তুমি তোমার বোনের ছেলের যে অনিষ্ট করেচ তার চেয়ে ওর কি বেশি অনিষ্ট করা হবে? কে আমাকে ছেলেবেলা হতে নবাবের মত সৌখীন করে তুলেচে এবং আজ ভিক্ষুকের মত পথে বের কল্লে? কে আমাকে পিতার শাসন হতে কেড়ে এনে বিশ্বের লাঞ্ছনার মধ্যে টেনে আনলে? কে আমাকে—

সুকুমারী। ওগো শুনচ? তোমার সামনে আমাকে এমনি করে অপমান করে? নিজের মুখে বল্লে কিনা খোকাকে গলা টিপে মারবে? ওমা, কি হবে গো! আমি কালসাপকে নিজের হাতে দুধকলা দিয়ে পুষেচি!

সতীশ। দুধকলা আমারও ঘরে ছিল—সে দুধকলায় আমার রক্ত বিষ হয়ে উঠত না—তা-হতে চিরকালের মত বঞ্চিত করে তুমি যে দুধকলা আমাকে খাইয়েচ তাতে আমার বিষ জমে উঠেচে! সত্য কথাই বলচ, এখন আমাকে ভয় করাই চাই—এখন আমি দংশন করতে পারি!

বিধুমুখীর প্রবেশ।

বিধু। কি সতীশ কি হয়েচে, তোকে দেখে যে ভয় হয়! অমন করে তাকিয়ে আছিস কেন? আমাকে চিন্‌তে পারচিস নে? আমি যে তোর মা সতীশ!

সতীশ। মা তোমাকে মা বলব কোন্ মুখে? মা হয়ে কেন তুমি আমার পিতার শাসন হতে আমাকে বঞ্চিত করলে? কেন তুমি আমাকে জেল হতে ফিরিয়ে আনলে? সে কি মাসির ঘর হতে ভয়ানক? তোমরা ঈশ্বরকে মা বলে ডাক, তিনি যদি তোমাদের মত মা হন তবে তাঁর আদর চাইনে তিনি যেন আমাকে নরকে দেন!

শশধর। আঃ সতীশ! চল চল—কি বকৃচ থাম! এস বাইরে আমার ঘরে এস!

—০—

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

শশধর। সতীশ একটু ঠাণ্ডা হও! তোমার প্রতি অত্যন্ত অন্যায় হয়েচে সে কি আমি জানিনে? তোমার মাসি রাগের মুখে কি বলেচেন সে কি অমন করে মনে নিতে আছে? দেখ, গোড়ায় যা ভুল হয়েচে তা এখন যতটা সম্ভব প্রতিকার করা যাবে তুমি নিশ্চিন্ত থাক!

সতীশ। মেসোমশায়, প্রতিকারের আর কোনো সম্ভাবনা নেই। মাসিমার সঙ্গে আমার এখন যেরূপ সম্পর্ক দাঁড়িয়েচে তাতে তোমার ঘরের অন্ন আমার গলা দিয়ে আর গলবে না। এতদিন তোমাদের যা খরচ করিয়েচি তা যদি শেষ কড়িটি পর্য্যন্ত শোধ করে না দিতে পারি তবে আমার মরেও শান্তি নাই। প্রতিকার যদি কিছু থাকে ত সে আমার হাতে, তুমি কি প্রতিকার করবে?

শশধর। না, শোন সতীশ—একটু স্থির হও! তোমার যা কর্ত্তব্য সে তুমি পরে ভেবো—তোমার সম্বন্ধে আমরা যে অন্যায় করেছি তার প্রায়শ্চিত্ত ত আমাকেই করতে হবে। দেখ, আমার বিষয়ের এক অংশ আমি তোমাকে লিখে দেব—সেটাকে তুমি দান মনে করো না, সে তোমার প্রাপ্য। আমি সমস্ত ঠিক করে রেখেছি—পর্শু শুক্রবারে রেজেষ্ট্রি করে দেব।

সতীশ। (শশধরের পায়ের ধূলা লইয়া) মেসোমশায়, কি আর বলব—তোমার এই স্নেহে—

শশধর। আচ্ছা থাক্ থাক্! ও সব স্নেহ ফ্রেহ আমি কিছু বুঝিনে, রসকস আমার কিছুই নেই—যা কর্ত্তব্য তা কোনো রকমে পালন কর্ত্তেই হবে এই বুঝি। সাড়ে আটটা বাজল, তুমি আজ কোরিস্থিয়ানে যাবে বলেছিলে যাও! সতীশ, একটা কথা তোমাকে বলে রাখি। দানপত্রখানা আমি মিষ্টার ভাদুড়িকে দিয়েই লিখিয়ে নিয়েছি। ভাবে বোধ হল তিনি এই ব্যাপারে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন—তোমার প্রতি যে তাঁর টান নেই এমন ত দেখা গেল না। এমন কি, আমি চলে আসবার সময় তিনি আমাকে বল্লেন সতীশ আজকাল আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসে না কেন? (সতীশের প্রস্থান)

ওরে রামচরণ, তোর মা ঠাকুরাণীকে একবার ডেকে দে ত!

সুকুমারীর প্রবেশ।

সুকুমারী। কি স্থির করলে?

শশধর। একটা চমৎকার প্ল্যান ঠাউরেছি!

সুকুমারী। তোমার প্ল্যান যত চমৎকার হবে সে আমি জানি। যাহোক সতীশকে এ বাড়ি হতে বিদায় করেচ ত ?

শশধর। তাই যদি না করব তবে আর প্ল্যান কিসের ? আমি ঠিক করেচি সতীশকে আমাদের তরফ মাণিকপুর লিখে পড়ে দেব—তা হলেই সে স্বচ্ছন্দে নিজের খরচ নিজে চালিয়ে আলাদা হয়ে থাকতে পারবে। তোমাকে আর বিরক্ত করবে না।

সুকুমারী। আহা কি সুন্দর প্ল্যানই ঠাউরেচ। সৌন্দর্য্যে আমি একেবারে মুগ্ধ! না, না, তুমি অমন পাগলামি করতে পারবে না আমি বলে দিলেম।

শশধর। দেখ, এক সময়ে ত ওকেই সমস্ত সম্পত্তি দেবার কথা ছিল।

সুকুমারী। তখন ত আমার হরেন জন্মায়নি। তা ছাড়া তুমি কি ভাব তোমার আর ছেলেপুলে হবে না!

শশধর। সুকু, ভেবে দেখ আমাদের অন্যায় হচ্ছে। মনেই করনা কেন তোমার দুই ছেলে।

সুকুমারী। সে আমি অতশত বুঝিনে—তুমি যদি এমন কাজ কর তবে আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরব—এই আমি বলে গেলেম। (সুকুমারীর প্রস্থান)

সতীশের প্রবেশ।

শশধর। কি সতীশ থিয়েটারে গেলে না ?

সতীশ। না মেসোমশায়, আজ আর থিয়েটার না। এই দেখ দীর্ঘকাল পরে মিষ্টার ভাদুড়ির কাছ হতে আমি নিমন্ত্রণ পেয়েচি!

তোমার দানপত্রের ফল দেখ! সংসারের উপর আমার ধিক্কার জন্মে গেছে মেসোমশায়! আমি তোমার সে তালুক নেব না!

শশধর। কেন সতীশ?

সতীশ। আমি ছদ্মবেশে পৃথিবীর কোনো সুখভোগ করব না। আমার যদি নিজের কোন মূল্য থাকে, তবে সেই মূল্য দিয়ে যতটুকু পাওয়া যায় ততটুকুই ভোগ করব তার চেয়ে এক কানা কড়িও আমি বেশি চাই না, তাছাড়া তুমি যে আমাকে তোমার সম্পত্তির অংশ দিতে চাও মাসিমার সম্মতি নিয়েচ ত!

শশধর। না সে তিনি—অর্থাৎ সে একরকম করে' হবে। হঠাৎ তিনি রাজি না হতে পারেন, কিন্তু—

সতীশ। তুমি তাঁকে বলেছ?

শশধর। হাঁ, বলেছি বইকি! বিলক্ষণ! তাঁকে না বলেই কি আর—

সতীশ। তিনি রাজি হয়েছেন?

শশধর। তাকে ঠিক রাজি বলা যায় না বটে, কিন্তু ভাল করে বুঝিয়ে—

সতীশ। বৃথা চেষ্টা মেসোমশায়। তাঁর নারাজিতে তোমার সম্পত্তি আমি নিতে চাইনে। তুমি তাঁকে বলো আজ পর্য্যন্ত তিনি আমাকে যে অন্ন খাইয়েচেন তা উদ্গার না করে আমি বাঁচব না! তাঁর সমস্ত ঋণ সুদশুদ্ধ শোধ করে তবে আমি হাঁফ ছাড়ব!

শশধর। সে কিছুই দরকার নেই সতীশ—তোমাকে বরঞ্চ কিছু নগদ টাকা গোপনে—

সতীশ। না মেসোমশায় আর ঋণ বাড়াবনা। তোমার কাছে এখন কেবল আমার একটি অনুরোধ আছে। তোমার যে সাহেব-বন্ধুর আপিসে আমাকে কাজ দিতে চেয়েছিলে, সেখানে আমার কাজ জুটিয়ে দিতে হবে।

শশধর। পারবে ত!

সতীশ। এর পরেও যদি না পারি তবে পুনর্ব্বার মাসিমার অন্ন খাওয়াই আমার উপযুক্ত শাস্তি হবে!

—০—

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

সুকুমারী। দেখ দেখি, এখন সতীশ কেমন পরিশ্রম ক'রে কাজকর্ম্ম করচে। দেখ অতবড় সাহেব-বাবু আজকাল পুরানো কালো আলপাকার চাপকানের উপরে কোঁচানো চাদর ঝুলিয়ে কেমন নিয়মিত আপিসে যায়!

শশধর। বড় সাহেব সতীশের খুব প্রশংসা করেন!

সুকুমারী। দেখ দেখি, তুমি যদি তোমার জমিদারিটা তাকে দিয়ে বসতে তবে এতদিনে সে টাই-কলার-জুতা-ছড়ি কিনেই সেটা নিলামে চড়িয়ে দিত। ভাগ্যে আমার পরামর্শ নিয়েছ তাইত সতীশ মানুষের মত হয়েচে!

শশধর। বিধাতা আমাদের বুদ্ধি দেন নাই কিন্তু স্ত্রী দিয়েচেন আর তোমাদের বুদ্ধি দিয়েচেন তেমনি সঙ্গে সঙ্গে নির্ব্বোধ স্বামীগুলাকেও তোমাদের হাতে সমর্পণ করেছেন—আমাদেরই জিত।

সুকুমারী। আচ্ছা আচ্ছা, ঢের হয়েচে, ঠাট্টা করতে হবে না! কিন্তু সতীশের পিছনে এতদিন যে টাকাটা ঢেলেছ সে যদি আজ থাকত তবে—

শশধর। সতীশ ত বলেচে কোন-একদিন সে সমস্তই শোধ করে দেবে।

রইল! সে ত বরাবরই ঐ রকম লম্বা-চৌড়া কথা বলে থাকে! তুমি বুঝি সেই ভরসায় পথ চেয়ে বসে আছ!

শশধর। এতদিন ত ভরসা ছিল তুমি যদি পরামর্শ দাও ত সেটা বিসর্জ্জন দিই!

সুকুমারী। দিলে তোমার বেশি লোকসান হবে না এই পর্য্যন্ত বলতে পারি! ঐ যে তোমার সতীশ বাবু আসচেন! চাকরি হয়ে অবধি একদিনও ত আমাদের চৌকাট মাড়ান নি এম্নি তাঁর কৃতজ্ঞতা। আমি যাই!

সতীশের প্রবেশ।

সতীশ। মাসিমা, পালাতে হবে না! এই দেখ আমার হাতে অস্ত্র শস্ত্র কিছুই নেই—কেবল খান কয়েক নোট আছে!

শশধর। ইস্! এ যে এক তোড়া নোট! যদি আপিসের টাকা হয় ত এমন করে সঙ্গে নিয়ে বেড়ানো ভাল হচ্চে না সতীশ!

সতীশ। আর সঙ্গে নিয়ে বেড়াব না। মাসিমার পায়ে বিসর্জ্জন দিলাম। প্রণাম হই মাসিমা! বিস্তর অনুগ্রহ করেছিলে—তখন তার হিসাব রাখতে হবে মনেও করিনি সুতরাং পরিশোধের অঙ্কে কিছু ভুলচুক হতে পারে! এই পনেরো হাজার

টাকা গুনে নাও! তোমার খোকার পোলাও পরমান্নে একটি তণ্ডুলকণাও কম না পড়ুক!

শশধর। এ কি কাণ্ড সতীশ! এত টাকা কোথায় পেলে!

সতীশ। আমি গুণচট্ আজ ছয়মাস আগাম খরিদ করে রেখেচি—ইতিমধ্যে দর চড়েচে; তাই মুনফা পেয়েচি।

শশধর। সতীশ, এ যে জুয়াখেলা!

সতীশ। খেলা এইখানেই শেষ—আর দরকার হবে না।

শশধর। তোমার এ টাকা তুমি নিয়ে যাও, আমি চাই না!

সতীশ। তোমাকে ত দিই নাই মেসোমশায়! এ মাসিমার ঋণশোধ। তোমার ঋণ কোনকালে শোধ করতে পারব না!

শশধর। কি সুকু, এ টাকাগুলো—

সুকুমারী। গুণে খাতাঞ্জির হাতে দাও না—ঐখানেই কি ছড়ানো পড়ে থাকবে?

শশধর। সতীশ, খেয়ে এসেচ ত?

সতীশ। বাড়ি গিয়ে খাব।

শশধর। অ্যাঁ সে কি কথা! বেলা যে বিস্তর হয়েচে! আজ এইখানেই খেয়ে যাও!

সতীশ। আর খাওয়া নয় মেসোমশায়! এক দফা শোধ করলেম, অন্নঋণ আবার নূতন করে ফাঁদতে পারব না! (প্রস্থান)

সুকুমারী। বাপের হাত হতে রক্ষা করে এত দিন ওকে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করলেম, আজ হাতে দু'পয়সা আসতেই ভাবখানা দেখেচ! কৃতজ্ঞতা এমনিই বটে! ঘোর কলি কি না!

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

সতীশ। বড় সাহেব হিসাবের খাতাপত্র কাল দেখবেন। মনে করেছিলেম ইতিমধ্যে "গানির" টাকাটা নিশ্চয় পাওয়া যাবে তহবিল পূরণ করে রাখব—কিন্তু বাজার নেমে গেল। এখন জেল ছাড়া গতি নেই। ছেলেবেলা হতে সেখানে যাবারই আয়োজন করা গেছে!

কিন্তু অদৃষ্টকে ফাঁকি দেব! এই পিস্তলে দুটি গুলি পূরেচি—এই যথেষ্ট! নেলি—না না ও নাম নয়, ও নাম নয়—আমি তাহলে মরতে পারব না। যদি বা সে আমাকে ভাল বেসে থাকে, সে ভালবাসা আমি ধূলিসাৎ করে দিয়ে এসেচি। চিঠিতে আমি তাঁর কাছে সমস্তই কবুল করে লিখেছি। এখন পৃথিবীতে আমার কপালে যার ভালবাসা বাকি রইল সে আমার এই পিস্তল! আমার অন্তিমের প্রেয়সী, ললাটে তোমার চুম্বন নিয়ে চক্ষু মুদব!

মেসোমশায়ের এ বাগানটি আমারই তৈরি। যেখানে যত দুর্লভ গাছ পাওয়া যায় সব সংগ্রহ করে এনেছিলেম। ভেবেছিলেম এ বাগান এক দিন আমারই হবে। ভাগ্য কার জন্য আমাকে দিয়ে এই গাছগুলো রোপণ করে নিচ্ছিল, তা আমাকে তখন বলে নি—তা হোক্, এই ঝিলের ধারে এই বিলাতি ষ্টিফানোটিস্ লতার কুঞ্জে আমার এ জন্মের হাওয়া খাওয়া শেষ করব—এখানে হাওয়া খেতে আস্‌তে আর কেউ সাহস করবেনা!

মেসোমশায়কে প্রণাম করে পায়ের ধূল নিতে চাই। পৃথিবী

হতে ঐ ধূলটুকু নিয়ে যেতে পারলে আমার মৃত্যু সার্থক হত। কিন্তু এখন সন্ধ্যার সময় তিনি মাসিমার কাছে আছেন—আমার এ অবস্থায় মাসিমার সঙ্গে দেখা করতে আমি সাহস করিনে! বিশেষতঃ পিস্তল ভরা আছে!

মরবার সময় সকলকে ক্ষমা করে শান্তিতে মরবার উপদেশ শাস্ত্রে আছে। কিন্তু আমি ক্ষমা করতে পারলেম না। আমার এ মরবার সময় নয়। আমার অনেক সুখের কল্পনা, ভোগের আশা ছিল—অল্প কয়েক বৎসরের জীবনে তা একে একে সমস্তই টুক্‌রা টুক্‌রা হয়ে ভেঙেচে। আমার চেয়ে অনেক অযোগ্য অনেক নির্ব্বোধ লোকের ভাগ্যে অনেক অযাচিত সুখ জুটেছে, আমার জুটেও জুটল না—সে জন্য যারা দায়ী তাদের কিছুতেই ক্ষমা করতে পারব না—কিছুতেই না। আমার মৃত্যুকালের অভিশাপ যেন চিরজীবন তাদের পিছনে পিছনে ফেরে—তাদের সকল সুখকে কাণা করে দেয়! তাদের তৃষ্ণার জলকে বাষ্প করে দেবার জন্য আমার দগ্ধ জীবনের সমস্ত দাহকে যেন আমি রেখে যেতে পারি!

হায়! প্রলাপ! সমস্তই প্রলাপ! অভিশাপের কোনোই বলই নেই! আমার মৃত্যু কেবল আমাকেই শেষ করে দেবে—আর কারো গায়ে হাত দিতে পারবে না! আঃ—তারা আমার জীবনটাকে একেবারে ছারখার করে দিলে আর আমি মরেও তাদের কিছুই করতে পারলেম না। তাদের কোন ক্ষতি হবে না—তারা সুখে থাকবে তাদের দাঁতমাজা হতে আরম্ভ করে মশারি-

ঝাড়া পর্য্যন্ত কোন তুচ্ছ কাজটিও বন্ধ থাকবে না—অথচ আমার সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্রের সমস্ত আলোক এক ফুৎকারে নিবল—আমার নেলি—উঃ ও নাম নয়!

ও কেও! হরেন! সন্ধ্যার সময় বাগানে বার হয়েচ যে! বাপমাকে লুকিয়ে চুরি করে কাঁচা পেয়ারা পাড়তে এসেচে। ওর আকাঙ্ক্ষা ঐ কাঁচা পেয়ারার চেয়ে আর অধিক উর্দ্ধে চড়ে নি—ঐ গাছের নীচু ডালেই ওর অধিকাংশ সুখ ফলে আছে। পৃথিবীতে ওর জীবনের কি মূল্য! গাছের একটা কাঁচা পেয়ারা যেমন এ সংসারে ওর কাঁচা জীবনটাই বা তার চেয়ে কি এমন বড়! এখনি যদি ছিন্ন করা যায়, তবে জীবনের কত নৈরাশ্য হতে ওকে বাঁচান যায় তা কে বলতে পারে? আর মসিমা—ইঃ! একেবারে লুটাপুটি করতে থাকবে! আঃ!

ঠিক সময়টি, ঠিক স্থানটি, ঠিক লোকটি! হাতকে আর সামলাতে পাচ্চিনে! হাতটাকে নিয়ে কি করি! হাতটাকে নিয়ে কি করা যায়!

(ছড়ি লইয়া সতীশ সবেগে চারা গাছগুলিকে ক্রমাগত আঘাত করিতে লাগিল। তাহাতে তাহার উত্তেজনা ক্রমশ আরো বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। অবশেষে নিজের হাতকে সে সবেগে আঘাত করিল; কিন্তু কোন বেদনা বোধ করিল না। শেষে পকেটের ভিতর হইতে পিস্তল সংগ্রহ করিয়া লইয়া সে হরেনের দিকে সবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল)

হরেন। (চমকিয়া উঠিয়া) এ কি! দাদা না কি! তোমার

দুটি পায়ে পড়ি দাদা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি—বাবাকে বলে দিয়ো না!

সতীশ। (চীৎকার করিয়া) মেসোমশায়—মেসোমশায়—এই বেলা রক্ষা কর—আর দেরি কোরো না—তোমার ছেলেকে এখনো রক্ষা কর!

শশধর। (ছুটিয়া আসিয়া) কি হয়েচে সতীশ! কি হয়েচে!

সুকুমারী। (ছুটিয়া আসিয়া) কি হয়েচে আমার বাছার কি হয়েচে!

হরেন। কিছুই হয় নি মা—কিছুই না—দাদা তোমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করচেন!

সুকুমারী। এ কি রকম বিশ্রী ঠাট্টা! ছি ছি, সকলি অনাসৃষ্টি দেখ দেখি! আমার বুক এখনো ধড়াস্ ধড়াস্ করচে! সতীশ, মদ ধরেচে বুঝি!

সতীশ। পালাও—তোমার ছেলেকে নিয়ে এখনি পালাও! নইলে তোমাদের রক্ষা নেই!

(হরেনকে লইয়া ত্রস্তপদে সুকুমারীর পলায়ন)

শশধর। সতীশ, অমন উতলা হয়ো না! ব্যাপারটা কি বল! হরেনকে কার হাত হতে রক্ষা করবার জন্য ডেকেছিলে?

সতীশ। আমার হাত হতে। (পিস্তল দেখাইয়া) এই দেখ এই দেখ মেসোমশায়!

দ্রুতপদে বিধুমুখীর প্রবেশ।

বিধু। সতীশ, তুই কোথায় কি সর্ব্বনাশ করে এসেছিস

বল দেখি! আপিসের সাহেব পুলিশ সঙ্গে নিয়ে আমাদের বাড়িতে খানাতল্লাসি করতে এসেচে। যদি পালাতে হয় ত এই বেলা পালা! হায় ভগবান! আমি ত কোন পাপ করিনি আমারি অদৃষ্টে এত দুঃখ ঘটে কেন?

সতীশ। ভয় নেই—পালাবার উপায় আমার হাতেই আছে।

শশধর। তবে কি তুমি—

সতীশ। তাই বটে মেসোমশায়—যা সন্দেহ করচ তাই! আমি চুরি করে মাসির ঋণ শোধ করেচি। আমি চোর। মা, শুনে খুসি হবে, আমি চোর, আমি খুনী! এখন আর কাঁদতে হবে না—যাও যাও আমার সম্মুখ হতে যাও! আমার অসহ্য বোধ হচ্চে!

শশধর। সতীশ, তুমি আমার কাছেও ত কিছু ঋণী আছ, তাই শোধ করে যাও।

সতীশ। বল, কেমন করে শোধ করব! কি আমি দিতে পরি! কি চাও তুমি!

শশধর। ঐ পিস্তলটা দাও!

সতীশ। এই দিলাম! আমি জেলেই যাব! না গেলে আমার পাপের ঋণশোধ হবে না!

শশধর। পাপের ঋণ শাস্তির দ্বারা শোধ হয় না সতীশ, কর্ম্মের দ্বারাই শোধ হয়! তুমি নিশ্চয় জেনো আমি অনুরোধ কল্লে তোমার বড় সাহেব তোমাকে জেলে দেবেন না। এখন হতে জীবনকে সার্থক করে বেঁচে থাক!

সতীশ। মেসোমশায়, এখন আমার পক্ষে বাঁচা যে কত কঠিন তা তুমি জান না—মরব নিশ্চয় জেনে পায়ের তলা হতে আমার শেষ সুখের অবলম্বনটা আমি পদাঘাতে ফেলে দিয়ে এসেচি—এখন কি নিয়ে বাঁচব।

শশধর। তবু বাঁচতে হবে, আমার ঋণের এই শোধ—আমাকে ফাঁকি দিয়ে পালাতে পারবে না!

সতীশ। তবে তাই হবে।

শশধর। আমার একটা অনুরোধ শোন! তোমার মাকে আর মাসীকে অন্তরের সহিত ক্ষমা কর!

সতীশ। তুমি যদি আমাকে ক্ষমা করতে পার—তবে এ সংসারে কে এমন থাকতে পারে যাকে আমি ক্ষমা করতে না পারি (প্রণাম করিয়া) মা, আশীর্ব্বাদ কর আমি সব যেন সহ্য করতে পারি—আমার সকল দোষগুণ নিয়ে তোমরা আমাকে যেমন গ্রহণ করেচ সংসারকে আমি যেন তেমনি করে গ্রহণ করি।

বিধু। বাবা, কি আর বলব! মা হয়ে আমি তোকে কেবল স্নেহই করেচি তোর কোন ভাল করতে পরিনি—ভগবান্ তোর ভাল করুন! দিদির কাছে আমি একবার তোর হয়ে ক্ষমাভিক্ষা করে নিইগে! (প্রস্থান)

শশধর। তবে এস সতীশ, আমার ঘরে আজ আহার করে যেতে হবে।

দ্রুতপদে নলিনীর প্রবেশ।

নলিনী। সতীশ!

সতীশ। কি নলিনী!

নলিনী। এর মানে কি? এ চিঠি তুমি আমাকে কেন লিখেচ?

সতীশ। মানে যেমন বুঝেছিলে সেইটেই ঠিক! আমি তোমাকে প্রাতারণা করে চিঠি লিখি নি। তবে আমার ভাগ্যক্রমে সকলি উল্টা হয়। তুমি মনে করতে পার তোমার দয়া উদ্রেক করবার জন্যই আমি—কিন্তু মেসোমশায় সাক্ষী আছেন আমি অভিনয় করছিলেম না—তবু যদি বিশ্বাস না হয় প্রতিজ্ঞারক্ষা করবার এখনো সময় আছে!

নলিনী। কি তুমি পাগলের মত বকচ? আমি তোমার কি অপরাধ করেছি যে তুমি অমাকে এমন নিষ্ঠুর ভাবে—

সতীশ। যে জন্য আমি এই সংকল্প করেছি সে তুমি জান নলিনী—আমি ত একবর্ণও গোপন করিনি তবু কি আমার উপর তোমার শ্রদ্ধা আছে?

নলিনী। শ্রদ্ধা! সতীশ, তোমার উপর ঐ জন্যই আমার রাগ ধরে! শ্রদ্ধা ছি, ছি, শ্রদ্ধা ত পৃথিবীতে অনেকেই অনেককে করে! তুমি যে কাজ করেছ আমিও তাই করেছি—তোমাতে আমাতে কোন ভেদ রাখিনি। এই দেখ আমার গহনাগুলি সব এনেচি—এগুলো এখনো আমার সম্পত্তি নয় —এগুলি আমার বাপ মায়ের। আমি তাঁদিগকে না বলে এনেচি এর কত দাম হতে পারে আমি কিছুই জানিনে; কিন্তু এদিয়ে কি তোমার উদ্ধার হবে না?

শশধর। উদ্ধার হবে এই গহনাগুলি সঙ্গে আরো অমূল্য যে ধনটি দিয়েচ তা দিয়েই সতীশের উদ্ধার হবে।

নলিনী। এই যে শশধর বাবু, মাপ করবেন, তাড়াতাড়িতে আপনাকে আমি—

শশধর। মা, সে জন্য লজ্জা কি! দৃষ্টির দোষ কেবল আমাদের মত বুড়োদেরই হয় না—তোমাদের বয়সে আমাদের মত প্রবীন লোক হঠাৎ চোখে ঠেকেনা! সতীশ, তোমার আপিশের সাহেব এসেচেন্ দেখ্‌চি। আমি তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়ে আসি, ততক্ষণ তুমি আমার হ'য়ে অতিথিসৎকার কর। মা, এই পিস্তলটা এখন তোমার জিম্বাতেই থাকতে পারে।

গুপ্তধন।

(১)

অমাবস্যার নিশীথ রাত্রি। মৃত্যুঞ্জয় তান্ত্রিক মতে তাহাদের বহুকালের গৃহদেবতা জয়কালীর পূজায় বসিয়াছে। পূজা সমাধা করিয়া যখন উঠিল, তখন নিকটস্থ আমবাগান হইতে প্রত্যূষের প্রথম কাক ডাকিল।

মৃত্যুঞ্জয় পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ রহিয়াছে। তখন সে একবার দেবীর চরণতলে মস্তক ঠেকাইয়া তাঁহার আসন সরাইয়া দিল। সেই আসনের নীচে হইতে একটি কাঁঠাল কাঠের বাক্স বাহির হইল। পৈতায় চাবি বাঁধা ছিল। সেই চাবি লাগাইয়া মৃত্যুঞ্জয় বাক্সটি খুলিল। খুলিবামাত্রেই চমকিয়া উঠিয়া মথায় করাঘাত করিল।

মৃত্যুঞ্জয়ের অন্দরের বগান প্রাচীর দিয়া ঘেরা। সেই বাগানের এক প্রান্তে বড় বড় গাছের ছায়ার অন্ধকারে এই ছোট মন্দিরটি। মন্দিরে জয়কালীর মূর্ত্তি ছাড়া আর কিছুই নাই; তাহার প্রবেশদ্বার একটিমাত্র। মৃত্যুঞ্জয় বাক্সটি লইয়া অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করিয়া দেখিল। মৃত্যুঞ্জয় বাক্সটি খুলিবার পূর্ব্বে তাহা বন্ধই ছিল—কেহ তাহা ভাঙ্গে নাই। মৃত্যুঞ্জয় দশবার করিয়া প্রতিমার চারিদিকে ঘুরিয়া হাতড়াইয়া দেখিল—কিছুই পাইল না। পাগলের মত হইয়া মন্দিরের দ্বার খুলিয়া ফেলিল—তখন ভোরের আলো ফুটিয়া

উঠিতেছে। মন্দিরের চারিদিকে মৃত্যুঞ্জয় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বৃথা আশ্বাসে খুঁজিয়া বেড়াইত লাগিল।

সকালবেলাকার অলোক যখন পরিস্ফুট হইয়া উঠিল, তখন সে বাহিরে চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া মথায় হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি অনিদ্রার পর ক্লান্তশরীরে একটু তন্দ্রা আসিয়াছে এমন সময়ে হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া শুনিল, জয় হোক বাবা।

সম্মুখে প্রাঙ্গণে এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসী। মৃত্যুঞ্জয় ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করিল। সন্ন্যাসী তাহার মথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন—বাবা, তুমি মনের মধ্যে বৃথা শোক করিতেছ।

শুনিয়া মৃত্যুঞ্জয় আশ্চর্য্য হইয়া উঠিল—কহিল,—আপনি অন্তর্য্যামী, নহিলে আমার শোক কেমন করিয়া বুঝিলেন? আমি ত কাহাকেও কিছু বলি নাই।

সন্ন্যাসী কহিলেন—বৎস, আমি বলিতেছি, তোমার যাহা হারাইয়াছে সেজন্য তুমি আনন্দ কর শোক করিয়ো না।

মৃত্যুঞ্জয় তাঁহার দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল—আপনি তবে ত সমস্তই জানিয়াছেন—কেমন করিয়া হারাইয়াছে, কোথায় গেলে ফিরিয়া পাইব তাহা না বলিলে আমি আপনার চরণ ছাড়িব না।

সন্ন্যাসী কহিলেন, আমি যদি তোমার অমঙ্গল কামনা করিতাম তবে বলিতাম। কিন্তু ভগবতী দয়া করিয়া যাহা হরণ করিয়াছেন সেজন্য শোক করিয়ো না।

মৃত্যুঞ্জয় সন্ন্যাসীকে প্রসন্ন করিবার জন্য সমস্ত দিন বিবিধ উপচারে তাঁহার সেবা করিল। পর দিন প্রত্যূষে নিজের গোহাল হইতে লোটা ভরিয়া সফেন দুগ্ধ দুহিয়া লইয়া আসিয়া দেখিল সন্ন্যাসী নাই।

(২)

মৃত্যুঞ্জয় যখন শিশু ছিল, যখন তাহার পিতামহ হরিহর একদিন এই চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া তামাক খাইতেছিল, তখন এমনি করিয়াই একটি সন্ন্যাসী "জয় হোক্, বাবা" বলিয়া এই প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। হরিহর সেই সন্ন্যাসীকে কয়েকদিন বাড়িতে রাখিয়া বিধিমত সেবার দ্বারা সন্তুষ্ট করিল।

বিদায়কালে সন্ন্যাসী যখন জিজ্ঞাসা করিলেন বৎস, তুমি কি চাও—হরিহর কহিল, বাবা যদি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন তবে আমার অবস্থাটা একবার শুনুন্! এককালে এই গ্রামে আমরা সকলের চেয়ে বর্দ্ধিষ্ণু ছিলাম। আমার প্রপিতামহ দূর হইতে কুলীন আনাইয়া তাঁহার এক কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। তাঁহার সেই দৌহিত্রবংশ আমাদিগকেই ফাঁকি দিয়া আজকাল এই গ্রামে বড়লোক হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের এখন অবস্থা ভাল নয়, কাজেই ইহাদের অহঙ্কার সহ্য করিয়া থাকি। কিন্তু আর সহ্য হয় না। কি করিলে আবার আমাদের বংশ বড় হইয়া উঠিবে সেই উপায় বলিয়া দিন, সেই আশীর্ব্বাদ করুন।

সন্ন্যাসী ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, বাবা, ছোট হইয়া সুখে থাক। বড় হইবার চেষ্টায় শ্রেয় দেখি না।

কিন্তু হরিহর তবু ছাড়িল না, বংশকে বড় করিবার জন্য সে সমস্ত স্বীকার করিতে রাজি আছে।

তখন সন্ন্যাসী তাঁহার ঝুলি হইতে কাপড়ে মোড়া একটি তুলট কাগজের লিখন বাহির করিলেন। কাগজখানি দীর্ঘ, কোষ্ঠীপত্রের মত গুটানো। সন্ন্যাসী সেটি মেজের উপরে খুলিয়া ধরিলেন। হরিহর দেখিল, তাহাতে নানাপ্রকার চক্রে নানা সাঙ্কেতিক চিহ্ন আঁকা, আর সকলের নিম্নে একটি প্রকাণ্ড ছড়া লেখা আছে তাহার আরম্ভটা এইরূপ ঃ—

পায়ে ধরে সাধা
রা নাহি দেয় রাধা ॥
শেষে দিল রা,
পাগোল ছাড় পা ॥
তেঁতুল বটের কোলে,
দক্ষিণে যাও চলে ॥
ঈশানকোণে ঈশানী,
কহে দিলাম নিশানী ॥ ইত্যাদি।

হরিহর কহিল, বাবা, কিছুই ত বুঝিলাম না!

সন্ন্যাসী কহিলেন—কাছে রাখিয়া দাও, দেবীর পূজা কর। তাঁহার প্রসাদে তোমার বংশে কেহ না কেহ এই লিখন ঐশ্বর্য্য পাইবে জগতে যাহার তুলনা নাই।

হরিহর মিনতি করিয়া কহিল, বাবা কি বুঝাইয়া দিবেন না?

সন্ন্যাসী কহিলেন—না। সাধনা দ্বারা বুঝিতে হইবে!

এমন সময় হরিহরের ছোট ভাই শঙ্কর আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া হরিহর তাড়াতাড়ি লিখনটি লইবার চেষ্টা করিল। সন্ন্যাসী হাসিয়া কহিলেন, বড় হইবার পথের দুঃখ এখন হইতেই সুরু হইল। কিন্তু গোপন করিবার দরকার নাই। কারণ ইহার রহস্য কেবল একজন মাত্রই ভেদ করিতে পারিবে, হাজার চেষ্টা করিলেও আর কেহ তাহা পারিবে না! তোমাদের মধ্যে সেই লোকটি যে কে তাহা কেহ জানে না। অতএব ইহা সকলের সম্মুখেই নির্ভয়ে খুলিয়া রাখিতে পার।

সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন। কিন্তু হরিহর এ কাগজটি লুকাইয়া না রাখিয়া থাকিতে পারিল না। পাছে আর কেহ ইহা হইতে লাভবান হয়, পাছে তাহার ছোট ভাই শঙ্কর ইহার ফলভোগ করিতে পারে, এই আশঙ্কায় হরিহর এই কাগজটি কাঁঠালকাঠের বাক্সে বন্ধ করিয়া তাহাদের গৃহদেবতা জয়কালীর আসনতলে লুকাইয়া রাখিল। প্রত্যেক অমাবস্যায় নিশীথ রাত্রে দেবীর পূজা সারিয়া সে একবার করিয়া সেই কাগজটি খুলিয়া দেখিত, যদি দেবী প্রসন্ন হইয়া তাহাকে অর্থ বুঝিবার শক্তি দেন্।

শঙ্কর কিছুদিন হইতে হরিহরকে মিনতি করিতে লাগিল, দাদা, আমাকে সেই কাগজটা একবার ভাল করিয়া দেখিতে দাও না!

হরিহর কহিল দূর পাগল! সে কাগজ কি আছে! বেটা ভণ্ডসন্ন্যাসী কাগজে কতকগুলা হিজিবিজি কাটিয়া আমাকে ফাঁকি দিয়া গেল—আমি সে পুড়াইয়া ফেলিয়াছি।

শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল। হঠাৎ একদিন শঙ্করকে ঘরে দেখিতে পাওয়া গেল না। তাহার পর হইতে সে নিরুদ্দেশ।

হরিহরের অন্য সমস্ত কাজকর্ম্ম নষ্ট হইল—গুপ্ত ঐশ্বর্য্যের ধ্যান এক মুহূর্ত্ত সে ছাড়িতে পারিল না।

মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে সে তাহার বড় ছেলে শ্যামাপদকে এই সন্ন্যাসীদত্ত কাগজখানি দিয়া গেল।

এই কাগজ পাইয়া শ্যামাপদ চাকুরি ছাড়িয়া দিল। জয়কালীর পূজায় আর একান্ত মনে এই লিখন পাঠের চর্চ্চায় তাহার জীবনটা যে কোনদিক দিয়া কাটিয়া গেল তাহা বুঝিতে পারিল না।

মৃত্যুঞ্জয় শ্যামাপদের বড় ছেলে। পিতার মৃত্যুর পরে সে এই সন্ন্যাসীদত্ত গুপ্তলিখনের অধিকারী হইয়াছে। তাহার অবস্থা উত্তরোত্তর যতই হীন হইয়া আসিতে লাগিল, ততই অধিকতর আগ্রহের সহিত ঐ কাগজখানির প্রতি তাহার সমস্ত চিত্ত নিবিষ্ট হইল। এমন সময় গত অমাবস্যারাত্রে পূজার পর লিখনখানি আর দেখিতে পাইল না—সন্ন্যাসীও কোথায় অন্তর্দ্ধান করিল।

মৃত্যুঞ্জয় কহিল এই সন্ন্যাসীকে ছাড়া হইবে না। সমস্ত সন্ধান ইহার কাছ হইতেই মিলিবে।

এই বলিয়া সে ঘর ছাড়িয়া সন্ন্যাসীকে খুঁজিতে বাহির হইল। একবৎসর পথে পথে কাটিয়া গেল।

(৩)

গ্রামের নাম ধারাগোল। সেখানে মৃত্যুঞ্জয় মুদির দোকানে বসিয়া তামাক খাইতেছিল আর অন্যমনস্ক হইয়া নানা কথা

ভাবিতেছিল। কিছু দূরে মাঠের ধার দিয়া একজন সন্ন্যাসী চলিয়া গেল। প্রথমটা মৃত্যুঞ্জয়ের মনযোগ আকৃষ্ট হইল না। একটু পরে হঠাৎ তাহার মনে হইল, যে লোকটা চলিয়া গেল এই ত সেই সন্ন্যাসী! তাড়াতাড়ি হুঁকাটা রাখিয়া মুদিকে সচকিত করিয়া একদৌড়ে সে দোকান হইতে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু সে সন্ন্যাসীকে দেখা গেল না।

তখন সন্ধ্যা অন্ধকার হইয়া অসিয়াছে। অপরিচিত স্থানে কোথায় যে সন্ন্যাসীর সন্ধান করিতে যাইবে তাহা সে ঠিক করিতে পারিল না। দোকানে ফিরিয়া আসিয়া মুদিকে জিজ্ঞাসা করিল, ঐ যে মস্ত বন দেখা যাইতেছে ওখানে কি আছে?

মুদি কহিল, এককালে ঐ বন সহর ছিল কিন্তু অগস্ত্য মুনির শাপে ওখানকার রাজা প্রজা সমস্তই মড়কে মরিয়াছে। লোকে বলে ওখানে অনেক ধনরত্ন আজও খুঁজিলে পাওয়া যায়; কিন্তু দিনদুপরেও ঐ বনে সাহস করিয়া কেহ যাইতে পারে না। যে গেছে সে আর ফেরে নাই।

মৃত্যুঞ্জয়ের মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। সমস্ত রাত্রি মুদির দোকানে মাদুরের উপর পড়িয়া মশার জ্বালায় সর্ব্বাঙ্গ চাপড়াইতে লাগিল আর ঐ বনের কথা, সন্ন্যাসীর কথা, সেই হারানো লিখনের কথা ভাবিতে থাকিল। বার বার পড়িয়া সেই লিখনটি মৃত্যুঞ্জয়ের প্রায় কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছিল—তাই এই অনিদ্রাবস্থায় কেবলি তাহার মাথায় ঘুরিতে লাগিল—

পায়ে ধরে সাধা।
রা নাহি দেয় রাধা ॥
শেষে দিল রা,
পাগোল ছাড় পা ॥

মাথা গরম হইয়া উঠিল—কোনমতেই এই ক'টা ছত্র সে মন হইতে দূর করিতে পারিল না। অবশেষে ভোরের বেলায় যখন তাহার তন্দ্রা আসিল, তখন স্বপ্নে এই চারি ছত্রের অর্থ অতি সহজে তাহার নিকট প্রকাশ হইল। "রা নাহি দেয় রাধা" অতএব "রাধা"র "রা" নাহি থাকিলে "ধা রহিল—"শেষে দিল রা" অতএব হইল "ধারা"—"পাগোল ছাড় পা"—"পাগোল" এর "পা" ছাড়িলে "গোল" বাকি রহিল—অতএব সমস্তটা মিলিয়া হইল "ধারা গোল"—এই জায়গাটার নামত "ধারাগোল"ই বটে!

স্বপ্ন ভাঙিয়া মৃত্যুঞ্জয় লাফাইয়া উঠিল।

৪

সমস্ত দিন বনের মধ্যে ফিরিয়া সন্ধ্যাবেলায় বহুকষ্টে পথ খুঁজিয়া অনাহারে মৃতপ্রায় অবস্থায় মৃত্যুঞ্জয় গ্রামে ফিরিল।

পরদিন চাদরে চিঁড়া বাঁধিয়া পুনর্ব্বার সে বনের মধ্যে যাত্রা করিল। অপরাহ্ণে একটা দিঘির ধারে আসিয়া উপস্থিত হইল। দিঘির মাঝখানটা পরিষ্কার জল আর পাড়ের গায়ে গায়ে চারিদিকে পদ্ম আর কুমুদের বন। পাথরে বাঁধান ঘাট ভাঙ্গিয়া চুরিয়া পড়িয়াছে। সেইখানে জলে চিঁড়া ভিজাইয়া খাইয়া দিঘির চারিদিক প্রদক্ষিণ করিয়া দেখিতে লাগিল।

দিঘির পশ্চিম পাড়ির প্রান্তে হঠাৎ মৃত্যুঞ্জয় থমকিয়া দাঁড়াইল। দেখিল একটা তেঁতুলগাছকে বেষ্টন করিয়া প্রকাণ্ড বটগাছ উঠিয়াছে। তৎক্ষণাৎ তাহার মনে পড়িল—

তেঁতুল বটের কোলে
দক্ষিণে যাও চলে॥

দক্ষিণে কিছুদূর যাইতেই ঘন জঙ্গলের মধ্যে আসিয়া পড়িল। সেখানে সে বেতঝাড় ভেদ করিয়া চলা একেবারে অসাধ্য। যাহা হউক্; মৃত্যুঞ্জয় ঠিক করিল এই গাছটাকে কোনো মতে হারাইলে চলিবে না।

এই গাছের কাছে ফিরিয়া আসিবার সময় গাছের অন্তরাল দিয়া অনতিদূরে একটা মন্দিরের চূড়া দেখা গেল। সেই দিকের প্রতি লক্ষ্য করিয়া মৃত্যুঞ্জয় এক ভাঙ্গা মন্দিরের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল নিকটে একটা চুল্লি, পোড়াকাঠ আর ছাই পড়িয়া আছে। অতি সাবধানে মৃত্যুঞ্জয় ভগ্নদ্বার মন্দিরের মধ্যে উ কি মারিল। সেখানে কোনো লোক নাই, প্রতিমা নাই, কেবল একটি কম্বল, কমণ্ডলু আর গেরুয়া উত্তরীয় পড়িয়া আছে।

তখন সন্ধ্যা আসন্ন হইয়া আসিয়াছে; গ্রাম বহুদূরে; অন্ধকারে বনের মধ্যে পথ সন্ধান করিয়া যাইতে পারিবে কি না; তাই এই মন্দিরে মনুষ্যবসতির লক্ষণ দেখিয়া মৃত্যুঞ্জয় খুসি হইল। মন্দির হইতে একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড ভাঙ্গিয়া দ্বারের কাছে পড়িয়াছিল; সেই পাথরের উপরে বসিয়া নতশিরে ভাবিতে ভাবিতে মৃত্যুঞ্জয় হটাৎ পাথরের গায়ে কি যেন লেখা দেখিতে পাইল। ঝুঁকিয়া

পড়িয়া দেখিল একটি চক্র আঁকা, তাহার মধ্যে কতক স্পষ্ট কতক লুপ্তপ্রায় ভাবে নিম্নলিখিত সংকেতিক অক্ষর লেখা আছে :—

এই চক্রটি মৃত্যুঞ্জয়ের সুপরিচিত। কত অমাবস্যা রাত্রে পূজাগৃহে সুগন্ধ ধূপের ধূমে ঘৃতদীপালোকে তুলট কাগজে অঙ্কিত এই চক্রচিহ্নের উপরে ঝুঁকিয়া পড়িয়া রহস্যভেদ করিবার জন্য একাগ্রমনে সে দেবীর প্রসাদ যাচ্ঞা করিয়াছে! আজ অভীষ্ট সিদ্ধির অত্যন্ত সন্নিকটে আসিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ যেন কাঁপিতে লাগিল। পাছে তীরে আসিয়া তরী ডোবে, পাছে সামান্য একটা ভুলে তাহার সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়, পাছে সেই সন্ন্যাসী পূর্ব্বে আসিয়া সমস্ত উদ্ধার করিয়া লইয়া গিয়া থাকে এই আশঙ্কায় তাহার বুকের মধ্যে তোলপাড় করিতে লাগিল! এখন যে তাহার কি কর্ত্তব্য তাহা সে ভাবিয়া পাইল না। তাহার মনে হইল সে হয় ত তাহার ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডারের ঠিক উপরেই বসিয়া আছে অথচ কিছুই জানিতে পাইতেছে না!

বসিয়া বসিয়া সে কালীনাম জপ করিতে লাগিল; সন্ধ্যার অন্ধকার নিবিড় হইয়া আসিল; ঝিল্লির ধ্বনিতে বনভূমি মুখর হইয়া উঠিল।

৫

এমন সময় কিছু দূর ঘনবনের মধ্যে অগ্নির দীপ্তি দেখা গেল। মৃত্যুঞ্জয় তাহার প্রস্তরাসন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল আর সেই শিখা লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিল।

বহুকষ্টে কিছুদূর গিয়া একটা অশথগাছের গুঁড়ির অন্তরাল হইতে স্পষ্ট দেখিতে পাইল তাহার সেই পরিচিত সন্ন্যাসী অগ্নির আলোকে সেই তুলটের লিখন মেলিয়া একটা কাঠি দিয়া ছাইয়ের উপরে এক মনে অঙ্ক কসিতেছে।

মৃত্যুঞ্জয়ের ঘরের সেই পৈতৃক তুলটের লিখন! আরে ভণ্ড, চোর! এই জন্যই সে মৃত্যুঞ্জয়কে শোক করিতে নিষেধ করিয়াছিল বটে!

সন্ন্যাসী একবার করিয়া অঙ্ক কসিতেছে, আর, একটা মাপ-কাঠি লইয়া জমি মাপিতেছে,—কিয়দ্দূর মাপিয়া হতাশ হইয়া ঘাড় নাড়িয়া পুনর্ব্বার আসিয়া অঙ্ক কসিতে প্রবৃত্ত হইতেছে।

এমনি করিয়া রাত্রি যখন অবসানপ্রায়—যখন নিশান্তের শীত বায়ুতে বনস্পতির অগ্রশাখার পল্লবগুলি মর্ম্মরিত হইয়া উঠিল, তখন সন্ন্যাসী সেই লিখনপত্র গুটাইয়া লইয়া চলিয়া গেল।

মৃত্যুঞ্জয় কি করিবে ভাবিয়া পাইল না। ইহা সে নিশ্চয় বুঝিতে পারিল যে, সন্ন্যাসীর সাহায্য ব্যতীত এই লিখনের রহস্যভেদ করা তাহার সাধ্য হইবে না। লুব্ধ সন্ন্যাসী যে মৃত্যুঞ্জয়কে সাহায্য করিবে না তাহাও নিশ্চিত। অতএব গোপনে সন্ন্যাসীর প্রতি দৃষ্টি রাখা ছাড়া অন্য উপায় নাই, কিন্তু দিনের বেলায় গ্রামে না

গেলে তাহার আহার মিলিবে না ; অতএব অন্ততঃ কাল সকালে একবার গ্রামে যাওয়া আবশ্যক।

ভোরের দিকে অন্ধকার একটু ফিকা হইবামাত্র সে গাছ হইতে নামিয়া পড়িল। যেখানে সন্ন্যাসী ছাইয়ের মধ্যে আঁক কসিতেছিল সেখানে ভাল করিয়া দেখিল, কিছুই বুঝিল না। চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া দেখিল, অন্য বনখণ্ডের সঙ্গে কোনও প্রভেদ নাই।

বনতলেব অন্ধকার ক্রমে যখন ক্ষীণ হইয়া আসিল তখন মৃত্যুঞ্জয় অতি সাবধানে চারিদিক দেখিতে দেখিতে গ্রামের উদ্দেশে চলিল। তাহার ভয় ছিল পাছে সন্ন্যাসী তাহাকে দেখিতে পায়।

যে দোকানে মৃত্যুঞ্জয় আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিল তাহার নিকটে একটি কায়স্থগৃহিণী ব্রতউদ্‌যাপন করিয়া সে দিন ব্রাহ্মণভোজন করাইতে প্রবৃত্ত ছিল। সেই খানে আজ মৃত্যুঞ্জয়ের আহার জুটিয়া গেল। কয়দিন আহারের কষ্টের পর আজ তাহার ভোজনটি গুরুতর হইয়া উঠিল। সেই গুরু ভোজনের পর যেমন তামাকটি খাইয়া দোকানের মাদুরটিতে একবার গড়াইয়া লইবার ইচ্ছা করিল, অমনি গত রাত্রির অনিদ্রাকাতর মৃত্যুঞ্জয় ঘুমে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

মৃত্যুঞ্জয় স্থির করিয়াছিল, আজ সকাল সকাল আহারাদি করিয়া যথেষ্ট বেলা থাকিতে বাহির হইবে। ঠিক তাহার উল্টা হইল। যখন তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল তখন সূর্য্য অস্ত গিয়াছে।

তবু মৃত্যুঞ্জয় দমিল না। অন্ধকারেই বনের মধ্যে সে প্রবেশ করিল।

দেখিতে দেখিতে রাত্রি ঘনীভূত হইয়া আসিল। গাছের ছায়ার মধ্যে দৃষ্টি আর চলে না, জঙ্গলের মধ্যে পথ অবরুদ্ধ হইয়া যায়। মৃত্যুঞ্জয় যে কোন্‌দিকে কোথায় যাইতেছে তাহা কিছুই ঠাহর পাইল না। রাত্রি যখন অবসান হইল তখন দেখিল সমস্ত রাত্রি সে বনের প্রান্তে একই জায়গায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে।

কাকের দল কা কা শব্দে গ্রামের দিকে উড়িল। এই শব্দ মৃত্যুঞ্জয়ের কাণে ব্যঙ্গপূর্ণ ধিক্কারবাক্যের মত শুনাইল।

৬

গণনায় বারম্বার ভুল আর সেই ভুল সংশোধন করিতে করিতে অবশেষে সন্ন্যাসী সুরঙ্গের পথ আবিষ্কার করিয়াছেন। সুরঙ্গের মধ্যে মশাল লইয়া তিনি প্রবেশ করিলেন। বাঁধানো ভিত্তির গায়ে স্যাঁৎলা পড়িয়াছে—মাঝে মাঝে এক এক জায়গায় জল চুঁইয়া পড়িতেছে। স্থানে স্থানে কতকগুলা ভেক গায়ে গায়ে স্তূপাকার হইয়া নিদ্রা দিতেছে। এই পিছল পথ দিয়া কিছু দূর যাইতেই সন্ন্যাসী দেখিলেন সম্মুখে দেয়াল উঠিয়াছে, পথ অবরুদ্ধ। কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। দেয়ালের সর্ব্বত্র লৌহদণ্ড দিয়া সবলে আঘাত করিয়া দেখিলেন কোথাও ফাঁকা আওয়াজ দিতেছে না—কোথাও রন্ধ্র নাই—এই পথটার যে এই খানেই শেষ তাহা নিঃসন্দেহ।

আবার সেই কাগজ খুলিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। সে রাত্রি এমনি করিয়া কাটিয়া গেল।

পরদিন পুনর্ব্বার গণনা সারিয়া সুরঙ্গে প্রবেশ করিলেন। সেদিন গুপ্তসংকেত অনুসরণ পূর্ব্বক একটি বিশেষ স্থান হইতে পাথর খসাইয়া এক শাখাপথ আবিষ্কার করিলেন। সেই পথে চলিতে চলিতে আবার একজায়গায় পথ অবরুদ্ধ হইয়া গেল।

অবশেষে পঞ্চম রাত্রে সুরঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সন্ন্যাসী বলিয়া উঠিলেন—আজ আমি পথ পাইয়াছি, আজ আর আমার কোন মতেই ভুল হইবে না।

পথ অত্যন্ত জটিল; তাহার শাখা প্রশাখার অন্ত নাই—কোথাও এত সঙ্কীর্ণ যে গুঁড়ি মারিয়া যাইতে হয়। বহু যত্নে মশাল ধরিয়া চলিতে চলিতে সন্ন্যাসী একটা গোলাকার ঘরের মত জায়গায় আসিয়া পৌঁছিলেন। সেই ঘরের মাঝখানে একটা বৃহৎ ইঁদারা। মশালের আলোকে সন্ন্যাসী তাহার তল দেখিতে পাইলেন না। ঘরের ছাদ হইতে একটা মোটা প্রকাণ্ড লৌহশৃঙ্খল ইঁদারার মধ্যে নামিয়া গেছে। সন্ন্যাসী প্রাণপণ বলে ঠেলিয়া এই শৃঙ্খলটাকে অল্প একটুখানি নাড়াইবামাত্র ঠং করিয়া একটা শব্দ ইঁদারার গহ্বর হইতে উত্থিত হইয়া ঘর ময় প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সন্ন্যাসী উচ্চৈস্বরে বলিয়া উঠিলেন, পাইয়াছি!

যেমন বলা অমনি সেই ঘরের ভাঙ্গা ভিত্তি হইতে একটা পাথর গড়াইয়া পড়িল আর সেই সঙ্গে আর একটি কি সচেতন পদার্থ ধপ্ করিয়া পড়িয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। সন্ন্যাসী এই অকস্মাৎ শব্দে চমকিয়া উঠিতেই তাঁহার হাত হইতে মশাল পড়িয়া নিবিয়া গেল।

৭

সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে ? কোনও উত্তর পাইলেন না। তখন অন্ধকারে হাৎড়াইতে গিয়া তাঁহার হাতে একটি মানুষের দেহ ঠেকিল। তাহাকে নাড়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কে তুমি!

কোনও উত্তর পাইলেন না। লোকটা অচেতন হইয়া গেছে।

তখন চক্‌মকি ঠুকিয়া ঠুকিয়া সন্ন্যাসী অনেক কষ্টে মশাল ধরাইলেন। ইতিমধ্যে সেই লোকটা সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইল আর উঠিবার চেষ্টা করিয়া বেদনায় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

সন্ন্যাসী কহিলেন, একি মৃত্যুঞ্জয় যে! তোমার এমতি হইল কেন ?

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, বাবা মাপ কর। ভগবান আমাকে শাস্তি দিয়াছেন। তোমাকে পাথর ছুঁড়িয়া মারিতে গিয়া সাম্‌লাইতে পারি নাই—পিছলে পাথরশুদ্ধ আমি পড়িয়া গেছি। পাটা নিশ্চয় ভাঙ্গিয়া গেছে।

সন্ন্যাসী কহিলেন, আমাকে মারিয়া তোমার কি লাভ হইত!

মৃত্যুঞ্জয় কহিল—লাভের কথা তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ! তুমি কিসের লোভে আমার পূজাঘর হইতে লিখনখানি চুরি করিয়া এই সুরঙ্গের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছ! তুমি চোর, তুমি ভণ্ড! আমার পিতামহকে যে সন্ন্যাসী ঐ লিখনখানি দিয়াছিলেন তিনি বলিয়াছিলেন আমাদেরই বংশের কেহ এই লিখনের সংকেত বুঝিতে পারিবে। এই গুপ্ত ঐশ্বর্য্য আমাদেরই বংশের প্রাপ্য। তাই আমি এ কয়দিন না খাইয়া না ঘুমাইয়া ছায়ার মত তোমার

পশ্চাতে ফিরিয়াছি। আজ যখন তুমি বলিয়া উঠিলে "পাইয়াছি" তখন আমি আর থাকিতে পারিলাম না। আমি তোমার পশ্চাতে আসিয়া ভিতের ঐ গর্ত্তটার ভিতরে লুকাইয়া বসিয়াছিলাম। ওখান হইতে একটা পাথর খসাইয়া তোমাকে মারিতে গেলাম কিন্তু শরীর দুর্ব্বল, জায়গাটাও অত্যন্ত পিছল—তাই পড়িয়া গেছি—এখন তুমি আমাকে মারিয়া ফেল সেও ভাল—আমি যক্ষ হইয়া এই ধন আগ্‌লাইব—কিন্তু তুমি ইহা লইতে পারিবে না—কোনমতেই না! যদি লইতে চেষ্টা কর, আমি ব্রাহ্মণ তোমাকে অভিশাপ দিয়া এই কুপের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করিব। এ ধন তোমার ব্রহ্মরক্ত গোরক্ততুল্য হইবে—এধন তুমি কোনও দিন সুখে ভোগ করিতে পারিবে না। আমাদের পিতা পিতামহ এই ধনের উপরে সমস্ত মন রাখিয়া মরিয়াছেন—এই ধনের ধ্যান করিতে করিতে আমরা দরিদ্র হইয়াছি—এই ধনের সন্ধানে আমি বাড়িতে অনাথা স্ত্রী ও শিশুসন্তান ফেলিয়া আহার-নিদ্রা ছাড়িয়া লক্ষ্মীছাড়া পাগলের মত মাঠে ঘাটে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি—এধন তুমি আমার চোখের সম্মুখে কখনও লইতে পারিবে না।

৮

সন্ন্যাসী কহিলেন—মৃত্যুঞ্জয়, তবে শোন! সমস্ত কথা তোমাকে বলি!

তুমি জান, তোমার পিতামহের এক কনিষ্ঠ সহোদর ছিল, তাহার নাম ছিল শঙ্কর।

মৃত্যুঞ্জয় কহিল—হাঁ, তিনি নিরুদ্দেশ হইয়া বাহির হইয়া গিয়াছেন।

সন্ন্যাসী কহিলেন—আমি সেই শঙ্কর। মৃত্যুঞ্জয় হতাশ হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। এতক্ষণ এই গুপ্তধনের উপর তাহার যে একমাত্র দাবী সে সাব্যস্ত করিয়া বসিয়াছিল তাহারই বংশের আত্মীয় আসিয়া সে দাবী নষ্ট করিয়া দিল।

শঙ্কর কহিলেন—দাদা সন্ন্যাসীর নিকট হইতে লিখন পাইয়া অবধি আমার কাছে তাহা বিধিমতে লুকাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু তিনি যতই গোপন করিতে লাগিলেন, আমার ঔৎসুক্য ততই বাড়িয়া উঠিল। তিনি দেবীর আসনের নীচে বাক্সের মধ্যে ঐ লিখনখানি লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন আমি তাহার সন্ধান পাইলাম আর দ্বিতীয় চাবি বানাইয়া প্রতিদিন অল্প অল্প করিয়া সমস্ত কাগজখানা নকল করিতে লাগিলাম। যেদিন নকল শেষ হইল সেই দিনই আমি এই ধনের সন্ধানে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইলাম। আমারও ঘরে অনাথা স্ত্রী এবং একটি শিশুসন্তান ছিল। আজ তাহারা কেহ বাঁচিয়া নাই।

কত দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ করিয়াছি তাহা বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন নাই। সন্ন্যাসীদত্ত এই লিখন নিশ্চয় কোনও সন্ন্যাসী আমাকে বুঝাইয়া দিতে পারিবেন এই মনে করিয়া অনেক সন্ন্যাসীর আমি সেবা করিয়াছি। অনেক ভণ্ড সন্ন্যাসী আমার ঐ কাগজের সন্ধান পাইয়া তাহা হরণ করিবারও চেষ্টা করিয়াছে।

এইরূপে কত বৎসরের পর বৎসর কাটিয়াছে, আমার মনে এক মুহূর্ত্তের জন্যও সুখ ছিল না, শান্তি ছিল না।

অবশেষে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যের বলে কুমায়ুন পর্ব্বতে বাবা স্বরূপানন্দ স্বামীর সঙ্গ পাইলাম। তিনি আমাকে কহিলেন, বাবা, তৃষ্ণা দূর কর তাহা হইলেই বিশ্বব্যাপী অক্ষয় সম্পদ আপনি তোমাকে ধরা দিবে!

তিনি আমার মনের দাহ জুড়াইয়া দিলেন। তাঁহার প্রসাদে আকাশের আলোক আর ধরণীর শ্যামলতা আমার কাছে রাজসম্পদ হইয়া উঠিল। একদিন পর্ব্বতের শিলাতলে শীতের সায়াহ্নে পরমহংস বাবার ধুনীতে আগুন জ্বলিতেছিল—সেই আগুনে আমার কাগজখানা সমর্পণ করিলাম। বাবা ঈষৎ একটু হাসিলেন। সে হাসির অর্থ তখন বুঝি নাই আজ বুঝিয়াছি। তিনি নিশ্চয় মনে মনে বলিয়াছিলেন, কাগজখানা ছাই করিয়া ফেলা সহজ কিন্তু বাসনা এত সহজে ভস্মসাৎ হয় না!

কাগজখানার যখন কোনও চিহ্ন রহিল না তখন আমার মনের চারিদিক হইতে একটা নাগপাশ বন্ধন যেন সম্পূর্ণরূপে খুলিয়া গেল। মুক্তির অপূর্ব্ব আনন্দে আমার চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। আমি মনে করিলাম এখন হইতে আমার আর কোনও ভয় নাই—আমি জগতে কিছুই চাহি না।

ইহার অনতিকাল পরে পরমহংসবাবার সঙ্গ হইতে চ্যুত হইলাম। তাঁহাকে অনেক খুঁজিলাম, কোথাও তাঁহার দেখা পাইলাম না।

আমি তখন সন্ন্যাসী হইয়া নিরাসক্তচিত্তে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। অনেক বৎসর কাটিয়া গেল—সেই লিখনের কথা প্রায় ভুলিয়াই গেলাম।

এমন সময় একদিন এই ধারাগোলের বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটি ভাঙ্গা মন্দিরের মধ্যে আশ্রয় লইলাম। দুইএক দিন থাকিতে থাকিতে দেখিলাম, মন্দিরের ভিতে স্থানে স্থানে নানা প্রকার চিহ্ন আঁকা আছে। এই চিহ্নগুলি আমার পূর্ব্ব পরিচিত।

এককালে বহুদিন যাহার সন্ধানে ফিরিয়াছিলাম তাহার যে নাগাল পাওয়া যাইতেছে তাহাতে আমার সন্দেহ রহিল না। আমি কহিলাম, এখানে আর থাকা হইবে না, এবন ছাড়িয়া চলিলাম।

কিন্তু ছাড়িয়া যাওয়া ঘটিল না। মনে হইল, দেখাই যাক না, কি আছে! কৌতূহল একেবারে নিবৃত্ত করিয়া যাওয়াই ভাল। চিহ্নগুলা লইয়া অনেক আলোচনা করিলাম; কোনও ফল হইল না। বারবার মনে হইতে লাগিল কেন সে কাগজখানা পুড়াইয়া ফেলিলাম! সেখানা রাখিলেই বা ক্ষতি কি ছিল!

তখন আবার আমার সেই জন্মগ্রামে গেলাম। আমাদের পৈতৃক ভিটার নিতান্ত দুরবস্থা দেখিয়া মনে করিলাম, আমি সন্ন্যাসী, আমার ধনরত্নে কোনও প্রয়োজন নাই, কিন্তু এই গরীবরা ত গৃহী, সেই গুপ্তসম্পদ ইহাদের জন্য উদ্ধার করিয়া দিলে তাহাতে দোষ নাই।

সেই লিখন কোথায় আছে জানিতাম, তাহা সংগ্রহ করা আমার পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন হইল না।

তাহার পরে একটি বৎসর ধরিয়া এই কাগজখানা লইয়া এই নির্জ্জন বনের মধ্যে গণনা করিয়াছি আর সন্ধান করিয়াছি। মনে আর কোনও চিন্তা ছিল না; যত বারম্বার বাধা পাইতে লাগিলাম ততই উত্তরোত্তর আগ্রহ আরও বাড়িয়া চলিল—উন্মত্তের মত অহোরাত্র এই এক অধ্যবসায়ে নিবিষ্ট রহিলাম।

ইতিমধ্যে কখন তুমি আমার অনুসরণ করিতেছ তাহা জানিতে পারি নাই। আমি সহজ অবস্থায় থাকিলে তুমি কখনই নিজেকে আমার কাছে গোপন রাখিতে পারিতে না; কিন্তু আমি তন্ময় হইয়াছিলাম, বাহিরের ঘটনা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিত না।

তাহার পরে, যাহা খুঁজিতেছিলাম আজ এইমাত্র তাহা আবিষ্কার করিয়াছি। এখানে যাহা আছে পৃথিবীতে কোনও রাজরাজেশ্বরের ভাণ্ডারেও এত ধন নাই। আর একটিমাত্র সঙ্কেত ভেদ করেলেই সেই ধন পাওয়া যাইবে।

এই সঙ্কেতটিই সর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ। কিন্তু এই সঙ্কেতও আমি মনে মনে ভেদ করিয়াছি। সেইজন্যই "পাইয়াছি" বলিয়া মনের উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলাম। যদি ইচ্ছা করি তবে আর এক দণ্ডের মধ্যে সেই স্বর্ণমাণিক্যের ভাণ্ডারের মাঝখানে গিয়া দাঁড়াইতে পারি!

মৃত্যুঞ্জয় শঙ্করের পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, তুমি সন্ন্যাসী

তোমার ত ধনের কোনও প্রয়োজন নাই—আমাকে সেই ভাণ্ডারের মধ্যে লইয়া যাও! আমাকে বঞ্চিত করিও না।

শঙ্কর কহিলেন, আজ আমার শেষবন্ধন ছিন্ন হইয়াছে! তুমি ঐ যে পাথর ফেলিয়া আমাকে মারিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিলে তাহার আঘাত আমার শরীরে লাগে নাই কিন্তু তাহা আমার মোহাবরণকে ভেদ করিয়াছে। তৃষ্ণার করালমূর্ত্তি আজ আমি দেখিলাম! আমার গুরু পরমহংসদেবের নিগূঢ় প্রশান্ত হাস্য এতদিন পরে আমার অন্তরের কল্যাণদীপে অনির্ব্বাণ আলোকশিখা জ্বালাইয়া তুলিল।

মৃত্যুঞ্জয় শঙ্করের পা ধরিয়া পুনরায় কাতরস্বরে কহিল, তুমি মুক্ত পুরুষ, আমি মুক্ত নহি, আমি মুক্তি চাহি না, আমাকে এই ঐশ্বর্য্য হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবে না।

সন্ন্যাসী কহিলেন, বৎস, তবে তুমি তোমার এই লিখনটি লও! যদি ধন খুঁজিয়া লইতে পার তবে লইও।

এই বলিয়া তাঁহার যষ্টি ও লিখনপত্র মৃত্যুঞ্জয়ের কাছে রাখিয়া সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন। মৃত্যুঞ্জয় কহিল, আমাকে দয়া কর, আমাকে ফেলিয়া যাইও না—আমাকে দেখাইয়া দাও!

কোনো উত্তর পাইল না।

তখন মৃত্যুঞ্জয় যষ্টির উপর ভর করিয়া হাতড়াইয়া সুরঙ্গ হইতে বাহির হইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু পথ অত্যন্ত জটিল, গোলকধাঁধার মত, বারবার বাধা পাইতে লাগিল। অবশেষে ঘুরিয়া

ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া এক জায়গায় শুইয়া পড়িল এবং নিদ্রা আসিতে বিলম্ব হইল না।

ঘুম হইতে যখন জাগিল তখন রাত্রি, কি দিন, কি কত বেলা তাহা জানিবার কোনও উপায় ছিল না। অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ হইলে মৃত্যুঞ্জয় চাদরের প্রান্ত হইতে চিঁড়া খুলিয়া লইয়া খাইল। তাহার পর আর একবার হাতড়াইয়া সুরঙ্গ হইতে বাহির হইবার পথ খুঁজিতে লাগিল। নানাস্থানে বাধা পাইয়া বসিয়া পড়িল। তখন চীৎকার করিয়া ডাকিল, ওগো সন্ন্যাসী তুমি কোথায়!

তাহার সেই ডাক সুরঙ্গের সমস্ত শাখাপ্রশাখা হইতে বারম্বার প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। অনতিদূর হইতে উত্তর আসিল আমি তোমার নিকটেই আছি—কি চাও বল!

মৃত্যুঞ্জয় কাতরস্বরে কহিল, কোথায় ধন আছে আমাকে দয়া করিয়া দেখাইয়া দাও!

তখন আর কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। মৃত্যুঞ্জয় বার-ম্বার ডাকিল, কোনও সাড়া পাইল না।

দণ্ডপ্রহরের দ্বারা অবিভক্ত এই ভূতলগত চিররাত্রির মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় আর একবার ঘুমাইয়া লইল। ঘুম হইতে আবার সেই অন্ধকারের মধ্যে জাগিয়া উঠিল। চীৎকার করিয়া ডাকিল— ওগো আছ কি?

নিকট হইতেই উত্তর পাইল—এইখানেই আছি। কি চাও?

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, আমি আর কিছু চাই না—আমাকে এই সুরঙ্গ হইতে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাও!

সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি ধন চাও না?

মৃত্যুঞ্জয় কহিল—না, চাহি না।

তখন চকমকি ঠোকার শব্দ উঠিল এবং কিছুক্ষণ পরে আলো জ্বলিল। সন্ন্যাসী কহিলেন, তবে এস মৃত্যুঞ্জয়, এই সুরঙ্গ হইতে বাহিরে যাই!

মৃত্যুঞ্জয় কাতর স্বরে কহিল, বাবা, নিতান্তই কি সমস্ত ব্যর্থ হইবে? এত কষ্টের পরেও ধন কি পাইব না?

তৎক্ষণাৎ মশাল নিবিয়া গেল। মৃত্যুঞ্জয় কহিল, কি নিষ্ঠুর!—বলিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিল। সময়ের কোনও পরিমাণ নাই, অন্ধকারের কোনও অন্ত নাই। মৃত্যুঞ্জয়ের ইচ্ছা করিতে লাগিল তাহার সমস্ত শরীর-মনের বলে এই অন্ধকারটাকে ভাঙিয়া চূর্ণ করিয়া ফেলে। আলোক, আকাশ আর বিশ্বচ্ছবির বৈচিত্র্যের জন্য তাহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল—কহিল, ওগো সন্ন্যাসী, ওগো নিষ্ঠুর সন্ন্যাসী, আমি ধন চাই না, আমাকে উদ্ধার কর।

সন্ন্যাসী কহিলেন, ধন চাও না? তবে আমার হাত ধর। আমার সঙ্গে চল।

এবারে আর আলো জ্বলিল না। এক হাতে যষ্টি ও এক হাতে সন্ন্যাসীর উত্তরীয় ধরিয়া মৃত্যুঞ্জয় ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। বহুক্ষণ ধরিয়া অনেক আঁকাবাঁকা পথ দিয়া অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া এক জায়গায় আসিয়া সন্ন্যাসী কহিলেন, দাঁড়াও!

মৃত্যুঞ্জয় দাঁড়াইল। তাহার পরে একটা মরিচা পড়া লোহার

দ্বার খোলার উৎকট শব্দ শোনা গেল। সন্ন্যাসী মৃত্যুঞ্জয়ের হাত ধরিয়া কহিলেন—এস।

মৃত্যুঞ্জয় অগ্রসর হইয়া যেন একটা ঘরে প্রবেশ করিল। তখন আবার চকমকি ঠোকার শব্দ শোনা গেল। কিছুক্ষণ পরে যখন মশাল জ্বলিয়া উঠিল তখন একি আশ্চর্য্য দৃশ্য! চারিদিকে দেয়ালের গায়ে মোটা মোটা সোনার পাত ভূগর্ভরুদ্ধ কঠিন সূর্য্যালোকপুঞ্জের মত স্তরে স্তরে সজ্জিত। মৃত্যুঞ্জয়ের চোখ দুটা জ্বলিতে লাগিল। সে পাগলের মত বলিয়া উঠিল—এ সোনা আমার—এ আমি কোন মতেই ফেলিয়া যাইতে পারিব না।

সন্ন্যাসী কহিলেন, আচ্ছা ফেলিয়া যাইও না; এই মশাল রহিল—আর এই ছাতু, চিঁড়া আর বড় এক ঘটি জল রাখিয়া গেলাম।

দেখিতে দেখিতে সন্ন্যাসী বাহির হইয়া আসিলেন আর এই স্বর্ণভাণ্ডারের লৌহদ্বারে কপাট পড়িল।

মৃত্যুঞ্জয় বার বার করিয়া এই স্বর্ণপুঞ্জ স্পর্শ করিয়া ঘরময় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ছোট ছোট স্বর্ণখণ্ড টানিয়া মেজের উপরে ফেলিতে লাগিল, কোলের উপর তুলিতে লাগিল, একটার উপরে আর একটা আঘাত করিয়া শব্দ করিতে লাগিল, সর্ব্বাঙ্গের উপর বুলাইয়া তাহার স্পর্শ লইতে লাগিল। অবশেষে শ্রান্ত হইয়া সোনার পাত বিছাইয়া তাহার উপরে শয়ন করিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, চারিদিকে সোনা ঝক্‌ঝক্ করিতেছে।

সোনা ছাড়া আর কিছুই নাই। মৃত্যুঞ্জয় ভাবিতে লাগিল—পৃথিবীর উপরে হয় ত এতক্ষণে প্রভাত হইয়াছে—সমস্ত জীবজন্তু আনন্দে জাগিয়া উঠিয়াছে।—তাহাদের বাড়িতে পুকুরের ধারের বাগান হইতে প্রভাতে যে একটি স্নিগ্ধগন্ধ উঠিত তাহাই কল্পনায় তাহার নাসিকায় যেন প্রবেশ করিতে লাগিল। সে যেন স্পষ্ট চোখে দেখিতে পাইল, পাতি হাঁসগুলি দুলিতে দুলিতে কলরব করিতে করিতে সকাল বেলায় পুকুরের জলের মধ্যে আসিয়া পড়িতেছে, আর বাড়ির ঝি বামা কোমরে কাপড় জড়াইয়া ঊর্দ্ধোত্থিত দক্ষিণ হস্তের উপর এক রাশি পিতল কাঁশার থালা বাটি লইয়া ঘাটে আনিয়া উপস্থিত করিতেছে।

মৃত্যুঞ্জয় দ্বারে আঘাত করিয়া ডাকিতে লাগিল—ওগো সন্ন্যাসী ঠাকুর, আছ কি ?

দ্বার খুলিয়া গেল। সন্ন্যাসী কহিলেন—কি চাও ?

মৃত্যুঞ্জয় কহিল—আমি বাহিরে যাইতেই চাই—কিন্তু সঙ্গে এই সোনার দুটো একটা পাতও কি লইয়া যাইতে পারিব না ?

সন্ন্যাসী তাহার কোনও উত্তর না দিয়া নূতন মশাল জ্বালাইলেন—পূর্ণ কমণ্ডলু একটি রাখিলেন আর উত্তরীয় হইতে কয়েক মুষ্টি চিঁড়া মেজের উপর রাখিয়া বাহির হইয়া গেলেন। দ্বার বন্ধ হইয়া গেল।

মৃত্যুঞ্জয় পাতলা একটা সোনার পাত লইয়া তাহা দোমড়াইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙিয়া ফেলিল। সেই খণ্ড সোনাগুলাকে লইয়া ঘরের চারিদিকে লোষ্ট্রখণ্ডের মত ছড়াইতে লাগিল।

কখনওবা দাঁত দিয়া দংশন করিয়া সোনার পাতের উপর দাগ করিয়া দিল। কখনও বা একটা সোনার পাত মাটিতে ফেলিয়া তাহার উপরে বারম্বার পদাঘাত করিতে লাগিল। মনে মনে বলিতে লাগিল, পৃথিবীতে এমন সম্রাট কয়জন আছে যাহারা সোনা লইয়া এমন করিয়া ফেলাছড়া করিতে পারে! মৃত্যুঞ্জয়ের যেন একটা প্রলয়ের রোখ চাপিয়া গেল। তাহার ইচ্ছা করিতে লাগিল, এই রাশীকৃত সোনাকে চূর্ণ করিয়া ধূলির মত সে ঝাঁটা দিয়া উড়াইয়া ফেলে—আর এইরূপে পৃথিবীর সমস্ত স্বর্ণলুব্ধ রাজা মহারাজকে সে অবজ্ঞা করিতে পারে!

এমনি করিয়া যতক্ষণ পারিল মৃত্যুঞ্জয় সোনাগুলাকে লইয়া টানাটানি করিয়া শ্রান্তদেহে ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুম হইতে উঠিয়া সে আবার তাহার চারিদিকে সেই সোনার স্তূপ দেখিতে লাগিল। সে তখন দ্বারে আঘাত করিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—ওগো সন্ন্যাসী, আমি এ সোনা চাই না—সোনা চাই না!

কিন্তু দ্বার খুলিল না। ডাকিতে ডাকিতে মৃত্যুঞ্জয়ের গলা ভাঙিয়া গেল কিন্তু দ্বার খুলিল না—এক একটা সোনার পিণ্ড লইয়া দ্বারের উপর ছুঁড়িয়া মারিতে লাগিল, কোনও ফল হইল না। মৃত্যুঞ্জয়ের বুক দমিয়া গেল—তবে আর কি সন্ন্যাসী আসিবে না! এই স্বর্ণকারাগারের মধ্যে তিলে তিলে পলে পলে শুকাইয়া মরিতে হইবে।

তখন সোনাগুলাকে দেখিয়া তাহার আতঙ্ক হইতে লাগিল। বিভীষিকার নিঃশব্দ কঠিন হাস্যের মত ঐ সোনার স্তূপ

চারিদিকে স্থির হইয়া রহিয়াছে—তাহার মধ্যে স্পন্দন নাই, পরিবর্ত্তন নাই—মৃত্যুঞ্জয়ের যে হৃদয় এখন কাঁপিতেছে, ব্যাকুল হইতেছে, তাহার সঙ্গে উহাদের কোন সম্পর্ক নাই, বেদনার কোন সম্বন্ধ নাই। এই সোনার পিণ্ডগুলা আলোক চায় না, আকাশ চায় না, বাতাস চায় না, প্রাণ চায় না, মুক্তি চায় না। ইহারা এই চির অন্ধকারের মধ্যে চিরদিন উজ্জ্বল হইয়া কঠিন হইয়া রহিয়াছে!

পৃথিবীতে এখন কি গোধূলি আসিয়াছে? আহা, সেই গোধূলির স্বর্ণ! যে স্বর্ণ কেবল ক্ষণকালের জন্য চোখ জুড়াইয়া অন্ধকারের প্রান্তে কাঁদিয়া বিদায় লইয়া যায়! তাহার পরে কুটীরের প্রাঙ্গণতলে সন্ধ্যাতারা একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে। গোষ্ঠে প্রদীপ জ্বালাইয়া বধূ ঘরের কোণে সন্ধ্যাদীপ স্থাপন করে। মন্দিরে আরতির ঘণ্টা বাজিয়া উঠে।

গ্রামের, ঘরের অতি ক্ষুদ্রতম, তুচ্ছতম ব্যাপার আজ মৃত্যুঞ্জয়ের কল্পনাদৃষ্টির কাছে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাহাদের সেই যে ভোলা কুকুরটা ল্যাজে মাথায় এক হইয়া উঠানের প্রান্তে সন্ধ্যার পর ঘুমাইতে থাকিত সে কল্পনাও তাহাকে যেন ব্যথিত করিতে লাগিল। ধারাগোল গ্রামে কয়দিন সে যে মুদির দোকানে আশ্রয় লইয়াছিল, সেই মুদি এতক্ষণ রাত্রে প্রদীপ নিবাইয়া দোকানে ঝাঁপ বন্ধ করিয়া ধীরে ধীরে গ্রামে বাড়িমুখে আহার করিতে চলিয়াছে, এই কথা স্মরণ করিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল মুদি কি সুখেই আছে! আজ কি বার কে জানে! যদি রবিবার হয় তবে এতক্ষণে হাটের লোক যে যার আপন আপন

বাড়ি ফিরিতেছে, সঙ্গচ্যুত সাথীকে উর্দ্ধস্বরে ডাক পাড়িতেছে, দল বাঁধিয়া খেয়া নৌকায় পার হইতেছে; মেঠো রাস্তা ধরিয়া, শস্যক্ষেত্রের আল বাহিয়া, পল্লীর শুষ্ক বংশপত্রখচিত অঙ্গণ পার্শ্ব দিয়া চাষীলোক হাতে দুটো একটা মাছ ঝুলাইয়া মাথায় একটা চুপ্ড়ি লইয়া অন্ধকারে আকাশভরা তারার ক্ষীণালোকে গ্রামে গ্রামান্তরে চলিয়াছে।

ধরণীর উপরিতলে এই বিচিত্র বৃহৎ চিরচঞ্চল জীবনযাত্রার মধ্যে তুচ্ছতম দীনতম হইয়া নিজের জীবন মিশাইবার জন্য শত স্তর মৃত্তিকা ভেদ করিয়া তাহার কাছে লোকালয়ের আহ্বান আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল। সেই জীবন, সেই আকাশ, সেই আলোক, পৃথিবীর সমস্ত মণিমাণিক্যের চেয়ে তাহার কাছে দুর্ম্মূল্য বোধ হইতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল কেবল ক্ষণকালের জন্য একবার যদি আমার সেই শ্যামা জননী ধরিত্রীর ধূলিক্রোড়ে, সেই উন্মুক্ত আলোকিত নীলাম্বরের তলে, সেই তৃণপত্রের গন্ধ-বাসিত বাতাস বুক ভরিয়া একটি মাত্র শেষ নিশ্বাসে গ্রহণ করিয়া মরিতে পারি তাহা হইলেও জীবন সার্থক হয়।

এমন সময় দ্বার খুলিয়া গেল: সন্ন্যাসী ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, মৃত্যুঞ্জয়, কি চাও!

সে বলিয়া উঠিল আমি আর কিছুই চাই না—আমি এই সুড়ঙ্গ হইতে, অন্ধকার হইতে, গোলকধাঁদা হইতে, এই সোনার গারদ হইতে বাহির হইতে চাই! আমি আলোক চাই, আকাশ চাই, মুক্তি চাই!

সন্ন্যাসী কহিলেন—এই সোনার ভাণ্ডারের চেয়ে মূল্যবান রত্নভাণ্ডার এখানে আছে। একবার যাইবে না?

মৃত্যুঞ্জয় কহিল—না, যাইব না।

সন্ন্যাসী কহিলেন—একবার দেখিয়া আসিবার কৌতূহলও নাই?

মৃত্যুঞ্জয় কহিল—না, আমি দেখিতেও চাই না। আমাকে যদি কৌপীন পরিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে হয় তবু আমি এখানে এক মুহূর্ত্তও কাটাইতে ইচ্ছা করি না।

সন্ন্যাসী কহিলেন—আচ্ছা তবে এস।

মৃত্যুঞ্জয়ের হাত ধরিয়া সন্ন্যাসী তাহাকে সেই গভীর কূপের সম্মুখে লইয়া গেলেন। তাহার হাতে সেই লিখনপত্র দিয়া কহিলেন—এখানি লইয়া তুমি কি করিবে?

মৃত্যুঞ্জয় সে পত্রখানি টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিল।

মাষ্টার মশায়।

ভূমিকা।

রাত্রি তখন প্রায় দুইটা। কলিকাতার নিস্তব্ধ শব্দ-সমুদ্রে একটু খানি ঢেউ তুলিয়া একটা বড় জুড়িগাড়ি ভবানীপুরের দিক হইতে আসিয়া বির্জ্জিতলাওয়ের মোড়ের কাছে থামিল। সেখানে একটা ঠিকা গাড়ি দেখিয়া, আরোহী বাবু তাহাকে ডাকিয়া আনাইলেন। তাঁহার পাশে একটি কোট হ্যাট্ পরা বাঙ্গালি বিলাতফের্ত্তা যুবা সম্মুখের আসনে দুই পা তুলিয়া দিয়া একটু মদমত্ত অবস্থায় ঘাড় নামাইয়া ঘুমাইতেছিল। এই যুবকটি নূতন বিলাত হইতে আসিয়াছে। ইহার অভ্যর্থনা উপলক্ষে বন্ধু মহলে একটা খানা হইয়া গেছে। সেই খানা হইতে ফিরিবার পথে একজন বন্ধু তাহাকে কিছুদুর অগ্রসর করিবার জন্য নিজের গাড়িতে তুলিয়া লইয়াছেন। তিনি ইহাকে দুতিনবার ঠেলা দিয়া জাগাইয়া কহিলেন—মজুমদার, গাড়ি পাওয়া গেছে, বাড়ি যাও।

মজুমদার সচকিত হইয়া একটা বিলাতী দিব্য গালিয়া ভাড়াটে গাড়িতে উঠিয়া পড়িল। তাহার গাড়োয়ানকে ভাল করিয়া ঠিকানা বাৎলাইয়া দিয়া ব্রুহাম গাড়ির আরোহী নিজের গম্যপথে চলিয়া গেলেন।

ঠিকা গাড়ি কিছুদুর সিধা গিয়া পার্কষ্ট্রীটের সম্মুখে ময়দানের রাস্তায় মোড় লইল। মজুমদার আর একবার ইংরাজি শপথ উচ্চারণ করিয়া আপন মনে কহিল—একি! এত আমার পথ নয়।—তার পরে নিদ্রাজড় অবস্থায় ভাবিল, হবেও বা, এইটিই হয় ত সোজা রাস্তা।

ময়দানে প্রবেশ করিতেই মজুমদারের গা কেমন করিয়া উঠিল। হঠাৎ তাহার মনে হইল—কোন লোক নাই তবু তাহার পাশের জায়গাটা যেন ভর্ত্তি হইয়া উঠিয়াছে; যেন তাহার আসনের শূন্য অংশের আকাশটা নিরেট হইয়া তাহাকে ঠেসিয়া ধরিতেছে। মজুমদার ভাবিল—একি ব্যাপার! গাড়িটা আমার সঙ্গে একি রকম ব্যবহার সুরু করিল! এই, গাড়োয়ান্, গাড়োয়াঁন্!—গাড়োয়ান কোনো জবাব দিল না। পিছনের খড়খড়ি খুলিয়া ফেলিয়া সহিসটার হাত চাপিয়া ধরিল—কহিল, তুম্ ভিতর আকে বৈঠো! সহিস্ ভীতকণ্ঠে কহিল, নেহি সা'ব ভিতর নেহি জায়েগা!—শুনিয়া মজুমদারের গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল—সে জোর করিয়া সহিসের হাত চাপিয়া কহিল, জল্‌দি ভিতর আও!

সহিস সবলে হাত ছিনাইয়া লইয়া নামিয়া দৌড় দিল। তখন মজুমদার পাশের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাইয়া দেখিতে লাগিল—কিছুই দেখিতে পাইল না.তবু মনে হইল পাশে একটা অটল পদার্থ একেবারে চাপিয়া বসিয়া আছে। কোনো মতে গলায় আওয়াজ আনিয়া মজুমদার কহিল, গাড়োয়ান, গাড়ী রাখো।—বোধ হইল, গাড়োয়ান যেন দাঁড়াইয়া উঠিয়া দুই হাতে

রাশ টানিয়া ঘোড়া থামাইতে চেষ্টা করিল—ঘোড়া কোনো মতেই থামিল না। না থামিয়া ঘোড়া ছুটা রেড রোডের রাস্তা ধরিয়া পুনর্ব্বার দক্ষিণের দিকে মোড় লইল। মজুমদার ব্যস্ত হইয়া কহিল, আরে কাঁহা যাতা!—কোন উত্তর পাইল না। পাশের শূন্যতার দিকে রহিয়া রহিয়া কটাক্ষ করিতে করিতে মজুমদারের সর্ব্বাঙ্গ দিয়া ঘাম ছুটিতে লাগিল। কোনো মতে আড়ষ্ট হইয়া নিজের শরীরটাকে যতদূর সঙ্কীর্ণ করিতে হয়, তাহা সে করিল—কিন্তু সে যতটুকু জায়গা ছাড়িয়া দিল• ততটুকু জায়গা ভরিয়া উঠিল। মজুমদার মনে মনে তর্ক করিতে লাগিল—যে, কোন্ প্রাচীন য়ুরোপীয় জ্ঞানী বলিয়াছেন, Nature abhors vacuum—তাই ত দেখছি! কিন্তু এটা কিরে! এটা কি Nature? যদি আমাকে কিছু না বলে তবে আমি এখনি ইহাকে সমস্ত জায়গাটা ছাড়িয়া দিয়া লাফাইয়া পড়ি। লাফ দিতে সাহস হইল না—পাছে পিছনের দিক হইতে অভাবিতপূর্ব্ব একটা কিছু ঘটে।—"পাহারাওলা" বলিয়া ডাক দিবার চেষ্টা করিল—কিন্তু বহুকষ্টে এমনি একটুখানি অদ্ভুত ক্ষীণ আওয়াজ বাহির হইল যে অত্যন্ত ভয়ের মধ্যেও তাহার হাসি পাইল। অন্ধকারে ময়দানের গাছগুলো ভুতের নিস্তব্ধ পার্লামেণ্টের মত পরস্পর মুখামুখি করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল—এবং গ্যাসের খুঁটিগুলো, সমস্তই যেন জানে অথচ কিছুই যেন বলিবে না এম্নি ভাবে, খাড়া হইয়া মিট্‌মিটে আলোকশিখায় চোখ টিপিতে লাগিল। মজুমদার মনে করিল চট্ করিয়া এক লম্ফে সামনের আসনে

গিয়া বসিবে। যেম্‌নি মনে করা অমনি অনুভব করিল সাম্‌-নের আসন হইতে কেবলমাত্র একটা চাহনি তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া আছে। চক্ষু নাই, কিছুই নাই, অথচ একটা চাহনি। সে চাহনি যে কাহার তাহা যেন মনে পড়িতেছে অথচ কোনো মতেই যেন মনে আনিতে পারিতেছে না। মজুম-দার দুই চক্ষু জোর করিয়া বুজিবার চেষ্টা করিল—কিন্তু ভয়ে বুজিতে পারিল না—সেই অনির্দ্দেশ্য চাহনির দিকে দুই চোখ এমন শক্ত করিয়া মেলিয়া রহিল যে নিমেষ ফেলিতে সময় পাইল না।

এদিকে গাড়িটা কেবলি ময়দানের রাস্তায় উত্তর হইতে দক্ষিণে ও দক্ষিণ হইতে উত্তরে চক্রপথে ঘুরিতে লাগিল। ঘোড়া দুটো ক্রমেই যেন উন্মত্ত হইয়া উঠিল—তাহাদের বেগ কেবলি বাড়িয়া চলিল—গাড়ির খড়খড়েগুলো থর্‌থর্‌ করিয়া কাঁপিয়া ঝর্‌ঝর্‌ শব্দ করিতে লাগিল।

এমন সময় গাড়িটা যেন কিসের উপর খুব একটা ধাক্কা খাইয়া হটাৎ থামিয়া গেল। মজুমদার চকিত হইয়া দেখিল তাহাদেরই রাস্তায় গাড়ি দাঁড়াইয়াছে ও গাড়োয়ান তাহাকে নাড়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে—সাহেব, কোথায় যাইতে হইবে বল!

মজুমদার রাগিয়া জিজ্ঞাসা করিল—এতক্ষণ ধরিয়া আমাকে ময়দানের মধ্যে ঘোরাইলি কেন?

গাড়োয়ান আশ্চর্য্য হইয়া কহিল—কই, ময়দানের মধ্যে ত ঘুরাই নাই!

মজুমদার বিশ্বাস না করিয়া কহিল—তবে একি শুধু স্বপ্ন ?

গাড়োয়ান একটু ভাবিয়া ভীত হইয়া কহিল—বাবু সাহেব, বুঝি শুধু স্বপ্ন নহে। আমার এই গাড়িতেই আজ তিন বছর হইল একটা ঘটনা ঘটিয়াছিল।

মজুমদারের তখন নেশা ও ঘুমের ঘোর সম্পূর্ণ ছাড়িয়া যাওয়াতে গাড়োয়ানের গল্পে কর্ণপাত না করিয়া ভাড়া চুকাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

কিন্তু রাত্রে তাহার ভাল করিয়া ঘুম হইল না—কেবলি ভাবিতে লাগিল, সেই চাহনিটা কার!

১

অধর মজুমদারের বাপ সামান্য শিপ সরকারী হইতে আরম্ভ করিয়া একটা বড় হৌসের মুচ্ছুদ্দিগিরি পর্য্যন্ত উঠিয়াছিলেন। অধর বাবু বাপের উপার্জ্জিত নগদ টাকা সুদে খাটাইতেছেন, তাঁহাকে আর নিজে খাটিতে হয় না। বাপ মাথায় সাদা ফেটা বাঁধিয়া পাল্কীতে করিয়া আপিসে যাইতেন, এদিকে তাঁহার ক্রিয়া-কর্ম্ম দান ধ্যান যথেষ্ট ছিল। বিপদে আপদে অভাবে অনটনে সকল শ্রেণীর লোকেই যে তাঁহাকে আসিয়া ধরিয়া পড়িত ইহাই তিনি গর্ব্বের বিষয় মনে করিতেন।

অধর বাবু বড় বাড়ি ও গাড়ি জুড়ি করিয়াছেন, কিন্তু লোকের সঙ্গে আর তাঁহার সম্পর্ক নাই; কেবল টাকা ধারের দালাল আসিয়া তাঁহার বাঁধানো হুঁকায় তামাক টানিয়া যায় এবং অ্যাটর্নি আপিসের বাবুদের সঙ্গে ষ্ট্যাম্প দেওয়া দলিলের সর্ত্ত

সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া থাকে। তাঁহার সংসারে খরচপত্র সম্বন্ধে হিসাবের এমনি কষাকষি যে পাড়ার ফুট্‌বল্ ক্লাবের না-ছোড়-বান্দা ছেলেরাও বহু চেষ্টায় তাঁহার তহবিলে দন্তস্ফুট করিতে পারে নাই।

এমন সময় তাঁহার ঘরকন্নার মধ্যে একটি অতিথির আগমন হইল। ছেলে হ'ল না ছেলে হ'ল না করিতে করিতে অনেকদিন পরে তাঁহার একটি ছেলে জন্মিল। ছেলেটির চেহারা তাহার মা'র ধরণের। বড় বড় চোখ, টিকলো নাক, রং রজনীগন্ধার পাপ্‌ড়ির মত,—যে দেখিল সেই বলিল আহা ছেলে ত নয় যেন কার্ত্তিক। অধর বাবুর অনুগত অনুচর রতিকান্ত বলিল, বড় ঘরের ছেলের যেমনটি হওয়া উচিত তেমনিই হইয়াছে।

ছেলেটির নাম হইল বেণুগোপাল। ইতিপূর্ব্বে অধর বাবুর স্ত্রী ননীবালা সংসার খরচ লইয়া স্বামীর বিরুদ্ধে নিজের মত তেমন জোর করিয়া কোনো দিন খাটান নাই। দুটো একটা সখের ব্যাপার অথবা লৌকিকতার অত্যাবশ্যক আয়োজন লইয়া মাঝে মাঝে বচসা হইয়াছে বটে কিন্তু শেষকালে স্বামীর কৃপণতার প্রতি অবজ্ঞা করিয়া নিঃশব্দে হার মানিয়াছেন।

এবারে ননীবালাকে অধরলাল আঁটিয়া উঠিতে পাড়িলেন না; —বেণুগোপাল সম্বন্ধে তাঁহার হিসাব এক এক পা করিয়া হঠিতে লাগিল। তাহার পায়ের মল, হাতের বালা, গলার হার, মাথার টুপি, তাহার দিশি বিলাতি নানা রকমের নানা রঙের সাজ সজ্জা সম্বন্ধে ননীবালা যাহা কিছু দাবী উত্থাপিত করিলেন সব ক'টাই

তিনি কখনো নীরব অশ্রুপাতে কখনো সরব বাক্যবর্ষণে জিতিয়া লইলেন। বেণুগোপালের জন্য যাহা দরকার এবং যাহা দরকার নয় তাহা চাইই চাই—সেখানে শূন্য তহবিলের ওজর বা ভবিষ্যতের ফাঁকা আশ্বাস একদিনও খাটিল না।

২

বেণুগোপাল বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। বেণুর জন্য খরচ করাটা অধরলালের অভ্যাস হইয়া আসিল। তাহার জন্য বেশি মাহিনা দিয়া অনেক পাস করা এক বুড়ো মাষ্টার রাখিলেন। এই মাষ্টার বেণুকে মিষ্টভাষায় ও শিষ্টাচারে বশ করিবার অনেক চেষ্টা করিলেন—কিন্তু তিনি নাকি বরাবর ছাত্রদিগকে কড়া শাসনে চালাইয়া আজ পর্য্যন্ত মাষ্টারি মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আসিয়াছেন সেই জন্য তাঁহার ভাষার মিষ্টতা ও আচারের শিষ্টতায় কেবলি বেসুর লাগিল—সেই শুষ্ক সাধনায় ছেলে ভুলিল না। ননীবালা অধরলালকে কহিলেন—ও তোমার কেমন মাষ্টার! ওকে দেখিলেই যে ছেলে অস্থির হইয়া উঠে। ওকে ছাড়াইয়া দাও!

বুড়া মাষ্টার বিদায় হইল। সেকালে মেয়ে যেমন স্বয়ম্বরা হইত তেমনি ননীবালার ছেলে স্বয়ম্মাষ্টার হইতে বসিল—সে যাহাকে না বরিয়া লইবে তাহার সকল পাস ও সকল সার্টিফিকেট বৃথা।

এমনি সময়টিতে গায়ে একখানি ময়লা চাদর ও পায়ে ছেঁড়া ক্যাম্বিসের জুতা পরিয়া মাষ্টারির উমেদারিতে হরলাল আসিয়া

জুটিল। তাহার বিধবা মা পরের বাড়িতে রাঁধিয়া ও ধান ভানিয়া তাহাকে মফস্বলের এণ্ট্রেন্সস্কুলে কোনো মতে এণ্ট্রেন্স পাশ করাইয়াছে। এখন হরলাল কলিকাতায় কলেজে পড়িবে বলিয়া প্রাণপণ প্রতিজ্ঞা করিয়া বাহির হইয়াছে। অনাহারে তাহার মুখের নিম্নঅংশ শুকাইয়া ভারতবর্ষের কন্যাকুমারীর মত সরু হইয়া আসিয়াছে, কেবল মস্ত কপালটা হিমালয়ের মত প্রশস্ত হইয়া অত্যন্ত চোখে পড়িতেছে। মরুভূমির বালু হইতে সূর্য্যের আলো যেমন ঠিকরিয়া পড়ে তেমনি তাহার দুই চক্ষু হইতে দৈন্যের একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি বাহির হইতেছে।

দরোয়ান জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি চাও? কাহাকে চাও? —হরলাল ভয়ে ভয়ে বলিল—বাড়ির বাবুর সঙ্গে দেখা করিতে চাই।—দরোয়ান কহিল—দেখা হইবে না। তাহার উত্তরে হরলাল কি বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া ইতস্তত করিতেছিল এমন সময় সাত বছরের ছেলে বেণুগোপাল বাগানে খেলা সারিয়া দেউড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল। দরোয়ান হরলালকে দ্বিধা করিতে দেখিয়া আবার কহিল—বাবু চলা যাও।

বেণুর হঠাৎ জিদ্ চড়িল—সে কহিল, নেহি জায়গা! বলিয়া সে হরলালের হাত ধরিয়া তাহাকে দোতলার বারান্দায় তাহার বাপের কাছে লইয়া হাজির করিল।

বাবু তখন দিবানিদ্রা সারিয়া জড়ালস ভাবে বারান্দায় বেতের কেদারায় চুপ চাপ বসিয়া পা দোলাইতেছিলেন ও বৃদ্ধ রতিকান্ত একটা কাঠের চৌকিতে আসন হইয়া বসিয়া

ধীরে ধীরে তামাক টানিতেছিল। সে দিন এই সময়ে এই অবস্থায় দৈবক্রমে হরলালের মাষ্টারি বাহাল হইয়া গেল।

রতিকান্ত জিজ্ঞাসা করিল—আপনার পড়া কি পর্য্যন্ত?

হরলাল একটুখানি মুখ নীচু করিয়া কহিল—এণ্ট্রেন্স পাস করিয়াছি।

রতিকান্ত ভ্রূ তুলিয়া কহিল—শুধু এণ্ট্রেন্স্ পাস? আমি বলি কলেজে পড়িয়াছেন। আপনার বয়সও ত নেহাৎ কম দেখি না।

হরলাল চুপ করিয়া রহিল। আশ্রিত ও আশ্রয়প্রত্যাশী-দিগকে সকল রকমে পীড়ন করাই রতিকান্তের প্রধান অনন্দ ছিল।

রতিকান্ত আদর করিয়া বেণুকে কোলের কাছে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিয়া কহিল—কত এম-এ বি-এ আসিল ও গেল—কাহাকেও পছন্দ হইল না—আর শেষকালে কি সোনা বাবু এণ্ট্রেন্স্ পাস করা মাষ্টারের কাছে পড়িবেন?

বেণু রতিকান্তের আদরের আকর্ষণ জোর করিয়া ছাড়াইয়া লইয়া কহিল—যাও! রতিকান্তকে বেণু কোনোমতেই সহ্য করিতে পারিত না, কিন্তু রতিও বেণুর এই অসহিষ্ণুতাকে তাহার বাল্যমাধুর্য্যের একটা লক্ষণ বলিয়া ইহাতে খুব আমোদ পাইবার চেষ্টা করিত, এবং তাহাকে সোনাবাবু চাঁদবাবু বলিয়া ক্ষ্যাপাইয়া আগুন করিয়া তুলিত।

হরলালের উমেদারী সফল হওয়া শক্ত হইয়া উঠিয়াছিল;—সে

মনে মনে ভাবিতেছিল এইবার কোনো সুযোগে চৌকি হইতে উঠিয়া বাহির হইতে পারিলে বাঁচা যায়। এমন সময়ে অধরলালের সহসা মনে হইল, এই ছোকরাটিকে নিতান্ত সামান্য মাহিনা দিলেও পাওয়া যাইবে। শেষকালে স্থির হইল হরলাল বাড়িতে থাকিবে, খাইবে ও পাঁচ টাকা করিয়া বেতন পাইবে। বাড়িতে রাখিয়া যে টুকু অতিরিক্ত দাক্ষিণ্য প্রকাশ করা হইবে তাহার বদলে অতিরিক্ত কাজ আদায় করিয়া লইলেই এটুকু সার্থক হইতে পারিবে।

৩

এবারে মাষ্টার টিঁকিয়া গেল। প্রথম হইতেই হরলালের সঙ্গে বেণুর এমনি জমিয়া গেল যেন তাহারা দুই ভাই। কলিকাতায় হরলালের আত্মীয় বন্ধু কেহই ছিল না—এই সুন্দর ছোট ছেলেটি তাহার সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া বসিল। অভাগা হরলালের এমন করিয়া কোন মানুষকে ভালবাসিবার সুযোগ ইতিপূর্ব্বে কখনো ঘটে নাই। কি করিলে তাহার অবস্থা ভাল হইবে এই আশায় সে বহুকষ্টে বই জোগাড় করিয়া কেবলমাত্র নিজের চেষ্টায় দিনরাত শুধু পড়া করিয়াছে। মাকে পরাধীন থাকিতে হইয়াছিল বলিয়া ছেলের শিশু বয়স কেবল সঙ্কোচেই কাটিয়াছে—নিষেধের গণ্ডী পার হইয়া দুষ্টামির দ্বারা নিজের বাল্য প্রতাপকে জয়শালী করিবার সুখ সে কোনো দিন পায় নাই। সে কাহারো দলে ছিল না, সে আপনার ছেঁড়া বই ও ভাঙ্গা স্লেটের মাঝখানে একলাই ছিল। জগতে জন্মিয়া যে ছেলেকে শিশুকালেই

নিস্তব্ধ ভালমানুষ হইতে হয়, তখন হইতেই মাতার দুঃখ ও নিজের অবস্থা যাহাকে সাবধানে বুঝিয়া চলিতে হয়, সম্পূর্ণ অবিবেচক হইবার স্বাধীনতা যাহার ভাগ্যে কোনদিন জোটে না, আমোদ করিয়া চঞ্চলতা করা বা দুঃখ পাইয়া কাঁদা, এদুটোই যাহাকে অন্য লোকের অসুবিধা ও বিরক্তির ভয়ে সমস্ত শিশুশক্তি প্রয়োগ করিয়া চাপিয়া যাইতে হয় তাহার মত করুণার পাত্র অথচ করুণা হইতে বঞ্চিত জগতে কে আছে!

সেই পৃথিবীর সকল মানুষের নীচে চাপাপড়া হরলাল নিজেও জানিত না তাহার মনের মধ্যে এত স্নেহের রস অবসরের অপেক্ষায় এমন করিয়া জমা হইয়াছিল। বেণুর সঙ্গে খেলা কয়িয়া, তাহাকে পড়াইয়া, অসুখের সময় তাহার সেবা করিয়া হরলাল স্পষ্ট বুঝিতে পারিল নিজের অবস্থার উন্নতি করার চেয়েও মানুষের আর একটা জিনিষ আছে—সে যখন পাইয়া বসে তখন তাহার কাছে আর কিছুই লাগে না।

বেণুও হরলালকে পাইয়া বাঁচিল। কারণ, ঘরে সে একটি ছেলে;—একটি অতি ছোট ও আর একটি তিন বছরের বোন আছে—বেণু তাহাদিগকে সঙ্গদানের যোগ্যই মনে করে না। পাড়ার সমবয়সী ছেলের অভাব নাই—কিন্তু অধরলাল নিজের ঘরকে অত্যন্ত বড় ঘর বলিয়া নিজের মনে নিশ্চয় স্থির করিয়া রাখাতে মেলামেশা করিবার উপযুক্ত ছেলে বেণুর ভাগ্যে জুটিল না। কাজেই হরলাল তাহার একমাত্র সঙ্গী হইয়া উঠিল। অনুকূল অবস্থায় বেণুর যে সকল দৌরাত্ম্য দশজনের মধ্যে ভাগ

হইয়া একরকম সহনযোগ্য হইতে পারিত তাহা সমস্তই একা হরলালকে বহিতে হইত। এই সমস্ত উপদ্রব প্রতিদিন সহ্য করিতে করিতে হরলালের স্নেহ আরো দৃঢ় হইয়া উঠিতে লাগিল। রতিকান্ত বলিতে লাগিল—আমাদের সোনাবাবুকে মাষ্টার মশায় মাটি করিতে বসিয়াছেন। অধরলালেরও মাঝে মাঝে মনে হইতে লাগিল মাষ্টারের সঙ্গে ছাত্রের সম্বন্ধটি ঠিক যেন যথোচিত হইতেছে না। কিন্তু হরলালকে বেণুর কাছ হইতে তফাৎ করে এমন সাধ্য এখন কাহার আছে!

৪

বেণুর বয়স এখন এগার! হরলাল এফ্‌ এ পাস করিয়া জলপানি পাইয়া তৃতীয় বার্ষিকে পড়িতেছে। ইতিমধ্যে কলেজে তাহার দুটি একটি বন্ধু যে জোটে নাই তাহা নহে কিন্তু ঐ এগারো বছরের ছেলেটাই তাহার সকল বন্ধুর সেরা। কলেজ হইতে ফিরিয়া বেণুকে লইয়া সে গোলদিঘি এবং কোনো দিন ইডেন গার্ডেনে বেড়াইতে যাইত। তাহাকে গ্রীক ইতিহাসের বীরপুরুষদের কাহিনী বলিত, তাহাকে স্কট্ ও ভিক্টর হ্যুগোর গল্প একটু একটু করিয়া বাংলায় শুনাইত—উচ্চৈঃস্বরে তাহার কাছে ইংরেজি কবিতা আবৃত্তি করিয়া তাহা তর্জ্জমা করিয়া ব্যাখ্যা করিত, তাহার কাছে শেক্‌স্‌পীয়ারের জুলিয়স্‌ সীজার মানে করিয়া পড়িয়া তাহা হইতে অ্যান্টনির বক্তৃতা মুখস্থ করাইবার চেষ্টা করিত। ঐ একটুখানি বালক হরলালের হৃদয়-উদ্বোধনের পক্ষে যেন সোনার কাঠির মত হইয়া উঠিল। একলা বসিয়া যখন পড়া মুখস্থ করিত,

তখন ইংরেজি সাহিত্য সে এমন করিয়া মনের মধ্যে গ্রহণ করে নাই, এখন সে ইতিহাস বিজ্ঞান সাহিত্য যাহা কিছু পড়ে তাহার মধ্যে কিছু রস পাইলেই সেটা আগে বেণুকে দিবার জন্য আগ্রহ বোধ করে এবং বেণুর মনে সেই আনন্দ সঞ্চার করিবার চেষ্টাতেই তাহার নিজের বুঝিবার শক্তি ও আনন্দের অধিকার যেন দুইগুণ বাড়িয়া যায়।

বেণু স্কুল হইতে আসিয়াই কোন মতে তাড়াতাড়ি জলপান সারিয়াই হরলালের কাছে যাইবার জন্য একেবারে ব্যস্ত হইয়া উঠিত, তাহার মা তাহাকে কোন ছুতায় কোন প্রলোভনে অন্তঃপুরে ধরিয়া রাখিতে পারিত না। ননীবালার ইহা ভাল লাগে নাই। তাহার মনে হইত, হরলাল নিজের চাকরি বজায় রাখিবার জন্যই ছেলেকে এত করিয়া বশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। সে একদিন হরলালকে ডাকিয়া পর্দ্দার আড়াল হইতে বলিল—তুমি মাষ্টার, ছেলেকে কেবল সকালে একঘণ্টা বিকালে একঘণ্টা পড়াইবে—দিনরাত্রি উহার সঙ্গে লাগিয়া থাক কেন? আজকাল ও যে মা বাপ কাহাকেও মানে না। ও কেমন শিক্ষা পাইতেছে! আগে যে ছেলে মা বলিতে একেবারে নাচিয়া উঠিত আজ যে তাহাকে ডাকিয়া পাওয়া যায় না! বেণু আমার বড় ঘরের ছেলে, উহার সঙ্গে তোমার অত মাখামাখি কিসের জন্য!

সেদিন রতিকান্ত অধরবাবুর কাছে গল্প করিতেছিল, যে, তাহার জানা তিন চার জন লোক, বড়মানুষের ছেলের মাষ্টারি করিতে আসিয়া ছেলের মন এমন করিয়া বশ করিয়া লইয়াছে যে,

ছেলে বিষয়ের অধিকারী হইলে তাহারাই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া ছেলেকে স্বেচ্ছামত চালাইয়াছে। হরলালের প্রতিই ইসারা করিয়া যে এ সকল কথা বলা হইতেছিল তাহা হরলালের বুঝিতে বাকি ছিল না। তবু সে চুপ করিয়া সমস্ত সহ্য করিয়া গিয়াছিল। কিন্তু আজ বেণুর মার কথা শুনিয়া তাহার বুক ভাঙ্গিয়া গেল। সে বুঝিতে পারিল বড় মানুষের ঘরে মাষ্টারের পদবীটা কি। গোয়াল ঘরে ছেলেকে দুধ জোগাইবার যেমন গোরু আছে তেমনি তাহাকে বিদ্যা জোগাইবার একটা মাষ্টারও রাখা হইয়াছে—ছাত্রের সঙ্গে স্নেহপূর্ণ আত্মীয়তার সম্বন্ধ স্থাপন এত বড় একটা স্পর্দ্ধা যে, বাড়ির চাকর হইতে গৃহিণী পর্য্যন্ত কেহই তাহা সহ্য করিতে পারে না, এবং সকলেই সেটাকে স্বার্থ সাধনের একটা চাতুরী বলিয়াই জানে।

হরলাল কম্পিত কণ্ঠে বলিল, মা, বেণুকে আমি কেবল পড়াইব, তাহার সঙ্গে আমার আর কোনো সম্পর্ক থাকিবে না।

সে দিন বিকালে বেণুর সঙ্গে তাহার খেলিবার সময়ে হরলাল কলেজ হইতে ফিরিলই না। কেমন করিয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া সে সময় কাটাইল তাহা সেই জানে। সন্ধ্যা হইলে যখন সে পড়াইতে আসিল তখন বেণু মুখভার করিয়া রহিল। হরলাল তাহার অনুপস্থিতির কোনো জবাবদিহি না করিয়া পড়াইয়া গেল—সে দিন পড়া সুবিধামত হইলই না।

হরলাল প্রতিদিন রাত্রি থাকিতে উঠিয়া তাহার ঘরে বসিয়া পড়া করিত। বেণু সকালে উঠিয়াই মুখ ধুইয়া তাহার কাছে

ছুটিয়া যাইত। বাগানে বাঁধানো চৌবাচ্চায় মাছ ছিল তাহা-দিগকে মুড়ি খাওয়ানো ইহাদের এক কাজ ছিল। বাগানের এক কোণে কতকগুলা পাথর সাজাইয়া, ছোট ছোট রাস্তা ও ছোট গেট ও বেড়া তৈরি করিয়া বেণু বালখিল্য ঋষির আশ্রমের উপযুক্ত একটি অতি ছোট বাগান বসাইয়াছিল। সে বাগানে মালীর কোনো অধিকার ছিল না। সকালে এই বাগানের চর্চ্চা করা তাহাদের দ্বিতীয় কাজ। তাহার পরে রৌদ্র বেশি হইলে বাড়ি ফিরিয়া বেণু হরলালের কাছে পড়িতে বসিত। কাল সায়াহ্নে যে গল্পের অংশ শোনা হয় নাই সেইটে শুনিবার জন্য আজ বেণু যথাসাধ্য ভোরে উঠিয়া বাহিরে ছুটিয়া আসিয়াছিল। সে মনে করিয়াছিল সকালে ওঠায় সে আজ মাষ্টার মশায়কে বুঝি জিতি-য়াছে। ঘরে আসিয়া দেখিল মাষ্টার মশায় নাই। দরোয়ানকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল মাষ্টার মশায় বাহির হইয়া গিয়াছেন।

সেদিনও সকালে পড়ার সময় বেণু ক্ষুদ্র হৃদয়টুকুর বেদনা লইয়া মুখ গম্ভীর করিয়া রহিল। সকাল বেলায় হরলাল কেন যে বাহির হইয়া গিয়াছিল তাহা জিজ্ঞাসাও করিল না। হরলাল বেণুর মুখের দিকে না চাহিয়া বইয়ের পাতার উপর চোখ রাখিয়া পড়াইয়া গেল। বেণু বাড়ির ভিতরে তাহার মার কাছে যখন খাইতে বসিল, তখন তাহার মা জিজ্ঞাসা করিলেন—কাল বিকাল হইতে তোর কি হইয়াছে বল্ দেখি! মুখ হাঁড়ি করিয়া আছিস্ কেন—ভাল করিয়া খাইতেছিস্ না—ব্যাপার খানা কি!

বেণু কোনো উত্তর করিল না। আহারের পর মা তাহাকে

কাছে টানিয়া আনিয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া অনেক আদর করিয়া যখন তাহাকে বারবার প্রশ্ন করিতে লাগিলেন তখন সে আর থাকিতে পারিল না—ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। বলিল—মাষ্টার মশায়—

মা কহিলেন—মাষ্টার মশায় কি?

বেণু বলিতে পারিল না মাষ্টার মশায় কি করিয়াছেন। কি যে অভিযোগ তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা কঠিন।

ননীবালা কহিলেন—মাষ্টার মশায় বুঝি তোর মার নামে তোর কাছে লাগাইয়াছেন!

সে কথার কোনো অর্থ বুঝিতে না পারিয়া বেণু উত্তর না করিয়া চলিয়া গেল।

৫

ইতিমধ্যে বাড়িতে অধরবাবুর কতকগুলা কাপড় চোপড় চুরি হইয়া গেল। পুলিসকে খবর দেওয়া হইল। পুলিস খানাতল্লাসীতে হরলালেরও বাক্স সন্ধান করিতে ছাড়িল না। রতিকান্ত নিতান্তই নিরীহভাবে বলিল, যে লোক লইয়াছে সে কি আর মাল বাক্সর মধ্যে রাখিয়াছে?

মালের কোনো কিনারা হইল না। এরূপ লোকসান অধরলালের পক্ষে অসহ্য। তিনি পৃথিবীসুদ্ধ লোকের উপর চটিয়া উঠিলেন। রতিকান্ত কহিল, বাড়িতে অনেক লোক রহিয়াছে, কাহাকেই বা দোষ দিবেন, কাহাকেই বা সন্দেহ করিবেন? যাহার যখন খুসি আসিতেছে যাইতেছে।

অধরলাল মাষ্টারকে ডাকাইয়া বলিলেন, দেখ হরলাল, তোমাদের কাহাকেও বাড়িতে রাখা আমার পক্ষে সুবিধা হইবে না। এখন হইতে তুমি আলাদা বাসায় থাকিয়া বেণুকে ঠিক সময়মত পড়াইয়া যাইবে এই হইলেই ভাল হয়—না হয় আমি তোমার দুইটাকা মাইনে বৃদ্ধি করিয়া দিতে রাজি আছি।

রতিকান্ত তামাক টানিতে টানিতে বলিল—এ ত অতি ভাল কথা—উভয়পক্ষেই ভাল।

হরলাল মুখ নীচু করিয়া শুনিল। তখন কিছু বলিতে পারিল না। ঘরে আসিয়া অধরবাবুকে চিঠি লিখিয়া পাঠাইল, নানা কারণে বেণুকে পড়ানো তাহার পক্ষে সুবিধা হইবে না—অতএব আজই সে বিদায় গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে।

সে দিন বেণু ইস্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল মাষ্টার মশায়ের ঘর শূন্য। তাঁহার সেই ভগ্নপ্রায় টিনের প্যাট্‌রাটিও নাই। দড়ির উপর তাঁহার চাদর ও গামছা ঝুলিত সে দড়িটা আছে কিন্তু চাদর ও গামছা নাই। টেবিলের উপর খাতাপত্র ও বই এলোমেলো ছড়ানো থাকিত তাহার বদলে সেখানে একটা বড় বোতলের মধ্যে সোনালী মাছ ঝক্‌ঝক্ করিতে করিতে ওঠানামা করিতেছে। বোতলের গায়ের উপর মাষ্টার মশায়ের হস্তাক্ষরে বেণুর নামলেখা একটা কাগজ আঁটা। আর একটি নূতন ভাল বাঁধাই করা ইংরেজি ছবির বই তাহার ভিতরকার পাতায় এক প্রান্তে বেণুর নাম ও তাহার নীচে আজকের তারিখ মাস ও সন দেওয়া আছে।

বেণু ছুটিয়া তাহার বাপের কাছে গিয়া কহিল, বাবা, মাষ্টার মশায় কোথায় গেছেন? বাপ তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া কহিলেন, তিনি কাজ ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া গেছেন।

বেণু বাপের হাত ছাড়াইয়া লইয়া পাশের ঘরে বিছানার উপরে উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। অধর বাবু ব্যাকুল হইয়া কি করিবেন কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না।

পরদিন বেলা সাড়ে দশটার সময় হরলাল একটা মেসের ঘরে তক্তপোষের উপর উন্মনা হইয়া বসিয়া কলেজে যাইবে কিনা ভাবিতেছে এমন সময় হঠাৎ দেখিল প্রথমে অধরবাবুদের দরোয়ান ঘরে প্রবেশ করিল এবং তাহার পিছনে বেণু ঘরে ঢুকিয়াই হরলালের গলা জড়াইয়া ধরিল। হরলালের গলার স্বর আট্‌কাইয়া গেল;—কথা কহিতে গেলেই তাহার দুই চোখ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িবে এই ভয়ে সে কোনো কথাই কহিতে পারিল না। বেণু কহিল—মাষ্টার মশায়, আমাদের বাড়ি চল।

বেণু তাহাদের বৃদ্ধ দরোয়ান চন্দ্রভানকে ধরিয়া পড়িয়াছিল যেমন করিয়া হউক্ মাষ্টার মশায়ের বাড়িতে তাহাকে লইয়া যাইতে হইবে। পাড়ার যে মুটে হরলালের প্যাঁট্‌রা বহিয়া আনিয়াছিল তাহার কাছ হইতে সন্ধান লইয়া আজ ইস্কুলে যাইবার গাড়িতে চন্দ্রভান বেণুকে হরলালের মেসে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে।

কেন যে হরলালের পক্ষে বেণুদের বাড়ি যাওয়া একেবারেই অসম্ভব তাহা সে বলিতেও পারিল না অথচ তাহাদের বাড়িতেও

যাইতে পারিল না। বেণু যে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে বলিয়াছিল আমাদের বাড়ি চল—এই স্পর্শ ও এই কথাটার স্মৃতি কত দিনে কত রাত্রে তাহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিয়া যেন তাহার নিঃশ্বাস রোধ করিয়াছে—কিন্তু ক্রমে এমনও দিন আসিল যখন দুই পক্ষেই সমস্ত চুকিয়া গেল—বক্ষের শিরা আঁকড়াইয়া ধরিয়া বেদনা-নিশাচর বাদুড়ের মত আর ঝুলিয়া রহিল না।

৬

হরলাল অনেক চেষ্টা করিয়াও পড়াতে আর তেমন করিয়া মনোযোগ করিতে পারিল না। সে কোনমতেই স্থির হইয়া পড়িতে বসিতে পারিত না। সে খানিকটা পড়িবার চেষ্টা করিয়াই ধাঁ করিয়া বই বন্ধ করিয়া ফেলিত এবং অকারণে দ্রুতপদে রাস্তায় ঘুরিয়া আসিত। কলেজে লেকচারের নোটের মাঝে মাঝে খুব বড় বড় ফাঁক পড়িত এবং মাঝে মাঝে যে সমস্ত আঁকযোগ পড়িত তাহার সঙ্গে প্রাচীন ঈজিপ্টের চিত্রলিপি ছাড়া আর কোনো বর্ণমালার সাদৃশ্য ছিল না।

হরলাল বুঝিল এ সমস্ত ভাল লক্ষণ নয়। পরীক্ষায় সে যদি বা পাস হয় বৃত্তি পাইবার কোনো সম্ভাবনা নাই। বৃত্তি না পাইলে কলিকাতায় তাহার একদিনও চলিবে না। ওদিকে মাকেও দু'চার টাকা পাঠানো চাই। নানা চিন্তা করিয়া চাকরির চেষ্টায় বাহির হইল। চাকরি পাওয়া কঠিন, কিন্তু না পাওয়া তাহার পক্ষে আরও কঠিন; এই জন্য আশা ছাড়িয়াও আশা ছাড়িতে পারিল না।

হরলাল সৌভাগ্যক্রমে একটি বড় ইংরেজ সদাগরের আপিসে

উমেদারী করিতে গিয়া হঠাৎ সে বড় সাহেবের নজরে পড়িল। সাহেবের বিশ্বাস ছিল তিনি মুখ দেখিয়া লোক চিনিতে পারেন। হরলালকে ডাকিয়া তাহার সঙ্গে দু'চার কথা কহিয়াই তিনি মনে মনে বলিলেন,—"এ লোকটা চলিবে।" জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাজ জানা আছে?" হরলাল কহিল,—"না।" কোনো বড়লোকের কাছ হইতে সার্টিফিকেট আনিতে পার?" কোনো বড়লোককেই সে জানে না।

শুনিয়া সাহেব আরও খুসি হইয়া কহিলেন,—"আচ্ছা বেশ, পঁচিশ টাকা বেতনে কাজ আরম্ভ কর, কাজ শিখিলে উন্নতি হইবে।"—তার পরে সাহেব তাহার বেশভূষার প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন,—"পনেরো টাকা আগাম দিতেছি—আফিসের উপযুক্ত কাপড় তৈয়ারি করাইয়া লইবে।"

কাপড় তৈরি হইলে. হরলাল আফিসেও বাহির হইতে আরম্ভ করিল। বড় সাহেব তাহাকে ভূতের মত খাটাইতে লাগিলেন। অন্য কেরাণীরা বাড়ি গেলেও হরলালের ছুটি ছিল না। এক একদিন সাহেবের বাড়ি গিয়াও তাঁহাকে কাজ বুঝাইয়া দিয়া আসিতে হইত।

এমনি করিয়া কাজ শিখিয়া লইতে হরলালের বিলম্ব হইল না। তাহার সহযোগী কেরাণীরা তাহাকে ঠকাইবার অনেক চেষ্টা করিল, তাহার বিরুদ্ধে উপরওয়ালাদের কাছে লাগালাগিও করিল, কিন্তু এই নিঃশব্দ নিরীহ সামান্য হরলালের কোনো অপকার করিতে পারিল না।

যখন তাহার চল্লিশ টাকা মাহিনা হইল, তখন হরলাল দেশ হইতে মাকে আনিয়া একটি ছোটখাট গলির মধ্যে ছোটখাট বাড়িতে বাসা করিল। এতদিন পরে তাহার মার দুঃখ ঘুচিল। মা বলিলেন,—"বাবা, এইবার বউ ঘরে আনিব।" হরলাল মাতার পায়ের ধুলা লইয়া বলিল, "মা, ঐটে মাপ করিতে হইবে।"

মাতার আর একটি অনুরোধ ছিল। তিনি বলিতেন,—তুই যে দিনরাত তোর ছাত্র বেণু গোপালের গল্প করিস তাহাকে একবার নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়া। তাহাকে আমার দেখিতে ইচ্ছা করে।

হরলাল কহিল, মা, এ বাসায় তাহাকে কোথায় বসাইব ?, রোস, একটা বড় বাসা করি, তাহার পর তাহাকে নিমন্ত্রণ করিব।

৭

হরলালের বেতন বৃদ্ধির সঙ্গে ছোট গলি হইতে বড় গলি ও ছোট বাড়ি হইতে বড় বাড়িতে তাহার বাস পরিবর্ত্তন হইল। তবু সে কি জানি কি মনে করিয়া, অধরলালের বাড়ি যাইতে বা বেণুকে নিজের বাসায় ডাকিয়া আনিতে কোনোমতে মনস্থির করিতে পারিল না।

হয় ত কোনো দিনই তাহার সঙ্কোচ ঘুচিত না। এমন সময়ে হঠাৎ খবর পাওয়া গেল বেণুর মা মারা গিয়াছেন। শুনিয়া মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া সে অধরলালের বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইল।

এই দুই অসমবয়সী বন্ধুতে অনেক দিন পরে আবার একবার মিলন হইল। বেণুর অশৌচের সময় পার হইয়া গেল— তবু এ বাড়িতে হরলালের যাতায়াত চলিতে লাগিল। কিন্তু

ঠিক তেমনটি আর কিছুই নাই। বেণু এখন বড় হইয়া উঠিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীযোগে তাহার নূতন গোঁফের রেখার সাধ্যসাধনা করিতেছে। চালচলনে বাবুয়ানা ফুটিয়া উঠিয়াছে। এখন তাহার উপযুক্ত বন্ধুবান্ধবেরও অভাব নাই। ফোনোগ্রাফে থিয়েটারের নটীদের ইতর গান বাজাইয়া সে বন্ধু মহলকে আমোদে রাখে। পড়িবার ঘরে সেই সাবেক ভাঙা চৌকি ও দাগী টেবিল কোথায় গেল। আয়নাতে, ছবিতে, আসবাবে ঘর যেন ছাতি ফুলাইয়া রহিয়াছে। বেণু এখন কলেজে যায় কিন্তু দ্বিতীয় বার্ষিকের সীমানা পার হইবার জন্য তাহার কোন তাগিদ দেখা যায় না। বাপ স্থির করিয়া আছেন, দুই একটা পাস করাইয়া লইয়া বিবাহের হাটে ছেলের বাজার দর বাড়াইয়া তুলিবেন। কিন্তু ছেলের মা জানিতেন ও স্পষ্ট করিয়া বলিতেন, আমার বেণুকে সামান্য লোকের ছেলের মত গৌরব প্রমাণ করিবার জন্য পাসের হিসাব দিতে হইবে না—লোহার সিন্ধুকে কোম্পানির কাগজ অক্ষয় হইয়া থাক্! ছেলেও মাতার এ কথাটা বেশ করিয়া মনে মনে বুঝিয়া লইয়াছিল।

যাহা হউক, বেণুর পক্ষে সে যে আজ নিতান্তই অনাবশ্যক তাহা হরলাল স্পষ্টই বুঝিতে পারিল এবং কেবলই থাকিয়া থাকিয়া সেই দিনের কথা মনে পড়িল, যেদিন বেণু হঠাৎ সকাল বেলায় তাহার মেসের বাসায় গিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছিল, মাষ্টার মশায় আমাদের বাড়ি চল। সে বেণু নাই, সে বাড়ি নাই, এখন মষ্টারমশায়কে কেই বা ডাকিবে!

হরলাল মনে করিয়াছিল এইবার বেণুকে তাহাদের বাসায় মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করিবে। কিন্তু তাহাকে আহ্বান করিবার জোর পাইল না। একবার ভাবিল, উহাকে আসিতে বলিব, তাহার পরে ভাবিল লাভ কি—বেণু হয় ত নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবে কিন্তু থাক্।

হরলালের মা ছাড়িলেন না। তিনি বার বার বলিতে লাগিলেন, তিনি নিজের হাতে রাঁধিয়া তাহাকে খাওয়াইবেন—আহা বাছার মা মারা গেছে!

অবশেষে হরলাল একদিন তাহাকে নিমন্ত্রণ করিতে গেল। কহিল অধর বাবুর কাছ হইতে অনুমতি লইয়া আসি। বেণু কহিল, "অনুমতি লইতে হইবে না, আপনি কি মনে করেন আমি এখনও সেই খোকাবাবু আছি?"

হরলালের বাসায় বেণু খাইতে আসিল। মা এই কার্ত্তিকের মত ছেলেটিকে তাঁহার দুই স্নিগ্ধচক্ষুর আশীর্ব্বাদে অভিষিক্ত করিয়া যত্ন করিয়া খাওয়াইলেন। তাঁহার কেবলি মনে হইতে লাগিল আহা এই বয়সের এমন ছেলেকে ফেলিয়া ইহার মা যখন মরিল তখন তাহার প্রাণ না জানি কেমন করিতেছিল!

আহার সারিয়াই বেণু কহিল—মাষ্টার মশায়, আমাকে আজ একটু সকাল সকাল যাইতে হইবে। আমার দুই একজন বন্ধুর আসিবার কথা আছে।

বলিয়া পকেট হইতে সোণার ঘড়ি খুলিয়া একবার সময় দেখিয়া লইল; তাহার পরে সংক্ষেপে বিদায় লইয়া জুড়ি গাড়িতে

চড়িয়া বসিল। হরলাল তাহার বাসার দরজার কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। গাড়ি সমস্ত গলিকে কাঁপাইয়া দিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যেই চোখের বাহির হইয়া গেল।

মা কহিলেন, হরলাল উহাকে মাঝে মাঝে ডাকিয়া আনিস্। এই বয়সে উহার মা মারা গেছে মনে করিলে আমার প্রাণটা কেমন করিয়া উঠে।

হরলাল চুপ করিয়া রহিল। এই মাতৃহীন ছেলেটিকে সান্ত্বনা দিবার জন্য সে কোনো প্রয়োজন বোধ করিল না। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে কহিল—"বাস, এই পর্য্যন্ত! আর কখনো ডাকিব না! একদিন পাঁচ টাকা মাইনের মাষ্টারি করিয়াছিলাম বটে—কিন্তু আমি সামান্য হরলাল মাত্র!"

৮

একদিন সন্ধ্যার পর হরলাল আপিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল তাহার একতলার ঘরে অন্ধকারে কে একজন বসিয়া আছে। সেখানে যে কোনো লোক আছে তাহা লক্ষ্য না করিয়াই সে বোধ হয় উপরে উঠিয়া যাইত কিন্তু দরজায় ঢুকিয়াই দেখিল এসেন্সের গন্ধে আকাশ পূর্ণ। ঘরে প্রবেশ করিয়া হরলাল জিজ্ঞাসা করিল, "কে মশায়?" বেণু বলিয়া উঠিল—"মাষ্টার মশায়, আমি।"

হরলাল কহিল—এ কি ব্যাপার? কখন আসিয়াছ?

বেণু কহিল—অনেকক্ষণ আসিয়াছি। আপনি যে এত দেরি করিয়া আপিস হইতে ফেরেন তাহা ত আমি জানিতাম না।

বহুকাল হইল সেই যে নিমন্ত্রণ খাইয়া গেছে তাহার পরে আর একবারও বেণু এ বাসায় আসে নাই। বলা নাই কহা নাই আজ হঠাৎ এমন করিয়া সে যে সন্ধ্যার সময় এই অন্ধকার ঘরের মধ্যে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে ইহাতে হরলালের মন উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল।

উপরের ঘরে গিয়া বাতি জ্বালিয়া দুই জনে বসিল। হরলাল জিজ্ঞাসা করিল—সব ভাল ত? কিছু বিশেষ খবর আছে?

বেণু কহিল, পড়াশুনা ক্রমে তাহার পক্ষে বড়ই একঘেয়ে হইয়া আসিয়াছে। কাঁহাতক সে বৎসরের পর বৎসর ঐ সেকেণ্ড ইয়ারেই আটকা পড়িয়া থাকে। তাহার চেয়ে অনেক বয়সে ছোট ছেলের সঙ্গে তাহাকে এক সঙ্গে পড়িতে হয়—তাহার বড় লজ্জা করে। কিন্তু বাবা কিছুতেই বোঝেন না।

হরলাল জিজ্ঞাসা করিল—তোমার কি ইচ্ছা?

বেণু কহিল, তাহার ইচ্ছা সে বিলাত যায়, বারিষ্টার হইয়া আসে। তাহারই সঙ্গে এক সঙ্গে পড়িত, এমন কি, তাহার চেয়ে পড়াশুনায় অনেক কাঁচা একটি ছেলে বিলাতে যাইবে স্থির হইয়া গেছে।

হরলাল কহিল, তোমার বাবাকে তোমার ইচ্ছা জানাইয়াছ?

বেণু কহিল—জানাইয়াছি। বাবা বলেন পাস না করিলে বিলাতে যাইবার প্রস্তাব তিনি কানে আনিবেন না। কিন্তু আমার মন খারাপ হইয়া গেছে—এখানে থাকিলে আমি কিছুতেই পাস করিতে পারিব না।

হরলাল চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। বেণু কহিল—আজ এই কথা লইয়া বাবা আমাকে যাহা মুখে আসিয়াছে তাহাই বলিয়াছেন। তাই আমি বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছি। মা থাকিলে এমন কখনোই হইতে পারিত না।—বলিতে বলিতে সে অভিমানে কাঁদিতে লাগিল।

হরলাল কহিল—চল আমি সুদ্ধ তোমার বাবার আছে যাই, পরামর্শ করিয়া যাহা ভাল হয় স্থির করা যাইবে।

বেণু কহিল—না, আমি সেখানে যাইব না।

বাপের সঙ্গে রাগারাগি করিয়া হরলালের বাড়িতে আসিয়া বেণু থাকিবে এ কথাটা হরলালের মোটেই ভাল লাগিল না। অথচ আমার বাড়ি থাকিতে পারিবে না এ কথা বলাও বড় শক্ত। হরলাল ভাবিল আর একটু বাদে মনটা একটু ঠাণ্ডা হইলেই ইহাকে ভুলাইয়া বাড়ি লইয়া যাইব। জিজ্ঞাসা করিল—তুমি খাইয়া আসিয়াছ?

বেণু কহিল—না, আমার ক্ষুধা নাই—আমি আজ খাইব না।

হরলাল কহিল—"সে কি হয়?" তাড়াতাড়ি মাকে গিয়া কহিল, "মা বেণু আসিয়াছে, তাহার জন্য কিছু খাবার চাই।"

শুনিয়া মা ভারি খুসি হইয়া খাবার তৈরি করিতে গেলেন। হরলাল আপিসের কাপড় ছাড়িয়া মুখ হাত ধুইয়া বেণুর কাছে আসিয়া বসিলেন। একটুখানি কাশিয়া একটুখানি ইতস্ততঃ করিয়া তিনি বেণুর কাঁধের উপর হাত রাখিয়া কহিলেন—বেণু,

কাজটা ভাল হইতেছে না। বাবার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া বাড়ি হইতে চলিয়া আসা, এটা তোমার উপযুক্ত নয়।

শুনিয়া তখনি বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া বেণু কহিল, "আপনার এখানে যদি সুবিধা না হয় আমি সতীশের বাড়ি যাইব।"—বলিয়া সে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল। হরলাল তাহার হাত ধরিয়া কহিল—রোস, কিছু খাইয়া যাও।

বেণু রাগ করিয়া কহিল—"না, আমি খাইতে পারিব না।" বলিয়া হাত ছাড়াইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

এমন সময়, হরলালের জন্য যে জলখাবার প্রস্তুত ছিল তাহাই বেণুর জন্য থালায় গুছাইয়া মা তাহাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কহিলেন, কোথায় যাও বাছা!

বেণু কহিল, আমার কাজ আছে আমি চলিলাম।

মা কহিলেন, সে কি হয় বাছা, কিছু না খাইয়া যাইতে পারিবে না। এই বলিয়া সেই বারান্দায় পাত পাড়িয়া তাহাকে হাতে ধরিয়া খাইতে বসাইলেন।

বেণু রাগ করিয়া কিছুই খাইতেছে না—খাবার লইয়া একটু নাড়াচাড়া করিতেছে মাত্র এমন সময় দরজার কাছে একটা গাড়ি আসিয়া থামিল। প্রথমে একটা দরোয়ান ও তাহার পশ্চাতে স্বয়ং অধরবাবু মচ্‌মচ্‌ শব্দে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে আসিয়া উপস্থিত। বেণুর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল।

মা ঘরের মধ্যে সরিয়া গেলেন। অধর ছেলের সম্মুখে আসিয়া ক্রোধে কম্পিতকণ্ঠে হরলালের দিকে চাহিয়া কহিলেন—

এই বুঝি! রতিকান্ত আমাকে তখনি বলিয়াছিল কিন্তু তোমার পেটে যে এত মৎলব ছিল তাহা আমি বিশ্বাস করি নাই। তুমি মনে করিয়াছ বেণুকে বশ করিয়া উহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া খাইবে! কিন্তু সে হইতে দিব না। ছেলে চুরি করিবে! তোমার নামে পুলিস্ কেস্ করিব তোমাকে জেলে ঠেলিব তবে ছাড়িব।—এই বলিয়া বেণুর দিকে চাহিয়া কহিলেন—"চল্! ওঠ!" বেণু কোনো কথাটি না কহিয়া তাহার বাপের পিছনে পিছনে চলিয়া গেল।

সে দিন কেবল হরলালের মুখেই খাবার উঠিল না।

৯

এবারে হরলালের সদাগর আপিস কি জানি কি কারণে মফস্বল হইতে প্রচুর পরিমাণে চাল ডাল খরিদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এই উপলক্ষে হরলালকে প্রতি সপ্তাহেই শনিবার ভোরের গাড়িতে সাত আট হাজার টাকা লইয়া মফস্বলে যাইতে হইত। পাইকেড়দিগকে হাতে হাতে দাম চুকাইয়া দিবার জন্য মফস্বলের একটা বিশেষ কেন্দ্রে তাহার যে আপিস আছে সেইখানে দশ ও পাঁচ টাকার নোট ও নগদ টাকা লইয়া সে যাইত, সেখানে রসিদ ও খাতা দেখিয়া গত সপ্তাহের মোটা হিসাব মিলাইয়া, বর্ত্তমান সপ্তাহের কাজ চালাইবার জন্য টাকা রাখিয়া আসিত। সঙ্গে আপিসের দুই জন দরোয়ান যাইত। হরলালের জামিন নাই বলিয়া আপিসে একটা কথা উঠিয়াছিল, কিন্তু বড় সাহেব নিজের উপর সমস্ত ঝুঁকি লইয়া বলিয়াছিলেন হরলালের জামিনের প্রয়োজন নাই।

মাঘমাস হইতে এইভাবে কাজ চলিতেছে—চৈত্র পর্য্যন্ত চলিবে এমন সম্ভাবনা আছে। এই ব্যাপার লইয়া হরলাল বিশেষ ব্যস্ত ছিল। প্রায়ই তাহাকে অনেক রাত্রে আপিস হইতে ফিরিতে হইত।

একদিন এইরূপ রাত্রে ফিরিয়া শুনিল বেণু আসিয়াছিল, মা তাহাকে খাওয়াইয়া যত্ন করিয়া বসাইয়াছিলেন—সেদিন তাহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা গল্প করিয়া তাহার প্রতি তাঁহার মন আরো স্নেহে আকৃষ্ট হইয়াছে।

এমন আরো দুই একদিন হইতে লাগিল। মা বলিলেন, "বাড়িতে মা নাই নাকি, সেই জন্য সেখানে তাহার মন টেকে না। আমি বেণুকে তোর ছোট ভাইয়ের মত, আপন ছেলের মতই দেখি। সেই স্নেহ পাইয়া আমাকে কেবল মা বলিয়া ডাকিবার জন্য এখানে আসে।"—এই বলিয়া আঁচলের প্রান্ত দিয়া তিনি চোখ মুছিলেন।

হরলালের একদিন বেণুর সঙ্গে দেখা হইল। সেদিন সে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া ছিল। অনেক রাত পর্য্যন্ত কথাবার্ত্তা হইল। বেণু বলিল, "বাবা আজকাল এমন হইয়া উঠিয়াছেন যে আমি কিছুতেই বাড়িতে টিঁকিতে পারিতেছি না। বিশেষত শুনিতে পাইতেছি তিনি বিবাহ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। রতি বাবু সম্বন্ধ লইয়া আসিতেছেন—তাঁহার সঙ্গে কেবলি পরামর্শ চলিতেছে। পূর্ব্বে আমি কোথাও গিয়া দেরি করিলে বাবা অস্থির হইয়া উঠিতেন, এখন যদি আমি দুই চার দিন বাড়িতে না

ফিরি তাহা হইলে তিনি আরাম বোধ করেন। আমি বাড়ি থাকিলে বিবাহের আলোচনা সাবধানে করিতে হয় বলিয়া আমি না থাকিলে তিনি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচেন। এ বিবাহ যদি হয় তবে আমি বাড়িতে থাকিতে পারিব না। আমাকে আপনি উদ্ধারের একটা পথ দেখাইয়া দিন—আমি স্বতন্ত্র হইতে চাই।”

স্নেহে ও বেদনায় হরলালের হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সঙ্কটের সময় আর সকলকে ফেলিয়া বেণু যে তাহার সেই মাষ্টার মশায়ের কাছে আসিয়াছে ইহাতে কষ্টের সঙ্গে সঙ্গে তাহার আনন্দ হইল। কিন্তু মাষ্টার মশায়ের কতটুকুই বা সাধ্য আছে!

বেণু কহিল—যেমন করিয়া হৌক্ বিলাতে গিয়া বারিষ্টার হইয়া আসিলে এই বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাই!

হরলাল কহিল—অধর বাবু কি যাইতে দিবেন?

বেণু কহিল—আমি চলিয়া গেলে তিনি বাঁচেন। কিন্তু টাকার উপরে যে রকম মায়া বিলাতের খরচ তাঁহার কাছ হইতে সহজে আদায় হইবে না। একটু কৌশল করিতে হইবে।

হরলাল বেণুর বিজ্ঞতা দেখিয়া হাসিয়া কহিল—কি কৌশল?

বেণু কহিল—আমি হ্যাণ্ডনোটে টাকা ধার করিব। পাওনাদার আমার নামে নালিশ করিলে বাবা তখন দায়ে পড়িয়া শোধ করিবেন। সেই টাকায় পালাইয়া বিলাত যাইব। সেখানে গেলে তিনি খরচ না দিয়া থাকিতে পারিবেন না।

হরলাল কহিল—তোমাকে টাকা ধার দিবে কে?

বেণু কহিল—আপনি পারেন না?

হরলাল আশ্চর্য্য হইয়া কহিল—আমি!—তাহার মুখে আর কোন কথা বাহির হইল না।

বেণু কহিল—কেন আপনার দরোয়ান ত তোড়ায় করিয়া অনেক টাকা ঘরে আনিল।

হরলাল হাসিয়া কহিল—সে দরোয়ানও যেমন আমার টাকাও তেমনি।

বলিয়া এই আপিসের টাকার ব্যবহারটা কি তাহা বেণুকে বুঝাইয়া দিল। এই টাকা কেবল একটি রাত্রের জন্য দরিদ্রের ঘরে আশ্রয় লয়, প্রভাত হইলে দশ দিকেতে গমন।

বেণু কহিল—আপনাদের সাহেব আমাকে ধার দিতে পারেন না? না হয় আমি সুদ বেশি করিয়া দিব।

হরলাল কহিল—তোমার বাপ যদি সিকিউরিটি দেন তাহা হইলে আমার অনুরোধে হয় ত দিতেও পারেন।

বেণু কহিল—বাবা যদি সিকিউরিটি দিবেন ত টাকা দিবেন না কেন?

তর্কটা এই খানেই মিটিয়া গেল। হরলাল মনে মনে ভাবিতে লাগিল, আমার যদি কিছু থাকিত তবে বাড়িঘর জমিজমা সমস্ত বেচিয়া কিনিয়া টাকা দিতাম। কিন্তু একটি মাত্র অসুবিধা এই যে বাড়িঘর জমিজমা কিছুই নাই।

১০

একদিন শুক্রবার রাত্রে হরলালের বাসার সম্মুখে জুড়িগাড়ি দাঁড়াইল। বেণু গাড়ি হইতে নামিবামাত্র হরলালের আপিসের

দরোয়ান তাহাকে মস্ত একটা সেলাম করিয়া উপরে বাবুকে শশব্যস্ত হইয়া সংবাদ দিতে গেল। হরলাল তখন তাহার শোবার ঘরে মেজের উপর বসিয়া টাকা মিলাইয়া লইতেছিল। বেণু সেই ঘরেই প্রবেশ করিল। আজ তাহার বেশ কিছু নূতন ধরনের। সৌখীন ধুতি চাদরের বদলে নধর শরীরে পার্সি কোট ও প্যান্টলুন আঁটিয়া মাথায় ক্যাপ পরিয়া আসিয়াছে। তাহার দুই হাতের আঙ্গুলে মণিমুক্তার আংটি ঝক্‌মক্‌ করিতেছে। গলা হইতে লম্বিত মোটা সোনার চেনে আবদ্ধ ঘড়ি বুকের পকেটে নিবিষ্ট। কোটের আস্তিনের ভিতর হইতে জামার হাতায় হীরার বোতাম দেখা যাইতেছে।

হরলাল টাকা গোনা বন্ধ করিয়া আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, একি ব্যাপার? এত রাত্রে এ বেশে যে?

বেণু কহিল—পশু বাবার বিবাহ। তিনি আমার কাছে তাহা গোপন করিয়া রাখিয়াছেন কিন্তু আমি খবর পাইয়াছি। বাবাকে বলিলাম আমি কিছু দিনের জন্য আমাদের বারাকপুরের বাগানে যাইব। শুনিয়া তিনি ভারি খুসি হইয়া রাজি হইয়াছেন। তাই বাগানে চলিয়াছি; ইচ্ছা হইতেছে আর ফিরিব না। যদি সাহস থাকিত তবে গঙ্গার জলে ডুবিয়া মরিতাম।

বলিতে বলিতে বেণু কাঁদিয়া ফেলিল। হরলালের বুকে যেন ছুরি বিঁধিতে লাগিল। একজন অপরিচিত স্ত্রীলোক আসিয়া মার ঘর, মার খাট, মার স্থান অধিকার করিয়া লইলে বেণুর স্নেহস্মৃতিজড়িত বাড়ি যে বেণুর পক্ষে কি রকম কণ্টকময় হইয়া

উঠিবে তাহা হরলাল সমস্ত হৃদয় দিয়া বুঝিতে পারিল। মনে মনে ভাবিল পৃথিবীতে গরীব হইয়া না জন্মিলেও দুঃখের এবং অপমানের অন্ত নাই। বেণুকে কি বলিয়া যে সে সান্ত্বনা দিবে তাহা কিছুই ভাবিয়া না পাইয়া বেণুর হাতখানা নিজের হাতে লইল। লইবামাত্র একটা তর্ক তাহার মনে উদয় হইল। সে ভাবিল এমন একটা বেদনার সময় বেণু কি করিয়া এত সাজ করিতে পারিল।

হরলাল তাহার আংটির দিকে চোখ রাখিয়াছে দেখিয়া বেণু যেন তাহার মনের প্রশ্নটা আঁচিয়া লইল। সে বলিল এই আংটি গুলি আমার মায়ের।

শুনিয়া হরলাল বহুকষ্টে চোখের জল সাম্‌লাইয়া লইল। কিছুক্ষণ পরে কহিল, বেণু, খাইয়া অসিয়াছ?

বেণু কহিল, হাঁ,—আপনার খাওয়া হয় নাই?

হরলাল কহিল, টাকা গুলি গণিয়া আয়রণ চেষ্টে না তুলিয়া ঘর হইতে বাহির হইতে পারিব না।

বেণু কহিল, আপনি খাইয়া আসুন, আপনার সঙ্গে অনেক কথা আছে। আমি ঘরে রহিলাম, মা আপনার খাবার লইয়া বসিয়া আছেন।

হরলাল একটু ইতস্তত করিয়া কহিল, আমি চট করিয়া খাইয়া আসিতেছি।

হরলাল তাড়াতাড়ি খাওয়া সারিয়া মাকে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল। বেণু তাঁহাকে প্রণাম করিল, তিনি বেণুর চিবুকের স্পর্শ

লইয়া চুম্বন করিলেন। হরলালের কাছে সমস্ত খবর পাইয়া তাঁহার বুক যেন ফাটিয়া যাইতেছিল। নিজের সমস্ত স্নেহ দিয়াও বেণুর অভাব তিনি পূরণ করিতে পারিবেন না এই তাঁহার দুঃখ।

চারিদিকে ছড়ানো টাকার মধ্যে তিনজনে বসিয়া বেণুর ছেলেবেলাকার গল্প হইতে লাগিল। মাষ্টার মশায়ের সঙ্গে জড়িত তাহার কত দিনের কত ঘটনা। তাহার মাঝে মাঝে সেই অসংযত স্নেহশালিনী মার কথাও আসিয়া পড়িতে লাগিল।

এমনি করিয়া রাত অনেক হইয়া গেল। হঠাৎ এক সময় ঘড়ি খুলিয়া বেণু কহিল, আর নয় দেরি করিলে গাড়ি ফেল করিব।

হরলালের মা কহিলেন—বাবা আজ রাত্রে এইখানেই থাক না, কাল সকালে হরলালের সঙ্গে এক সঙ্গেই বাহির হইবে।

বেণু মিনতি করিয়া কহিল—না মা, এ অনুরোধ করিবেন না, আজ রাত্রে যে করিয়া হউক আমাকে যাইতেই হইবে।

হরলালকে কহিল—মাষ্টার মশায়, এই আংটি ঘড়ি গুলা বাগানে লইয়া যাওয়া নিরাপদ নয়। আপনার কাছেই রাখিয়া যাই, ফিরিয়া আসিয়া লইয়া যাইব। আপনার দরোয়ানকে বলিয়া দিন আমার গাড়ি হইতে চামড়ার হ্যাণ্ডব্যাগটা আনিয়া দিক্। সেইটের মধ্যে এগুলা রাখিয়া দিই।

আফিসের দরোয়ান গাড়ি হইতে ব্যাগ্ লইয়া আসিল। বেণু তাহার চেন ঘড়ি আংটি বোতাম সমস্ত খুলিয়া ব্যাগেরমধ্যে পুরিয়া দিল। সতর্ক হরলাল সেই ব্যাগটি লইয়া তখনি আয়রন সেফের মধ্যে রাখিল।

বেণু হরলালের মার পায়ের ধুলা লইল। তিনি রুদ্ধ কণ্ঠে আশীর্ব্বাদ করিলেন,—মা জগদম্বা তোমার মা হইয়া তোমাকে রক্ষা করুন।

তাহার পরে বেণু হরলালের পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিল। আর কোনদিন সে হরলালকে এমন করিয়া প্রণাম করে নাই। হরলাল কোনো কথা না বলিয়া তাহার পিঠে হাত দিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে নীচে নামিয়া আসিল। গাড়ির লণ্ঠনে আলো জ্বলিল, ঘোড়া ছুটা অধীর হইয়া উঠিল। কলিকাতার গ্যাসালোকখচিত নিশীথের মধ্যে বেণুকে লইয়া গাড়ি অদৃশ্য হইয়া গেল।

হরলাল তাহার ঘরে আসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া টাকা গণিতে গণিতে ভাগ করিয়া এক একটা থলিতে ভর্ত্তি করিতে লাগিল। নোটগুলা পূর্ব্বেই গণা হইয়া থলিবন্দি হইয়া লোহার সিন্দুকে উঠিয়াছিল।

১১

লোহার সিন্ধুকের চাবি মাথার বালিশের নীচে রাখিয়া সেই টাকার ঘরেই হরলাল অনেক রাত্রে শয়ন করিল। ভাল ঘুম হইল না। স্বপ্ন দেখিল—বেণুর মা পর্দ্দার আড়াল হইতে তাহাকে উচ্চস্বরে তিরস্কার করিতেছেন; কথা কিছুই স্পষ্ট শুনা যাইতেছে না, কেবল সেই অনির্দ্দিষ্ট কণ্ঠস্বরের সঙ্গে সঙ্গে বেণুর মার চুনী পান্না হীরার অলঙ্কার হইতে লাল সবুজ শুভ্র রশ্মির সূচিগুলি কালো পর্দ্দাটাকে ফুঁড়িয়া বাহির হইয়া আন্দোলিত হইতেছে।

হরলাল প্রাণপণে বেণুকে ডাকিবার চেষ্টা করিতেছে কিন্তু তাহার গলা দিয়া কিছুতেই স্বর বাহির হইতেছে না। এমন সময় প্রচণ্ড শব্দে কি একটা ভাঙ্গিয়া পর্দ্দা ছিঁড়িয়া পড়িয়া গেল,—চমকিয়া চোখ মেলিয়া হরলাল দেখিল একটা স্তূপাকার অন্ধকার। হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া উঠিয়া সশব্দে জান্‌লায় ঠেলা দিয়া আলো নিবাইয়া দিয়াছে। হরলালের সমস্ত শরীর ঘামে ভিজিয়া গেছে। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দেশালাই দিয়া আলো জ্বালিল। ঘড়িতে দেখিল চারটে বাজিয়াছে। আর ঘুমাইবার সময় নাই—টাকা লইয়া মফস্বলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

হরলাল মুখ ধুইয়া ফিরিবার সময় মা তাঁহার ঘর হইতে কহিলেন, কি বাবা উঠিয়াছিস্?

হরলাল প্রভাতে প্রথমে মাতার মঙ্গল মুখ দেখিবার জন্য ঘরে প্রবেশ করিল। মা তাহার প্রণাম লইয়া মনে মনে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন—বাবা, আমি এই মাত্র স্বপ্ন দেখিতেছিলাম তুই যেন বউ আনিতে চলিয়াছিস্। ভোরের স্বপন কি মিথ্যা হইবে?

হরলাল হাসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। টাকা ও নোটের থলেগুলো লোহার সিন্ধুক হইতে বাহির করিয়া প্যাক বাক্সয় বন্ধ করিবার জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিল। হঠাৎ তাহার বুকের ভিতর ধড়াস্ করিয়া উঠিল—দুই তিনটা নোটের থলি শূন্য। মনে হইল স্বপন দেখিতেছি। থলেগুলা লইয়া সিন্ধুকের গায়ে জোরে আছাড় দিল—তাহাতে শূন্য থলের শূন্যতা অপ্রমাণ হইল না।

তবু বৃথা আশায় থলের বন্ধনগুলা খুলিয়া খুব করিয়া ঝাড়া দিল একটি থলের ভিতর হইতে দুইখানি চিঠি বাহির হইয়া পড়িল। বেণুর হাতের লেখা—একটি চিঠি তাহার বাপের নামে, আর একটি হরলালের।

তাড়াতাড়ি খুলিয়া পড়িতে গেল। চোখে যেন দেখিতে পাইল না। মনে হইল যেন আলো যথেষ্ট নাই। কেবলি বাতি উস্কাইয়া দিতে লাগিল। যাহা পড়ে তাহা ভাল বোঝে না, বাংলা ভাষা যেন ভুলিয়া গেছে।

কথাটা এই যে, বেণু তিন হাজার টাকার পরিমাণ দশটাকা ওয়ালা নোট লইয়া বিলাতে যাত্রা করিয়াছে, আজ ভোরেই জাহাজ ছাড়িবার কথা। হরলাল যে সময় খাইতে গিয়াছিল, সেই সময় বেণু এই কাণ্ড করিয়াছে। লিখিয়াছে যে, "বাবাকে চিঠি দিলাম, তিনি আমার এই ঋণ শোধ করিয়া দিবেন! তা ছাড়া ব্যাগ খুলিয়া দেখিবেন তাহার মধ্যে মায়ের যে গহনা আছে তাহার দাম কত ঠিক জানি না, বোধ হয় তিন হাজার টাকার বেশি হইবে। মা যদি বাঁচিয়া থাকিতেন তবে বাবা আমাকে বিলাতে যাইবার টাকা না দিলেও এই গহনা দিয়াই নিশ্চয় মা আমার খরচ জোগাড় করিয়া দিতেন। আমার মায়ের গহনা বাবা যে আর কাহাকেও দিবেন তাহা আমি সহ্য করিতে পারি নাই। সেই জন্য যেমন করিয়া পারি আমিই তাহা লইয়াছি। বাবা যদি টাকা দিতে দেরি করেন তবে আপনি অনায়াসে এই গহনা বেচিয়া বা বন্ধক দিয়া টাকা লইতে পারিবেন। এ আমার

মায়ের জিনিষ—এ আমারই জিনিষ।" এ ছাড়া আরো অনেক কথা—সে কোনো কাজের কথা নহে।

হরলাল ঘরে তালা দিয়া তাড়াতাড়ি একখানা গাড়ি লইয়া গঙ্গার ঘাটে ছুটিল। কোন্ জাহাজে বেণু যাত্রা করিয়াছে তাহার নামও সে জানে না। মেটিয়াবুরুজ পর্য্যন্ত ছুটিয়া হরলাল খবর পাইল দুই খানা জাহাজ ভোরে রওনা হইয়া গেছে। দু'খানাই ইংলণ্ডে যাইবে। কোন জাহাজে বেণু আছে তাহাও তাহার অনুমানের অতীত এবং সে জাহাজ ধরিবার যে কি উপায় তাহাও সে ভাবিয়া পাইল না।

মেটিয়াবুরুজ হইতে তাহার বাসার দিকে যখন গাড়ি ফিরিল তখন সকালের রৌদ্রে কলিকাতার সহর জাগিয়া উঠিয়াছে। হরলালের চোখে কিছুই পড়িল না। তাহার সমস্ত হতবুদ্ধি অন্তঃকরণ একটা কলেবরহীন নিদারুণ প্রতিকূলতাকে যেন কেবলি প্রাণপণে ঠেলা মারিতেছিল—কিন্তু কোথাও এক তিলও তাহাকে টলাইতে পারিতেছিল না। যে বাসায় তাহার মা থাকেন, একদিন যে বাসায় পা দিবামাত্র কর্ম্মক্ষেত্রের সমস্ত ক্লান্তি ও সংঘাতের বেদনা মুহূর্ত্তের মধ্যেই তাহার দূর হইয়াছে—সেই বাসার সম্মুখে গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল—গাড়োয়ানের ভাড়া চুকাইয়া দিয়া সেই বাসার মধ্যে সে অপরিমেয় নৈরাশ্য ও ভয় লইয়া প্রবেশ করিল।

মা উদ্বিগ্ন হইয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবা কোথায় গিয়াছিলে?

হরলাল বলিয়া উঠিল—মা, তোমার জন্য বউ আনিতে গিয়া-

ছিলাম।—বলিয়া শুষ্ককণ্ঠে হাসিতে হাসিতে সেইখানেই মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

"ওমা, কি হইল গো" বলিয়া মা তাড়াতাড়ি জল আনিয়া তাহার মুখে জলের ঝাপটা দিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে হরলাল চোখ খুলিয়া শূন্যদৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া উঠিয়া বসিল। হরলাল কহিল—মা, তোমরা ব্যস্ত হইও না। আমাকে একটু একলা থাকিতে দাও।—বলিয়া সে তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। মা দরজার বাহিরে মাটির উপর বসিয়া পড়িলেন,—ফাল্গুনের রৌদ্র তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে আসিয়া পড়িল। তিনি রুদ্ধ দরজার উপর মাথা রাখিয়া থাকিয়া থাকিয়া কেবল ডাকিতে লাগিলেন, হরলাল, বাবা হরলাল।

হরলাল কহিল, মা, একটু পরেই আমি বাহির হইব, এখন তুমি যাও!

মা রৌদ্রে সেইখানেই বসিয়া জপ করিতে লাগিলেন।

আফিসের দরোয়ান আসিয়া দরজায় ঘা দিয়া কহিল—'বাবু, এখনি না বাহির হইলে আর গাড়ি পাওয়া যাইবে না।

হরলাল ভিতর হইতে কহিল—আজ সাতটার গাড়িতে যাওয়া হইবে না।

দরোয়ান কহিল—তবে কখন যাইবেন?

হরলাল কহিল—সে আমি তোমাকে পরে বলিব।

দরোয়ান মাথা নাড়িয়া হাত উলটাইয়া নীচে চলিয়া গেল।

হরলাল ভাবিতে লাগিল—এ কথা বলি কাহাকে? এ যে চুরি! বেণুকে কি জেলে দিব?

হঠাৎ সেই গহনার কথা মনে পড়িল। সে কথাটা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিল। মনে হইল যেন কিনারা পাওয়া গেল। ব্যাগ খুলিয়া দেখে তাহার মধ্যে শুধু আংটি, ঘড়ি, বোতাম, হার নহে—ব্রেস্‌লেট, চিক, সিঁথি, মুক্তারমালা প্রভৃতি আরো অনেক দামী গহনা আছে। তাহার দাম তিন হাজার টাকার অনেক বেশি। কিন্তু এও ত চুরি! এও ত বেণুর নয়। এ ব্যাগ যতক্ষণ তাহার ঘরে থাকে ততক্ষণ তাহার বিপদ।

তখন আর দেরি না করিয়া অধরলালের সেই চিঠি ও ব্যাগ লইয়া হরলাল ঘর হইতে বাহির হইল।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন—কোথায় যাও বাবা।

হরলাল কহিল—অধর বাবুর বাড়িতে।

মার বুক হইতে হঠাৎ অনির্দ্দিষ্ট ভয়ের একটা মস্ত বোঝা নামিয়া গেল। তিনি স্থির করিলেন ঐ যে হরলাল কাল শুনিয়াছে বেণুর বাপের বিয়ে তাই শুনিয়া অবধি বাছার মনে শান্তি নাই। আহা, বেণুকে কত ভালই বাসে!

মা জিজ্ঞাসা করিলেন—আজ তবে তোমার আর মফস্বলে যাওয়া হইবে না?

হরলাল কহিল—না।—বলিয়াই তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িল।

অধর বাবুর বাড়ি পৌঁছিবার পূর্ব্বেই দূর হইতে শোনা গেল

রসনচৌকি আলেয়া রাগিণীতে করুণস্বরে আলাপ জুড়িয়া দিয়াছে, কিন্তু হরলাল দরজায় ঢুকিয়াই দেখিল, বিবাহবাড়ির উৎসবের সঙ্গে একটা যেন অশান্তির লক্ষণ মিশিয়াছে। দরোয়ানের পাহারা কড়াক্কড়, বাড়ি হইতে চাকরবাকর কেহ বাহির হইতে পারিতেছে না—সকলেরই মুখে ভয় ও চিন্তার ভাব। হরলাল খবর পাইল কাল রাত্রে বাড়িতে অনেক টাকার গহনা চুরি হইয়া গেছে। দুই তিনজন চাকরকে বিশেষভাবে সন্দেহ করিয়া পুলিসের হাতে সমর্পণ করিবার উদ্যোগ হইতেছে।

হরলাল দোতলায় বারান্দায় গিয়া দেখিল—অধর বাবু আগুন হইয়া বসিয়া আছেন—ও রতিকান্ত তামাক খাইতেছে। হরলাল কহিল—আপনার সঙ্গে গোপনে আমার একটু কথা আছে।

অধর বাবু চটিয়া উঠিয়া কহিলেন, তোমার সঙ্গে গোপনে আলাপ করিবার এখন আমার সময় নয়—যাহা কথা থাকে এই-খানেই বলিয়া ফেল!

তিনি ভাবিলেন, হরলাল বুঝি এই সময়ে তাঁহার কাছে সাহায্য বা ধার চাহিতে আসিয়াছে। রতিকান্ত কহিল—আমার সামনে বাবুকে কিছু জানাইতে যদি লজ্জা করেন, আমি না হয় উঠি!

অধর বিরক্ত হইয়া কহিলেন—আঃ বোস না!

হরলাল কহিল—কাল রাত্রে বেণু আমার বাড়িতে এই ব্যাগ রাখিয়া গেছে।

অধর। ব্যাগে কি আছে?

হরলাল ব্যাগ খুলিয়া অধরবাবুর হাতে দিল।

অধর। মাষ্টারে ছাত্রে মিলিয়া বেশ কারবার খুলিয়াছ ত? জানিতে এ চোরাই মাল বিক্রি করিলে ধরা পড়িবে—তাই আনিয়া দিয়াছ—মনে করিতেছ সাধুতার জন্য বকৃশিস পাইবে?

তখন হরলাল অধরের পত্রখানা তাঁহার হাতে দিল। পড়িয়া তিনি আগুন হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, আমি পুলিশে খবর দিব। আমার ছেলে এখনো সাবালক হয় নাই—তুমি তাহাকে চুরি করিয়া বিলাতে পাঠাইয়াছ! হয়ত পাঁচশো টাকা ধার দিয়া তিন হাজার টাকা লিখাইয়া লইয়াছ! এ ধার আমি শুধিব না!

হরলাল কহিল—আমি ধার দিই নাই।

অধর কহিলেন—তবে সে টাকা পাইল কোথা হইতে! তোমার বাক্স ভাঙিয়া চুরি করিয়াছে?

হরলাল সে প্রশ্নের কোনও উত্তর দিল না। রতিকান্ত টিপিয়া টিপিয়া কহিল—ওঁকে জিজ্ঞাসা করুন না তিন হাজার টাকা কেন, পাঁচশো টাকাও উনি কি কখনো চক্ষে দেখিয়াছেন?

যাহা হউক গহনা চুরির মীমাংসা হওয়ার পরেই বেণুর বিলাত পালানো লইয়া বাড়িতে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। হরলাল সমস্ত অপরাধের ভার মাথায় করিয়া লইয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়া আসিল।

রাস্তায় যখন বাহির হইল তখন তাহার মন যেন অসাড় হইয়া গেছে। ভয় করিবার এবং ভাবনা করিবারও শক্তি তখন ছিল

না। এই ব্যাপারের পরিণাম যে কি হইতে পারে মন তাহা চিন্তা করিতেও চাহিল না।

গলিতে প্রবেশ করিয়া দেখিল তাহার বাড়ির সমুখে একটা গাড়ি দাঁড়াইয়া আছে। চমকিয়া উঠিল। হঠাৎ আশা হইল বেণু ফিরিয়া আসিয়াছে। নিশ্চয়ই বেণু! তাহার বিপদ যে সম্পূর্ণ নিরুপায়রূপে চূড়ান্ত হইয়া উঠিবে এ কথা সে কোন মতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না।

তাড়াতাড়ি গাড়ির কাছে আসিয়া দেখিল—গাড়ির ভিতরে তাহাদের আপিসের একজন সাহেব বসিয়া আছে। সাহেব হরলালকে দেখিয়াই গাড়ি হইতে নামিয়া তাহার হাত ধরিয়া বাড়িতে প্রবেশ করিল। জিজ্ঞাসা করিল আজ মফস্বলে গেলে না কেন?

আপিসের দরোয়ান সন্দেহ করিয়া বড় সাহেবকে গিয়া জানাইয়াছে—তিনি ইহাকে পাঠায়াছেন।

হরলাল কহিল—তিন হাজার টাকার নোট পাওয়া যাইতেছে না।

সাহেব জিজ্ঞাসা করিল—কোথায় গেল?

হরলাল—"জানি না"—এমন উত্তরও দিতে পারিল না, চুপ করিয়া রহিল।

সাহেব কহিল—টাকা কোথায় আছে দেখিব চল।

হরলাল তাহাকে উপরের ঘরে লইয়া গেল। সাহেব সমস্ত গণিয়া চারিদিক খুঁজিয়া পাতিয়া দেখিল। বাড়ীর সমস্ত ঘর তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিল। এই সমস্ত ব্যাপার

দেখিয়া মা আর থাকিতে পারিলেন না—তিনি সাহেবের সাম্‌নেই বাহির হইয়া ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—ওরে হরলাল, কি হইল রে?

হরলাল কহিল—মা, টাকা চুরি গেছে।

মা কহিলেন—চুরি কেমন করিয়া যাইবে? হরলাল এমন সর্ব্বনাশ কে করিল!

হরলাল কহিল—মা, চুপ কর।

সন্ধান শেষ করিয়া সাহেব জিজ্ঞাসা করিল—এ ঘরে রাত্রে কে ছিল?

হরলাল কহিল—দ্বার বন্ধ করিয়া আমি একলা শুইয়াছিলাম—আর কেহ ছিল না।

সাহেব টাকাগুলা গাড়িতে তুলিয়া হরলালকে কহিল—আচ্ছা বড় সাহেবের কাছে চল।

হরলালকে সাহেবের সঙ্গে চলিয়া যাইতে দেখিয়া মা তাহাদের পথ রোধ করিয়া কহিল—সাহেব আমার ছেলেকে কোথায় লইয়া যাইবে? আমি না খাইয়া এ ছেলে মানুষ করিয়াছি—আমার ছেলে কখনই পরের টাকায় হাত দিবে না!

সাহেব বাঙ্গলা কথা কিছু না বুঝিয়া কহিল—আচ্ছা, আচ্ছা!

হরলাল কহিল, মা তুমি কেন ব্যস্ত হইতেছ? বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়া আমি এখনি আসিতেছি!

মা উদ্বিগ্ন হইয়া কহিলেন—তুই যে সকাল থেকে কিছুই খাস্ নাই।

সে কথার কোনো উত্তর না দিয়া হরলাল গাড়িতে উঠিয়া চলিয়া গেল। মা মেজের উপরে লুটাইয়া পড়িয়া রহিলেন।

বড় সাহেব হরলালকে কহিলেন, সত্য করিয়া বল ব্যাপার-খানা কি?

হরলাল কহিল—আমি টাকা লই নাই।

বড় সাহেব। সে কথা আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। কিন্তু তুমি নিশ্চয় জান কে লইয়াছে?

হরলাল কোনো উত্তর না দিয়া মুখ নীচু করিয়া বসিয়া রহিল।

সাহেব। তোমার জ্ঞাতসারে এ টাকা কেহ লইয়াছে?

হরলাল কহিল,—আমার প্রাণ থাকিতে আমার জ্ঞাতসারে এ টাকা কেহ লইতে পারিত না।

বড়সাহেব কহিলেন—দেখ হরলাল, আমি তোমাকে বিশ্বাস করিয়া কোন জামিন না লইয়া এই দায়িত্বের কাজ দিয়াছিলাম। আপিসের সকলেই বিরোধী ছিল। তিন হাজার টাকা কিছুই বেশি নয়। কিন্তু তুমি আমাকে বড় লজ্জাতেই ফেলিবে। আজ সমস্ত দিন তোমাকে সময় দিলাম—যেমন করিয়া পার 'টাকা সংগ্রহ করিয়া আন—তাহা হইলে এ লইয়া কোন কথা তুলিব না, তুমি যেমন কাজ করিতেছ তেমনি করিবে।

এই বলিয়া সাহেব উঠিয়া গেলেন। তখন বেলা এগারটা হইয়া গেছে। হরলাল যখন মাথা নীচু করিয়া বাহির হইয়া গেল তখন আপিসের বাবুরা অত্যন্ত খুসি হইয়া হরলালের পতন লইয়া আলোচনা করিতে লাগিল।

হরলাল একদিন সময় পাইল। আরও একটা দীর্ঘদিন নৈরাশ্যের শেষতলের পঙ্ক আলোড়ন করিয়া তুলিবার মেয়াদ বাড়িল।

উপায় কি, উপায় কি, উপায় কি—এই ভাবিতে ভাবিতে সেই রৌদ্রে হরলাল রাস্তায় বেড়াইতে লাগিল। শেষে উপায় আছে কি না সে ভাবনা বন্ধ হইয়া গেল কিন্তু বিনা কারণে পথে ঘুরিয়া বেড়ান থামিল না। যে কলিকাতা হাজার হাজার লোকের আশ্রয় স্থান তাহাই এক মুহূর্ত্তে হরলালের পক্ষে একটা প্রকাণ্ড ফাঁস-কলের মত হইয়া উঠিল। ইহার কোনও দিকে বাহির হইবার কোনও পথ নাই। সমস্ত জনসমাজ এই অতি ক্ষুদ্র হরলালকে চারিদিকে আটক করিয়া দাঁড়াইয়াছে। কেহ তাহাকে জানেও না, এবং তাহার প্রতি কাহারও মনে কোন বিদ্বেষও নাই, কিন্তু প্রত্যেক লোকেই তাহার শত্রু। অথচ রাস্তার লোক তাহার গা ঘেঁষিয়া তাহার পাশ দিয়া চলিয়াছে; আপিসের বাবুরা বাহিরে আসিয়া ঠোঙায় করিয়া জল খাইতেছেন, তাহার দিকে কেহ তাকাইতেছেন না; ময়দানের ধারে অলস পথিক মাথার নীচে হাত রাখিয়া একটা পায়ের উপর আর একটা পা তুলিয়া গাছের তলায় পড়িয়া আছে; ঠিকাগাড়ি ভর্ত্তি করিয়া হিন্দুস্থানী মেয়েরা কালীঘাটে চলিয়াছে; একজন চাপরাসি একখানা চিঠি লইয়া হরলালের সম্মুখে ধরিয়া কহিল, বাবু ঠিকানা পড়িয়া দাও,—যেন তাহার সঙ্গে অন্য পথিকের কোন প্রভেদ নাই, সেও ঠিকানা পড়িয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিল।

ক্রমে আফিস বন্ধ হইবার সময় আসিল। বাড়িমুখো গাড়িগুলো আপিস মহলের নানা রাস্তা দিয়া ছুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। আপিসের বাবুরা ট্র্যাম ভর্ত্তি করিয়া থিয়েটারের বিজ্ঞাপন পড়িতে পড়িতে বাসায় ফিরিয়া চলিল। আজ হইতে হরলালের আপিস নাই, আপিসের ছুটি নাই, বাসায় ফিরিয়া যাইবার জন্য ট্র্যাম ধরিবার কোন তাড়া নাই। সহরের সমস্ত কাজকর্ম্ম, বাড়িঘর, গাড়িজুড়ি, আনাগোনা হরলালের কাছে কখনও বা অত্যন্ত উৎকট সত্যের মত দাঁত মেলিয়া উঠিতেছে কখন বা একবারে বস্তুহীন স্বপ্নের মত ছায়া হইয়া আসিতেছে। আহার নাই, বিশ্রাম নাই, আশ্রয় নাই, কেমন করিয়া যে হরলালের দিন কাটিয়া গেল তাহা সে জানিতেও পারিল না। রাস্তায় রাস্তায় গ্যাসের আলো জ্বলিল—যেন একটা সতর্ক অন্ধকার দিকে দিকে তাহার সহস্র ক্রূর চক্ষু মেলিয়া শিকারলুব্ধ দানবের মত চুপ করিয়া রহিল। রাত্রি কত হইল সে কথা হরলাল চিন্তাও করিল না। তাহার কপালের শিরা দব্ দব্ করিতেছে; মাথা যেন ফাটিয়া যাইতেছে; সমস্ত শরীরে আগুন জ্বলিতেছে; পা আর চলে না। সমস্ত দিন পর্য্যায়ক্রমে বেদনার উত্তেজনা ও অবসাদের অসাড়তার মধ্যে মার কথা কেবল মনের মধ্যে যাতায়াত করিয়াছে—কলিকাতার অসংখ্য জনশ্রেণীর মধ্যে কেবল ঐ একটি মাত্র নামই শুষ্ককণ্ঠ ভেদ করিয়া মুখে উঠিয়াছে—মা, মা, মা। আর কাহাকেও ডাকিবার নাই। মনে করিল, রাত্রি যখন নিবিড় হইয়া আসিবে, কোন লোকই যখন এই অতি সামান্য হরলালকে বিনা অপরাধে

অপমান করিবার জন্য জাগিয়া থাকিবে না, তখন সে চুপ করিয়া তাহার মায়ের কোলের কাছে গিয়া শুইয়া পড়িবে—তাহার পরে ঘুম যেন আর না ভাঙে! পাছে তার মার সম্মুখে পুলিসের লোক বা আর কেহ তাঁহাকে অপমান করিতে আসে এই ভয়ে সে বাসায় যাইতে পারিতেছিল না। শরীরের ভার যখন আর বহিতে পারে না এমন সময় হরলাল একটা ভাড়াটে গাড়ি দেখিয়া তাহাকে ডাকিল। গাড়োয়ান জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাইবে?"

হরলাল কহিল "কোথাও না। এই ময়দানের রাস্তায় খানিক-ক্ষণ হাওয়া খাইয়া বেড়াইব।"

গাড়োয়ান সন্দেহ করিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই হরলাল তাহার হাতে আগাম ভাড়া একটা টাকা দিল। সে গাড়ি তখন হরলালকে লইয়া ময়দানের রাস্তায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

তখন শ্রান্ত হরলাল তাহার তপ্ত মাথা খোলা জান্‌লার উপর রাখিয়া চোখ বুজিল। একটু একটু করিয়া তাহার সমস্ত বেদনা যেন দূর হইয়া আসিল। শরীর শীতল হইল। মনের মধ্যে একটি সুগভীর সুনিবিড় আনন্দপূর্ণ শান্তি ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। একটা যেন পরম পরিত্রাণ তাহাকে চারিদিক হইতে আলিঙ্গন করিয়া ধরিল। সে যে সমস্ত দিন মনে করিয়াছিল কোথাও তাহার কোনো পথ নাই, সহায় নাই, নিষ্কৃতি নাই, তাহার অপমানের শেষ নাই, দুঃখের অবধি নাই, সে কথাটা যেন

একমুহূর্তেই মিথ্যা হইয়া গেল। এখন মনে হইল, সে ত একটা ভয় মাত্র, সে ত সত্য নয়। যাহা তাহার জীবনকে লোহার মুঠিতে আঁটিয়া পিষিয়া ধরিয়াছিল, হরলাল তাহাকে আর কিছুমাত্র স্বীকার করিল না;—মুক্তি অনন্ত আকাশ পূর্ণ করিয়া আছে, শান্তির কোথাও সীমা নাই। এই অতি সামান্য হরলালকে বেদনার মধ্যে অপমানের মধ্যে অন্যায়ের মধ্যে বন্দী করিয়া রাখিতে পারে এমন শক্তি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোনো রাজা মহারাজারও নাই। যে আতঙ্কে সে আপানাকে আপনি বাঁধিয়াছিল তাহা সমস্তই খুলিয়া গেল। তখন হরলাল আপনার বন্ধনমুক্ত হৃদয়ের চারি দিকে অনন্ত আকাশের মধ্যে অনুভব করিতে লাগিল, যেন তাহার সেই দরিদ্র মা দেখিতে দেখিতে বাড়িতে বাড়িতে বিরাটরূপে সমস্ত অন্ধকার জুড়িয়া বসিতেছেন। তাঁহাকে কোথাও ধরিতেছে না। কলিকাতার রাস্তা-ঘাট বাড়ি-ঘর দোকান-বাজার একটু একটু করিয়া তাঁহার মধ্যে আচ্ছন্ন হইয়া লুপ্ত হইয়া যাইতেছে—বাতাস ভরিয়া গেল, আকাশ ভরিয়া উঠিল, একটি একটি করিয়া নক্ষত্র তাঁহার মধ্যে মিলাইয়া গেল,—হরলালের শরীর-মনের সমস্ত বেদনা, সমস্ত ভাবনা, সমস্ত চেতনা তাঁহার মধ্যে অল্প অল্প করিয়া নিঃশেষ হইয়া গেল,—ঐ গেল, তপ্ত বাষ্পের বুদ্বুদ একেবারে ফাটিয়া গেল—এখন আর অন্ধকারও নাই, আলোকও নাই, রহিল কেবল একটি প্রগাঢ় পরিপূর্ণতা।

গির্জ্জার ঘড়িতে একটা বাজিল। গাড়োয়ান অন্ধকার ময়দানের মধ্যে গাড়ি লইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে বিরক্ত হইয়া

কহিল—বাবু ঘোড়া ত আর চলিতে পারে না—কোথায় যাইতে হইবে বল!

কোনো উত্তর পাইল না। কোচ্‌বাক্স হইতে নামিয়া হর-লালকে নাড়া দিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল। উত্তর নাই। তখন ভয় পাইয়া গাড়োয়ান পরীক্ষা করিয়া দেখিল হরলালের শরীর আড়ষ্ট, তাহার নিশ্বাস বহিতেছে না।

"কোথায় যাইতে হইবে" হরলালের কাছ হইতে এই প্রশ্নের আর উত্তর পাওয়া গেল না।

গল্প চারিটি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মূল্য দশ আনা

প্রকাশক

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

আদিব্রাহ্মসমাজ

৫৫, আপার চিৎপুর রোড্, কলিকাতা

আদিব্রাহ্মসমাজ প্রেস্

৫৫, আপার চিৎপুর রোড্, কলিকাতা

শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত

সূচীপত্র।

রাসমণির ছেলে	...	...	...	১
পণরক্ষা	...	...	...	৫৫
দর্পহরণ	...	...	...	৮৬
মাল্যদান	...	...	...	১০১

এই চারিটি গল্পের মধ্যে দর্পহরণ ও মাল্যদান ১৩০৯ সালে লিখিত হইয়াছিল।

গল্প চারিটি।

রাসমণির ছেলে।

(১)

কালীপদর মা ছিলেন রাসমণি—কিন্তু তাঁহাকে দায়ে পড়িয়া বাপের পদ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। কারণ বাপ মা উভয়েই মা হইয়া উঠিলে ছেলের পক্ষে স্থবিধা হয় না। তাঁহার স্বামী ভবানীচরণ ছেলেকে একেবারেই শাসন করিতে পারেন না।

তিনি কেন এত বেশি আদর দেন তাহা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি যে উত্তর দিয়া থাকেন তাহা বুঝিতে হইলে পূর্ব্ব-ইতিহাস জানা চাই।

ব্যাপারখানা এই—শানিয়াড়ির বিখ্যাত বনিয়াদী ধনীর বংশে ভবানীচরণের জন্ম। ভবানীচরণের পিতা অভয়াচরণের প্রথম পক্ষের পুত্র শ্যামাচরণ। অধিক বয়সে স্ত্রী-বিয়োগের পর দ্বিতীয়বার যখন অভয়াচরণ বিবাহ করেন তখন তাঁহার শ্বশুর আলন্দি তালুকটি বিশেষ করিয়া তাঁহার কন্যার নামে লিখাইয়া লইয়াছিলেন। জামাতার বয়স হিসাব করিয়া তিনি মনে মনে ভাবিয়াছিলেন যে, কন্যার বৈধব্য যদি ঘটে তবে খাওয়াপরার জন্য যেন সপত্নীপুত্রের অধীন তাঁহাকে না হইতে হয়।

তিনি যাহা কল্পনা করিয়াছিলেন তাহার প্রথম অংশ ফলিতে বিলম্ব হইল না। তাঁহার দৌহিত্র ভবানীচরণের জন্মের অনতিকাল পরেই তাঁহার জামাতার মৃত্যু হইল। তাঁহার কন্যা নিজের বিশেষ সম্পত্তিটির অধিকার লাভ করিলেন ইহা স্বচক্ষে দেখিয়া তিনিও পরলোকযাত্রার সময় কন্যার ইহলোক সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া গেলেন।

শ্যামাচরণ তখন বয়ঃপ্রাপ্ত। এমন কি, তাঁহার বড় ছেলেটি তখনই ভবানীর চেয়ে এক বৎসরের বড়। শ্যামাচরণ নিজের ছেলেদের সঙ্গে একত্রেই ভবানীকে মানুষ করিতে লাগিলেন। ভবানীচরণের মাতার সম্পত্তি হইতে কখনো তিনি নিজে এক পয়সা লন নাই এবং বৎসরে বৎসরে তাহার পরিষ্কার হিসাবটি তিনি বিমাতার নিকট দাখিল করিয়া তাহার রসিদ লইয়াছেন, ইহা দেখিয়া সকলেই তাঁহার সাধুতায় মুগ্ধ হইয়াছে।

বস্তুতঃ প্রায় সকলেই মনে করিয়াছিল এতটা সাধুতা অনাবশ্যক, এমন কি ইহা নির্বুদ্ধিতারই নামান্তর। অখণ্ড পৈতৃক সম্পত্তির একটা অংশ দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর হাতে পড়ে ইহা গ্রামের লোকের কাহারো ভাল লাগে নাই। যদি শ্যামাচরণ ছল করিয়া এই দলিলটি কোনো কৌশলে বাতিল করিয়া দিতেন তবে প্রতিবেশীরা তাঁহার পৌরুষের প্রশংসাই করিত, এবং যে উপায়ে তাহা সুচারুরূপে সাধিত হইতে পারে তাহার পরামর্শদাতা প্রবীন ব্যক্তিরও অভাব ছিল না। কিন্তু শ্যামাচরণ তাঁহাদের চিরকালীন পারিবারিক স্বত্বকে অঙ্গহীন করিয়াও তাঁহার বিমাতার সম্পত্তিটিকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করিয়া রাখিলেন।

এই কারণে এবং স্বভাবসিদ্ধ স্নেহশীলতাবশত বিমাতা ব্রজসুন্দরী শ্যামাচরণকে আপনার পুত্রের মতই স্নেহ এবং বিশ্বাস করিতেন। এবং

তাঁহার সম্পত্তিটিকে শ্যামাচরণ অত্যন্ত পৃথক্ করিয়া দেখিতেন বলিয়া তিনি অনেকবার তাহাকে ভৎর্সনা করিয়াছেন ;—বলিয়াছেন, বাবা, এ সম্পত্তি সঙ্গে লইয়া আমি ত স্বর্গে যাইব না, এ তোমাদেরই থাকিবে ; আমার এত হিসাবপত্র দেখিবার দরকার কি।—শ্যামাচরণ সে কথায় কর্ণপাত করিতেন না।

শ্যামাচরণ নিজের ছেলেদের কঠোর শাসনে রাখিতেন। কিন্তু ভবানীচরণের পরে তাঁহার কোনো শাসনই ছিল না। ইহা দেখিয়া সকলেই একবাক্যে বলিত নিজের ছেলেদের চেয়ে ভবানীর প্রতিই তাঁহার বেশি স্নেহ। এমনি করিয়া ভবানীর পড়াশুনা কিছুই হইল না। এবং বিষয়বুদ্ধিসম্বন্ধে চিরদিন শিশুর মত থাকিয়া দাদার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া তিনি বয়স কাটাইতে লাগিলেন। বিষয়কর্ম্মে তাঁহাকে কোনোদিন চিন্তা করিতে হইত না—কেবল মাঝে মাঝে এক একদিন সই করিতে হইত। কেন সই করিতেছেন তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিতেন না, কারণ, চেষ্টা করিলে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না।

এদিকে শ্যামাচরণের বড় ছেলে তারাপদ সকল কাজে পিতার সহকারীরূপে থাকিয়া কাজে কর্ম্মে পাকা হইয়া উঠিল। শ্যামাচরণের মৃত্যু হইলে পর তারাপদ ভবানীচরণকে কহিল, খুড়ামহাশয়, আমাদের আর একত্র থাকা চলিবে না। কি জানি কোন্‌দিন সামান্য কারণে মনান্তর ঘটিতে পারে তখন সংসার ছারখার হইয়া যাইবে।

পৃথক হইয়া কোনোদিন নিজের বিষয় নিজেকে দেখিতে হইবে এ কথা ভবানী স্বপ্নেও কল্পনা করেন নাই। যে সংসারে শিশুকাল হইতে তিনি মানুষ হইয়াছেন সেটাকে তিনি সম্পূর্ণ অখণ্ড বলিয়াই জানিতেন—তাহার যে কোন একটা জায়গায় জোড় আছে, এবং

জোড়ের মুখে তাহাকে দুইখানা করা যায় সহসা সে সংবাদ পাইয়া তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।

বংশের সম্মানহানি এবং আত্মীয়দের মনোবেদনায় তারাপদকে যখন কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারিল না তখন কেমন করিয়া বিষয় বিভাগ হইতে পারে সেই অসাধ্য চিন্তায় ভবানীকে প্রবৃত্ত হইতে হইল। তারাপদ তাঁহার চিন্তা দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া কহিল খুড়ামহাশয় কাণ্ড কি! আপনি এত ভাবিতেছেন কেন? বিষয় ভাগ ত হইয়াই আছে। ঠাকুরদাদা বাঁচিয়া থাকিতেই ত ভাগ করিয়া দিয়া গেছেন।

ভবানী হতবুদ্ধি হইয়া কহিলেন—সত্য না কি! আমি ত তাহার কিছুই জানি না।

তারাপদ কহিলেন, বিলক্ষণ! জানেন না ত কি? দেশসুদ্ধ লোক জানে পাছে আপনাদের সঙ্গে আমাদের কোনো বিবাদ ঘটে এইজন্ম আলন্দি তালুক আপনাদের অংশে লিখিয়া দিয়া ঠাকুরদাদা প্রথম হইতেই আপনাদিগকে পৃথক করিয়া দিয়াছেন—সেই ভাবেই ত এ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে।

ভবানীচরণ ভাবিলেন, সকলই সম্ভব। জিজ্ঞাসা করিলেন, এই বাড়ি?

তারাপদ কহিলেন, ইচ্ছা করেন ত বাড়ি আপনারাই রাখিতে পারেন। সদর মহকুমায় যে কুঠি আছে সেইটে পাইলেই আমাদের কোনোরকম করিয়া চলিয়া যাইবে।

তারাপদ এত অনায়াসে পৈতৃক বাড়ি ছাড়িতে প্রস্তুত হইল দেখিয়া তাহার ঔদার্য্যে তিনি বিস্মিত হইয়া গেলেন। তাঁহাদের সদর মহকুমার বাড়ি তিনি কোনোদিন দেখেন নাই এবং তাহার প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র মমতা ছিল না।

ভবানী যখন তাঁহার মাতা ব্রজসুন্দরীকে সকল বৃত্তান্ত জানাইলেন—তিনি কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন ওমা, সে কি কথা! আলন্দি তালুক ত আমার খোরপোষের জন্য আমি স্ত্রীধনস্বরূপে পাইয়াছিলাম—তাহার আয়ও ত তেমন বেশী নয়। পৈতৃক সম্পত্তিতে তোমার যে অংশ সে তুমি পাইবে না কেন?

ভবানী কহিলেন, তারাপদ বলে পিতা আমাদিগকে ঐ তালুক ছাড়া আর কিছু দেন নাই।

ব্রজসুন্দরী কহিলেন, সে কথা বলিলে আমি শুনিব কেন? কর্ত্তা নিজের হাতে তাঁহার উইল দুই প্রস্থ লিখিয়াছিলেন—তাহার এক প্রস্থ আমার কাছে রাখিয়াছেন; সে আমার সিন্ধুকে আছে।

সিন্ধুক খোলা হইল। সেখানে আলন্দি তালুকের দানপত্র আছে কিন্তু উইল নাই। উইল চুরি গিয়াছে।

পরামর্শদাতাকে ডাকা হইল। লোকটি তাঁহাদের গুরুঠাকুরের ছেলে। নাম বগলাচরণ। সকলে বলে তাহার ভারি পাকা বুদ্ধি। তাহার বাপ গ্রামের মন্ত্রদাতা, আর ছেলেটি মন্ত্রণাদাতা। পিতাপুত্রে গ্রামের পরকাল ইহকাল ভাগাভাগি করিয়া লইয়াছে। অন্যের পক্ষে তাহার ফলাফল যেমনই হউক্ তাহাদের নিজেদের পক্ষে কোনো অসুবিধা ঘটে নাই।

বগলাচরণ কহিল, উইল নাই পাওয়া গেল। পিতার সম্পত্তিতে দুই ভায়ের ত সমান অংশ থাকিবেই।

এমন সময় অপর পক্ষ হইতে একটা উইল বাহির হইল। তাহাতে ভবানীচরণের অংশে কিছুই লেখে না। সমস্ত সম্পত্তি পৌত্রদিগকে দেওয়া হইয়াছে। তখন অভয়াচরণের পুত্র জন্মে নাই।

বগলাকে কাণ্ডারী করিয়া ভবানী মকদ্দমার সমুদ্রে পাড়ি দিলেন।

বন্দরে আসিয়া লোহার সিন্দুকটি যখন পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন তখন দেখিতে পাইলেন, লক্ষ্মীপেঁচার বাসাটি একেবারে শূন্য—সামান্য দুটো একটা সোনার পালক খসিয়া পড়িয়া আছে। পৈতৃক সম্পত্তি অপর পক্ষের হাতে গেল। আর আলন্দি তালুকের যে ডগাটুকু মকদ্দমা খরচার বিনাশতল হইতে জাগিয়া রহিল কোনোমতে তাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকা চলে মাত্র কিন্তু বংশমর্য্যাদা রক্ষা করা চলে না। পুরাতন বাড়িটা ভবানীচরণ পাইয়া মনে করিলেন ভারি জিতিয়াছি। তারাপদর দল সদরে চলিয়া গেল। উভয়পক্ষের মধ্যে আর দেখাসাক্ষাৎ রহিল না।

(২)

শ্যামাচরণের বিশ্বাসঘাতকতা ব্রজসুন্দরীকে শেলের মত বাজিল। শ্যামাচরণ অন্যায় করিয়া কর্ত্তার উইল চুরি করিয়া ভাইকে বঞ্চিত করিল এবং পিতার বিশ্বাসভঙ্গ করিল ইহা তিনি কোনোমতেই ভুলিতে পারিলেন না। তিনি যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন প্রতিদিনই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বার বার করিয়া বলিতেন ধর্ম্মে ইহা কখনই সহিবে না। ভবানীচরণকে প্রায়ই প্রতিদিন তিনি এই বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন যে, আমি আইন আদালত কিছুই বুঝি না, আমি তোমাকে বলিতেছি, কর্ত্তার সে উইল কখনই চিরদিন চাপা থাকিবে না। সে তুমি নিশ্চয়ই ফিরিয়া পাইবে।

বরাবর মাতার কাছে এই কথা শুনিয়া ভবানীচরণ মনে অত্যন্ত একটা ভরসা পাইলেন। তিনি নিজে অক্ষম বলিয়া এইরূপ আশ্বাস-বাক্য তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত সান্ত্বনার জিনিষ। সতী সাধ্বীর বাক্য ফলিবেই, যাহা তাঁহারই তাহা আপনিই তাঁহার কাছে ফিরিয়া আসিবে এ কথা তিনি নিশ্চয় স্থির করিয়া বসিয়া রহিলেন। মাতার

মৃত্যুর পরে এ বিশ্বাস তাঁহার আরো দৃঢ় হইয়া উঠিল—কারণ মৃত্যুর বিচ্ছেদের মধ্য দিয়া মাতার পুণ্যতেজ তাঁহার কাছে আরো অনেক বড় করিয়া প্রতিভাত হইল। দারিদ্র্যের সমস্ত অভাবপীড়ন যেন তাঁহার গায়েই বাজিত না। মনে হইত, এই যে অন্নবস্ত্রের কষ্ট, এই যে পূর্ব্বেকার চালচলনের ব্যত্যয়, এ যেন দুদিনের একটা অভিনয়-মাত্র—এ কিছুই সত্য নহে। এইজন্য সাবেক ঢাকাই ধুতি ছিঁড়িয়া গেলে যখন কম দামের মোটা ধুতি তাঁহাকে কিনিয়া পরিতে হইল তখন তাঁহার হাসি পাইল। পূজার সময় সাবেককালের ধুমধাম চলিল না, নমোনম করিয়া কাজ সারিতে হইল; অভ্যাগতজন এই দরিদ্র আয়োজন দেখিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সাবেক কালের কথা পাড়িল। ভবানীচরণ মনে মনে হাসিলেন, তিনি ভাবিলেন ইহারা জানে না এ সমস্তই কেবল কিছুদিনের জন্য—তাহার পর এমন ধুম করিয়া একদিন পূজা হইবে যে ইহাদের চক্ষু স্থির হইয়া যাইবে। সেই ভবিষ্যতের নিশ্চিত সমারোহ তিনি এমনি প্রত্যক্ষের মত দেখিতে পাইতেন যে, বর্ত্তমান দৈন্য তাঁহার চোখেই পড়িত না।

এ সম্বন্ধে তাঁহার আলোচনা করিবার প্রধান মানুষটি ছিল নোটো চাকর। কত বার পূজোৎসবের দারিদ্র্যের মাঝখানে বসিয়া প্রভু ভৃত্যে, ভাবী সুদিনে কিরূপ আয়োজন করিতে হইবে তাহারই বিস্তারিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এমন কি, কাহাকে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে, না হইবে, এবং কলিকাতা হইতে যাত্রার দল আনিবার প্রয়োজন আছে কি না তাহা লইয়া উভয় পক্ষে ঘোরতর মতান্তর ও তর্কবিতর্ক হইয়া গিয়াছে। স্বভাবসিদ্ধ অনৌদার্য্যবশত নটবিহারী সেই ভাবীকালের ফর্দ্দ-রচনায় কৃপণতা প্রকাশ করায়

ভবানীচরণের নিকট হইতে তীব্র ভৎর্সনা লাভ করিয়াছে এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটিত।

মোটের উপরে বিষয়সম্পত্তি সম্বন্ধে ভবানীচরণের মনে কোনো প্রকার দুশ্চিন্তা ছিল না। কেবল তাঁহার একটিমাত্র উদ্বেগের কারণ ছিল, কে তাঁহার বিষয় ভোগ করিবে। আজ পর্য্যন্ত তাঁহার সন্তান হইল না। কন্যাদায়গ্রস্ত হিতৈষীরা যখন তাঁহাকে আর একটি বিবাহ করিতে অনুরোধ করিত তখন তাঁহার মন এক একবার চঞ্চল হইত;—তাহার কারণ এ নয় যে নববধূ সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ সখ ছিল—বরঞ্চ সেবক ও অন্নের ন্যায় স্ত্রীকেও পুরাতনভাবেই তিনি প্রশস্ত বলিয়া গণ্য করিতেন—কিন্তু যাহার ঐশ্বর্য্যসম্ভাবনা আছে তাহার সন্তানসম্ভাবনা না থাকা বিষম বিড়ম্বনা বলিয়াই তিনি জানিতেন।

এমন সময় যখন তাঁহার পুত্র জন্মিল তখন সকলেই বলিল, এইবার এই ঘরের ভাগ্য ফিরিবে তাহার সূত্রপাত হইয়াছে। স্বয়ং স্বর্গীয় কর্ত্তা অভয়াচরণ আবার এ ঘরে জন্মিয়াছেন, ঠিক সেই রকমেরই টানা চোখ। ছেলের কোষ্ঠিতেও দেখা গেল, গ্রহে নক্ষত্রে এমনি ভাবে যোগাযোগ ঘটিয়াছে যে হৃতসম্পত্তি উদ্ধার না হইয়া যায় না।

ছেলে হওয়ার পর হইতে ভবানীচরণের ব্যবহারে কিছু পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা গেল। এতদিন পর্য্যন্ত দারিদ্র্যকে তিনি নিতান্তই একটা খেলার মত সকৌতুকে অতি অনায়াসেই বহন করিয়াছিলেন কিন্তু ছেলের সম্বন্ধে সে ভাবটি তিনি রক্ষা করিতে পারিলেন না। শানিয়াড়ির বিখ্যাত চৌধুরীদের ঘরে নির্ব্বাণপ্রায় কুলপ্রদীপকে উজ্জ্বল করিবার জন্য সমস্ত গ্রহনক্ষত্রের আকাশব্যাপী আনুকূল্যের ফলে যে শিশু ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছে তাহার প্রতি ত একটা কর্ত্তব্য আছে!

আজ পর্য্যন্ত ধারাবাহিক কাল ধরিয়া এই পরিবারে পুত্রসন্তানমাত্রই আজন্মকাল যে সমাদর লাভ করিয়াছে ভবানীচরণের জ্যেষ্ঠ পুত্রই প্রথম তাহা হইতে বঞ্চিত হইল এ বেদনা তিনি ভুলিতে পারিলেন না। এ বংশের চিরপ্রাপ্য আমি যাহা পাইয়াছি আমার পুত্রকে তাহা দিতে পারিলাম না তাহা স্মরণ করিয়া তাঁহার মনে হইতে লাগিল আমিই ইহাকে ঠকাইলাম। তাই কালীপদর জন্য অর্থব্যয় যাহা করিতে পারিলেন না প্রচুর আদর দিয়া তাহা পূরণ করিবার চেষ্টা করিলেন।

ভবানীচরণের স্ত্রী রাসমণি ছিলেন অন্য ধরণের মানুষ। তিনি শানিয়াড়ির চৌধুরীদের বংশগৌরব সম্বন্ধে কোনো দিন উদ্বেগ অনুভব করেন নাই। ভবানী তাহা জানিতেন এবং ইহা লইয়া মনে মনে তিনি হাসিতেন—ভাবিতেন, যেরূপ সামান্য দরিদ্র বৈষ্ণব বংশে স্ত্রীর জন্ম তাহাতে তাহার এ ত্রুটি ক্ষমা করাই উচিত—চৌধুরীদের মানমর্য্যাদা সম্বন্ধে ঠিক মত ধারণা করাই তাঁহার পক্ষে অসম্ভব।

রাসমণি নিজেই তাহা স্বীকার করিতেন—বলিতেন, আমি গরীবের মেয়ে মানসম্ভ্রমের ধার ধারি না, কালীপদ আমার বাঁচিয়া থাক্ সেই আমার সকলের চেয়ে বড় ঐশ্বর্য্য।—উইল আবার পাওয়া যাইবে এবং কালীপদর কল্যাণে এ বংশে লুপ্ত সম্পদের শূন্য নদীপথে আবার বান ডাকিবে এ সব কথায় তিনি একেবারে কানই দিতেন না। এমন মানুষই ছিল না যাহার সঙ্গে তাঁহার স্বামী হারানো উইল লইয়া আলোচনা না করিতেন। কেবল সকলের চেয়ে বড় এই মনের কথাটি তাঁহার স্ত্রীর সঙ্গে হইত না। দুই একবার তাঁহার সঙ্গে আলোচনার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু কোন রস পাইলেন না। অতীত মহিমা এবং ভাবী মহিমা এই দুইয়ের প্রতিই তাঁহার স্ত্রী মনোযোগ-

মাত্র করিতেন না, উপস্থিত প্রয়োজনই তাঁহার সমস্ত চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছিল।

সে প্রয়োজনও বড় অল্প ছিল না। অনেক চেষ্টায় সংসার চালাইতে হইত। কেননা, লক্ষ্মী চলিয়া গেলেও তাহার বোঝা কিছু-কিছু পশ্চাতে ফেলিয়া যান, তখন উপায় থাকে না বটে কিন্তু অপায় থাকিয়া যায়। এ পরিবারে আশ্রয় প্রায় ভাঙিয়া গিয়াছে কিন্তু আশ্রিতের দল এখনও তাঁহাদিগকে ছুটি দিতে চায় না। ভবানী-চরণও তেমন লোক নহেন যে, অভাবের ভয়ে কাহাকেও বিদায় করিয়া দিবেন।

এই ভারগ্রস্ত ভাঙা সংসারটিকে চালাইবার ভার রাসমণির উপরে। কাহারো কাছে তিনি বিশেষ কিছু সাহায্যও পান না। কারণ এ সংসারে সচ্ছল অবস্থার দিনে আশ্রিতেরা সকলেই আরামে ও আল-স্যেই দিন কাটাইয়াছে। চৌধুরীবংশের মহাবৃক্ষের তলে ইহাদের সুখশয্যার উপরে ছায়া আপনিই আসিয়া বিস্তীর্ণ হইয়াছে এবং ইহাদের মুখের কাছে পাকাফল আপনিই আসিয়া পড়িয়াছে—সেজন্য ইহাদের কাহাকেও কিছুমাত্র চেষ্টা করিতে হয় নাই। আজ ইহাদিগকে কোনো প্রকার কাজ করিতে বলিলে ইহারা ভারি অপমান বোধ করে—এবং রান্নাঘরের ধোঁয়া লাগিলেই ইহাদের মাথা ধরে, আর হাঁটাহাঁটি করিতে গেলেই কোথা হইতে এমন পোড়া বাতের ব্যামো আসিয়া অভিভূত করিয়া তোলে যে কবিরাজের বহুমূল্য তৈলেও রোগ উপশম হইতে চায় না। তা ছাড়া ভবানীচরণ বলিয়া থাকেন আশ্রয়ের পরিবর্তে যদি আশ্রিতের কাছ হইতে কাজ আদায় করা হয় তবে সে ত চাকরি করাইয়া লওয়া—তাহাতে আশ্রয়দানের মূল্যই চলিয়া যায়—চৌধুরীদের ঘরে এমন নিয়মই নহে।

অতএব সমস্ত দায় রাসমণিরই উপর। দিনরাত্রি নানা কৌশলে ও পরিশ্রমে এই পরিবারের সমস্ত অভাব তাঁহাকে গোপনে মিটাইয়া চলিতে হয়। এমন করিয়া দিনরাত্রি দৈন্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া টানাটানি করিয়া দরদস্তুর করিয়া চলিতে থাকিলে মানুষকে বড় কঠিন করিয়া তুলে—তাহার কমনীয়তা চলিয়া যায়। যাহাদের জন্য সে পদে পদে খাটিয়া মরে, তাহারাই তাহাকে সহ্য করিতে পারে না। রাসমণি যে কেবল পাকশালায় অন্ন পাক করেন তাহা নহে অন্নের সংস্থানভারও অনেকটা তাঁহার উপর—অথচ সেই অন্ন সেবন করিয়া মধ্যাহ্নে যাঁহারা নিদ্রা দেন তাঁহারা প্রতিদিন সেই অন্নেরও নিন্দা করেন অন্নদাতারও সুখ্যাতি করেন না।

কেবল ঘরের কাজ নহে—তালুক ব্রহ্মত্র অল্পস্বল্প যা কিছু এখনো বাকি আছে তাহার হিসাবপত্র দেখা, খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা করা সমস্ত রাসমণিকে করিতে হয়। তহশিল প্রভৃতি সম্বন্ধে পূর্ব্বে এত কষাকষি কোনো দিন ছিল না—ভবানীচরণের টাকা অভিমন্যুর ঠিক উল্টা, সে বাহির হইতেই জানে, প্রবেশ করিবার বিদ্যা তাহার জানা নাই। কোনো দিন টাকার জন্য কাহাকেও তাগিদ করিতে তিনি একেবারেই অক্ষম। রাসমণি নিজের প্রাপ্য সম্বন্ধে কাহাকেও সিকি পয়সা রেয়াৎ করেন না। ইহাতে প্রজারা তাঁহাকে নিন্দা করে, গোমস্তাগুলো পর্য্যন্ত তাঁহার সতর্কতার জ্বালায় অস্থির হইয়া তাঁহার বংশোচিত ক্ষুদ্রাশয়তার উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে গালি দিতে ছাড়ে না। এমন কি, তাঁহার স্বামীও তাঁহার কৃপণতা ও তাঁহার কর্কশতাকে তাঁহাদের বিশ্ববিখ্যাত পরিবারের পক্ষে মানহানিজনক বলিয়া কখন কখন মৃদুস্বরে আপত্তি করিয়া থাকেন। এ সমস্ত নিন্দা ও ভর্ৎসনা তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া নিজের নিয়মে কাজ করিয়া চলেন, দোষ

সমস্তই নিজের ঘাড়ে লন;—তিনি গরীবের ঘরের মেয়ে, তিনি বড়মানুষিআনার কিছুই বোঝেন না এই কথা বারবার স্বীকার করিয়া ঘরে বাহিরে সকল লোকের কাছে অপ্রিয় হইয়া, আঁচলের প্রান্তটা কষিয়া কোমরে জড়াইয়া,—ঝড়ের বেগে কাজ করিতে থাকেন; কেহ তাঁহাকে বাধা দিতে সাহস করে না।

স্বামীকে কোনো দিন তিনি কোনো কাজে ডাকা দূরে থাক্—তাঁহার মনে মনে এই ভয় সর্ব্বদা ছিল পাছে ভবানীচরণ সহসা কর্ত্তৃত্ব করিয়া কোনো কাজে হস্তক্ষেপ করিয়া বসেন। তোমাকে কিছুই ভাবিতে হইবে না, এ সব কিছুতে তোমার থাকার প্রয়োজন নাই এই বলিয়া সকল বিষয়েই স্বামীকে নিরুদ্যম করিয়া রাখাই তাঁহার একটা প্রধান চেষ্টা ছিল। স্বামীরও আজন্মকাল সেটা সুন্দররূপে অভ্যস্ত থাকাতে সে বিষয়ে স্ত্রীকে অধিক দুঃখ পাইতে হয় নাই। রাসমণির অনেক বয়স পর্য্যন্ত সন্তান হয় নাই;—এই তাঁহার অকর্ম্মণ্য সরল-প্রকৃতি পরমুখাপেক্ষী স্বামীটিকে লইয়া তাঁহার পত্নীপ্রেম ও মাতৃস্নেহ দুই মিটিয়াছিল। ভবানীকে তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত বালক বলিয়াই দেখিতেন। কাজেই শাশুড়ির মৃত্যুর পর হইতে বাড়ির কর্ত্তা এবং গৃহিণী উভয়েরই কাজ তাঁহাকে একলাই সম্পন্ন করিতে হইত। গুরুঠাকুরের ছেলে এবং অন্যান্য বিপদ হইতে স্বামীকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি এমনি কঠোরভাবে চলিতেন যে, তাঁহার স্বামীর সঙ্গীরা তাঁহাকে ভারি ভয় করিত। প্রখরতা গোপন করিয়া রাখিবেন, স্পষ্ট কথাগুলার ধারটুকু একটু নরম করিয়া দিবেন এবং পুরুষমণ্ডলীর সঙ্গে যথোচিত সঙ্কোচ রক্ষা করিয়া চলিবেন সেই নারীজনোচিত সুযোগ তাঁহার ঘটিল না।

এপর্য্যন্ত ভবানীচরণ তাঁহার বাধ্যভাবেই চলিতেছিলেন। কিন্তু

কালীপদর সম্বন্ধে রাসমণিকে মানিয়া চলা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল।

তাহার কারণ এই, রাসমণি ভবানীর পুত্রটিকে ভবানীচরণের নজরে দেখিতেন না। তাঁহার স্বামীর সম্বন্ধে তিনি ভাবিতেন, বেচারা করিবে কি, উহার দোষ কি, ও বড়মানুষের ঘরে জন্মিয়াছে—ওর ত উপায় নাই! এই জন্য তাঁহার স্বামী যে কোনোরূপ কষ্ট স্বীকার করিবেন ইহা তিনি আশাই করিতে পারিতেন না। তাই সহস্র অভাবসত্ত্বেও প্রাণপণ শক্তিতে তিনি স্বামীর সমস্ত অভ্যস্ত প্রয়োজন যথাসম্ভব জোগাইয়া দিতেন। তাঁহার ঘরে, বাহিরের লোকের সম্বন্ধে হিসাব খুবই কষা ছিল কিন্তু ভবানীচরণের আহারে ব্যবহারে পারৎপক্ষে সাবেক নিয়মের কিছুমাত্র ব্যত্যয় হইতে পারিত না। নিতান্ত টানাটানির দিনে যদি কোনো বিষয়ে কিছু ত্রুটি ঘটিত তবে সেটা যে অভাববশত ঘটিয়াছে সে কথা তিনি কোনোমতেই স্বামীকে জানিতে দিতেন না—হয় ত বলিতেন, ঐ রে, হতভাগা কুকুর খাবারে মুখ দিয়া সমস্ত নষ্ট করিয়া দিয়াছে! বলিয়া নিজের কল্পিত অসতর্কতাকে ধিক্কার দিতেন। নয় ত লক্ষ্মীছাড়া নোটোর দোষেই নূতন কেনা কাপড়টা খোওয়া গিয়াছে বলিয়া তাহার বুদ্ধির প্রতি প্রচুর অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেন,—ভবানীচরণ তখন তাঁহার প্রিয় ভৃত্যটির পক্ষাবলম্বন করিয়া গৃহিণীর ক্রোধ হইতে তাহাকে বাঁচাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিতেন। এমন কি, কখনো এমনও ঘটিয়াছে, যে কাপড় গৃহিণী কেনেন নাই, এবং ভবানীচরণ চক্ষেও দেখেন নাই এবং যে কাল্পনিক কাপড়খানা হারাইয়া ফেলিয়াছে বলিয়া নটবিহারী অভিযুক্ত—ভবানীচরণ অম্লান মুখে স্বীকার করিয়াছেন যে সেই কাপড় নোটো তাঁহাকে কোঁচাইয়া দিয়াছে, তিনি তাহা পরিয়াছেন, এবং

তাহার পর—তাহার পর কি হইল সেটা হঠাৎ তাঁহার কল্পনাশক্তিতে জোগাইয়া উঠে নাই—রাসমণি নিজেই সেটুকু পূরণ করিয়া বলিয়াছেন—নিশ্চয়ই তুমি তোমার বাহিরের বৈঠকখানার ঘরে ছাড়িয়া রাখিয়াছিলে—সেখানে যে খুসি আসে যায়—কে চুরি করিয়া লইয়াছে।

ভবানীচরণের সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থা। কিন্তু নিজের ছেলেকে তিনি কোনো অংশেই স্বামীর সমকক্ষ বলিয়া গণ্য করিতেন না। সে ত তাঁহারই গর্ভের সন্তান—তাহার আবার কিসের বাবুয়ানা! সে শক্তসমর্থ কাজের লোক—অনায়াসে দুঃখ সহিবে এবং খাটিয়া খাইবে। তাহার এটা নহিলে চলে না ওটা নহিলে অপমান বোধ হয় এমন কথা কোনোমতেই শোভা পাইবে না। কালীপদ সম্বন্ধে রাসমণি খাওয়া পরায় খুব মোটা রকমই বরাদ্দ করিয়া দিলেন। মুড়িগুড় দিয়াই তাহার জলখাবার সারিলেন এবং মাথা কান ঢাকিয়া দোলাই পরাইয়া তাহার শীত নিবারণের ব্যবস্থা করিলেন। গুরুমশায়কে স্বয়ং ডাকিয়া বলিয়া দিলেন ছেলে যেন পড়াশুনায় কিছুমাত্র শৈথিল্য করিতে না পারে, তাহাকে যেন বিশেষরূপ শাসনে সংযত রাখিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়।

এইখানে বড় মুস্কিল বাধিল। নিরীহস্বভাব ভবানীচরণ মাঝে মাঝে বিদ্রোহের লক্ষণ প্রকাশ করিতে লাগিলেন কিন্তু রাসমণি যেন তাহা দেখিয়াও দেখিতে পাইলেন না। ভবানী প্রবলপক্ষের কাছে চিরদিনই হার মানিয়াছেন এবারেও তাঁহাকে অগত্যা হার মানিতে হইল, কিন্তু মন হইতে তাঁহার বিরুদ্ধতা ঘুচিল না। এ ঘরের ছেলে দোলাই মুড়ি দিয়া গুড়মুড়ি খায় এমন বিসদৃশ দৃশ্য দিনের পর দিন কি দেখা যায়!

পূজার সময় তাঁহার মনে পড়ে কর্ত্তাদের আমলে নূতন সাজসজ্জা পরিয়া তাঁহারা কিরূপ উৎসাহ বোধ করিয়াছেন। পূজার দিনে

রাসমণি কালীপদর জন্য যে সস্তা কাপড় জামার ব্যবস্থা করিয়াছেন সাবেক কালে তাঁহাদের বাড়ির ভৃত্যেরাও তাহাতে আপত্তি করিত। রাসমণি স্বামীকে অনেক করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, কালীপদকে যাহা দেওয়া যায় তাহাতেই সে খুসি হয়, সে ত সাবেক দস্তরের কথা কিছু জানে না—তুমি কেন মিছামিছি মন ভার করিয়া থাক? কিন্তু ভবানীচরণ কিছুতেই ভুলিতে পারেন না যে, বেচারা কালীপদ আপন বংশের গৌরব জানে না বলিয়া তাহাকে ঠকানো হইতেছে। বস্তুত সামান্য উপহার পাইয়া সে যখন গর্ব্বে ও আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে তাঁহাকে ছুটিয়া দেখাইতে আসে তখন তাহাতেই ভবানীচরণকে যেন আরো আঘাত করিতে থাকে। তিনি সে কিছুতেই দেখিতে পারেন না। তাঁহাকে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইতে হয়।

ভবানীচরণের মকদ্দমা চালাইবার পর হইতে তাঁহাদের গুরুঠাকুরের ঘরে বেশ কিঞ্চিৎ অর্থ সমাগম হইয়াছে। তাহাতেই সন্তুষ্ট না থাকিয়া গুরুপুত্রটি প্রতি বৎসর পূজার কিছু পূর্ব্বে কলিকাতা হইতে নানাপ্রকার চোখ-ভোলানো সস্তা সৌখীন জিনিষ আনাইয়া কয়েক-মাসের জন্য ব্যবসা চালাইয়া থাকেন। অদৃশ্য কালী, ছিপ-ছড়ি-ছাতার একত্র সমবায়, ছবি-আঁকা চিঠির কাগজ, নিলামে কেনা নানা রঙের রেসম ও সাটিনের থান, কবিতা-লেখা পাড়ওয়ালা সাড়ি প্রভৃতি লইয়া তিনি গ্রামের নরনারীর মন উতলা করিয়া দেন। কলিকাতার বাবুমহলে আজকাল এই সমস্ত উপকরণ না হইলে ভদ্রতা রক্ষা হয় না শুনিয়া গ্রামের উচ্চাভিলাষী ব্যক্তিমাত্রই আপনার গ্রাম্যতা ঘুচাই-বার জন্য সাধ্যাতিরিক্ত ব্যয় করিতে ছাড়েন না।

একবার বগলাচরণ একটা অত্যাশ্চর্য্য মেমের মূর্ত্তি আনিয়াছিলেন।

তার কোন্ একজায়গায় দম দিলে মেম চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রবল বেগে নিজেকে পাখা করিতে থাকে।

এই বীজনপরায়ণ গ্রীষ্মকাতর মেমমূর্ত্তিটির প্রতি কালীপদর অত্যন্ত লোভ জন্মিল। কালীপদ তাহার মাকে বেশ চেনে এই জন্য মার কাছে কিছু না বলিয়া ভবানীচরণের কাছে করুণকণ্ঠে আবেদন উপস্থিত করিল। ভবানীচরণ তখনই উদারভাবে তাহাকে আশ্বস্ত করিলেন কিন্তু তাহার দাম শুনিয়া তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল।

টাকাকড়ি আদায়ও করেন রাসমণি, তহবিলও তাঁহার কাছে, খরচও তাঁহার হাত দিয়াই হয়। ভবানীচরণ ভিখারীর মত তাঁহার অন্নপূর্ণার দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রথমে বিস্তর অপ্রাসঙ্গিক কথা আলোচনা করিয়া অবশেষে এক সময়ে ধাঁ করিয়া আপনার মনের ইচ্ছাটা বলিয়া ফেলিলেন। রাসমণি অত্যন্ত সংক্ষেপে বলিলেন—পাগল হইয়াছ!

ভবানীচরণ চুপ করিয়া খানিকক্ষণ ভাবিতে লাগিলেন। তাহার পরে হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, অচ্ছা দেখ, ভাতের সঙ্গে তুমি যে রোজ আমাকে ঘি আর পায়স দাও সেটার ত প্রয়োজন নাই।

রাসমণি বলিলেন, প্রয়োজন নাই ত কি ?

ভবানীচরণ কহিলেন, কবিরাজ বলে উহাতে পিত্ত বৃদ্ধি হয়।

রাসমণি তীক্ষ্ণভাবে মাথা নাড়িয়া কহিলেন, তোমার কবিরাজ ত সব জানে!

ভবানীচরণ কহিলেন—আমি ত বলি রাত্রে আমার লুচি বন্ধ করিয়া ভতের ব্যবস্থা করিয়া দিলে ভাল হয়। উহাতে পেট ভার করে।

রাসমণি কহিলেন, পেটভার করিয়া আজ পর্য্যন্ত তোমার ত

কোনো অনিষ্ট হইতে দেখিলাম না। জন্মকাল হইতে লুচি খাইয়াই ত তুমি মানুষ!

ভবানীচরণ সর্ব্বপ্রকার ত্যাগস্বীকার করিতেই প্রস্তুত—কিন্তু সেদিকে ভারি কড়াকড়। ঘিয়ের দর বাড়িতেছে তবু লুচির সংখ্যা ঠিক সমানই আছে। মধ্যাহ্ন ভোজনে পায়সটা যখন আছেই তখন দইটা না দিলে কোনো ক্ষতিই হয় না—কিন্তু বাহুল্য হইলেও এ বাড়িতে বাবুরা বরাবর দই পায়স খাইয়া আসিয়াছেন। কোনো-দিন ভবানীচরণের ভোগে সেই চিরন্তন দধির অনটন দেখিলে রাসমণি কিছুতেই তাহা সহ্য করিতে পারেন না। অতএব গায়ে-হাওয়া-লাগানো সেই মেমমূর্ত্তিটি ভবানীচরণের দই-পায়স-ঘি-লুচির কোনো ছিদ্রপথ দিয়া যে প্রবেশ করিবে এমন উপায় দেখা গেল না।

ভবানীচরণ তাঁহার গুরুপুত্রের বাসায় একদিন যেন নিতান্ত অকারণেই গেলেন এবং বিস্তর অপ্রাসঙ্গিক কথার পর সেই মেমের খবরটা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার বর্ত্তমান আর্থিক দুর্গতির কথা বগলাচরণের কাছে গোপন থাকিবার কোনোই কারণ নাই তাহা তিনি জানেন, তবু আজ তাঁহার টাকা নাই বলিয়া ঐ একটা সামান্য খেলনা তিনি তাঁহার ছেলের জন্য কিনিতে পারিতেছেন না একথার আভাস দিতেও তাঁহার যেন মাথা ছিঁড়িয়া পড়িতে লাগিল। তবু দুঃসহ সঙ্কোচকেও অধঃকৃত করিয়া তিনি তাঁহার চাদরের ভিতর হইতে কাপড়ে মোড়া একটি দামী পুরাতন জামিয়ার বাহির করিলেন। রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে কহিলেন, সময়টা কিছু খারাপ পড়িয়াছে, নগদ টাকা হাতে বেশী নাই—তাই মনে করিয়াছি এই জামিয়ারটি তোমার কাছে বন্ধক রাখিয়া সেই পুতুলটা কালীপদর জন্য লইয়া যাইব।

জামিয়ারের চেয়ে অল্পদামের কোনো জিনিষ যদি হইত তবে

বগলাচরণের বাধিত না—কিন্তু সে জানিত এটা হজম করিয়া উঠিতে পারিবে না—গ্রামের লোকেরা ত নিন্দা করিবেই তাহার উপরে রাসমণির রসনা হইতে যাহা বাহির হইবে তাহা সরস হইবে না। জামিয়ারটাকে পুনরায় চাদরের মধ্যে গোপন করিয়া হতাশ হইয়া ভবানীচরণকে ফিরিতে হইল।

কালীপদ পিতাকে রোজ জিজ্ঞাসা করে, বাবা আমার সেই মেমের কি হইল? ভবানীচরণ রোজই হাসিমুখে বলেন, রোস্—এখন কি! সপ্তমী পূজার দিন আগে আসুক!

প্রতিদিনই মুখে হাসি টানিয়া আনা দুঃসাধ্যতর হইতে লাগিল।

আজ চতুর্থী। ভবানীচরণ অসময়ে অন্তঃপুরে কি একটা ছুতা করিয়া গেলেন। যেন হঠাৎ কথাপ্রসঙ্গে রাসমণিকে বলিয়া উঠিলেন—দেখ আমি কয়দিন হইতে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, কালীপদর শরীরটা যেন দিনে দিনে খারাপ হইয়া যাইতেছে।

রাসমণি কহিলেন—বালাই! খারাপ হইতে যাইবে কেন? ওর ত আমি কোনো অসুখ দেখি না।

ভবানীচরণ কহিলেন—দেখ নাই! ও চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। কি যেন ভাবে।

রাসমণি কহিলেন—ও একদণ্ড চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে আমি ত বাঁচিতাম! ওর আবার ভাবনা! কোথায় কি দুষ্টামি করিতে হইবে ও সেই কথাই ভাবে!

দুর্গপ্রাচীরের এদিকটাতেও কোনো দুর্ব্বলতা দেখা গেল না—পাথরের উপরে গোলার দাগও বসিল না। নিশ্বাস ফেলিয়া মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে ভবানীচরণ বাহিরে চলিয়া আসিলেন। একলা ঘরের দাওয়ায় বসিয়া খুব কসিয়া তামাক খাইতে লাগিলেন।

পঞ্চমীর দিনে তাঁহার পাতে দই পায়স অমনি পড়িয়া রহিল। সন্ধ্যাবেলায় শুধু একটা সন্দেশ খাইয়াই জল খাইলেন, লুচি ছুঁইতে পারিলেন না। বলিলেন, ক্ষুধা একেবারেই নাই।

এইবার দুর্গপ্রাচীরে মস্ত একটা ছিদ্র দেখা দিল। ষষ্ঠীর দিনে রাসমণি স্বয়ং কালীপদকে নিভৃতে ডাকিয়া লইয়া তাহার আদরের ডাকনাম ধরিয়া বলিলেন—ভেঁটু, তোমার এত বয়স হইয়াছে, তবু তোমার অন্যায় আবদার ঘুচিল না! ছি ছি! যেটা পাইবার উপায় নাই সেটাতে লোভ করিলে অর্দ্ধেক চুরি করা হয়, তা জান!

কালীপদ নাকীসুরে কহিল—আমি কি জানি! বাবা যে বলিয়াছেন ওটা আমাকে দেবেন।

তখন বাবার বলার অর্থ কি, রাসমণি তাহা কালীপদকে বুঝাইতে বসিলেন। পিতার এই বলার মধ্যে যে কত স্নেহ কত বেদনা, অথচ এই জিনিসটা দিতে হইলে তাঁহাদের দরিদ্রঘরের কত ক্ষতি কত দুঃখ তাহা অনেক করিয়া বলিলেন। রাসমণি এমন করিয়া কোনোদিন কালীপদকে কিছু বুঝান নাই—তিনি যাহা করিতেন খুব সংক্ষেপে এবং জোরের সঙ্গেই করিতেন—কোনো আদেশকে নরম করিয়া তুলিবার আবশ্যকই তাঁর ছিল না। সেইজন্য কালীপদকে তিনি যে আজ এমনি মিনতি করিয়া এত বিস্তারিত করিয়া কথা বলিতেছেন তাহাতে সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল, এবং মাতার মনের এক জায়গায় যে কতটা দরদ আছে বালক হইয়াও একরকম করিয়া সে তাহা বুঝিতে পারিল। কিন্তু মেমের দিক হইতে মন একমুহূর্ত্তে ফিরাইয়া আনা কত কঠিন তাহা বয়স্ক পাঠকদের বুঝিতে কষ্ট হইবে না। তাই কালীপদ মুখ অত্যন্ত গম্ভীর করিয়া একটা কাঠি লইয়া মাটিতে আঁচড় কাটিতে লাগিল।

তখন রাসমণি আবার কঠিন হইয়া উঠিলেন—কঠোরস্বরে কহিলেন, তুমি রাগই কর আর কান্নাকাটিই কর যাহা পাইবার নয় তাহা কোনমতেই পাইবে না।—এই বলিয়া আর বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া দ্রুতপদে গৃহকর্ম্মে চলিয়া গেলেন।

কালীপদ বাহিরে গেল। তখন ভবানীচরণ একলা বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন। দূর হইতে কালীপদকে দেখিয়াই তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া যেন একটা বিশেষ কাজ আছে এম্‌নি ভাবে কোথায় চলিলেন। কালীপদ ছুটিয়া আসিয়া কহিল—বাবা, আমার সেই মেম্—

আজ আর ভবানীচরণের মুখে হাসি বাহির হইল না। কালীপদর গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন—রোস, বাবা, আমার একটা কাজ আছে—সেরে আসি, তারপরে সব কথা হবে!—বলিয়া তিনি বাড়ির বাহির হইয়া পড়িলেন। কালীপদর মনে হইল তিনি যেন তাড়াতাড়ি চোখ হইতে জল মুছিয়া ফেলিলেন।

তখন পাড়ার এক বাড়িতে পরীক্ষা করিয়া উৎসবের বাঁশির বায়না করা হইতেছিল। সেই রসনচৌকিতে সকাল বেলাকার করুণসুরে শরতের নবীন রৌদ্র যেন প্রচ্ছন্ন অশ্রুভারে ব্যথিত হইয়া উঠিতেছিল। কালীপদ তাহাদের বাড়ীর দরজার কাছে দাঁড়াইয়া চুপ করিয়া পথের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পিতা যে কোন কাজেই কোথাও যাইতেছেন না, তাহা তাঁহার গতি দেখিয়াই বুঝা যায়—প্রতি পদক্ষেপেই তিনি যে একটা নৈরাশ্যের বোঝা টানিয়া টানিয়া চলিয়াছেন এবং তাহা কোথাও ফেলিবার স্থান নাই, তাহা তাঁহার পশ্চাৎ হইতেও স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল।

কালীপদ অন্তঃপুরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, মা, আমি সেই পাখা-করা মেম চাই না।

মা তখন জাঁতি লইয়া ক্ষিপ্রহস্তে সুপুরি কাটিতেছিলেন। তাঁহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ছেলেতে মায়েতে সেইখানে বসিয়া কি পরামর্শ হইয়া গেল তাহা কেহই জানিতে পারিল না। জাঁতি রাখিয়া ধামাভরা কাটা ও আকাটা সুপুরি ফেলিয়া রাসমণি তখনই বগলাচরণের বাড়ি চলিয়া গেলেন।

আজ ভবানীচরণের বাড়ি ফিরিতে অনেক বেলা হইল। স্নান সারিয়া যখন তিনি খাইতে বসিলেন তখন তাঁহার মুখ দেখিয়া বোধ হইল আজও দধি পায়সের সদ্গতি হইবে না, এমন কি মাছের মুড়াটা আজ সম্পূর্ণই বিড়ালের ভোগে লাগিবে।

তখন দড়ি দিয়া মোড়া কাগজের এক বাক্স লইয়া রাসমণি তাঁহার স্বামীর সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। আহারের পরে যখন ভবানীচরণ বিশ্রাম করিতে যাইবেন তখনি এই রহস্যটা তিনি আবিষ্কার করিবেন ইহাই রাসমণির ইচ্ছা ছিল কিন্তু দধি পায়স ও মাছের মুড়ার অনাদর দূর করিবার জন্য এখনি এটা বাহির করিতে হইল। বাক্সের ভিতর হইতে সেই মেমমূর্ত্তি বাহির হইয়া বিনা বিলম্বে প্রবল উৎসাহে আপন গ্রীষ্মতাপ-নিবারণে লাগিয়া গেল। বিড়ালকে আজ হতাশ হইয়া ফিরিতে হইল। ভবানীচরণ গৃহিণীকে বলিলেন, আজ রান্নাটা বড় উত্তম হইয়াছে। অনেকদিন এমন মাছের ঝোল খাই নাই। আর দইটা যে কি চমৎকার জমিয়াছে সে আর কি বলিব!

সপ্তমীর দিন কালীপদ তাহার অনেক দিনের আকাঙ্ক্ষার ধন পাইল। সেদিন সমস্ত দিন সে মেমের পাখাখাওয়া দেখিল, তাহার সমবয়সী বন্ধুবান্ধবদিগকে দেখাইয়া তাহাদের ঈর্ষার উদ্রেক করিল। অন্য কোনো অবস্থায় হইলে সমস্তক্ষণ এই পুতুলের একঘেয়ে পাখা

নাড়ায় সে নিশ্চয়ই একদিনেই বিরক্ত হইয়া যাইত—কিন্তু অষ্টমীর দিনেই এই প্রতিমা বিসর্জ্জন দিতে হইবে জানিয়া তাহার অনুরাগ অটল হইয়া রহিল। রাসমণি তাঁহার গুরুপুত্রকে দুইটাকা নগদ দিয়া কেবল একদিনের জন্য এই পুতুলটি ভাড়া করিয়া আনিয়াছিলেন। অষ্টমীর দিনে কালীপদ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া স্বহস্তে বাক্সসমেত পুতুলটি বগলাচরণের কাছে ফিরাইয়া দিয়া আসিল। এই একদিনের মিলনের সুখস্মৃতি অনেক দিন তাহার মনে জাগরূক হইয়া রহিল, তাহার কল্পনালোকে পাখা চলার আর বিরাম রহিল না।

এখন হইতে কালীপদ মাতার মন্ত্রণার সঙ্গী হইয়া উঠিল এবং এখন হইতে ভবানীচরণ প্রতিবৎসরই এত সহজে এমন মূল্যবান পূজার উপহার কালীপদকে দিতে পারিতেন যে, তিনি নিজেই আশ্চর্য্য হইয়া যাইতেন।

পৃথিবীতে মূল্য না দিয়া যে কিছুই পাওয়া যায় না এবং সে মূল্য যে দুঃখের মূল্য, মাতার অন্তরঙ্গ হইয়া সে কথা কালীপদ প্রতিদিন যতই বুঝিতে পারিল ততই দেখিতে দেখিতে সে যেন ভিতরের দিক হইতে বড় হইয়া উঠিতে লাগিল। সকল কাজেই এখন সে তার মাতার দক্ষিণপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। সংসারের ভার বহিতে হইবে সংসারের ভার বাড়াইতে হইবে না একথা বিনা উপদেশবাক্যেই তাহার রক্তের সঙ্গে মিশিয়া গেল।

জীবনের দায়িত্ব গ্রহণ করিবার জন্য তাহাকে প্রস্তুত হইতে হইবে এই কথা স্মরণ রাখিয়া কালীপদ প্রাণপণে পড়িতে লাগিল। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যখন সে ছাত্রবৃত্তি পাইল তখন ভবানীচরণ মনে করিলেন, আর বেশি পড়াশুনার দরকার নাই এখন কালীপদ তাঁহাদের বিষয়কর্ম্ম দেখায় প্রবৃত্ত হউক্।

কালীপদ মাকে আসিয়া কহিল, কলিকাতায় গিয়া পড়াশুনা না করিতে পারিলে আমি ত মানুষ হইতে পারিব না।

মা বলিলেন, সে ত ঠিক কথা বাবা। কলিকাতায় ত যাইতেই হইবে।

কালীপদ কহিল, আমার জন্যে কোন খরচ করিতে হইবে না। এই বৃত্তি হইতেই চালাইয়া দিব—এবং কিছু কাজকর্ম্মেরও জোগাড় করিয়া লইব।

ভবানীচরণকে রাজি করাইতে অনেক কষ্ট পাইতে হইল। দেখিবার মত বিষয়সম্পত্তি যে কিছুই নাই সে কথা বলিলে ভবানীচরণ অত্যন্ত দুঃখবোধ করেন তাই রাসমণিকে সে যুক্তিটা চাপিয়া যাইতে হইল। তিনি বলিলেন, কালীপদকে ত মানুষ হইতে হইবে।—কিন্তু পুরুষানুক্রমে কোনো দিন শানিয়াড়ির বাহিরে না গিয়াই ত চৌধুরীরা এতকাল মানুষ হইয়াছে! বিদেশকে তাঁহারা যমপুরীর মত ভয় করেন। কালীপদর মত বালককে একলা কলিকাতায় পাঠাইবার প্রস্তাবমাত্র কি করিয়া কাহারো মাথায় আসিতে পারে তিনি ভাবিয়া পাইলেন না। অবশেষে গ্রামের সর্ব্বপ্রধান বুদ্ধিমান ব্যক্তি বগলাচরণ পর্য্যন্ত রাসমণির মতে মত দিল। সে বলিল, কালীপদ একদিন উকীল হইয়া সেই উইলচুরি ফাঁকির শোধ দিবে—নিশ্চয়ই এ তাহার ভাগ্যের লিখন—অতএব কলিকাতায় যাওয়া হইতে কেহই তাহাকে নিবারণ করিতে পারিবে না।

এ কথা শুনিয়া ভবানীচরণ অনেকটা সান্ত্বনা পাইলেন। গামছায় বাঁধা পুরাণো সমস্ত নথি বাহির করিয়া উইল-চুরি লইয়া কালীপদর সঙ্গে বারবার আলোচনা করিতে লাগিলেন। সম্প্রতি মাতার মন্ত্রীর কাজটা কালীপদ বেশ বিচক্ষণতার সঙ্গেই চালাইতেছিল কিন্তু পিতার

মন্ত্রণাসভায় সে জোর পাইল না। কেননা তাহাদের পরিবারের এই প্রাচীন অন্যায়টা সম্বন্ধে তাহার মনে যথেষ্ট উত্তেজনা ছিল না। তবু সে পিতার কথায় সায় দিয়া গেল। সীতাকে উদ্ধার করিবার জন্য বীরশ্রেষ্ঠ রাম যেমন লঙ্কায় যাত্রা করিয়াছিলেন—কালীপদর কলিকাতায় যাত্রাকেও ভবানীচরণ তেমনি খুব বড় করিয়া দেখিলেন—সে কেবল সামান্য পাস করার ব্যাপার নয়—ঘরের লক্ষ্মীকে ঘরে ফিরাইয়া আনিবার আয়োজন।

কলিকাতায় যাইবার আগের দিন রাসমণি কালীপদর গলায় একটি রক্ষাকবচ ঝুলাইয়া দিলেন ; এবং তাহার হাতে একটি পঞ্চাশ টাকার নোট দিয়া বলিয়া দিলেন—এই নোটটি রাখিয়ো, আপদে বিপদে প্রয়োজনের সময় কাজে লাগিবে।—সংসার খরচ হইতে অনেক কষ্টে জমানো এই নোটটিকেই কালীপদ যথার্থ পবিত্র কবচের ন্যায় জ্ঞান করিয়া গ্রহণ করিল—এই নোটটিকে মাতার আশীর্ব্বাদের মত সে চিরদিন রক্ষা করিবে, কোনোদিন খরচ করিবে না এই সে মনে মনে সঙ্কল্প করিল।

(৩)

ভবানীচরণের মুখে উইল-চুরির কথাটা এখন আর তেমন শোনা যায় না। এখন তাঁহার একমাত্র আলোচনার বিষয় কালীপদ। তাহারই কথা বলিবার জন্য তিনি এখন সমস্ত পাড়া ঘুরিয়া বেড়ান। তাহার চিঠি পাইলে ঘরে ঘরে তাহা পড়িয়া শুনাইবার উপলক্ষ্যে নাক হইতে চষমা আর নামিতে চায় না। কোনোদিন এবং কোনোপুরুষে কলিকাতায় যান নাই বলিয়াই কলিকাতার গৌরববোধে তাঁহার কল্পনা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল। আমাদের কালীপদ কলিকাতায় পড়ে এবং কলিকাতার কোনো সংবাদই তাহার অগোচর নাই—

এমন কি, হুগলীর কাছে গঙ্গার উপর দ্বিতীয় আর একটা পুল বাঁধা হইতেছে এ সমস্ত বড় বড় খবর তাহার কাছে নিতান্ত ঘরের কথা মাত্র!—শুনেছ ভায়া গঙ্গার উপর আর একটা যে পুল বাঁধা হচ্ছে—আজই কালীপদর চিঠি পেয়েছি তাতে সমস্ত খবর লিখেছে!—বসিয়া চষমা খুলিয়া তাহার কাঁচ ভাল করিয়া মুছিয়া চিঠিখানি অতি ধীরে ধীরে আদ্যোপান্ত প্রতিবেশীকে পড়িয়া শুনাইলেন।—দেখ্‌চ ভায়া! কালে কালে কতই যে কি হবে তার ঠিকানা নেই। শেষকালে ধুলোপায়ে গঙ্গার উপর দিয়ে কুকুর শেয়ালগুলোও পার হয়ে যাবে, কলিতে এত ঘট্‌ল হে!—গঙ্গার এইরূপ মাহাত্ম্যখর্ব্ব নিঃসন্দেহই শোচনীয় ব্যাপার কিন্তু কালীপদ যে কলিকালের এতবড় একটা জয়বার্ত্তা তাঁহাকে লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠাইয়াছে এবং গ্রামের নিতান্ত অজ্ঞ লোকেরা এ খবরটা তাহারই কল্যাণে জানিতে পারিয়াছে সেই আনন্দে তিনি বর্ত্তমান যুগে জীবের অসীম দুর্গতির দুশ্চিন্তাও অনায়াসে ভুলিতে পারিলেন। যাহার দেখা পাইলেন তাহারই কাছে মাথা নাড়িয়া কহিলেন, আমি বলে দিচ্চি, গঙ্গা আর বেশি দিন নাই!—মনে মনে এই আশা করিয়া রহিলেন গঙ্গা যখনই যাইবার উপক্রম করিবেন তখনই সে খবরটা সর্ব্বপ্রথমে কালীপদর চিঠি হইতেই পাওয়া যাইবে।

এদিকে কলিকাতায় কালীপদ বহুকষ্টে পরের বাসায় থাকিয়া ছেলে পড়াইয়া, রাত্রে হিসাবের খাতা নকল করিয়া পড়াশুনা চালাইতে লাগিল। কোনোমতে এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা পার হইয়া পুনরায় সে বৃত্তি পাইল। এই আশ্চর্য্য ঘটনা উপলক্ষ্যে সমস্ত গ্রামের লোককে প্রকাণ্ড একটা ভোজ দিবার জন্য ভবানীচরণ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি ভাবিলেন তরী ত প্রায় কূলে আসিয়া ভিড়িল—সেই সাহসে

এখন হইতে মন খুলিয়া খরচ করা যাইতে পারে। রাসমণির কাছে কোনো উৎসাহ না পাওয়াতে ভোজটা বন্ধ রহিল।

কালীপদ এবার কলেজের কাছে একটি মেসে আশ্রয় পাইল। মেসের যিনি অধিকারী তিনি তাহাকে নীচের তলার একটি অব্যবহার্য্য ঘরে থাকিতে অনুমতি দিয়াছেন। কালীপদ বাড়িতে তাঁহার ছেলেকে পড়াইয়া দুইবেলা খাইতে পায় এবং মেসের সেই স্যাঁৎসেঁতে অন্ধকার ঘরে তাহার বাসা। ঘরটার একটা মস্ত সুবিধা এই যে সেখানে কালীপদর ভাগী কেহ ছিল না সুতরাং যদিচ সেখানে বাতাস চলিত না, তবু পড়া শুনা অবাধে চলিত। যেমনই হউক সুবিধা অসুবিধা বিচার করিবার অবস্থা কালীপদর নহে।

এ মেসে যাহারা ভাড়া দিয়া বাস করে, বিশেষত যাহারা দ্বিতীয় তলের উচ্চলোকে থাকে, তাহাদের সঙ্গে কালীপদর কোনো সম্পর্ক নাই। কিন্তু সম্পর্ক না থাকিলেও সংঘাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায় না। উচ্চের বজ্রাঘাত নিম্নের পক্ষে কতদূর প্রাণান্তিক কালীপদর তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না।

এই মেসের উচ্চলোকে ইন্দ্রের সিংহাসন যাহার, তাহার পরিচয় আবশ্যক। তাহার নাম শৈলেন্দ্র। সে বড়মানুষের ছেলে; কলেজে পড়িবার সময় মেসে থাকা তাহার পক্ষে অনাবশ্যক—তবু সে মেসে থাকিতেই ভালবাসিত।

তাহাদের বৃহৎ পরিবার হইতে কয়েকজন স্ত্রী ও পুরুষজাতীয় আত্মীয়কে আনাইয়া কলিকাতায় একটা বাসা ভাড়া করিয়া থাকিবার জন্য বাড়ি হইতে অনুরোধ আসিয়াছিল—সে তাহাতে কোনোমতেই রাজি হয় নাই।

সে কারণ দেখাইয়াছিল যে বাড়ির লোকজনের সঙ্গে থাকিলে

তাহার পড়াশুনা কিছুই হইবে না। কিন্তু আসল কারণটা তাহা নহে। শৈলেন্দ্র লোকজনের সঙ্গ খুবই ভালবাসে—কিন্তু আত্মীয়দের মুস্কিল এই যে, কেবলমাত্র তাহাদের সঙ্গটি লইয়া খালাস পাওয়া যায় না, তাহাদের নানা দায় স্বীকার করিতে হয়;—কাহারো সম্বন্ধে এটা করিতে নাই, কাহারো সম্বন্ধে ওটা না করিলে অত্যন্ত নিন্দার কথা। এই জন্য শৈলেন্দ্রের পক্ষে সকলের চেয়ে সুবিধার জায়গা মেস। সেখানে লোক যথেষ্ট আছে অথচ তাহার উপর তাহাদের কোনো ভার নাই। তাহারা আসে, যায়, হাসে কথা কয়; তাহারা নদীর জলের মত, কেবলি বহিয়া চলিয়া যায় অথচ কোথাও লেশমাত্র ছিদ্র রাখে না।

শৈলেন্দ্রের ধারণা ছিল সে লোক ভাল; যাহাকে বলে সহৃদয়। সকলেই জানেন এই ধারণাটির মস্ত সুবিধা এই যে নিজের কাছে ইহাকে বজায় রাখিবার জন্য ভাল লোক হইবার কোনো দরকার করে না। অহঙ্কার জিনিষটা হাতিঘোড়ার মত নয়; তাহাকে নিতান্তই অল্প খরচে ও বিনা খোরাকে বেশ মোটা করিয়া রাখা যায়।

কিন্তু শৈলেন্দ্রের ব্যয় করিবার সামর্থ্য ও প্রবৃত্তি ছিল—এইজন্য আপনার অহঙ্কারটাকে সে সম্পূর্ণ বিনাখরচে চরিয়া খাইতে দিত না;—দামি খোরাক দিয়া তাহাকে সুন্দর সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিল।

বস্তুত শৈলেন্দ্রের মনে দয়া যথেষ্ট ছিল। লোকের দুঃখ দূর করিতে সে সত্যই ভালবাসিত। কিন্তু এত ভালবাসিত যে যদি কেহ দুঃখ দূর করিবার জন্য তাহার শরণাপন্ন না হইত তাহাকে সে বিধি-মতে দুঃখ না দিয়া ছাড়িত না। তাহার দয়া যখন নির্দ্দয় হইয়া উঠিত তখন বড় ভীষণ আকার ধারণ করিত।

মেসের লোকদিগকে থিয়েটার দেখানো, পাঁটা খাওয়ানো, টাকা ধার দিয়া সে কথাটাকে সর্ব্বদা মনে করিয়া না রাখা তাহার দ্বারা প্রায়ই ঘটিত। নবপরিণীত মুগ্ধ যুবক পূজার ছুটিতে বাড়ী যাইবার সময় কলিকাতার বাসাখরচ সমস্ত শোধ করিয়া যখন নিঃস্ব হইয়া পড়িত তখন বধূর মনোহরণের উপযোগী সৌখীন সাবান এবং এসেন্স, আর তারি সঙ্গে এক আধখানি হালের আমদানী বিলাতী ছিটের জ্যাকেট সংগ্রহ করিবার জন্য তাহাকে অত্যন্ত বেশী দুশ্চিন্তায় পড়িতে হইত না। শৈলেনের সুরুচির উপর, সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া সে বলিত, তোমাকেই কিন্তু ভাই পছন্দ করিয়া দিতে হইবে।—দোকানে তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া নিজে নিতান্ত সস্তা এবং বাজে জিনিষ বাছিয়া তুলিত;—তখন শৈলেন তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিত—আরে ছি ছি, তোমার কি রকম পছন্দ!—বলিয়া সব চেয়ে সৌখীন্ জিনিষটি টানিয়া তুলিত। দোকানদার হাসিয়া বলিত, হাঁ ইনি জিনিষ চেনেন বটে!—খরিদদার দামের কথা আলোচনা করিয়া মুখ বিমর্ষ করিতেই শৈলেন দাম চুকাইবার অকিঞ্চিৎকর ভারটা নিজেই লইত—অপর পক্ষের ভূয়োভূয়ঃ আপত্তিতেও কর্ণপাত করিত না।

এমনি করিয়া, যেখানে শৈলেন ছিল সেখানে সে চারিদিকের সকলেরই সকল বিষয়ে আশ্রয়স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। কেহ তাহার আশ্রয় স্বীকার না করিলে তাহার সেই ঔদ্ধত্য সে কোনোমতেই সহ্য করিতে পারিত না। লোকের হিত করিবার সখ তাহার এতই প্রবল!

বেচারা কালীপদ, নীচের স্যাঁৎসেতে ঘরে ময়লা মাদুরের উপর বসিয়া একখানা ছেঁড়া গেঞ্জি পরিয়া বইয়ের পাতায় চোখ গুঁজিয়া দুলিতে দুলিতে পড়া মুখস্থ করিত। যেমন করিয়া হোক তাহাকে স্কলারশিপ্ পাইতেই হইবে।

মা তাহাকে কলিকাতায় আসিবার পূর্ব্বে মাথার দিব্য দিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন, বড়মানুষের ছেলের সঙ্গে মেশামেশি করিয়া সে যেন আমোদ প্রমোদে মাতিয়া না ওঠে। কেবল মাতার আদেশ বলিয়া নহে—কালীপদকে যে দৈন্য স্বীকার করিতে হইয়াছিল তাহা রক্ষা করিয়া বড়মানুষের ছেলের সঙ্গে মেলা তাহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। সে কোনোদিন শৈলেনের কাছে ঘেঁসে নাই—এবং যদিও সে জানিত শৈলেনের মন পাইলে তাহার প্রতিদিনের অনেক দুরূহ সমস্যা এক-মুহূর্ত্তেই সহজ হইয়া যাইতে পারে তবু কোনো কঠিন সঙ্কটেও তাহার প্রসাদলাভের প্রতি কালীপদর লোভ আকৃষ্ট হয় নাই। সে আপনার অভাব লইয়া আপনার দারিদ্র্যের নিভৃত অন্ধকারের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া বাস করিত।

গরীব হইয়া তবু দূরে থাকিবে শৈলেন এই অহঙ্কারটা কোনো-মতেই সহিতে পারিল না। তাহা ছাড়া অশনে বসনে কালীপদর দারিদ্র্যটা এতই প্রকাশ্য যে তাহা নিতান্ত দৃষ্টিকটু। তাহার অত্যন্ত দীনহীন কাপড়চোপড় এবং মশারি বিছানা যখনি দোতলার সিঁড়ি উঠিতে চোখে পড়িত তখনি সেটা যেন একটা অপরাধ বলিয়া মনে বাজিত। ইহার পরে তাহার গলায় তাবিজ ঝুলানো; এবং সে দুই সন্ধ্যা যথাবিধি আহ্নিক করিত। তাহার এই সকল অদ্ভুত গ্রাম্যতা উপরের দলের পক্ষে বিষম হাস্যকর ছিল। শৈলেনের পক্ষের দুই একটি লোক এই নিভৃতবাসী নিরীহ লোকটির রহস্য উদ্ঘাটন করিবার জন্য দুইচারিদিন তাহার ঘরে আনাগোনা করিল। কিন্তু এই মুখচোরা মানুষের মুখ তাহারা খুলিতে পারিল না। তাহার ঘরে বেশি-ক্ষণ বসিয়া থাকা সুখকর নহে, স্বাস্থ্যকর ত নয়ই কাজেই ভঙ্গ দিতে হইল।

তাহাদের পাঁঠার মাংসের ভোজে এই অকিঞ্চনকে একদিন আহ্বান করিলে সে নিশ্চয়ই কৃতার্থ হইবে এই কথা মনে করিয়া অনুগ্রহ করিয়া একদা নিমন্ত্রণপত্র পাঠান হইল। কালীপদ জানাইল ভোজের ভোজ্য সহ্য করা তাহার সাধ্য নহে, তাহার অভ্যাস অন্যরূপ। এই প্রত্যাখ্যানে দলবলসমেত শৈলেন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল।

কিছুদিন তাহার ঠিক উপরের ঘরটাতে এমনি ধুপ্‌ধাপ্‌শব্দ ও সবেগে গানবাজনা চলিতে লাগিল যে, কালীপদর পক্ষে পড়ায় মন দেওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিল। দিনের বেলায় সে যথাসম্ভব গোল-দিঘিতে এক গাছের তলে বই লইয়া পড়া করিত এবং রাত্রি থাকিতে উঠিয়া খুব ভোরের দিকে একটা প্রদীপ জ্বালিয়া অধ্যয়নে মন দিত।

কলিকাতায় আহার ও বাসস্থানের কষ্টে এবং অতি পরিশ্রমে কালীপদর একটা মাথাধরার ব্যামো উপসর্গ জুটিল। কখনো কখনো এমন হইত তিন চারিদিন তাহাকে পড়িয়া থাকিতে হইত। সে নিশ্চয় জানিত এ সংবাদ পাইলে তাহার পিতা তাহাকে কখনই কলি-কাতায় থাকিতে দিবেন না এবং তিনি ব্যাকুল হইয়া হয়ত বা কলিকাতা পর্য্যন্ত ছুটিয়া আসিবেন। ভবানীচরণ জানিতেন কলি-কাতায় কালীপদ এমন সুখে আছে যাহা গ্রামের লোকের পক্ষে কল্পনা করাও অসম্ভব। পাড়াগাঁয়ে যেমন গাছপালা ঝোপঝাড় আপ-নিই জন্মে কলিকাতার হাওয়ায় সর্ব্বপ্রকার আরামের উপকরণ যেন সেইরূপ আপনিই উৎপন্ন হয় এবং সকলেই তাহার ফলভোগ করিতে পারে এইরূপ তাঁহার একটা ধারণা ছিল। কালীপদ কোনোমতেই তাঁহার সে ভুল ভাঙ্গে নাই। অসুখের অত্যন্ত কষ্টের সময়ও সে এক-দিনও পিতাকে পত্র লিখিতে ছাড়ে নাই। কিন্তু এইরূপ পীড়ার দিনে শৈলেনের দল যখন গোলমাল করিয়া ভূতের কাণ্ড করিতে থাকিত

তখন কালীপদর কষ্টের সীমা থাকিত না। সে কেবল এপাশ ওপাশ করিত এবং জনশূন্য ঘরে পড়িয়া মাতাকে ডাকিত ও পিতাকে স্মরণ করিত। দারিদ্র্যের অপমান ও দুঃখ এইরূপে যতই সে ভোগ করিত ততই ইহার বন্ধন হইতে তাহার পিতামাতাকে মুক্ত করিবেই এই প্রতিজ্ঞা তাহার মনে কেবলি দৃঢ় হইয়া উঠিত।

কালীপদ নিজেকে অত্যন্ত সঙ্কুচিত করিয়া সকলের লক্ষ্য হইতে সরাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিল কিন্তু তাহাতে উৎপাত কিছুমাত্র কমিল না। কোনোদিন বা সে দেখিল তাহার চিনাবাজারের পুরাতন সস্তা জুতার একপাটির পরিবর্তে একটি অতি উত্তম বিলাতী জুতার পাটি। এরূপ বিসদৃশ জুতা পরিয়া কলেজে যাওয়াই অসম্ভব। সে এ সম্বন্ধে কোনো নালিশ না করিয়া পরের জুতার পাটি ঘরের বাহিরে রাখিয়া দিল এবং জুতামেরামৎওয়ালা মুচির নিকট হইতে অল্প দামের পুরাতন জুতা কিনিয়া কাজ চালাইতে লাগিল। একদিন উপর হইতে একজন ছেলে হঠাৎ কালীপদর ঘরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল —আপনি কি ভুলিয়া আমার ঘর হইতে আমার সিগারেটের কেস্‌টা লইয়া আসিয়াছেন? আমি কোথাও খুঁজিয়া পাইতেছি না।—কালীপদ বিরক্ত হইয়া বলিল, আমি আপনাদের ঘরে যাই নাই।—এই যে, এইখানেই আছে, বলিয়া সেই লোকটি ঘরের এক কোণ হইতে মূল্যবান একটি সিগারেটের কেস্ তুলিয়া লইয়া আর কিছু না বলিয়া উপরে চলিয়া গেল।

কালীপদ মনে মনে স্থির করিল এফ্‌. এ পরীক্ষায় যদি ভালরকম বৃত্তি পাই তবে এই মেস্ ছাড়িয়া চলিয়া যাইব।

মেসের ছেলেরা মিলিয়া প্রতিবৎসর ধুম করিয়া সরস্বতীপূজা করে। তাহার ব্যয়ের প্রধান অংশ শৈলেন বহন করে কিন্তু সকল ছেলেই

চাঁদা দিয়া থাকে। গত বৎসর নিতান্তই অবজ্ঞা করিয়া কালীপদর কাছে কেহ চাঁদা চাহিতেও আসে নাই। এবৎসর কেবল তাহাকে বিরক্ত করিবার জন্যই তাহার নিকট চাঁদার খাতা আনিয়া ধরিল। যে দলের নিকট হইতে কোনোদিন কালীপদ কিছুমাত্র সাহায্য লয় নাই—যাহাদের প্রায় নিত্যঅনুষ্ঠিত আমোদ প্রমোদে যোগ দিবার সৌভাগ্য সে একেবারে অস্বীকার করিয়াছে তাহারা যখন কালীপদর কাছে চাঁদার সাহায্য চাহিতে আসিল তখন জানিনা সে কি মনে করিয়া পাঁচটা টাকা দিয়া ফেলিল। পাঁচ টাকা শৈলেন তাহার দলের লোক কাহারও নিকট হইতে পায় নাই।

কালীপদর দারিদ্র্যের কৃপণতায় এ পর্য্যন্ত সকলেই তাহাকে অবজ্ঞা করিয়া আসিয়াছে কিন্তু আজ তাহার এই পাঁচ টাকা দান তাহাদের একেবারে অসহ্য হইল। উহার অবস্থা যে কিরূপ তাহা ত আমাদের অগোচর নাই তবু উহার এত বড়াই কিসের? ও যে দেখি সকলকে টেক্কা দিতে চায়!

সরস্বতীপূজা ধুম করিয়া হইল—কালীপদ যে পাঁচটা টাকা দিয়াছিল তাহা না দিলেও কোনো ইতরবিশেষ হইত না। কিন্তু কালীপদর পক্ষে সে কথা বলা চলে না। পরের বাড়িতে তাহাকে খাইতে হইত—সকল দিন সময়মত আহার জুটিত না। তা ছাড়া পাকশালার ভৃত্যরাই তাহার ভাগ্যবিধাতা, সুতরাং ভালমন্দ কমিবেশী সম্বন্ধে কোনো অপ্রিয় সমালোচনা না করিয়া জলখাবারের জন্য কিছু সম্বল তাহাকে হাতে রাখিতেই হইত। সেই সঙ্গতিটুকু গাঁদাফুলের শুষ্ক স্তূপের সঙ্গে বিসর্জ্জিত দেবীপ্রতিমার পশ্চাতে অন্তর্ধান করিল।

কালীপদর মাথাধরার উৎপাত বাড়িয়া উঠিল। এবার পরীক্ষায়

সে ফেল্ করিল না বটে কিন্তু বৃত্তি পাইল না। কাজেই পড়িবার সময় সঙ্কোচ করিয়া তাহাকে আরো একটি টুইশনির জোগাড় করিয়া লইতে হইল। এবং বিস্তর উপদ্রব-সত্ত্বেও বিনাভাড়ার বাসাটুকু ছাড়িতে পারিল না।

উপরিতলবাসীরা আশা করিয়াছিল এবার ছুটির পরে নিশ্চয়ই কালীপদ এ মেসে আর আসিবে না। কিন্তু যথা-সময়েই তাহার সেই নীচের ঘরটার তালা খুলিয়া গেল। ধুতির উপর সেই তাহার চিরকেলে চেককাটা চায়না-কোট পরিয়া কালীপদ কোটরের মধ্যে প্রবেশ করিল—এবং একটা ময়লা কাপড়ে বাঁধা মস্ত পুঁটুলিসমেত টিনের বাক্স নামাইয়া রাখিয়া শেয়ালদহের মুটে তাহার ঘরের সম্মুখে উবু হইয়া বসিয়া অনেক বাদপ্রতিবাদ কবিয়া ভাড়া চুকাইয়া লইল। ঐ পুঁটুলিটার গর্ভে নানা হাঁড়ি খুরি ভাণ্ডের মধ্যে কালীপদর মা কাঁচা আম কুল চাল্‌তা প্রভৃতি উপকরণে নানাপ্রকার মুখরোচক পদার্থ তৈরি করিয়া নিজে সাজাইয়া দিয়াছেন। কালীপদ জানিত তাহার অবর্ত্তমানে কৌতুকপরায়ণ উপরতলার দল তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়া থাকে। তাহার আর কোনো ভাবনা ছিল না কেবল তাহার বড় সঙ্কোচ ছিল পাছে তাহার পিতামাতার কোনো স্নেহের নিদর্শন এই বিদ্রূপ-কারীদের হাতে পড়ে। তাহার মা তাহাকে যে থাবার জিনিসগুলি দিয়াছেন এ তাহার পক্ষে অমৃত—কিন্তু এ সমস্তই তাহার দরিদ্র গ্রাম্যঘরের আদরের ধন;—যে আধারে সেগুলি রক্ষিত, সেই ময়দা দিয়া আঁটা সরা-ঢাকা হাঁড়ি, তাহার মধ্যেও সহরের ঐশ্বর্য্যসজ্জার কোনো লক্ষণ নাই, তাহা কাচের পাত্র নয়, তাহা চিনামাটির ভাণ্ডও নহে—কিন্তু এইগুলিকে কোনো সহরের ছেলে যে অবজ্ঞা করিয়া দেখিবে—ইহা তাহার পক্ষে একেবারেই

অসহ্য। আগের বারে তাহার এই সমস্ত বিশেষ জিনিষগুলিকে তক্তাপোষের নীচে পুরাণো খবরের কাগজ প্রভৃতি চাপা দিয়া প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিত। এবারে তালাচাবির আশ্রয় লইল। যখন সে পাঁচমিনিটের জন্যও ঘরের বাহিরে যাইত ঘরে তালাবন্ধ করিয়া যাইত।

এটা সকলেরই চোখে লাগিল। শৈলেন বলিল ধনরত্ন ত বিস্তর! ঘরে ঢুকিলে চোরের চক্ষে জল আসে—সেই ঘরে ঘন ঘন তালা পড়িতেছে—একেবারে দ্বিতীয় ব্যাঙ্ক অফ্ বেঙ্গল হইয়া উঠিল দেখিতেছি। আমাদের কাহাকেও বিশ্বাস নাই—পাছে ঐ পাবনার ছিটের চায়নাকোটটার লোভ সাম্‌লাইতে না পারি! ওহে রাধু, ওকে একটা ভদ্রগোচের নূতন কোট কিনিয়া না দিলে ত কিছুতেই চলিতেছে না। চিরকাল ওর ঐ একমাত্র কোট দেখিতে দেখিতে আমার বিরক্ত ধরিয়া গেছে!

শৈলেন কোনোদিন কালীপদর ঐ লোনাধরা চুনবালিখসা অন্ধকার ঘরটার মধ্যে প্রবেশ করে নাই। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিবার সময় বাহির হইতে দেখিলেই তাহার সর্ব্বশরীর সঙ্কুচিত হইয়া উঠিত। বিশেষত সন্ধ্যার সময় যখন দেখিত একটা টিম্‌টিমে প্রদীপ লইয়া একলা সেই বায়ুশূন্য বদ্ধ ঘরে কালীপদ গা খুলিয়া বসিয়া বইয়ের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া পড়া করিতেছে তখন তাহার প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিত। দলের লোককে শৈলেন বলিল, এবারে কালীপদ কোন্ সাতরাজার ধন মাণিক আহরণ করিয়া আনিয়াছে সেটা তোমরা খুঁজিয়া বাহির কর!—এই কৌতুকে সকলেই উৎসাহ প্রকাশ করিল।

কালীপদর ঘরের তালাটি নিতান্তই অল্প দামের তালা—তাহার

নিষেধ খুব প্রবল নিষেধ নহে—প্রায় সকল চাবিতেই এ তালা খোলে। একদিন সন্ধ্যার সময় কালীপদ যখন ছেলে পড়াইতে গিয়াছে সেই অবকাশে জন দুই তিন অত্যন্ত আমুদে ছেলে হাসিতে হাসিতে তালা খুলিয়া একটা লণ্ঠন হাতে তাহার ঘরে প্রবেশ করিল। তক্তাপোষের নীচে হইতে আচার চাট্‌নি আমসত্ব প্রভৃতির ভাণ্ড-গুলিকে আবিষ্কার করিল। কিন্তু সেগুলি যে বহুমূল্য গোপনীয় সামগ্রী তাহা তাহাদের মনে হইল না।

খুঁজিতে খুঁজিতে বালিশের নীচে হইতে রিং-সমেত এক চাবি বাহির হইল। সেই চাবি দিয়া টিনের বাক্সটা খুলিতেই কয়েকটা ময়লা কাপড় বই খাতা কাঁচি ছুরি কলম ইত্যাদি চোখে পড়িল। বাক্স বন্ধ করিয়া তাহারা চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে এমন সময় সমস্ত কাপড়চোপড়ের নীচে রুমালে মোড়া একটা কি পদার্থ বাহির হইল। রুমাল খুলিতেই ছেঁড়া কাপড়ের মোড়ক দেখা দিল। সেই মোড়কটি খোলা হইলে একটির পর আর একটি প্রায় তিনচার খানা কাগজের আবরণ ছাড়াইয়া ফেলিয়া একখানি পঞ্চাশ টাকার নোট বাহির হইয়া পড়িল।

এই নোটখানা দেখিয়া কেহ আর হাসি রাখিতে পারিল না। হো হো করিয়া উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিল। সকলেই স্থির করিল এই নোটখানারই জন্যে কালীপদ ঘন ঘন ঘরে চাবি লাগাইতেছে, পৃথিবীর কোনো লোককেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। লোকটার কৃপণতা এবং সন্দিগ্ধ প্রকৃতিতে শৈলেনের প্রসাদ-প্রত্যাশী সহচর-গুলি বিস্মিত হইয়া উঠিল।

এমন সময় হঠাৎ মনে হইল রাস্তায় কালীপদর মত যেন কাহার কাশি শোনা গেল। তৎক্ষণাৎ বাক্সটার ডালা বন্ধ করিয়া, নোটখানা

হাতে লইয়াই তাহারা উপরে ছুটিল। একজন তাড়াতাড়ি দরজায় তালা লাগাইয়া দিল।

শৈলেন সেই নোটখানা দেখিয়া অত্যন্ত হাসিল। পঞ্চাশ টাকা শৈলেনের কাছে কিছুই নয় তবু এত টাকাও যে কালীপদর বাক্সে ছিল তাহা তাহার ব্যবহার দেখিয়া কেহ অনুমান করিতে পারিতনা। তাহার পরে আবার এই নোটটুকুর জন্য এত সাবধান! সকলেই স্থির করিল দেখা যাক্ এই টাকাটা খোয়া গিয়া এই অদ্ভুত লোকটি কি রকম কাণ্ডটা করে।

রাত্রি নটার পর ছেলে পড়াইয়া শ্রান্ত দেহে কালীপদ ঘরের অবস্থা কিছুই লক্ষ্য করে নাই। বিশেষত মাথা তাহার যেন ছিঁড়িয়া পড়িতেছিল। বুঝিয়াছিল এখন কিছুদিন তাহার এই মাথার যন্ত্রণা চলিবে।

পরদিন সে কাপড় বাহির করিবার জন্য তক্তাপোষের নীচে হইতে টিনের বাক্সটা টানিয়া দেখিল বাক্সটা খোলা। যদিচ কালীপদ স্বভাবত অসাবধান নয় তবু তাহার মনে হইল হয় ত সে চাবিবন্ধ করিতে ভুলিয়া গিয়াছিল। কারণ, ঘরে যদি চোর আসিত তবে বাহিরের দরজায় তালা বন্ধ থাকিত না।

বাক্স খুলিয়া দেখে তাহার কাপড়চোপড় সমস্ত উলট্‌পালট। তাহার বুক দমিয়া গেল। তাড়াতাড়ি সমস্ত জিনিষপত্র বাহির করিয়া দেখিল তাহার সেই মাতৃদত্ত নোটখানি নাই। কাগজ ও কাপড়ের মোড়কগুলা আছে। বারবার করিয়া কালীপদ সমস্ত কাপড় সবলে ঝাড়া দিতে লাগিল, নোট বাহির হইল না। এদিকে উপরের তলার দুই একটি করিয়া লোক যেন আপনার কাজে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া সেই ঘরটার দিকে কটাক্ষপাত করিয়া বারবার উঠানামা করিতে লাগিল। উপরে অট্টহাস্যের ফোয়ারা খুলিয়া গেল।

যখন নোটের কোনো আশাই রহিল না এবং মাথার কষ্টে যখন জিনিষপত্র নাড়ানাড়ি করা তাহার পক্ষে আর সম্ভবপর হইলনা তখন সে বিছানার উপর উপুড় হইয়া মৃতদেহের মত পড়িয়া রহিল। এই তাহার মাতার অনেক দুঃখের নোটখানি—জীবনের কত মুহূর্ত্তকে কঠিন যন্ত্রে পেষণ করিয়া দিনে দিনে একটু একটু করিয়া এই নোটখানি সঞ্চিত হইয়াছে। একদা এই দুঃখের ইতিহাস সে কিছুই জানিত না, সেদিন সে তাহার মাতার ভারের উপর ভার কেবল্ বাড়াইয়াছে, অবশেষে যেদিন মা তাহাকে তাঁহার প্রতিদিনের নিয়ত আবর্ত্তমান দুঃখের সঙ্গী করিয়া লইলেন সেদিনকার মত এমন গৌরব সে তাহার বয়সে আর কখনো ভোগ করে নাই। কালীপদ আপনার জীবনে সব চেয়ে যে বড় বাণী, যে মহত্তম আশীর্ব্বাদ পাইয়াছে এই নোটখানির মধ্যে তাহাই পূর্ণ হইয়া ছিল। সেই তাহার মাতার অতলস্পর্শ স্নেহসমুদ্রমন্থনকরা অমূল্য দুঃখের উপহারটুকু চুরি যাওয়াকে সে একটা পৈশাচিক অভিশাপের মত মনে করিল। পাশের সিঁড়ির উপর দিয়া পায়ের শব্দ আজ বারবার শোনা যাইতে লাগিল। অকারণ ওঠা এবং নামার আজ আর বিরাম নাই। গ্রামে আগুন লাগিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছে আর ঠিক তাহার পাশ দিয়াই কৌতুকের কলশব্দে নদী অবিরত ছুটিয়া চলিয়াছে—এও সেই রকম।

উপরের তলার অট্টহাস্য শুনিয়া এক সময়ে কালীপদর হঠাৎ মনে হইল এ চোরের কাজ নয়;—একমুহূর্ত্তে সে বুঝিতে পারিল শৈলেন্দ্রের দল কৌতুক করিয়া তাহার এই নোট লইয়া গিয়াছে। চোরে চুরি করিলেও তাহার মনে এত বাজিত না। তাহার মনে হইতে লাগিল যেন ধনমদগর্ব্বিত যুবকেরা তাহার মায়ের গায়ে হাত

তুলিয়াছে। এতদিন কালীপদ এই মেসে আছে এই সিঁড়িটুকু বাহিয়া একদিনো সে উপরের তলায় পদার্পণও করে নাই। আজ তাহার গায়ে সেই ছেঁড়া গেঞ্জি, পায়ে জুতা নাই, মনের আবেগে এবং মাথাধরার উত্তেজনায় তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে—সবেগে সে উপরে উঠিয়া পড়িল।

আজ রবিবার—কলেজে যাইবার উপসর্গ ছিলনা। কাঠের ছাদওয়ালা বারান্দায় বন্ধুগণ কেহবা চৌকিতে কেহবা বেতের মোড়ায় বসিয়া, হাস্যালাপ করিতেছিল। কালীপদ তাহাদের মাঝখানে ছুটিয়া পড়িয়া ক্রোধগদ্‌গদস্বরে বলিয়া উঠিল—দিন্‌ আমার নোট্‌ দিন্‌!

যদি সে মিনতির সুরে বলিত তবে ফল পাইত সন্দেহ নাই। কিন্তু উন্মত্তবৎ ক্রুদ্ধমূর্ত্তি দেখিয়া শৈলেন অত্যন্ত ক্ষাপা হইয়া উঠিল। যদি তাহার বাড়ির দারোয়ান থাকিত তবে তাহাকে দিয়া এই অসভ্যকে কান ধরিয়া দূর করিয়া দিত সন্দেহ নাই। সকলেই দাঁড়াইয়া উঠিয়া একত্রে গর্জ্জন করিয়া উঠিল, কি বলেন মশায়! কিসের নোট!

কালীপদ কহিল, আমার বাক্স থেকে আপনারা নোট নিয়ে এসেছেন।

এতবড় কথা! আমাদের চোর বল্‌তে চান্‌!

কালীপদর হাতে যদি কিছু থাকিত তবে সেই মুহূর্ত্তেই সে খুনোখুনি করিয়া ফেলিত। তাহার রকম দেখিয়া চারপাঁচজনে মিলিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল। সে জালবদ্ধ বাঘের মত গুম্‌রাইতে লাগিল।

এই অন্যায়ের প্রতিকার করিবার তাহার কোনো শক্তি নাই—কোনো প্রমাণ নাই—সকলেই তাহার সন্দেহকে উন্মত্ততা বলিয়া উড়াইয়া দিবে। যাহারা তাহাকে মৃত্যুবাণ মারিয়াছে তাহারা তাহার ঔদ্ধত্যকে অসহ্য বলিয়া বিষম আস্ফালন করিতে লাগিল।

সে রাত্রি যে কালীপদর কেমন করিয়া কাটিল তাহা কেহ জানিতে পারিল না। শৈলেন একখানা একশোটাকার নোট বাহির করিয়া বলিল—দাও, বাঙালটাকে দিয়ে এসগে যাও।

সহচররা কহিল, পাগল হয়েছ! তেজটুকু আগে মরুক্—আমাদের সকলের কাছে একটা রিট্‌ন্ অ্যাপলজি আগে দিক্ তার পরে বিবেচনা করে দেখা যাবে।

যথাসময়ে সকলে শুইতে গেল এবং ঘুমাইয়া পড়িতেও কাহারও বিলম্ব হইল না। সকালে কালীপদর কথা প্রায় সকলে ভুলিয়াই গিয়াছিল। সকালে কেহ কেহ সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিবার সময় তাহার ঘর হইতে কথা শুনিতে পাইল—ভাবিল, হয় ত উকীল ডাকিয়া পরামর্শ করিতেছে। দরজা ভিতর হইতে খিল লাগানো। বাহিরে কান পাতিয়া যাহা শুনিল তাহার মধ্যে আইনের কোনো সংস্রব নাই, সমস্ত অসম্বদ্ধ প্রলাপ।

উপরে গিয়া শৈলেনকে খবর দিল। শৈলেন নামিয়া আসিয়া দরজার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। কালীপদ কি যে বকিতেছে ভাল বোঝা যাইতেছে না, কেবল ক্ষণে ক্ষণে "বাবা" "বাবা" করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেছে।

ভয় হইল, হয় ত সে নোটের শোকে পাগল হইয়া গিয়াছে। বাহির হইতে দুই তিনবার ডাকিল, কালীপদবাবু। কেহ কোনো সাড়া দিল না। কেবল সেই বিড়বিড় বকুনি চলিতে লাগিল। শৈলেন পুনশ্চ উচ্চস্বরে কহিল—কালীপদবাবু দরজা খুলুন, আপনার সেই নোট পাওয়া গেছে। দরজা খুলিল না, কেবল বকুনির গুঞ্জনধ্বনি শোনা গেল।

ব্যাপারটা যে এতদূর গড়াইবে তাহা শৈলেন কল্পনাও করে নাই।

সে মুখে তাহার অনুচরদের কাছে অনুতাপবাক্য প্রকাশ করিল না কিন্তু তাহার মনের মধ্যে বিঁধিতে লাগিল। সে বলিল, দরজা ভাঙিয়া ফেলা যাক্।—কেহ কেহ পরামর্শ দিল, পুলিশ ডাকিয়া আন—কি জানি পাগল হইয়া যদি হঠাৎ কিছু করিয়া বসে—কাল যে রকম কাণ্ড দেখিয়াছি—সাহস হয় না!

শৈলেন কহিল, না, শীঘ্র একজন গিয়া অনাদি ডাক্তারকে ডাকিয়া আন। অনাদি ডাক্তার বাড়ির কাছেই থাকেন। তিনি আসিয়া দরজায় কান দিয়া বলিলেন—এ ত বিকার বলিয়াই বোধ হয়।

দরজা ভাঙিয়া ভিতরে গিয়া দেখা গেল—তক্তাপোষের উপর এলোমেলো বিছানা খানিকটা ভ্রষ্ট হইয়া মাটিতে লুটাইতেছে। কালীপদ মেজের উপর পড়িয়া—তাহার চেতনা নাই। সে গড়াইতেছে, ক্ষণে ক্ষণে হাত পা ছুঁড়িতেছে এবং প্রলাপ বকিতেছে—তাহার রক্তবর্ণ চোখ দুটা খোলা, এবং তাহার মুখে যেন রক্ত ফাটিয়া-পড়িতেছে।

ডাক্তার তাহার পাশে বসিয়া অনেকক্ষণ পরীক্ষা করিয়া শৈলেনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার আত্মীয় কেহ আছে?

শৈলেনের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সে ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কেন বলুন দেখি?

ডাক্তার গম্ভীর হইয়া কহিলেন, খবর দেওয়া ভাল, লক্ষণ ভাল নয়।

শৈলেন কহিল, ইঁহাদের সঙ্গে আমাদের ভাল আলাপ নাই—আত্মীয়ের খবর কিছুই জানিনা। সন্ধান করিব। কিন্তু ইতিমধ্যে কি করা কর্ত্তব্য?

ডাক্তার কহিলেন, এ ঘর হইতে রোগীকে এখনি দোতলার ভাল ঘরে লইয়া যাওয়া উচিত। দিনরাত শুশ্রূষার ব্যবস্থা করাও চাই।

শৈলেন রোগীকে তাহার নিজের ঘরে লইয়া গেল। তাহার সহচরদের সকলকে ভিড় করিতে নিষেধ করিয়া ঘর হইতে বিদায় করিয়া দিল। কালীপদর মাথায় বরফের পুঁটুলি লাগাইয়া নিজের হাতে বাতাস করিতে লাগিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই বাড়ির উপরতলার দলে পাছে কোনপ্রকার অবজ্ঞা বা পরিহাস করে এইজন্য নিজের পিতামাতার সকল পরিচয় কালীপদ ইহাদের নিকট হইতে গোপন করিয়া চলিয়াছে। নিজে তাঁহাদের নামে যে চিঠি লিখিত তাহা সাবধানে ডাকঘরে দিয়া আসিত এবং ডাকঘরের ঠিকানাতেই তাহার নামে চিঠি আসিত—প্রত্যহ সে নিজে গিয়া তাহা সংগ্রহ করিয়া আনিত।

কালীপদর বাড়ির পরিচয় লইবার জন্য আর একবার তাহার বাক্স খুলিতে হইল। তাহার বাক্সের মধ্যে দুইতাড়া চিঠি ছিল। প্রত্যেক তাড়াটি অতি যত্নে ফিতা দিয়া বাঁধা। একটি তাড়াতে তাহার মাতার চিঠি—আর একটিতে তাহার পিতার। মায়ের চিঠি সংখ্যায় অল্পই, পিতার চিঠিই বেশি।

চিঠিগুলি হাতে করিয়া আনিয়া শৈলেন দরজা বন্ধ করিয়া দিল এবং রোগীর বিছানার পার্শ্বে বসিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। চিঠিতে ঠিকানা পড়িয়াই একেবারে চমকিয়া উঠিল। শানিয়াড়ি, চৌধুরীবাড়ি, ছয় আনী! নীচে নাম দেখিল, ভবানীচরণ দেবশর্ম্মা। ভবানীচরণ চৌধুরী!

চিঠি রাখিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া সে কালীপদর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কিছুদিন পূর্ব্বে একবার তাহার সহচরদের মধ্যে কে একজন বলিয়াছিল তাহার মুখের সঙ্গে কালীপদর মুখের অনেকটা আদল আসে। সে কথাটা তাহার শুনিতে ভাল লাগে নাই এবং অন্য সকলে

তাহা একেবারে উড়াইয়া দিয়াছিল। আজ বুঝিতে পারিল, সে কথাটা অমূলক নহে। তাহার পিতামহরা দুই ভাই ছিলেন—শ্যামাচরণ এবং ভবানীচরণ, একথা সে জানিত। তাহার পরবর্ত্তীকালের ইতিহাস তাহাদের বাড়িতে কখনো আলোচিত হয় নাই। ভবানীচরণের যে পুত্র আছে এবং তাহার নাম কালীপদ, তাহা সে জানিতই না। এই কালীপদ! এই তাহার খুড়া!

শৈলেনের তখন মনে পড়িতে লাগিল, শৈলেনের পিতামহী, শ্যামাচরণের স্ত্রী যতদিন বাঁচিয়াছিলেন, শেষ পর্য্যন্ত পরমস্নেহে তিনি ভবানীচরণের কথা বলিতেন। ভবানীচরণের নাম করিতে তাঁহার দুই চক্ষে জল ভরিয়া উঠিত। ভবানীচরণ তাঁহার দেবর বটে, কিন্তু তাঁহার পুত্রের চেয়ে বয়সে ছোট—তাহাকে তিনি আপন ছেলের মতই মানুষ করিয়াছেন। বৈষয়িক বিপ্লবে যখন তাঁহারা স্বতন্ত্র হইয়া গেলেন, তখন ভবানীচরণের একটু খবর পাইবার জন্য তাঁহার বক্ষ তৃষিত হইয়া থাকিত। তিনি বারবার তাঁহার ছেলেদের বলিয়াছেন—ভবানীচরণ নিতান্ত অবুঝ ভালমানুষ বলিয়া নিশ্চয়ই তোরা তাহাকে ফাঁকি দিয়াছিস্—আমার শ্বশুর তাহাকে এত ভালবাসিতেন, তিনি যে তাহাকে বিষয় হইতে বঞ্চিত করিয়া যাইবেন একথা আমি বিশ্বাস করিতে পারি না।—তাঁহার ছেলেরা এসব কথায় অত্যন্ত বিরক্ত হইত এবং শৈলেনের মনে পড়িল সেও তাহার পিতামহীর উপর অত্যন্ত রাগ করিত। এমন কি, পিতামহী তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিতেন বলিয়া ভবানীচরণের উপরেও তাহার ভারি রাগ হইত। বর্ত্তমানে ভবানীচরণের যে এমন দরিদ্র অবস্থা তাহাও সে জানিত না—কালীপদর অবস্থা দেখিয়া সকল কথা সে বুঝিতে পারিল এবং এতদিন সহস্র প্রলোভনসত্বেও কালীপদ যে তাহার অনুচরশ্রেণীতে ভর্ত্তি হয় নাই ইহাতে সে ভারি গৌরব

অনুভব করিল। যদি দৈবাৎ কালীপদ তাহার অনুবর্ত্তী হইত তবে আজ যে তাহার লজ্জার সীমা থাকিত না।

(৪)

শৈলেনের দলের লোকেরা এতদিন প্রত্যহই কালীপদকে পীড়ন ও অপমান করিয়াছে। এই বাসাতে তাহাদের মাঝখানে কাকাকে শৈলেন রাখিতে পারিল না। ডাক্তারের পরামর্শ লইয়া অতি যত্নে তাঁহাকে একটা ভাল বাড়িতে স্থানান্তরিত করিল।

ভবানীচরণ শৈলেনের চিঠি পাইয়া একটি সঙ্গী আশ্রয় করিয়া তাড়াতাড়ি কলিকাতায় ছুটিয়া আসিলেন। আসিবার সময় ব্যাকুল হইয়া রাসমণি তাঁহার কষ্টসঞ্চিত অর্থের অধিকাংশই তাঁহার স্বামীর হাতে দিয়া বলিলেন, দেখো যেন অযত্ন না হয়। যদি তেমন বোঝো আমাকে খবর দিলেই আমি যাব।—চোধুরীবাড়ির বধূর পক্ষে হট্‌হট্‌ করিয়া কলিকাতায় যাওয়ার প্রস্তাব এতই অসঙ্গত যে প্রথম সংবাদেই তাঁহার যাওয়া ঘটিত না। তিনি রক্ষাকালীর নিকট মানত করিলেন এবং গ্রহাচার্য্যকে ডাকিয়া সস্ত্যয়ন করাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

ভবানীচরণ কালীপদর অবস্থা দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। কালীপদর তখনো ভাল করিয়া জ্ঞান হয় নাই; সে তাঁহাকে মাষ্টার মশায় বলিয়া ডাকিল—ইহাতে তাঁহার বুক ফাটিয়া গেল। কালীপদ প্রায় মাঝে মাঝে প্রলাপে বাবা বাবা বলিয়া ডাকিয়া উঠিতেছিল—তিনি তাহার হাত ধরিয়া তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া উচ্চস্বরে বলিতেছিলেন—এই যে বাবা, এই যে আমি এসেছি।—কিন্তু সে যে তাঁকে চিনিয়াছে এমন ভাব প্রকাশ করিল না।

ডাক্তার আসিয়া বলিলেন, জ্বর পূর্ব্বের চেয়ে কিছু কমিয়াছে, হয়ত এবার ভালর দিকে যাইবে। কালীপদ ভালর দিকে যাইবে না

একথা ভবানীচরণ মনেই করিতে পারেন না। বিশেষত তাহার শিশুকাল হইতে সকলেই বলিয়া আসিতেছে কালীপদ বড় হইয়া একটা অসাধ্য সাধন করিবে—সেটাকে ভবানীচরণ কেবলমাত্র লোক-মুখের কথা বলিয়া গ্রহণ করেন নাই—সে বিশ্বাস একেবারে তাঁহার সংস্কারগত হইয়া গিয়াছিল। কালীপদকে বাঁচিতেই হইবে, এ তাহার ভাগ্যের লিখন।

এই কারণে, ডাক্তার যতটুকু ভাল বলে তিনি তাহার চেয়ে অনেক বেশি ভাল শুনিয়া বসেন এবং রাসমণিকে যে পত্র লেখেন তাহাতে আশঙ্কার কোনো কথাই থাকে না।

শৈলেন্দ্রের ব্যবহারে ভবানীচরণ একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। সে যে তাঁহার পরমাত্মীয় নহে এ কথা কে বলিবে! বিশেষত কলিকাতার সুশিক্ষিত সুসভ্য ছেলে হইয়াও সে তাঁহাকে যে রকম ভক্তিশ্রদ্ধা করে এমন ত দেখা যায় না। তিনি ভাবিলেন কলিকাতার ছেলেদের বুঝি এই প্রকারই স্বভাব। মনে মনে ভাবিলেন সে ত হবারই কথা, আমাদের পাড়াগেঁয়ে ছেলেদের শিক্ষাই বা কি আর সহবৎই বা কি!

জ্বর কিছু কমিতে লাগিল এবং কালীপদ ক্রমে চৈতন্যলাভ করিল। পিতাকে শয্যার পাশে দেখিয়া সে চমকিয়া উঠিল, ভাবিল, তাহার কলিকাতার অবস্থার কথা এইবার তাহার পিতার কাছে ধরা পড়িবে। তাহার চেয়ে ভাবনা এই যে, তাহার গ্রাম্য পিতা সহরের ছেলেদের পরিহাসের পাত্র হইয়া উঠিবেন। চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া সে ভাবিয়া পাইল না, এ কোন্ ঘর! মনে হইল, এ কি স্বপ্ন দেখিতেছি!

তখন তাহার বেশি কিছু চিন্তা করিবার শক্তি ছিল না। তাহার

মনে হইল অসুখের খবর পাইয়া তাহার পিতা আসিয়া একটা ভাল বাসায় আনিয়া রাখিয়াছেন। কি করিয়া আনিলেন, তাহার খরচ কোথা হইতে জোগাইতেছেন, এত খরচ করিতে থাকিলে পরে কিরূপ সঙ্কট উপস্থিত হইবে সে সব কথা ভাবিবার তাহার সময় নাই। এখন তাহাকে বাঁচিয়া উঠিতে হইবে, সেজন্য সমস্ত পৃথিবীর উপর তাহার যেন দাবি আছে।

একসময়ে যখন তাহার পিতা ঘরে ছিলেন না এমন সময় শৈলেন একটি পাত্রে কিছু ফল লইয়া তাহার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। কালীপদ অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—ভাবিতে লাগিল, ইহার মধ্যে কিছু পরিহাস আছে না কি! প্রথম কথা তাহার মনে হইল এই যে, পিতাকে ত ইহার হাত হইতে রক্ষা করিতে হইবে।

শৈলেন ফলের পাত্র টেবিলের উপর রাখিয়া পায়ে ধরিয়া কালীপদকে প্রণাম করিল এবং কহিল, আমি গুরুতর অপরাধ করিয়াছি, আমাকে মাপ করুন।

কালীপদ শশব্যস্ত হইয়া উঠিল। শৈলেনের মুখ দেখিয়াই সে বুঝিতে পারিল তাহার মনে কোনো কপটতা নাই। প্রথম যখন কালীপদ মেসে আসিয়াছিল এই যৌবনের দীপ্তিতে উজ্জ্বল সুন্দর মুখশ্রী দেখিয়া কতবার তাহার মন অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াছে কিন্তু সে আপনার দারিদ্র্যের সঙ্কোচে কোনো দিন ইহার নিকটেও আসে নাই। যদি সে সমকক্ষ লোক হইত—যদি বন্ধুর মত ইহার কাছে আসিবার অধিকার তাহার পক্ষে স্বাভাবিক হইত তবে সে কত খুসিই হইত—কিন্তু পরস্পর অত্যন্ত কাছে থাকিলেও মাঝখানে অপার ব্যবধান লঙ্ঘন করিবার উপায় ছিল না। সিঁড়ি দিয়া যখন শৈলেন উঠিত

বা নামিত, তখন তাহার সৌখীন চাদরের সুগন্ধ কালীপদর অন্ধকার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিত—তখন সে পড়া ছাড়িয়া একবার এই হাস্যপ্রফুল্ল চিন্তারেখাহীন তরুণ মুখের দিকে না তাকাইয়া থাকিতে পারিত না। সেই মুহূর্ত্তে কেবল ক্ষণকালের জন্য তাহার সেই স্যাঁৎসেঁতে কোণের ঘরে দূর সৌন্দর্য্যলোকের ঐশ্বর্য্য বিচ্ছুরিত রশ্মিচ্ছটা আসিয়া পড়িত। তাহার পরে সেই শৈলেনের নির্দ্দয় তারুণ্য তাহার কাছে কিরূপ সাংঘাতিক হইয়া উঠিয়াছিল তাহা সকলেরই জানা আছে। আজ শৈলেন যখন ফলের পাত্র বিছানায় তাহার সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিল তখন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ঐ সুন্দর মুখের দিকে কালীপদ আর একবার তাকাইয়া দেখিল। ক্ষমার কথা সে মুখে কিছুই উচ্চারণ করিল না—আস্তে আস্তে ফল তুলিয়া খাইতে লাগিল—ইহাতেই যাহা বলিবার তাহা বলা হইয়া গেল।

কালীপদ প্রত্যহ আশ্চর্য্য হইয়া দেখিতে লাগিল তাহার গ্রাম্য পিতা ভবানীচরণের সঙ্গে শৈলেনের খুব ভাব জমিয়া উঠিল। শৈলেন তাঁহাকে ঠাকুর্দ্দা বলে, এবং পরস্পরের মধ্যে অবাধে ঠাট্টাতামাসা চলে। তাহাদের উভয়পক্ষের হাস্যকৌতুকের প্রধান লক্ষ্য ছিলেন অনুপস্থিত ঠাকরুণদিদি। এতকাল পরে এই পরিহাসের দক্ষিণবায়ুর হিল্লোলে ভবানীচরণের মনে যেন যৌবনস্মৃতির পুলক সঞ্চার করিতে লাগিল। ঠাকরুণদিদির স্বহস্তরচিত আচার আমসত্ব প্রভৃতি সমস্তই শৈলেন রোগীর অনবধানতার অবকাশে চুরি করিয়া নিঃশেষে খাইয়া ফেলিয়াছে একথা আজ সে নির্লজ্জভাবে স্বীকার করিল। এই চুরির খবরে কালীপদর মনে বড় একটি গভীর আনন্দ হইল! তাহার মায়ের হাতের সামগ্রী সে বিশ্বের লোককে ডাকিয়া খাওয়াইতে চায় যদি তাহারা ইহার আদর বোঝে। কালীপদর কাছে আজ নিজের

রোগের শয্যা আনন্দসভা হইয়া উঠিল—এমন সুখ তাহার জীবনে সে অল্পই পাইয়াছে। কেবল ক্ষণে ক্ষণে তাহার মনে হইতে লাগিল আজ মা যদি থাকিতেন! তাহার মা থাকিলে এই কৌতুকপরায়ণ সুন্দর যুবকটিকে যে কত স্নেহ করিতেন সেই কথা সে কল্পনা করিতে লাগিল।

তাহাদের রুগ্নকক্ষসভায় কেবল একটা আলোচনার বিষয় ছিল যেটাতে আনন্দপ্রবাহে মাঝে মাঝে বড় বাধা দিত। কালীপদর মনে যেন দারিদ্র্যের একটা অভিমান ছিল—কোনো একসময়ে তাহাদের প্রচুর ঐশ্বর্য্য ছিল একথা লইয়া বৃথা গর্ব্ব করিতে তাহার ভারি লজ্জা বোধ হইত। আমরা গরিব, এ কথাটাকে কোনো "কিন্তু" দিয়া চাপা দিতে সে মোটেই রাজি ছিল না। ভবানীচরণও যে তাঁহাদের ঐশ্বর্য্যের দিনের কথা গর্ব্ব করিয়া পাড়িতেন তাহা নহে। কিন্তু সে যে তাঁহার সুখের দিন ছিল—তখন তাঁহার যৌবনের দিন ছিল। বিশ্বাসঘাতক সংসারের বীভৎসমূর্ত্তি তখনো ধরা পড়ে নাই। বিশেষত শ্যামাচরণের স্ত্রী, তাঁহার পরমস্নেহশালিনী ভ্রাতৃজায়া রমাসুন্দরী, যখন তাঁহাদের সংসারের গৃহিণী ছিলেন তখন সেই লক্ষ্মীর ভরা ভাণ্ডারের দ্বারে দাঁড়াইয়া কি অজস্র আদরই তাঁহারা লুঠিয়াছিলেন—সেই অস্তমিত সুখের দিনের স্মৃতির ছটাতেই ত ভবানীচরণের জীবনের সন্ধ্যা সোনায় মণ্ডিত হইয়া আছে। কিন্তু এই সমস্ত সুখস্মৃতি আলোচনার মাঝখানে ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবলি সেই উইল-চুরির কথাটা আসিয়া পড়ে। ভবানীচরণ এই প্রসঙ্গে ভারি উত্তেজিত হইয়া পড়েন। এখনো সে উইল পাওয়া যাইবে এ সম্বন্ধে তাঁহার মনে লেশমাত্র সন্দেহ নাই—তাঁহার সতীসাধ্বী মার কথা কখনই ব্যর্থ হইবে না। এই কথা উঠিয়া পড়িলেই কালীপদ মনে মনে অস্থির হইয়া উঠিত। সে জানিত এটা তাহার পিতার একটা পাগলামিমাত্র। তাহারা মায়ে ছেলের এই

পাপ্‌লামিকে আপোসে প্রশ্রয়ও দিয়াছে কিন্তু শৈলেনের কাছে তাহার পিতার এই দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায় এ তাহার কিছুতেই ভাল লাগে না। কতবার সে পিতাকে বলিয়াছে, না বাবা, ওটা তোমার একটা মিথ্যা সন্দেহ।—কিন্তু এরূপ তর্কে উন্টা ফল হইত। তাঁহার সন্দেহ যে অমূলক নহে তাহা প্রমাণ করিবার জন্য সমস্ত ঘটনা তিনি তন্ন তন্ন করিয়া বিবৃত করিতে থাকিতেন। তখন কালীপদ নানা চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই তাঁহাকে থামাইতে পারিত না।

বিশেষত কালীপদ ইহা স্পষ্ট লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছে যে, এই প্রসঙ্গটা কিছুতেই শৈলেনের ভাল লাগে না। এমন কি, সেও বিশেষ একটু যেন উত্তেজিত হইয়া ভবানীচরণের যুক্তি খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিত। অন্য সকল বিষয়েই ভবানীচরণ আর সকলের মত মানিয়া লইতে প্রস্তুত আছেন—কিন্তু এই বিষয়টাতে তিনি কাহারও কাছে হার মানিতে পারেন না। তাঁহার মা লিখিতে পড়িতে জানিতেন—তিনি নিজের হাতে তাঁহার পিতার উইল এবং অন্য দলিলটা বাক্সে বন্ধ করিয়া লোহার সিন্ধুকে তুলিয়াছেন; অথচ তাঁহার সাম্‌নেই মা যখন বাক্স খুলিলেন তখন দেখা গেল অন্য দলিলটা যেমন ছিল তেমনি আছে অথচ উইলটা নাই, ইহাকে চুরি বলা হইবে না ত কি! কালীপদ তাঁহাকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য বলিত—তা বেশত বাবা, যারা তোমার বিষয় ভোগ করিতেছে তারা ত তোমারি ছেলেরই মত, তারা ত তোমারি ভাইপো। সে সম্পত্তি তোমার পিতার বংশেই রহিয়াছে —ইহাই কি কম সুখের কথা!—শৈলেন এসব কথা বেশিক্ষণ সহিতে পারিত না, সে ঘর ছাড়িয়া উঠিয়া চলিয়া যাইত। কালীপদ মনে মনে পীড়িত হইয়া ভাবিত—শৈলেন হয়ত তাহার পিতাকে অর্থলোলুপ বিষয়ী বলিয়া মনে করিতেছে, অথচ তাহার পিতার মধ্যে বৈষয়িকতা র

নামগন্ধ নাই একথা কোনোমতে শৈলেনকে বুঝাইতে পারিলে কালী-পদ বড়ই আরাম পাইত।

এতদিনে কালীপদ ও ভবানীচরণের কাছে শৈলেন আপনার পরিচয় নিশ্চয় প্রকাশ করিত। কিন্তু এই উইল-চুরির আলোচনাতেই তাহাকে বাধা দিল। তাহার পিতা পিতামহ যে উইল চুরি করিয়াছেন একথা সে কোনোমতেই বিশ্বাস করিতে চাহিল না, অথচ ভবানী-চরণের পক্ষে পৈতৃক বিষয়ের ন্যায্য অংশ হইতে বঞ্চিত হওয়ার মধ্যে যে একটা নিষ্ঠুর অন্যায় আছে সেকথাও সে কোনোমতে অস্বীকার করিতে পারিল না। এখন হইতে এই প্রসঙ্গে কোনো প্রকার তর্ক করা সে বন্ধ করিয়া দিল—একেবারে সে চুপ করিয়া থাকিত—এবং যদি কোনো সুযোগ পাইত তবে উঠিয়া চলিয়া যাইত।

এখনো বিকালে একটু অল্প জ্বর আসিয়া কালীপদর মাথা ধরিত কিন্তু সেটাকে সে রোগ বলিয়া গণ্যই করিত না। পড়ার জন্য তাহার মন উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। একবার তাহার স্কলারশিপ্ ফস্কাইয়া গিয়াছে, আর ত সেরূপ হইলে চলিবে না। শৈলেনকে লুকাইয়া আবার সে পড়িতে আরম্ভ করিল—এসম্বন্ধে ডাক্তারের কঠোর নিষেধ আছে জানিয়াও সে তাহা অগ্রাহ্য করিল।

ভবানীচরণকে কালীপদ কহিল, বাবা, তুমি বাড়ি ফিরিয়া যাও—সেখানে মা একলা আছেন। আমি ত বেশ সারিয়া উঠিয়াছি।

শৈলেনও বলিল, এখন আপনি গেলে কোনো ক্ষতি নাই। আর ত ভাবনার কারণ কিছু দেখি না। এখন যেটুক আছে সে দুদিনেই সারিয়া যাইবে। আর, আমরা ত আছি।

ভবানীচরণ কহিলেন—সে আমি বেশ জানি; কালীপদর জন্য ভাবনা করিবার কিছুই নাই। আমার কলিকাতায় আসিবার কোনো

প্রয়োজনই ছিল না, তবু মন মানে কই ভাই! বিশেষত তোমার ঠাকরুণদিদি যখন যেটি ধরেন সে ত আর ছাড়াইবার জো নাই।

শৈলেন হাসিয়া কহিল—ঠাকুর্দ্দা তুমিই ত আদর দিয়া ঠাক্‌রুণ-দিদিকে একেবারে মাটি করিয়াছ।

ভবানীচরণ হাসিয়া কহিলেন, আচ্ছা ভাই আচ্ছা, ঘরে যখন নাৎবৌ আসিবে তখন তোমার শাসনপ্রণালীটা কি রকম কঠোর আকার ধারণ করে দেখা যাইবে।

ভবানীচরণ একান্তভাবে রাসমণির সেবায় পালিত জীব। কলি-কাতার নানা প্রকার আরাম আয়োজনও রাসমণির আদর যত্নের অভাব কিছুতেই পূরণ করিতে পারিতেছিল না। এই কারণে ঘরে যাইবার জন্য তাঁহাকে বড় বেশি অনুরোধ করিতে হইল না।

সকাল বেলায় জিনিষ পত্র বাঁধিয়া প্রস্তুত হইয়াছেন এমন সময় কালীপদর ঘরে গিয়া দেখিলেন তাহার চোখমুখ অত্যন্ত লাল হইয়া উঠিয়াছে—তাহার গা যেন আগুনের মত গরম;—কাল অর্দ্ধেক রাত্রি সে লজিক মুখস্থ করিয়াছে, বাকি রাত্রি এক নিমেষের জন্যও ঘুমাইতে পারে নাই।

কালীপদর দুর্ব্বলতা ত সারিয়া উঠে নাই, তাহার উপরে আবার রোগের প্রবল আক্রমণ দেখিয়া ডাক্তার বিশেষ চিন্তিত হইলেন। শৈলেনকে আড়ালে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিলেন, এবার ত গতিক ভাল বোধ করিতেছি না।

শৈলেন ভবানীচরণকে কহিল, দেখ ঠাকুর্দ্দা, তোমারও কষ্ট হইতেছে রোগীরও বোধ হয় ঠিক তেমন সেবা হইতেছে না, তাই আমি বলি আর দেরি না করিয়া ঠাকরুণদিদিকে আনানো যাক্‌।

শৈলেন যতই ঢাকিয়া বলুক্‌ একটা প্রকাণ্ড ভয় আসিয়া ভবানী-

চরণের মনকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। তাঁহার হাত পা থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তিনি বলিলেন, তোমরা যেমন ভাল বোঝ তাই কর!

রাসমণির কাছে চিঠি গেল তিনি তাড়াতাড়ি বগলাচরণকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় আসিলেন। সন্ধ্যার সময় কলিকাতায় পৌঁছিয়া তিনি কেবল কয়েক ঘণ্টামাত্র কালীপদকে জীবিত দেখিয়াছিলেন। বিকারের অবস্থায় সে রহিয়া রহিয়া মাকে ডাকিয়াছিল—সেই ধ্বনিগুলি তাঁহার বুকে বিঁধিয়া রহিল।

ভবানীচরণ এই আঘাত সহিয়া যে কেমন করিয়া বাঁচিয়া থাকিবেন সেই ভয়ে রাসমণি নিজের শোককে ভাল করিয়া প্রকাশ করিবার আর অবসর পাইলেন না—তাঁহার পুত্র আবার তাঁহার স্বামীর মধ্যে গিয়া বিলীন হইল—স্বামীর মধ্যে আবার দুই জনেরই ভার তাঁহার ব্যথিত হৃদয়ের উপর তিনি তুলিয়া লইলেন। তাঁহার প্রাণ বলিল আর আমার সয় না! তবু তাঁহাকে সহিতেই হইল।

(৫)

রাত্রি তখন অনেক। গভীর শোকের একান্ত ক্লান্তিতে কেবল ক্ষণকালের জন্য রাসমণি অচেতন হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু ভবানীচরণের ঘুম হইতেছিলনা। কিছুক্ষণ বিছানায় এ পাশ ও পাস করিয়া অবশেষে দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে “দয়াময় হরি” বলিয়া উঠিয়া পড়িয়াছেন। কালীপদ যখন গ্রামের বিদ্যালয়েই পড়িত, যখন সে কলিকাতায় যায় নাই তখন সে যে-একটি কোণের ঘরে বসিয়া পড়াশুনা করিত ভবানীচরণ কম্পিত হস্তে একটি প্রদীপ ধরিয়া সেই শূন্যঘরে প্রবেশ করিলেন। রাসমণির হাতে চিত্র করা ছিন্ন কাঁথাটি এখনো তক্তাপোষের উপর পাতা আছে, তাহার নানাস্থানে এখনো

সেই কালীর দাগ রহিয়াছে; মলিন দেয়ালের গায়ে কয়লায় আঁকা সেই জ্যামিতির রেখাগুলি দেখা যাইতেছে; তক্তাপোষের এক কোণে কতকগুলি হাতে বাঁধা ময়লা কাগজের খাতার সঙ্গে তৃতীয় খণ্ড রয়াল রীডারের ছিন্নাবশেষ আজিও পড়িয়া আছে। আর—হায় হায়—তার ছেলে-বয়সের ছোট পায়ের এক পাটি চটি যে ঘরের কোণে পড়িয়াছিল তাহা এতদিন কেহ দেখিয়াও দেখে নাই, আজ তাহা সকলের চেয়ে বড় হইয়া চোখে দেখা দিল—জগতে এমন কোনো মহৎ সামগ্রী নাই যাহা আজ ঐ ছোট জুতাটিকে আড়াল করিয়া রাখিতে পারে।

কুলুঙ্গিতে প্রদীপটি রাখিয়া ভবানীচরণ সেই তক্তাপোষের উপর আসিয়া বসিলেন। তাঁহার শুষ্ক চোখে জল আসিল না, কিন্তু তাঁহার বুকের মধ্যে কেমন করিতে লাগিল—যথেষ্ট পরিমাণে নিশ্বাস লইতে তাঁহার পাঁজর যেন ফাটিয়া যাইতে চাহিল। ঘরের পূর্ব্বদিকের দরজা খুলিয়া দিয়া গরাদে ধরিয়া তিনি বাহিরের দিকে চাহিলেন।

অন্ধকার রাত্রি—টিপটিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। সম্মুখে প্রাচীর-বেষ্টিত ঘন জঙ্গল। তাহার মধ্যে ঠিক পড়িবার ঘরের সাম্নে একটুখানি জমিতে কালীপদ বাগান করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিল। এখনো তাহার স্বহস্তে রোপিত ঝুমকালতা কঞ্চির বেড়ার উপর প্রচুর পল্লব বিস্তার করিয়া সজীব আছে—তাহা ফুলে ফুলে ভরিয়া গিয়াছে।

আজ সেই বালকের যত্নপালিত বাগানের দিকে চাহিয়া তাঁহার প্রাণ যেন কণ্ঠের কাছে উঠিয়া আসিল। আর কিছু আশা করিবার নাই; গ্রীষ্মের সময় পূজার সময় কলেজের ছুটি হয় কিন্তু যাহার জন্ত তাঁহার দরিদ্র ঘর শূন্ত হইয়া আছে সে আর কোনো দিন কোনো ছুটিতেই ঘরে ফিরিয়া আসিবে না। "ওরে বাপ আমার!" বলিয়া ভবানীচরণ সেইখানেই মাটিতে বসিয়া পড়িলেন। কালীপদ তাহার

বাপের দারিদ্র্য ঘুচাইবে বলিয়াই কলিকাতায় গিয়াছিল কিন্তু জগৎ সংসারে সে এই বৃদ্ধকে কি একান্ত নিঃসম্বল করিয়াই চলিয়া গেল! বাহিরে বৃষ্টি আরো চাপিয়া আসিল।

এমন সময়ে অন্ধকারে ঘাস-পাতার মধ্যে পায়ের শব্দ শোনা গেল। ভবানীচরণের বুকের মধ্যে ধড়াস্ করিয়া উঠিল। যাহা কোনোমতেই আশা করিবার নহে তাহাও যেন তিনি আশা করিয়া বসিলেন। তাঁহার মনে হইল কালীপদ যেন বাগান দেখিতে আসিয়াছে। কিন্তু বৃষ্টি যে মুষলধারায় পড়িতেছে—ওযে ভিজিবে, এই অসম্ভব উদ্বেগে যখন তাঁহার মনের ভিতরটা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে এমন সময়ে কে গরাদের বাহিরে তাঁহার ঘরের সামনে আসিয়া মুহূর্ত্তকালের জন্য দাঁড়াইল। চাদর দিয়া সে মাথা মুড়ি দিয়াছে—তাহার মুখ চিনিবার জো নাই। কিন্তু সে যেন মাথায় কালীপদরই মত হইবে। এসেছিস্ বাপ্—বলিয়া ভবানীচরণ তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাহিরের দরজা খুলিতে গেলেন। দ্বার খুলিয়া বাগানে আসিয়া সেই ঘরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সেখানে কেহই নাই। সেই বৃষ্টিতে বাগানময় ঘুরিয়া বেড়াইলেন কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। সেই নিশীথরাত্রে অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়াইয়া ভাঙা গলায় একবার "কালীপদ" বলিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিলেন—কাহারও সাড়া পাইলেন না। সেই ডাকে নটু চাকরটা গোহাল ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া অনেক করিয়া বৃদ্ধকে ঘরে লইয়া আসিল।

পরদিন সকালে নটু ঘর ঝাট দিতে গিয়া দেখিল গরাদের সামনেই ঘরের ভিতরে পুঁটুলিতে বাঁধা একটা কি পড়িয়া আছে। সেটা সে ভবানীচরণের হাতে আনিয়া দিল। ভবানীচরণ খুলিয়া দেখিলেন একটা পুরাতন দলিলের মত। চষমা বাহির করিয়া চোখে লাগাইয়া

একটু পড়িয়াই তিনি তাড়াতাড়ি ছুটিয়া রাসমণির সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কাগজখানা তাঁহার নিকট মেলিয়া ধরিলেন।

রাসমণি জিজ্ঞাসা করিলেন—ও কিও ?

ভবানীচরণ কহিলেন—সেই উইল।

রাসমণি কহিলেন—কে দিল ?

ভবানীচরণ কহিলেন—কালরাত্রে সে আসিয়াছিল—সে দিয়া গেছে।

রাসমণি জিজ্ঞাসা করিলেন—এ কি হইবে ?

ভবানীচরণ কহিলেন—আর আমার কোনো দরকার নাই। বলিয়া সেই দলিল ছিন্ন ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন।

এ সংবাদটা পাড়ায় যখন রটিয়া গেল তখন বগলাচরণ মাথা নাড়িয়া সগর্ব্বে বলিল—আমি বলি নাই, কালীপদকে দিয়াই উইল উদ্ধার হইবে ?

রামচরণ মুদি কহিল—কিন্তু দাদাঠাকুর, কাল যখন রাত দশটার গাড়ি এষ্টেশনে পৌঁছিল তখন একটি সুন্দর দেখিতে বাবু আমার দোকানে আসিয়া চৌধুরীদের বাড়ির পথ জিজ্ঞাসা করিল—আমি তাহাকে পথ দেখাইয়া দিলাম। তার হাতে যেন কি একটা দেখিয়াছিলাম।—

"আরে দুর" বলিয়া এ কথাটাকে বগলাচরণ একেবারেই উড়াইয়া দিল!

পণরক্ষা।

বংশীবদন তাহার ভাই রসিককে যেমন ভালবাসিত এমন করিয়া সচরাচর মাও ছেলেকে ভালবাসিতে পারে না। পাঠশালা হইতে রসিকের আসিতে যদি কিছু বিলম্ব হইত তবে সকল কাজ ফেলিয়া সে তাহার সন্ধানে ছুটিত। তাহাকে না খাওয়াইয়া সে নিজে খাইতে পারিত না। রসিকের অল্প কিছু অসুখবিসুখ হইলেই বংশীর দুই চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল ঝরিতে থাকিত।

রসিক বংশীর চেয়ে ষোল বছরের ছোট। মাঝে যে কয়টি ভাই-বোন জন্মিয়াছিল সবগুলিই মারা গিয়াছে। কেবল এই সব-শেষের-টিকে রাখিয়া, যখন রসিকের এক বছর বয়স, তখন তাহার মা মারা গেল এবং রসিক যখন তিন বছরের ছেলে তখন সে পিতৃহীন হইল। এখন রসিককে মানুষ করিবার ভার একা এই বংশীর উপর।

তাঁতে কাপড় বোনাই বংশীর পৈতৃক ব্যবসায়। এই ব্যবসা করিয়াই বংশীর বৃদ্ধ প্রপিতামহ অভিরাম বসাক গ্রামে যে দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছে আজও সেখানে রাধানাথের বিগ্রহ স্থাপিত আছে। কিন্তু সমুদ্রপার হইতে একদল দৈত্য আসিয়া বেচারা তাঁতের উপর অগ্নিবান হানিল এবং তাঁতীর ঘরে ক্ষুধাসুরকে বসাইয়া দিয়া বাষ্পফুৎকারে মুহুর্মুহু জয়শৃঙ্গ বাজাইতে লাগিল।

তবু তাঁতের কঠিন প্রাণ মরিতে চায় না—ঠুক্‌ঠাক্ ঠুক্‌ঠাক্ করিয়া সুতা দাঁতে লইয়া মাকু এখনো চলাচল করিতেছে—কিন্তু তাহার সাবেক চালচলন চঞ্চল লক্ষ্মীর মনঃপূত হইতেছে না, লোহার দৈত্যটা কলে-বলে-কৌশলে তাঁহাকে একেবারে বশ করিয়া লইয়াছে।

বংশীর একটু সুবিধা ছিল। থানাগড়ের বাবুরা তাহার মুরুব্বি ছিলেন। তাঁহাদের বৃহৎ পরিবারের সমুদয় সৌখীন কাপড় বংশীই বুনিয়া দিত। একলা সব পারিয়া উঠিত না, সে জন্য তাহাকে লোক রাখিতে হইয়াছিল।

যদিচ তাহাদের সমাজে মেয়ের দর বড় বেশি তবু চেষ্টা করিলে বংশী এতদিনে যেমনতেমন একটা বউ ঘরে আনিতে পারিত। রসিকের জন্যই সে আর ঘটিয়া উঠিল না। পূজার সময় কলিকাতা হইতে রসিকের যে সাজ আমদানি হইত তাহা যাত্রার দলের রাজপুত্রকেও লজ্জা দিতে পারিত। এইরূপ আর আর সকল বিষয়েই রসিকের যাহা কিছু প্রয়োজন ছিলনা তাহা জোগাইতে গিয়া বংশীকে নিজের সকল প্রয়োজনকেই খর্ব্ব করিতে হইল।

তবু বংশরক্ষা করিতে ত হইবে। তাহাদের বিবাহযোগ্য ঘরের একটি মেয়েকে মনে মনে ঠিক করিয়া বংশী টাকা জমাইতে লাগিল। তিনশো টাকা পণ এবং অলঙ্কার বাবদ আর একশো টাকা হইলেই মেয়েটিকে পাওয়া যাইবে স্থির করিয়া অল্প-অল্প কিছু-কিছু সে খরচ বাঁচাইয়া চলিল। হাতে যথেষ্ট টাকা ছিল না বটে কিন্তু যথেষ্ট সময় ছিল। কারণ মেয়েটির বয়স সবে চার—এখনো অন্তত চার পাঁচ বছর মেয়াদ পাওয়া যাইতে পারে।

কিন্তু কোষ্ঠিতে তাহার সঞ্চয়ের স্থানে দৃষ্টি ছিল রসিকের। সে দৃষ্টি শুভগ্রহের দৃষ্টি নহে।

রসিক ছিল তাহাদের পাড়ার ছোট ছেলে এবং সমবয়সীদের দলের সর্দ্দার। যে লোক সুখে মানুষ হয় এবং যাহা চায় তাহাই পাইয়া থাকে ভাগ্যদেবতীকর্ত্তৃক বঞ্চিত হতভাগাদের পক্ষে তাহার ভারি একটা আকর্ষণ আছে। তাহার কাছে ঘেঁষিতে পাওয়াই যেন কতকটা পরিমাণে প্রার্থিত বস্তুকে পাওয়ার সামিল। যাহার অনেক আছে সে যে অনেক দেয় বলিয়াই লোকে তাহার কাছে আনাগোনা করে তাহা নহে—সে কিছু না দিলেও মানুষের লুব্ধ কল্পনাকে তৃপ্ত করে।

শুধু যে রসিকের সৌখিনতাই পাড়ার ছেলেদের মন মুগ্ধ করিয়াছে এ কথা বলিলে তাহার প্রতি অবিচার করা হইবে। সকল বিষয়েই রসিকের এমন একটি আশ্চর্য্য নৈপুণ্য ছিল যে তাহার চেয়ে উচ্চবংশের ছেলেরাও তাহাকে খাতির না করিয়া থাকিতে পারিত না। সে যাহাতে হাত দেয় তাহাই অতি সুকৌশলে করিতে পারে। তাহার মনের উপর যেন কোনো পূর্ব্বসংস্কারের মূঢ়তা চাপিয়া নাই সেইজন্য সে যাহা দেখে তাহাই গ্রহণ করিতে পারে।

রসিকের এই কারুনৈপুণ্যের জন্য তাহার কাছে ছেলেমেয়েরা, এমন কি, তাহাদের অভিভাবকেরা পর্য্যন্ত উমেদারি করিত। কিন্তু তাহার দোষ ছিল কি, কোনো একটা কিছুতে সে বেশি দিন মন দিতে পারিত না। একটা কোনো বিদ্যা আয়ত্ত করিলেই আর সেটা তাহার ভাল লাগিত না—তখন তাহাকে সেবিষয়ে সাধ্যসাধনা করিতে গেলে সে বিরক্ত হইয়া উঠিত। বাবুদের বাড়িতে দেওয়ালির উৎসবে কলিকাতা হইতে আতসবাজিওয়ালা আসিয়াছিল—তাহাদের কাছ হইতে সে বাজি তৈরি শিখিয়া কেবল দুটো বৎসর পাড়ার কালীপূজার উৎসবকে জ্যোতির্ম্ময় করিয়া তুলিয়াছিল; তৃতীয়

বৎসরে কিছুতেই আর তুবড়ির ফোয়ারা ছুটিল না—রসিক তখন, চাপকানজোব্বাপরা মেডেল-ঝোলানো এক নব্য যাত্রাওয়ালার দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়া বাক্স হার্ম্মোনিয়ম লইয়া লক্ষ্ণৌ ঠুংরি সাধিতেছিল।

তাহার ক্ষমতার এই খামখেয়ালী লীলায় কখনো সুলভ কখনো দুর্লভ হইয়া সে লোককে আরো বেশি মুগ্ধ করিত, তাহার নিজের দাদার ত কথাই নাই। দাদা কেবলি ভাবিত, এমন আশ্চর্য্য ছেলে আমাদের ঘরে আসিয়া জন্মিয়াছে এখন কোনোমতে বাঁচিয়া থাকিলে হয়—এই ভাবিয়া নিতান্ত অকারণেই তাহার চোখে জল আসিত এবং মনে মনে রাধানাথের কাছে ইহাই প্রার্থনা করিত যে আমি যেন উহার আগে মরিতে পারি।

এমনতর ক্ষমতাশালী ভাইয়ের নিত্যনূতন সখ মিটাইতে গেলে ভাবীবধূ কেবলি দূরতর ভবিষ্যতে অন্তর্ধান করিতে থাকে অথচ বয়স চলিয়া যায় অতীতের দিকেই। বংশীর বয়স যখন ত্রিশ পার হইল, টাকা যখন একশত পূরিল না এবং সেই মেয়েটি অন্যত্র শ্বশুরঘর করিতে গেল তখন বংশী মনে মনে কহিল, আমার আর বড় আশা দেখি না, এখন বংশরক্ষার ভার রসিককেই লইতে হইবে।

পাড়ায় যদি স্বয়ম্বরপ্রথা চলিত থাকিত তবে রসিকের বিবাহের জন্য কাহাকেও ভাবিতে হইত না। বিধু, তারা, ননী, শশী, সুধা—এমন কত নাম করিব—সবাই রসিককে ভালবাসিত। রসিক যখন কাদা লইয়া মাটির মূর্ত্তি গড়িবার মেজাজে থাকিত তখন তাহার তৈরি পুতুলের অধিকার লইয়া মেয়েদের মধ্যে বন্ধুবিচ্ছেদের উপক্রম হইত। ইহাদের মধ্যে একটি মেয়ে ছিল, সৌরভী, সে বড় শান্ত—সে চুপ করিয়া বসিয়া পুতুলগড়া দেখিতে ভালবাসিত এবং প্রয়োজনমত রসিককে কাদাকাঠি প্রভৃতি অগ্রসর করিয়া দিত। তাহার ভারি

ইচ্ছা রসিক তাহাকে একটা কিছু ফরমাস করে। কাজ করিতে করিতে রসিক পান চাহিবে জানিয়া সৌরভী তাহা জোগাইয়া দিবার জন্য প্রতিদিন প্রস্তুত হইয়া আসিত। রসিক স্বহস্তের কীর্ত্তিগুলি তাহার সামনে সাজাইয়া ধরিয়া যখন বলিত, সৈরী, তুই এর কোন্‌টা নিবি বল্‌—তখন সে ইচ্ছা করিলে যেটা খুসি লইতে পারিত কিন্তু সঙ্কোচে কোনোটাই লইত না; রসিক নিজের পচ্ছন্দমত জিনিষটি তাহাকে তুলিয়া দিত। পুতুলগড়ার পর্ব্ব শেষ হইলে যখন হার্ম্মোনিয়ম বাজাইবার দিন আসিল তখন পাড়ার ছেলেমেয়েরা সকলেই এই যন্ত্রটা টেপাটুপি করিবার জন্য ঝুঁকিয়া পড়িত—রসিক তাহাদের সকলকেই হুঙ্কার দিয়া খেদাইয়া রাখিত। সৌরভী কোন উৎপাত করিত না—সে তাহার ডুরে শাড়ি পরিয়া বড় বড় চোখ মেলিয়া বামহাতের উপর শরীরটার ভর দিয়া হেলিয়া বসিয়া চুপ করিয়া আশ্চর্য্য হইয়া দেখিত। রসিক ডাকিত, আয় সৈরি, একবার টিপিয়া দেখ্‌। সে মৃদু মৃদু হাসিত, অগ্রসর হইতে চাহিত না। রসিক অসম্মতিসত্ত্বেও নিজের হাতে তাহার আঙুল ধরিয়া তাহাকে দিয়া বাজাইয়া লইত।

সৌরভীর দাদা গোপালও রসিকের ভক্তবৃন্দের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ছিল। সৌরভীর সঙ্গে তাহার প্রভেদ এই যে, ভাল জিনিষ লইবার জন্য তাহাকে কোনদিন সাধিতে হইত না। সে আপনি ফরমাস করিত এবং না পাইলে অস্থির করিয়া তুলিত। নূতনগোছের যাহা কিছু দেখিত তাহাই সে সংগ্রহ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিত। রসিক কাহারো আবদার বড় সহিতে পারিত না, তবু গোপাল যেন অন্য ছেলেদের চেয়ে রসিকের কাছে কিছু বেশি প্রশ্রয় পাইত।

বংশী মনে ঠিক করিল এই সৌরভীর সঙ্গেই রসিকের বিবাহ

দিতে হইবে। কিন্তু সৌরভীর ঘর তাহাদের চেয়ে বড়—পাঁচশো টাকার কমে কাজ হইবার আশা নাই।

এতদিন বংশী কখনো রসিককে তাহার তাঁতবোনায় সাহায্য করিতে ডাকে নাই। খাটুনি সমস্তই সে নিজের ঘাড়ে লইয়াছিল। রসিক নানাপ্রকার বাজে কাজ লইয়া লোকের মনোরঞ্জন করিত ইহা তাহার দেখিতে ভালই লাগিত। রসিক ভাবিত, দাদা কেমন করিয়া যে রোজই এই এক তাঁতের কাজ লইয়া পড়িয়া থাকে কে জানে! আমি হইলে ত মরিয়া গেলেও পারিতাম না। তাহার দাদা নিজের সম্বন্ধে নিতান্তই টানাটানি করিয়া চালাইত ইহাতে সে দাদাকে কৃপণ বলিয়া জানিত। তাহার দাদার সম্বন্ধে রসিকের মনে যথেষ্ট একটা লজ্জা ছিল। শিশুকাল হইতেই সে নিজেকে তাহার দাদা হইতে সকল বিষয়ে ভিন্ন শ্রেণীর লোক বলিয়াই জানিত। তাহার দাদাই তাহার এই ধারণাকে প্রশ্রয় দিয়া আসিয়াছে।

এমন সময়ে বংশী নিজের বিবাহের আশা বিসর্জ্জন দিয়া রসিকেরই বধূ আনিবার জন্য যখন উৎসুক হইল তখন বংশীর মন আর ধৈর্য্য মানিতে চাহিল না। প্রত্যেক মাসের বিলম্ব তাহার কাছে অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। বাজনা বাজিতেছে, আলো জ্বালা হইয়াছে, বরসজ্জা করিয়া রসিকের বিবাহ হইতেছে, এই আনন্দের ছবি বংশীর মনে তৃষার্ত্তের সম্মুখে মৃগতৃষ্ণিকার মত কেবলি জাগিয়া আছে।

তবু যথেষ্ট দ্রুতবেগে টাকা জমিতে চায় না। যত বেশি চেষ্টা করে ততই যেন সফলতাকে আরো বেশি দূরবর্ত্তী বলিয়া মনে হয়। বিশেষত মনের ইচ্ছার সঙ্গে শরীরটা সমানবেগে চলিতে চায় না, বারবার ভাঙিয়া পড়ে। পরিশ্রমের মাত্রা দেহের শক্তিকে ছাড়াইয়া যাইবার জো করিয়াছে।

যখন সমস্ত গ্রাম নিষুপ্ত, কেবল নিশা নিশাচরীর চৌকিদারের মত প্রহরে প্রহরে শৃগালের দল হাঁক দিয়া যাইতেছে তখনো মিট্‌মিটে প্রদীপে বংশী কাজ করিতেছে এমন কত রাত ঘটিয়াছে। বাড়িতে তাহার এমন কেহই ছিল না যে তাহাকে নিষেধ করে। এদিকে যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্টিকর আহার হইতেও বংশী নিজেকে বঞ্চিত করিয়াছে। গায়ের শীতবস্ত্রখানা জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, তাহা নানা ছিদ্রের খিড়কির পথ দিয়া গোপনে শীতকে ডাকিয়া-ডাকিয়াই আনে। গত দুই বৎসর হইতে প্রত্যেক শীতের সময়ই বংশী মনে করে এইবারটা একরকম করিয়া চালাইয়া দিই, আর একটু হাতে টাকা জমুক, আসচে বছরে যখন কাবুলিওয়ালা তাহার শীতবস্ত্রের বোঝা লইয়া গ্রামে আসিবে তখন একটা কাপড় ধারে কিনিয়া তাহার পরের বৎসরে শোধ করিব, ততদিনে তহবিল ভরিয়া উঠিবে। সুবিধামত বৎসর আসিল না। ইতিমধ্যে তাহার শরীর টেঁকে না এমন হইয়া আসিল।

এতদিন পরে বংশী তাহার ভাইকে বলিল তাঁতের কাজ আমি একলা চালাইয়া উঠিতে পারি না তুমি আমার কাজে যোগ দাও। রসিক কোন জবাব না করিয়া মুখ বাঁকাইল। শরীরের অসুখে বংশীর মেজাজ খারাপ ছিল, সে রসিককে ভর্ৎসনা করিল; কহিল, বাপ-পিতামহের ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া তুমি যদি দিনরাত হো হো করিয়া বেড়াইবে তবে তোমার দশা হইবে কি?

কথাটা অসঙ্গত নহে এবং ইহাকে কটূক্তিও বলা যায় না। কিন্তু রসিকের মনে হইল এত বড় অন্যায় তাহার জীবনে সে কোনোদিন সহ্য করে নাই। সেদিন বাড়িতে সে বড় একটা কিছু খাইল না; ছিপ হাতে করিয়া চন্দনীদহে মাছ ধরিতে বসিল। শীতের মধ্যাহ্ন নিস্তব্ধ, ভাঙা উঁচু পাড়ির উপর শালিক নাচিতেছে, পশ্চাতের আম-

বাগানে ঘুঘু ডাকিতেছে এবং জলের কিনারায় শৈবালের উপর একটি পতঙ্গ তাহার স্বচ্ছ দীর্ঘ দুই পাখা মেলিয়া দিয়া স্থিরভাবে রৌদ্র পোহাইতেছে। কথা ছিল রসিক আজ গোপালকে লাঠিখেলা শিখাইবে—গোপাল তাহার আশু কোনো সম্ভাবনা না দেখিয়া রসিকের ভাঁড়ের মধ্যেকার মাছ ধরিবার কেঁচোগুলাকে লইয়া অস্থিরভাবে ঘাঁটাঘাঁটি করিতে লাগিল—রসিক তাহার গালে ঠাস করিয়া এক চড় কসাইয়া দিল। কখন্ তাহার কাছে রসিক পান চাহিবে বলিয়া সৌরভী যখন ঘাটের পাশে ঘাসের উপর দুই পা মেলিয়া অপেক্ষা করিয়া আছে এমন সময়ে রসিক হঠাৎ তাহাকে বলিল, "সৈরী, বড় ক্ষুধা পাইয়াছে, কিছু খাবার আনিয়া দিতে পারিস্?" সৌরভী খুসি হইয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া বাড়ি হইতে আঁচল ভরিয়া মুড়িমুড়কি আনিয়া উপস্থিত করিল। রসিক সেদিন তাহার দাদার কাছেও ঘেঁষিল না।

বংশীর শরীর মন খারাপ ছিল, রাত্রে সে তাহার বাপকে স্বপ্নে দেখিল। স্বপ্ন হইতে উঠিয়া তাহার মন আরও বিকল হইয়া উঠিল। তাহার নিশ্চয় মনে হইল বংশলোপের আশঙ্কায় তাহার বাপের পরলোকেও ঘুম হইতেছে না।

পরদিন বংশী কিছু জোর করিয়াই রসিককে কাজে বসাইয়া দিল। কেননা ইহা ত ব্যক্তিগত সুখদুঃখের কথা নহে, এ যে বংশের প্রতি কর্ত্তব্য। রসিক কাজে বসিল বটে কিন্তু তাহাতে কাজের সুবিধা হইল না; তাহার হাত আর চলেই না, পদে পদে সুতা ছিঁড়িয়া যায়, সুতা সারিয়া তুলিতে তাহার বেলা কাটিতে থাকে। বংশী মনে করিল ভালরূপ অভ্যাস নাই বলিয়াই এমনটা ঘটিতেছে, কিছুদিন গেলেই হাত দুরস্ত হইয়া যাইবে।

কিন্তু স্বভাবপটু রসিকের হাত দুরস্ত হইবার দরকার ছিলনা

বলিয়াই তাহার হাত দুরন্ত হইতে চাহিল না। বিশেষত তাহার অনুগতবর্গ তাহার সন্ধানে আসিয়া যখন দেখিত সে নিতান্ত ভাল-মানুষটির মত তাহাদের বাপ পিতামহের চিরকালীন ব্যবসায়ে লাগিয়া গেছে তখন রসিকের মনে ভারি লজ্জা এবং রাগ হইতে লাগিল।

দাদা তাহাকে তাহার এক বন্ধুর মুখ দিয়া খবর দিল যে, সৌরভীর সঙ্গেই রসিকের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করা যাইতেছে। বংশী মনে করিয়াছিল এই সুখবরটায় নিশ্চয়ই রসিকের মন নরম হইবে। কিন্তু সেরূপ ফলত দেখা গেল না। "দাদা মনে করিয়াছেন সৌরভীর সঙ্গে বিবাহ হইলেই আমার মোক্ষলাভ হইবে!" সৌরভীর প্রতি হঠাৎ তাহার ব্যবহারের এমনি পরিবর্ত্তন হইল যে সে বেচারা আঁচলের প্রান্তে পান বাঁধিয়া তাহার কাছে আসিতে আর সাহসই করিত না—সমস্ত রকমসকম দেখিয়া কি জানি এই ছোট শান্ত মেয়েটির ভারি কান্না পাইতে লাগিল। হার্ম্মোনিয়ম বাজনা সম্বন্ধে অন্য মেয়েদের চেয়ে তাহার যে একটু বিশেষ অধিকার ঘটিয়াছিল, সে ত ঘুচিয়াই গেল—তার পর সর্ব্বদাই রসিকের যে ফাইফরমাস খাটিবার ভার তাহার উপর ছিল সেটাও রহিল না। হঠাৎ জীবনটা ফাঁকা এবং সংসারটা নিতান্তই ফাঁকি বলিয়া তাহার কাছে মনে হইতে লাগিল।

এতদিন রসিক এই গ্রামের বনবাদাড়, রথতলা, রাধানাথের মন্দির, নদী, খেয়াঘাট, বিল, দীঘি, কামারপাড়া, ছুতারপাড়া, হাট, বাজার সমস্তই আপনার আনন্দে ও প্রয়োজনে বিচিত্রভাবে অধিকার করিয়া লইয়াছিল। সব জায়গাতেই তাহার একটা একটা আড্ডা ছিল, যেদিন যেখানে খুসি কখনো বা একলা কখনো বা দলবলে কিছু না কিছু লইয়া থাকিত! এই গ্রাম এবং থানাগড়ের বাবুদের বাড়ি ছাড়া জগতের আর যে কোনো অংশ তাহার জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয়

তাহা সে কোনোদিন মনেও করে নাই। আজ এই গ্রামে তাহার মন আর কুলাইল না। দূর দূর বহু দূরের জন্য তাহার চিত্ত ছটফট করিতে লাগিল। তাহার অবসর যথেষ্ট ছিল—বংশী তাহাকে খুব বেশীক্ষণ কাজ করাইত না। কিন্তু ঐ একটুকুক্ষণ কাজ করিয়াই তাহার সমস্ত অবসর পর্য্যন্ত যেন বিস্বাদ হইয়া গেল;—এরূপ খণ্ডিত অবসরকে কোনো ব্যবহারে লাগাইতে তাহার ভাল লাগিল না।

(৩)

এই সময়ে থানাগড়ের বাবুদের একছেলে এক বাইসিকল্ কিনিয়া আনিয়া চড়া অভ্যাস করিতেছিল। রসিক সেটাকে লইয়া অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই এমন আয়ত্ত করিয়া লইল যেন সে তাহার নিজেরই পায়ের তলাকার একটা ডানা। কিন্তু কি চমৎকার, কি স্বাধীনতা, কি আনন্দ! দূরত্বের সমস্ত বাধাকে এই বাহনটা যেন তীক্ষ্ম সুদর্শন চক্রের মত অতি অনায়াসেই কাটিয়া দিয়া চলিয়া যায়। ঝড়ের বাতাস যেন চাকার আকার ধারণ করিয়া উন্মত্তের মত মানুষকে পিঠে করিয়া লইয়া ছোটে। রামায়ণ মহাভারতের সময় মানুষে কখনো কখনো দেবতার অস্ত্র লইয়া যেমন ব্যবহার করিতে পাইত—এ যেন সেই রকম।

রসিকের মনে হইল এই বাইসিকল্ নহিলে তাহার জীবন বৃথা। দাম এমনই কি বেশি? একশো পচিশ টাকা মাত্র! এই একশো পঁচিশ টাকা দিয়া মানুষ একটা নূতন শক্তি লাভ করিতে পারে—ইহা ত সস্তা! বিষ্ণুর গরুড়বাহন এবং সূর্য্যের অরুণসারথি ত সৃষ্টিকর্ত্তাকে কম ভোগ ভোগায় নাই আর ইন্দ্রের উচ্চৈশ্রবার জন্য সমুদ্রমন্থন করিতে হইয়াছিল—কিন্তু এই বাইসিকল্‌টি আপন পৃথিবীজয়ী গতিবেগ স্তব্ধ

করিয়া কেবল একশো পঁচিশ টাকার জন্তে দোকানের এক কোণে দেয়াল ঠেস্ দিয়া প্রতীক্ষা করিয়া আছে।

দাদার কাছে রসিক আর কিছু চাইবে না পণ করিয়াছিল কিন্তু সে পণ রক্ষা হইল না। তবে, চাওয়াটার কিছু বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া দিল। কহিল—আমাকে একশো পঁচিশ টাকা ধার দিতে হইবে।

বংশীর কাছে রসিক কিছুদিন হইতে কোনো আবদার করে নাই ইহাতে শরীরের অসুখের উপর আর একটা গভীরতর বেদনা বংশীকে দিনরাত্রি পীড়া দিতেছিল। তাই রসিক তাহার কাছে দরবার উপস্থিত করিবামাত্রই মুহূর্ত্তের জন্ত বংশীর মন নাচিয়া উঠিল; মনে হইল, দূর হোক গে ছাই, এমন করিয়া আর টানাটানি করা যায় না—দিয়া ফেলি। কিন্তু বংশ? সে যে একেবারেই ডোবে! একশো পঁচিশ টাকা দিলে আর বাকী থাকে কি! ধার! রসিক একশো পঁচিশ টাকা ধার শুধিবে! তাই যদি সম্ভব হইত তবে ত বংশী নিশ্চিন্ত হইয়া মরিতে পারিত।

বংশী মনটাকে একেবারে পাথরের মত শক্ত করিয়া বলিল, সে কি হয়, একশো পঁচিশ টাকা আমি কোথায় পাইব! রসিক বন্ধুদের কাছে বলিল, এ টাকা যদি না পাই তবে আমি বিবাহ করিবই না। বংশীর কানে যখন সে কথা গেল তখন সে বলিল, এও ত মজা মন্দ নয়। পাত্রীকে টাকা দিতে হইবে আবার পাত্রকে না দিলেও চলিবে না! এমন দায় ত আমাদের সাত পুরুষের মধ্যে কখনো ঘটে নাই।

রসিক সুস্পষ্ট বিদ্রোহ করিয়া তাঁতের কাজ হইতে অবসর হইল। জিজ্ঞাসা করিলে বলে, আমার অসুখ করিয়াছে। তাঁতের কাজ না করা ছাড়া তাহার আহার বিহারে অসুখের অন্ত কোনো লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। বংশী মনে মনে একটু অভিমান করিয়া বলিল, থাক্,

উহাকে আমি আর কখনো কাজ করিতে বলিব না—বলিয়া রাগ করিয়া নিজেকে আরো বেশি কষ্ট দিতে লাগিল। বিশেষত সেই বছরেই বয়কটের কল্যাণে হঠাৎ তাঁতের কাপড়ের দর এবং আদর অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। তাঁতীদের মধ্যে যাহারা অন্য কাজে ছিল তাহারাও প্রায় সকলে তাঁতে ফিরিল। নিয়তচঞ্চল মাকুগুলা ইঁদুর বাহনের মত সিদ্ধিদাতা গণনায়ককে বাংলাদেশের তাঁতীর ঘরে দিনরাত কাঁধে করিয়া দৌড়াইতে লাগিল। এখন এক মুহূর্ত্ত তাঁত কামাই পড়িলে বংশীর মন অস্থির হইয়া উঠে;—এই সময়ে রসিক যদি তাহার সাহায্য করে তবে দুই বৎসরের কাজ ছয় মাসে আদায় হইতে পারে কিন্তু সে আর ঘটিল না। কাজেই ভাঙা শরীর লইয়া বংশী একেবারে সাধ্যের অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে লাগিল।

রসিক প্রায় বাড়ির বাহিরে বাহিরেই কাটায়। কিন্তু হঠাৎ একদিন যখন সন্ধ্যার সময় বংশীর হাত আর চলে না, পিঠের দাঁড়া যেন ফাটিয়া পড়িতেছে, কেবলি কাজের গোলমাল হইয়া যাইতেছে এবং তাহা সারিয়া লইতে বৃথা সময় কাটিতেছে এমন সময় শুনিতে পাইল সেই কিছুকালের উপেক্ষিত হার্ম্মোনিয়ম যন্ত্রে আবার লক্ষ্ণৌ ঠুংরি বাজিতেছে। এমন দিন ছিল যখন কাজ করিতে করিতে রসিকের এই হার্ম্মোনিয়ম বাজনা শুনিলে গর্ব্বে ও আনন্দে বংশীর মন পুলকিত হইয়া উঠিত আজ একেবারেই সেরূপ হইল না। সে তাঁত ফেলিয়া ঘরের আঙিনার কাছে আসিয়া দেখিল একজন কোথাকার অপরিচিত লোককে রসিক বাজনা শুনাইতেছে। ইহাতে তাহার জ্বরতপ্ত ক্লান্তদেহ আরো জ্বলিয়া উঠিল। মুখে তাহার যাহা আসিল তাহাই বলিল। রসিক উদ্ধত হইয়া জবাবকরিল—তোমার অন্নে যদি আমি ভাগ বসাই তবে আমি ইত্যাদি ইত্যাদি। বংশী কহিল, আর মিথ্যা বড়াই করিয়া

কাজ নাই তোমার সামর্থ্য যতদূর ঢের দেখিয়াছি। শুধু বাবুদের নকলে বাজনা বাজাইয়া নবাবী করিলেই ত হয় না! বলিয়া সে চলিয়া গেল—আর তাঁতে বসিতে পারিল না; ঘরে মাদুরে গিয়া শুইয়া পড়িল।

রসিক যে হার্ম্মোনিয়ম বাজাইয়া চিত্তবিনোদন করিবার জন্য সঙ্গী জুটাইয়া আনিয়াছিল তাহা নহে। থানাগড়ে যে সার্কাসের দল আসিয়াছিল রসিক সেই দলে চাকরির উমেদারি করিতে গিয়াছিল। সেই দলেরই একজনের কাছে নিজের ক্ষমতার পরিচয় দিবার জন্য তাহাকে, যতগুলি গৎ জানে একে একে শুনাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল—এমন সময় সঙ্গীতের মাঝখানে নিতান্ত অন্যরকম সুর আসিয়া পৌঁছিল।

আজ পর্য্যন্ত বংশীর মুখ দিয়া এমন কঠিন কথা কখনো বাহির হয় নাই। নিজের বাক্যে সে নিজেই আশ্চর্য্য হইয়া গেল। তাহার মনে হইল যেন তাহাকে অবলম্বন করিয়া আর একজন কে এই নিষ্ঠুর কথাগুলো বলিয়া গেল। এমনতর মর্ম্মান্তিক ভর্ৎসনার পরে বংশীর পক্ষে আর তাহার সেই সঞ্চয়ের টাকা রক্ষা করা সম্ভবপর নহে। যে টাকার জন্য হঠাৎ এমন অভাবনীয় কাণ্ডটা ঘটিতে পারিল সেই টাকার উপর বংশীর ভারি একটা রাগ হইল—তাহাতে আর তাহার কোনো সুখ রহিল না। রসিক যে তাহার কত আদরের সামগ্রী এই কথা কেবলি তাহার মনের মধ্যে তোলপাড় করিতে লাগিল। যখন সে দাদা শব্দ পর্য্যন্ত উচ্চারণ করিতে পারিত না, যখন তাহার দুরন্ত হস্ত হইতে তাঁতের সুতাগুলোকে রক্ষা করা এক বিষম ব্যাপার ছিল, যখন তাহার দাদা হাত বাড়াইবামাত্র সে অন্য সকলের কোল হইতেই ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সবেগে তাহার বুকের উপর আসিয়া পড়িত, এবং তাহার ঝাঁকড়া চুল ধরিয়া টানাটানি করিত, তাহার নাক ধরিয়া দন্ত-

হীন মুখের মধ্যে পুরিবার চেষ্টা করিত সে সমস্তই সুস্পষ্ট মনে পড়িয়া বংশীর প্রাণের ভিতরটাতে হাহা করিতে লাগিল। সে আর শুইয়া থাকিতে পারিল না। রসিকের নাম ধরিয়া বারকয়েক করুণকণ্ঠে ডাকিল। সাড়া না পাইয়া তাহার জ্বর লইয়াই সে উঠিল। গিয়া দেখিল, সেই হার্ম্মোনিয়মটা পাশে পড়িয়া আছে, অন্ধকারে দাওয়ায় রসিক চুপ করিয়া একলা বসিয়া। তখন বংশী কোমর হইতে সাপের মত সরু লম্বা এক থলি খুলিয়া ফেলিল রুদ্ধপ্রায়কণ্ঠে কহিল, এই নে ভাই—আমার এ টাকা সমস্ত তোরই জন্য। 'তোরই বৌ ঘরে আনিব বলিয়া আমি এ জমাইতেছিলাম। কিন্তু তোকে কাঁদাইয়া আমি জমাইতে পারিব না ভাই আমার, গোপাল আমার,—আমার সে শক্তি নাই - তুই চাকার গাড়ি কিনিস তোর যা খুসি তাই করিস্। রসিক দাঁড়াইয়া উঠিয়া শপথ করিয়া কঠোরস্বরে কহিল, চাকার গাড়ি কিনিতে হয়, বৌ আনিতে হয় আমার নিজের টাকায় করিব, তোমার ও টাকা আমি ছুঁইব না। বলিয়া বংশীর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল। উভয়ের মধ্যে আর এই টাকার কথা বলার পথ রহিল না—কোনো কথা বলাই অসম্ভব হইয়া উঠিল।

(৪)

রসিকের ভক্তশ্রেষ্ঠ গোপাল আজকাল অভিমান করিয়া দূরে দূরে থাকে। রসিকের সাম্‌নে দিয়া তাহাকে দেখাইয়া দেখাইয়া একাই মাছ ধরিতে যায় আগেকার মত তাহাকে ডাকাডাকি করে না। আর সৌরভীর ত কথাই নাই। রসিকদাদার সঙ্গে তাহার আড়ি, একেবারে জন্মের মত আড়ি—অথচ সে যে এত বড় একটা ভয়ঙ্কর আড়ি করিয়াছে সেটা রসিককে স্পষ্ট করিয়া জানাইবার সুযোগ না পাইয়া

আপন মনে ঘরের কোণে অভিমানে ক্ষণে ক্ষণে কেবলি তাহার দুই চোখ ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

এমন সময় একদিন রসিক মধ্যাহ্নে গোপালদের বাড়িতে গিয়া তাহাকে ডাক দিল। আদর করিয়া তাহার কান মলিয়া দিল, তাহাকে কাতুকুতু দিতে লাগিল। গোপাল প্রথমটা প্রবল আপত্তি প্রকাশ করিয়া লড়াইয়ের ভাব দেখাইল কিন্তু বেশিক্ষণ সেটা রাখিতে পারিল না; দুইজনে বেশ হাস্যালাপ জমিয়া উঠিল। রসিক কহিল, "গোপাল, আমার হার্মোনিয়মটি নিবি!"

হার্মোনিয়ম! এত বড় দান! কলির সংসারে এও কি কখনো সম্ভব! কিন্তু যে জিনিষটা তাহার ভাল লাগে বাধা না পাইলে সেটা অসঙ্কোচে গ্রহণ করিবার শক্তি গোপালের যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। অতএব হার্মোনিয়মটি সে অবিলম্বে অধিকার করিয়া লইল, বলিয়া রাখিল ফিরিয়া চাহিলে আর কিন্তু পাইবে না।

গোপালকে যখন রসিক ডাক দিয়াছিল তখন নিশ্চয় জানিয়াছিল সে ডাক অন্তত আরো একজনের কানে গিয়া পৌঁছিয়াছে। কিন্তু বাহিরে আজ তাহার কোনো প্রমাণ পাওয়া গেল না। তখন রসিক গোপালকে বলিল—সৈরি কোথায় আছে একবার ডাকিয়া আন্‌ ত।

গোপাল ফিরিয়া আসিয়া কহিল, সৈরি বলিল তাহাকে এখন বড়ি শুকাইতে দিতে হইবে তাহার সময় নাই।—রসিক মনে মনে হাসিয়া কহিল, চল্‌ দেখি সে কোথায় বড়ি শুকাইতেছে। রসিক আঙিনার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল কোথাও বড়ির নামগন্ধ নাই। সৌরভী তাহাদের পায়ের শব্দ পাইয়া আর কোথাও লুকাইবার উপায় না দেখিয়া তাহাদের দিকে পিঠ করিয়া মাটির প্রাচীরের কোণ ঠেসিয়া দাঁড়াইল। রসিক তাহার কাছে গিয়া তাহাকে ফিরাইবার চেষ্টা করিয়া

বলিল, রাগ করেছিস্ সৈরি ?—সে আঁকিয়া বাঁকিয়া রসিকের চেষ্টাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া দেয়ালের দিকেই মুখ করিয়া রহিল।

একদা রসিক আপন খেয়ালে নানা রঙের সুতা মিলাইয়া নানা চিত্র বিচিত্র করিয়া একটা কাঁথা শেলাই করিতেছিল। মেয়েরা যে কাঁথা শেলাই করিত তাহার কতকগুলা বাঁধা নক্সা ছিল—কিন্তু রসিকের সমস্তই নিজের মনের রচনা। যখন এই শেলাইয়ের ব্যাপার চলিতেছিল তখন সৌরভী আশ্চর্য্য হইয়া একমনে তাহা দেখিত—সে মনে করিত জগতে কোথাও এমন আশ্চর্য্য কাঁথা আজ পর্য্যন্ত রচিত হয় নাই। প্রায় যখন কাঁথা শেষ হইয়া আসিয়াছে এমন সময়ে রসিকের বিরক্তি বোধ হইল, সে আর শেষ করিল না। ইহাতে সৌরভী মনে ভারি পীড়া বোধ করিয়াছিল—এইটে শেষ করিয়া ফেলিবার জন্য সে রসিককে কতবার যে কত সানুনয় অনুরোধ করিয়াছে তাহার ঠিক নাই। আর ঘণ্টা দুই তিন বসিলেই শেষ হইয়া যায় কিন্তু রসিকের যাহাতে গা লাগেনা তাহাতে তাহাকে প্রবৃত্ত করাইতে কে পারে। হঠাৎ এতদিন পরে রসিক কাল রাত্রি জাগিয়া সেই কাঁথাটি শেষ করিয়াছে।

রসিক বলিল, সৈরি, সেই কাঁথাটা শেষ করিয়াছি একবার দেখবি না ?

অনেক কষ্টে সৌরভীর মুখ ফিরাইতেই সে আঁচল দিয়া মুখ ঝাঁপিয়া ফেলিল। তখন যে তাহার দুই কপোল বাহিয়া জল পড়িতেছিল, সে জল সে দেখাইবে কেমন করিয়া ?

সৌরভীর সঙ্গে তাহার পূর্ব্বের সহজ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে রসিকের যথেষ্ট সময় লাগিল। অবশেষে উভয়পক্ষে সন্ধি যখন এতদূর অগ্রসর হইল যে সৌরভী রসিককে পান আনিয়া দিল তখন রসিক সেই

কাঁথার আবরণ খুলিয়া সেটা আঙিনার উপর মেলিয়া দিল্—সৌরভীর হৃদয়টি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেল। অবশেষে যখন রসিক বলিল, সৈরি, এ কাঁথা তোর জন্যেই তৈরি করিয়াছি, এটা আমি তোকেই দিলাম—তখন এত বড় অভাবনীয় দান কোনোমতেই সৌরভী স্বীকার করিয়া লইতে পারিল না। পৃথিবীতে সৌরভী কোনো দুর্লভ জিনিষ দাবী করিতে শেখে নাই। গোপাল তাহাকে খুব ধমক দিল। মানুষের মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্মতা সম্বন্ধে তাহার কোনো বোধ ছিল না;—সে মনে করিল, লোভনীয় জিনিষ লইতে লজ্জা একটা নিরবচ্ছিন্ন কপটতামাত্র। গোপাল ব্যর্থ কালব্যয় নিবারণের জন্য নিজেই কাঁথাটা ভাঁজ করিয়া লইয়া ঘরের মধ্যে রাখিয়া আসিল। বিচ্ছেদ মিটমাট হইয়া গেল এখন হইতে আবার পূর্ব্বতন প্রণালীতে তাহাদের বন্ধুত্বের ইতিহাসের দৈনিক অনুবৃত্তি চলিতে থাকিবে দুটি বালকবালিকার মন এই আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

সেদিন পাড়ায় তাহার দলের সকল ছেলেমেয়ের সঙ্গেই রসিক আগেকার মতই ভাব করিয়া লইল—কেবল তাহার দাদার ঘরে একবারও প্রবেশ করিল না। যে প্রৌঢ়া বিধবা তাহাদের বাড়িতে আসিয়া রাঁধিয়া দিয়া যায় সে আসিয়া যখন সকালে বংশীকে জিজ্ঞাসা করিল, আজ কি রান্না হইবে—বংশী তখন বিছানায় শুইয়া। সে বলিল আমার শরীর ভাল নাই, আজ আমি কিছু খাইবনা—রসিককে ডাকিয়া তুমি খাওয়াইয়া দিয়ো।—স্ত্রীলোকটি বলিল রসিক তাহাকে বলিয়াছে, সে আজ বাড়িতে খাইবে না—অন্যত্র বোধ করি তাহার নিমন্ত্রণ আছে।—শুনিয়া বংশী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া গায়ের কাপড়টায় মাথা পর্য্যন্ত মুড়িয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

রসিক যেদিন সন্ধ্যার পর গ্রাম ছাড়িয়া সার্কাসের দলের সঙ্গে

চলিয়া গেল সেদিন এমনি করিয়াই কাটিল। শীতের রাত্রি; আকাশে আধখানি চাঁদ উঠিয়াছে। সেদিন হাট ছিল। হাট সারিয়া সকলেই চলিয়া গিয়াছে—কেবল যাহাদের দূর পাড়ায় বাড়ি এখনো তাহারা মাঠের পথে কথা কহিতে কহিতে চলিয়াছে। একখানি বোঝাইশূন্য গোরুর গাড়িতে গাড়োয়ান র‍্যাপার মুড়ি দিয়া নিদ্রামগ্ন; গরু দুটি আপন মনে ধীরে ধীরে বিশ্রামশালার দিকে গাড়ি টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। গ্রামের গোয়ালঘর হইতে খড়জ্বালানো ধোঁয়া বায়ুহীন শীতরাত্রে হিমভারাক্রান্ত হইয়া স্তরে স্তরে বাঁশঝাড়ের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া আছে।—রসিক যখন প্রান্তরের প্রান্তে গিয়া পৌঁছিল, যখন অস্ফুট চন্দ্রালোকে তাহাদের গ্রামের ঘন গাছগুলির নীলিমাও আর দেখা যায় না, তখন রসিকের মনটা কেমন করিয়া উঠিল। তখনো ফিরিয়া আসার পথ কঠিন ছিল না কিন্তু তখনো তাহার হৃদয়ের কঠিনতা যায় নাই। উপার্জ্জন করি না অথচ দাদার অন্ন খাই, যেমন করিয়া হৌক এ লাঞ্ছনা না মুছিয়া নিজের টাকায় কেনা বাইসিকেলে না চড়িয়া আজন্মকালের এই গ্রামে আর ফিরিয়া আসা চলিবে না—রহিল এখানকার চন্দনীদহের ঘাট; এখানকার সুখসাগর দীঘি; এখানকার ফাল্গুন মাসে শর্ষে ক্ষেতের গন্ধ, চৈত্র মাসে আমবাগানে মৌমাছির গুঞ্জনধ্বনি; রহিল এখানকার বন্ধুত্ব এখানকার আমোদ উৎসব,—এখন সম্মুখে অপরিচিত পৃথিবী, অনাত্মীয় সংসার, এবং ললাটে অদৃষ্টের লিখন।

(৫)

রসিক একমাত্র তাঁতের কাজেই যত অসুবিধা দেখিয়াছিল। তাহার মনে হইত আর সকল কাজই ইহার চেয়ে ভাল। সে মনে করিয়াছিল একবার তাহার সঙ্কীর্ণ ঘরের বন্ধন ছেদন করিয়া বাহির হইতে

পারিলেই তাহার কোনো ভাবনা নাই। তাই সে ভারি আনন্দে পথে বাহির হইয়াছিল। মাঝখানে যে কোনো বাধা, কোনো কষ্ট, কোনো দীর্ঘকালব্যয় আছে তাহা তাহার মনেও হইল না। বাহিরে দাঁড়াইয়া দূরের পাহাড়কেও যেমন মনে হয় অনতিদূরে—যেমন মনে হয় আধ-ঘণ্টার পথ পার হইলেই বুঝি তাহার শিখরে গিয়া পৌঁছিতে পারা যায়—গ্রামের বেষ্টন হইতে বাহির হইবার সময় নিজের ইচ্ছার দুর্লভ সার্থকতাকে রসিকের তেমনি সহজগম্য এবং অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী বলিয়া বোধ হইল। কোথায় যাইতেছে রসিক কাহাকেও তাহার কোনো খবর দিল না। একদিন স্বয়ং সে খবর বহন করিয়া আসিবে এই তাহার পণ রহিল।

কাজ করিতে গিয়া দেখিল, বেগারের কাজে আদর পাওয়া যায় এবং সেই আদর সে বরাবর পাইয়াছে কিন্তু যেখানে গরজের কাজ সেখানে দয়ামায়া নাই। যখন দর্শকের মত দেখিয়াছিল তখন রসিক মনে করিয়াছিল সার্কাসে ভারি মজা। কিন্তু যখন সে ভিতরে প্রবেশ করিল মজা তখন বাহির হইয়া আসিল। যাহা আমোদের জিনিষ যখন তাহা আমোদ দেয় না, যখন তাহার প্রতিদিনের পুনরাবৃত্তি বন্ধ হইলে প্রাণ বাঁচে অথচ তাহা কিছুতেই বন্ধ হইতে চায় না, তখন তাহার মত অরুচিকর জিনিষ আর কিছুই হইতে পারে না। এই সার্কাসের দলের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া রসিকের প্রত্যেক দিনই তাহার পক্ষে একান্ত বিস্বাদ হইয়া উঠিল। সে প্রায়ই বাড়ীর স্বপ্ন দেখে। রাত্রে ঘুম হইতে জাগিয়া অন্ধকারে প্রথমটা রসিক মনে করে সে তাহার দাদার বিছানার কাছে শুইয়া আছে, মুহূর্ত্তকাল পরেই চমক ভাঙিয়া দেখে দাদা কাছে নাই। বাড়িতে থাকিতে এক-একদিন শীতের রাত্রে ঘুমের ঘোরে সে অনুভব করিত, দাদা তাহার শীত করিতেছে মনে

করিয়া তাহার গাত্রবস্ত্রের উপরে নিজের কাপড়খানা ধীরে ধীরে চাপাইয়া দিতেছে; এখানে পৌষের রাত্রে যখন ঘুমের ঘোরে তাহার শীতশীত করে তখন দাদা তাহার গায়ে ঢাকা দিতে আসিবে মনে করিয়া সে যেন অপেক্ষা করিতে থাকে,—দেরি হইতেছে দেখিয়া রাগ হয়। এমন সময় জাগিয়া উঠিয়া মনে পড়ে দাদা কাছে নাই এবং সেই সঙ্গে ইহাও মনে হয় যে এই শীতের সময় তাহার গায়ে আপন কাপড়টি টানিয়া দিতে না পারিয়া আজ রাত্রে শূন্যশয্যার প্রান্তে তাহার দাদার মনে শান্তি নাই। তখনই সেই অর্দ্ধরাত্রে সে মনে করে কাল সকালে উঠিয়াই আমি ঘরে ফিরিয়া যাইব। কিন্তু ভাল করিয়া জাগিয়া উঠিয়া আবার সে শক্ত করিয়া প্রতিজ্ঞা করে; মনে মনে আপনাকে বারবার করিয়া জপাইতে থাকে যে, আমি পণের টাকা ভর্ত্তি করিয়া বাইসিকলে চড়িয়া বাড়ি ফিরিব তবে আমি পুরুষ মানুষ, তবে আমার নাম রসিক।

একদিন দলের কর্ত্তা তাহাকে তাঁতী বলিয়া বিশ্রী করিয়া গালি দিল। সেই দিন রসিক তাহার সামান্য কয়েকটি কাপড়, ঘটি ও থালা বাটি, নিজের যে কিছু ঋণ ছিল তাহার পরিবর্ত্তে ফেলিয়া রাখিয়া সম্পূর্ণ রিক্তহস্তে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। সমস্ত দিন কিছু খাওয়া হয় নাই। সন্ধ্যার সময় যখন নদীর ধারে দেখিল গোরুগুলা আরামে চরিয়া খাইতেছে তখন একপ্রকার ঈর্ষার সহিত তাহার মনে হইতে লাগিল পৃথিবী যথার্থ এই পশুপক্ষীদের মা—নিজের হাতে তাহাদের মুখে আহারের গ্রাস তুলিয়া দেন—আর মানুষ বুঝি তাঁর কোন্ সতীনের ছেলে, তাই চারিদিকে এত বড় মাঠ ধূ ধূ করিতেছে কোথাও রসিকের জন্য এক মুষ্টি অন্ন নাই। নদীর কিনারায় গিয়া রসিক অঞ্জলি ভরিয়া খুব খানিকটা জল খাইল। এই নদীটির ক্ষুধা নাই,

তৃষ্ণা নাই, কোনো ভাবনা নাই, কোনো চেষ্টা নাই, ঘর নাই তবু ঘরের অভাব নাই, সম্মুখে অন্ধকার রাত্রি আসিতেছে তবু সে নিরুদ্বেগে নিরুদ্দেশের অভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে এই কথা ভাবিতে ভাবিতে রসিক একদৃষ্টে জলের স্রোতের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল—বোধ করি তাহার মনে হইতেছিল দুর্ব্বহ মানবজন্মটাকে এই বন্ধনহীন নিশ্চিন্ত জলধারার সঙ্গে মিশাইয়া ফেলিতে পারিলেই একমাত্র শান্তি।

এমন সময় একজন তরুণ যুবক মাথা হইতে একটা বস্তা নামাইয়া তাহার পাশে বসিয়া কোঁচার প্রান্ত হইতে চিঁড়া খুলিয়া লইয়া ভিজাইয়া খাইবার উদ্যোগ করিল। এই লোকটিকে দেখিয়া রসিকের কিছু নূতন রকমের ঠেকিল। পায়ে জুতা নাই, ধুতির উপর একটা জামা, মাথায় পাগড়ি পরা—দেখিবামাত্র স্পষ্ট মনে হয় ভদ্রলোকের ছেলে—কিন্তু মুটে মজুরের মত কেন যে সে এমন করিয়া বস্তা বহিয়া বেড়াইতেছে ইহা সে বুঝিতে পারিল না। দুই জনের আলাপ হইতে দেরি হইল না এবং রসিক ভিজা চিঁড়ার যথোচিত পরিমাণে ভাগ লইল। এ ছেলেটি কলিকাতার কলেজের ছাত্র। ছাত্রেরা যে স্বদেশী কাপড়ের দোকান খুলিয়াছে তাহারই জন্য দেশী কাপড় সংগ্রহ করিতে সে এই গ্রামের হাটে আসিয়াছে। নাম সুবোধ, জাতিতে ব্রাহ্মণ। তাহার কোনো সঙ্কোচ নাই, বাধা নাই—সমস্ত দিন হাটে ঘুরিয়া সন্ধ্যাবেলায় চিঁড়া ভিজাইয়া খাইতেছে।

দেখিয়া নিজের সম্বন্ধে রসিকের ভারি একটা লজ্জা বোধ হইল। শুধু তাই নয়, তাহার মনে হইল যেন মুক্তি পাইলাম। এমন করিয়া খালি পায়ে মজুরের মত যে মাথায় মোট বহিতে পারা যায় ইহা উপলব্ধি করিয়া জীবনযাত্রার ক্ষেত্র এক মুহূর্ত্তে তাহার সম্মুখে প্রসারিত হইয়া গেল। সে ভাবিতে লাগিল আজ ত আমার উপবাস করিবার

কোনো দরকারই ছিল না—আমি ত ইচ্ছা করিলেই মোট বাহিতে পারিতাম।

সুবোধ যখন মোট মাথায় লইতে গেল রসিক বাধা দিয়া বলিল, মোট আমি বহিব। সুবোধ তাহাতে নারাজ হইলে রসিক কহিল, আমি তাঁতীর ছেলে, আমি আপনার মোট বহিব, আমাকে কলিকাতায় লইয়া যান। "আমি তাঁতী" আগে হইলে রসিক এ কথা কখনই মুখে উচ্চারণ করিতে পারিত না—তাহার বাধা কাটিয়া গেছে।

সুবোধ ত লাফাইয়া উঠিল—বলিল, তুমি তাঁতী! আমি ত তাঁতী খুঁজিতেই বাহির হইয়াছি। আজকাল তাহাদের দর এত বাড়িয়াছে যে কেহই আমাদের তাঁতের স্কুলে শিক্ষকতা করিতে যাইতে রাজি হয় না।

রসিক তাঁতের স্কুলের শিক্ষক হইয়া কলিকাতায় আসিল। এতদিন পরে বাসাখরচধাদে সে সামান্য কিছু জমাইতে পারিল কিন্তু বাইসিক্‌ল্ চক্রের লক্ষ্য ভেদ করিতে এখনো অনেক বিলম্ব আছে। আর বধূর বরমাল্যের ত কথাই নাই। ইতিমধ্যে তাঁতের স্কুলটা গোড়ায় যেমন হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিয়াছিল তেমনি হঠাৎ নিবিয়া যাইবার উপক্রম করিল। কমিটির বাবুরা যতক্ষণ কমিটি করিতে থাকেন অতি চমৎকার হয় কিন্তু কাজ করিতে নামিলেই গণ্ডগোল বাধে; তাঁহারা নানা দিগ্‌দেশ হইতে নানা প্রকারের তাঁত আনাইয়া শেষকালে এমন একটা অপরূপ জঞ্জাল বুনিয়া তুলিলেন যে, সমস্ত ব্যাপারটা লইয়া যে কোন্ আবর্জ্জনাকুণ্ডে ফেলা যাইতে পারে তাহা কমিটির পর কমিটি করিয়াও স্থির করিতে পারিলেন না।

রসিকের আর সহ্য হয় না। ঘরে ফিরিবার জন্য তাহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। চোখের সাম্‌নে সে কেবলি আপনার

গ্রামের নানা ছবি দেখিতেছে। অতি তুচ্ছ খুঁটিনাটিও উজ্জ্বল হইয়া তাহার মনের সামনে দেখা দিয়া যাইতেছে। পুরোহিতের আধপাগলা ছেলেটা; তাহাদের প্রতিবেশীর কপিল বর্ণের বাছুরটা; নদীর পথে যাইতে রাস্তার দক্ষিণ ধারে একটা তালগাছকে শিকড় দিয়া আঁটিয়া জড়াইয়া একটা অশথ গাছ দুই কুস্তিগির পালোয়ানের মত প্যাঁচ কষিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহারই তলায় একটা অনেকদিনের পরিত্যক্ত ভিটা; তাহাদের বিলের তিনদিকে আমন ধান, একপাশে গভীর জলের প্রান্তে মাছধরা *জাল্‌ বাঁধিবার জন্য বাঁশের খোঁটা পোঁতা, তাহারি উপরে একটি মাছরাঙা চুপ করিয়' বসিয়া; কৈবর্ত্তপাড়া হইতে সন্ধ্যার পরে মাঠ পার হইয়া কীর্ত্তনের শব্দ আসিতেছে; ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে নানাপ্রকার মিশ্রিত গন্ধে গ্রামের ছায়াময় পথে স্তব্ধ হাওয়া ভরিয়া রহিয়াছে; আর তারই সঙ্গে মিলিয়া তাহার সেই ভক্তবন্ধুর দল, সেই চঞ্চল গোপাল, সেই আঁচলের খুঁটে পান বাঁধা বড় বড় স্নিগ্ধ চোখ মেলা সৌরভী; এই সমস্ত স্মৃতি, ছবিতে গন্ধে শব্দে স্নেহে প্রীতিতে বেদনায় তাহার মনকে প্রতিদিন গভীরতর আবিষ্ট করিয়া ধরিতে লাগিল। গ্রামে থাকিতে রসিকের যে নানাপ্রকার কারুনৈপুণ্য প্রকাশ পাইত এখানে তাহা একেবারে বন্ধ হইয়া গেছে, এখানে তাহার কোনো মূল্য নাই; এখানকার দোকান বাজারের কলের তৈরি জিনিষ হাতের চেষ্টাকে লজ্জা দিয়া নিরস্ত করে। তাঁতের ইস্কুলের কাজ কাজের বিড়ম্বনামাত্র, তাহাতে মন ভরে না। থিয়েটারের দীপশিখা তাহার চিত্তকে পতঙ্গের মত মরণের পথে টানিয়াছিল —কেবল টাকা জমাইবার কঠোর নিষ্ঠা তাহাকে বাঁচাইয়াছে। সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে কেবলমাত্র তাহার গ্রামটিতে যাইবার পথই তাহার কাছে একেবারে রুদ্ধ। এই জন্যই গ্রামে যাইবার টান প্রতি মুহূর্ত্তে

তাহাকে এমন করিয়া পীড়া দিতেছে। তাঁতের ইস্কুলে সে প্রথমটা ভারি ভরসা পাইয়াছিল, কিন্তু আজ যখন সে আশা আর টেঁকে না, যখন তাহার দুই মাসের বেতনই সে আদায় করিতে পারিল না তখন সে আপনাকে আর ধরিয়া রাখিতে পারে না এমন হইল। সমস্ত লজ্জা স্বীকার করিয়া মাথা হেঁট করিয়া, এই এক বৎসরের ব্যর্থতা বহিয়া দাদার আশ্রয়ে যাইবার জন্য তাহার মনের মধ্যে কেবলি তাগিদ আসিতে লাগিল।

যখন মনটা অত্যন্ত যাই-যাই করিতেছে এমন সময় তাহার বাসার কাছে খুব ধূম করিয়া একটা বিবাহ হইল। সন্ধ্যাবেলায় বাজনা বাজাইয়া বর আসিল। সেই দিন রাত্রে রসিক স্বপ্ন দেখিল, তাহার মাথায় টোপর, গায়ে লাল চেলি, কিন্তু সে গ্রামের বাঁশঝাড়ের আড়ালে দাঁড়াইয়া আছে। পাড়ার ছেলেমেয়েরা, তোর বর আসিয়াছে বলিয়া সৌরভীকে ক্ষ্যাপাইতেছে, সৌরভী বিরক্ত হইয়া কাঁদিয়া ফেলিয়াছে —রসিক তাহাদিগকে শাসন করিতে ছুটিয়া আসিতে চায়, কিন্তু কেমন করিয়া কেবলি বাঁশের কঞ্চিতে তাহার কাপড় জড়াইয়া যায়, ডালে তাহার টোপর আট্‌কায়, কোনোমতেই পথ করিয়া বাহির হইতে পারে না। জাগিয়া উঠিয়া রসিকের মনের মধ্যে ভারি লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। বধূ তাহার জন্য ঠিক করা আছে অথচ সেই বধূকে ঘরে আনিবার যোগ্যতা তাহার নাই এইটেই তাহার কাপুরুষতার সব চেয়ে চূড়ান্ত পরিচয় বলিয়া মনে হইল। না—এতবড় দীনতা স্বীকার করিয়া গ্রামে ফিরিয়া যাওয়া কোনোমতেই হইতে পারে না।

(৬)

অনাবৃষ্টি যখন চলিতে থাকে তখন দিনের পর দিন কাটিয়া যায় মেঘের আর দেখা নাই, যদি বা মেঘ দেখা দেয় বৃষ্টি পড়ে না, যদি বা

বৃষ্টি পড়ে তাহাতে মাটি ভেজে না ;—কিন্তু বৃষ্টি যখন নামে তখন দিগ-ন্তের এক কোণে যেমনি মেঘ দেখা দেয় অমনি দেখিতে দেখিতে আকাশ ছাইয়া ফেলে এবং অবিরল বর্ষণে পৃথিবী ভাসিয়া যাইতে থাকে। রসিকের ভাগ্যে হঠাৎ সেই রকমটা ঘটিল।

জানকী নন্দী মস্ত ধনী লোক। সে একদিন কাহার কাছ হইতে কি একটা খবর পাইল ; তাঁতের ইস্কুলের সামনে তাহার জুড়ি আসিয়া থামিল, তাঁতের ইস্কুলের মাষ্টারের সঙ্গে তাহার দুই চারটে কথা হইল এবং তাহার পরদিনেই রসিক আপনার মেসের বাসা পরিত্যাগ করিয়া নন্দী বাবুদের মস্ত তেতালা বাড়ির এক ঘরে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

নন্দীবাবুদের বিলাতের সঙ্গে কমিসন এজেন্সির মস্ত কারবার—সেই কারবারে কেন যে জানকী বাবু অযাচিতভাবে রসিককে একটা নিতান্ত সামান্য কাজে নিযুক্ত করিয়া যথেষ্ট পরিমাণে বেতন দিতে লাগিলেন তাহা রসিক বুঝিতেই পারিল না। সে রকম কাজের জন্য লোক সন্ধান করিবারই দরকারই হয় না, এবং যদি বা লোক জোটে তাহার ত এত আদর নহে। বাজারে নিজের মূল্য কত এতদিনে রসিক তাহা বুঝিয়া লইয়াছে অতএব জানকী বাবু যখন তাহাকে ঘরে রাখিয়া যত্ন করিয়া খাওয়াইতে লাগিলেন তখন রসিক তাহার এত আদরের মূলকারণ সুদূর আকাশের গ্রহনক্ষত্র ছাড়া আর কোথাও খুঁজিয়া পাইল না।

কিন্তু তাহার শুভগ্রহটি অত্যন্ত দূরে ছিল না। তাহার একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ বলা আবশ্যক।

একদিন জানকী বাবুর অবস্থা এমন ছিল না। তিনি যখন কষ্ট করিয়া কলেজে পড়িতেন তখন তাঁহার সতীর্থ ছিল হরমোহন ; তিনি ব্রাহ্মসমাজের লোক। এই কমিসন এজেন্সি হরমোহনদেরই পৈতৃক

বাণিজ্য—তাঁহাদের একজন মুরুব্বি ইংরেজ সদাগর তাঁহার পিতাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন তিনি তাঁহাকে এই কাজে জুড়িয়া দিয়াছিলেন। হরমোহন তাঁহার নিঃস্ব বন্ধু জানকীকে এই কাজে টানিয়া লইলেন।

সেই দরিদ্র অবস্থায় নূতন যৌবনে সমাজসংস্কারসম্বন্ধে জানকীর উৎসাহ হরমোহনের চেয়ে কিছুমাত্র কম ছিল না। তাই তিনি পিতার মৃত্যুর পরে তাঁহার ভগিনীর বিবাহের সম্বন্ধ ভাঙিয়া দিয়া তাহাকে বড় বয়স পর্য্যন্ত লেখাপড়া শিখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাতে তাঁহাদের তন্তুবায়সমাজে যখন তাঁহার ভগিনীর বিবাহ অসম্ভব হইয়া উঠিল তখন কায়স্থ হরমোহন নিজে তাঁহাকে এই সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিয়া এই মেয়েটিকে বিবাহ করিলেন।

তাহার পরে অনেকদিন চলিয়া গিয়াছে। হরমোহনেরও মৃত্যু হইয়াছে তাঁহার ভগিনীও মারা গেছে। ব্যবসাটিও প্রায় সম্পূর্ণ জানকীর হাতে আসিয়াছে। ক্রমে বাসাবাড়ি হইতে তাঁহার তেতালা বাড়ি হইল, চিরকালের নিকেলের ঘড়িটিকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিয়া সোনার ঘড়ি সুয়োরাণীর মত তাঁহার বক্ষের পার্শ্বে টিক্‌টিক্ করিতে লাগিল।

এইরূপে তাঁহার তহবীল যতই স্ফীত হইয়া উঠিল—অল্প বয়সের অকিঞ্চন অবস্থার সমস্ত উৎসাহ ততই তাঁহার কাছে নিতান্ত ছেলেমানুষী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কোনোমতে পারিবারিক পূর্ব্ব-ইতিহাসের এই অধ্যায়টাকে বিলুপ্ত করিয়া দিয়া সমাজে উঠিবার জন্য তাঁহার রোখ চাপিয়া উঠিল। নিজের মেয়েটিকে সমাজে বিবাহ দিবেন এই তাঁহার জেদ। টাকার লোভ দেখাইয়া দুই একটি পাত্রকে রাজি করিয়াছিলেন কিন্তু যখনি তাহাদের আত্মীয়েরা খবর পাইল তখনি তাহারা গোলমাল করিয়া বিবাহ ভাঙিয়া দিল। শিক্ষিত

সৎপাত্র না হইলেও তাঁহার চলে—কন্যার চিরজীবনের সুখ বলিদান দিয়াও তিনি সমাজদেবতার প্রসাদলাভের জন্য উৎসুক হইয়া উঠিলেন।

এমন সময়ে তিনি তাঁতের ইস্কুলের মাষ্টারের খবর পাইলেন। সে থানাগড়ের বসাক বংশের ছেলে—তাহার পূর্ব্বপুরুষ অভিরাম বসাকের নাম সকলেই জানে—এখন তাহাদের অবস্থা হীন কিন্তু কুলে তাহারা তাঁহাদের চেয়ে বড়।

দূর হইতে দেখিয়া গৃহিণীর ছেলেটিকে পছন্দ হইল। স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ছেলেটির পড়াশুনা কি রকম?—জানকী বাবু বলিলেন, সে বালাই নাই। আজকাল যাহার পড়াশুনা বেশি, তাহাকে হিন্দুয়ানিতে আঁটিয়া ওঠা শক্ত। গৃহিণী প্রশ্ন করিলেন—টাকাকড়ি? জানকী বাবু বলিলেন, যথেষ্ট অভাব আছে। আমার পক্ষে সেইটেই লাভ।—গৃহিণী কহিলেন, আত্মীয় স্বজনদের ত ডাকিতে হইবে। জানকীবাবু কহিলেন, পূর্ব্বে অনেকবার সে পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে; তাহাতে আত্মীয়স্বজনেরা দ্রুতবেগে ছুটিয়া আসিয়াছে কিন্তু বিবাহ হয় নাই। এবারে স্থির করিয়াছি আগে বিবাহ দিব, আত্মীয় স্বজন-দের সঙ্গে মিষ্টালাপ পরে সময়মত করা যাইবে।

রসিক যখন দিনে রাত্রে তাহার গ্রামে ফিরিবার কথা চিন্তা করিতেছে—এবং হঠাৎ অভাবনীয়রূপে অতি সত্বর টাকা জমাইবার কি উপায় হইতে পারে তাহা ভাবিয়া কোনো কূলকিনারা পাইতেছে না, এমন সময় আহার ঔষধ দুইই তাহার মুখের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। হাঁ করিতে সে আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিতে চাহিল না।

জানকী বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার দাদাকে খবর দিতে চাও? রসিক কহিল, না, তাহার কোন দরকার নাই।—সমস্ত কাজ

নিঃশেষে সারিয়া তাহার পরে সে দাদাকে চমৎকৃত করিয়া দিবে, অকর্ম্মণ্য রসিকের যে সামর্থ্য কি রকম তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণে কোনো ত্রুটি থাকিবে না।

শুভলগ্নে বিবাহ হইয়া গেল। অন্যান্য সকল প্রকার দানসামগ্রীর আগে একটা বাইসিক্‌ল্‌ দাবী করিল।

(৭)

তখন মাঘের শেষ। শর্ষে এবং তিসির ক্ষেতে ফল ধরিতেছে। আখের গুড় জ্বাল দেওয়া আরম্ভ হইয়াছে, তাহারই গন্ধে বাতাস যেন ঘন হইয়া উঠিয়াছে। গ্রামের ঘরে ঘরে গোলাভরা ধান এবং কলাই; গোয়ালের প্রাঙ্গণে খড়ের গাদা স্তূপাকার। ওপারে নদীর চরে বাথানে রাখালেরা গোরুমহিষের দল লইয়া কুটীর বাঁধিয়া বাস করিতেছে। খেয়াঘাটের কাজ প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে—নদীর জল কমিয়া গিয়া লোকেরা কাপড় গুটাইয়া হাঁটিয়া পার হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

রসিক কলার-পরানো শার্টের উপর মালকোঁচা মারিয়া ঢাকাই ধুতি পরিয়াছে; শার্টের উপরে বোতামখোলা কালো বনাতের কোট, পায়ে রঙীন ফুলমোজা ও চক্‌চকে কালো চাম্‌ড়ার সৌখীন বিলাতীজুতা। ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের পাকা রাস্তা বাহিয়া দ্রুতবেগে সে বাইসিকল চালাইয়া আসিল; গ্রামের কাঁচা রাস্তায় আসিয়া তাহাকে বেগ কমাইতে হইল। গ্রামের লোকে হঠাৎ তাহার বেশভূষা দেখিয়া তাহাকে চিনিতেই পারিল না। সেও কাহাকেও কোনো সম্ভাষণ করিল না; তাহার ইচ্ছা অন্যলোকে তাহাকে চিনিবার আগেই সর্ব্বাগ্রে সে তাহার দাদার সঙ্গে দেখা করিবে। বাড়ির কাছাকাছি

যখন সে আসিয়াছে তখন ছেলেদের চোখ সে এড়াইতে পারিল না। তাহারা এক মুহূর্ত্তেই তাহাকে চিনিতে পারিল। সৌরভীদের বাড়ি কাছেই ছিল,—ছেলেরা সেইদিকে ছুটিয়া চেঁচাইতে লাগিল, "সৈরিদিদির বর এসেছে, সৈরিদিদির বর।" গোপাল বাড়িতেই ছিল, সে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিবার পূর্ব্বেই বাইসিক্‌ল রসিকদের বাড়ির সাম্‌নে আসিয়া থামিল।

তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, ঘর অন্ধকার, বাহিরে তালা লাগানো। জনহীন পরিত্যক্ত বাড়ির যেন নীরব একটা কান্না উঠিতেছে—কেহ নাই—কেহ নাই! এক নিমেষেই রসিকের বুকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিয়া চোখের সামনে সমস্ত অস্পষ্ট হইয়া আসিল। তাহার পা কাঁপিতে লাগিল; বন্ধ দরজা ধরিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার গলা শুকাইয়া গেল, কাহাকেও ডাক দিতে সাহস হইল না। দূরে মন্দিরে সন্ধ্যারতির যে কাঁসর ঘণ্টা বাজিতে-ছিল, তাহা যেন বহুদূরের কোন্‌ একটি গতজীবনের পরপ্রান্ত হইতে সুগভীর একটা বিদায়ের বার্ত্তা বহিয়া তাহার কানের কাছে আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল। সাম্‌নে যাহা কিছু দেখিতেছে, এই মাটির প্রাচীর, এই চালাঘর, এই রুদ্ধ কপাট, এই জিরেল গাছের বেড়া, এই হেলিয়া-পড়া খেজুর গাছ সমস্তই যেন একটা হারানো সংসারের ছবিমাত্র, কিছুই যেন সত্য নহে।

গোপাল আসিয়া কাছে দাঁড়াইল। রসিক পাংশু মুখে গোপালের মুখের দিকে চাহিল, গোপাল কিছু না বলিয়া চোখ নীচু করিল। রসিক বলিয়া উঠিল—বুঝেছি, বুঝেছি—দাদা নাই! অমনি সেই-খানেই দরজার কাছে সে বসিয়া পড়িল। গোপাল তাহার পাশে বসিয়া কহিল, ভাই রসিক দাদা, চল আমাদের বাড়ি চল। রসিক

তাহার দুই হাত ছড়াইয়া দিয়া সেই দরজার সাম্‌নে উপুড় হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। দাদা! দাদা! দাদা! যে দাদা তাহার পায়ের শব্দটি পাইলে আপনিই ছুটিয়া আসিত কোথাও তাহার সাড়া পাওয়া গেল না।

গোপালের বাপ আসিয়া অনেক বলিয়া কহিয়া রসিককে বাড়িতে লইয়া আসিল। রসিক সেখানে প্রবেশ করিয়াই মুহূর্ত্তকালের জন্য দেখিতে পাইল, সৌরভী সেই তাহার চিত্রিত কাঁথায় মোড়া কি একটা জিনিষ অতি যত্নে রোয়াকের দেয়ালে ঠেসান দিয়া রাখিতেছে। প্রাঙ্গণে লোক সমাগমের শব্দ পাইবামাত্রই সে ছুটিয়া ঘরের মধ্যে অন্তর্হিত হইল। রসিক কাছে আসিয়াই বুঝিতে পারিল এই কাঁথায় মোড়া পদার্থটি একটি নূতন বাইসিক্‌ল্। তৎক্ষণাৎ তাহার অর্থ বুঝিতে আর বিলম্ব হইল না। একটা বুকফাটা কান্না বক্ষ ঠেলিয়া তাহার কণ্ঠের কাছে পাকাইয়া পাকাইয়া উঠিতে লাগিল এবং চোখের জলের সমস্ত রাস্তা যেন ঠাসিয়া বন্ধ করিয়া ধরিল।

রসিক চলিয়া গেলে বংশী দিনরাত্রি অবিশ্রাম খাটিয়া সৌরভীর পণ এবং এই বাইসিক্‌ল্ কিনিবার টাকা সঞ্চয় করিয়াছিল। তাহার একমুহূর্ত্ত আর কোনো চিন্তা ছিল না। ক্লান্ত ঘোড়া যেমন প্রাণপণে ছুটিয়া গম্যস্থানে পৌঁছিয়াই পড়িয়া মরিয়া যায় তেমনই যেদিন পণের টাকা পূর্ণ করিয়া বংশী বাইসিক্‌ল্‌টি ভি, পি, ডাকে পাইল সেই দিনই আর তাহার হাত চলিল না, তাহার তাঁত বন্ধ হইয়া গেল ;—গোপালের পিতাকে ডাকিয়া তাহার হাতে ধরিয়া সে বলিল, আর একটি বছর রসিকের জন্য অপেক্ষা করিও—এই তোমার হাতে পণের টাকা দিয়া গেলাম, আর যেদিন রসিক আসিবে তাহাকে এই চাকার গাড়িটি দিয়া বলিয়ো—দাদার কাছে চাহিয়াছিল,

তখন হতভাগ্য দাদা দিতে পারে নাই কিন্তু তাই বলিয়া মনে যেন সে রাগ না রাখে।

দাদার টাকার উপহার গ্রহণ করিবে না, একদিন এই শপথ করিয়া রসিক চলিয়া গিয়াছিল—বিধাতা তাহার সেই কঠোর শপথ শুনিয়াছিলেন। আজ যখন রসিক ফিরিয়া আসিল তখন দেখিল দাদার উপহার তাহার জন্য এতদিন পথ চাহিয়া বসিয়া আছে—কিন্তু তাহা গ্রহণ করিবার দ্বার একেবারে রুদ্ধ। তাহার দাদা যে তাঁতে আপনার জীবনটি বুনিয়া আপনার ভাইকে দান করিয়াছে রসিকের ভারি ইচ্ছা করিল সব ছাড়িয়া সেই তাঁতের কাছেই আপনার জীবন উৎসর্গ করে, কিন্তু হায়, কলিকাতা সহরে টাকার হাড়কাটে চিরকালের মত সে আপনার জীবন বলি দিয়া আসিয়াছে।

দর্পহরণ।

কি করিয়া গল্প লিখিতে হয়, তাহা সম্প্রতি শিখিয়াছি। বঙ্কিম-বাবু এবং সার্ ওয়াল্‌টার্ স্কট্ পড়িয়া আমার বিশেষ ফল হয় নাই। ফল কোথা হইতে কেমন করিয়া হইল, আমার এই প্রথম গল্পেই সেই কথাটা লিখিতে বসিলাম।

আমার পিতার মতামত অনেকরকম ছিল; কিন্তু বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে কোন মত তিনি কেতাব বা স্বাধীনবুদ্ধি হইতে গড়িয়া তোলেন নাই। আমার বিবাহ যখন হয়, তখন সতেরো উত্তীর্ণ হইয়া আঠারোয় পা দিয়াছি; তখন আমি কলেজে থার্ডইয়ারে পড়ি—এবং তখন আমার চিত্তক্ষেত্রে যৌবনের প্রথম দক্ষিণবাতাস বহিতে আরম্ভ করিয়া কত অলক্ষ্য দিক্ হইতে কত অনির্ব্বচনীয় গীতে এবং গন্ধে, কম্পনে এবং মর্ম্মরে আমার তরুণ জীবনকে উৎসুক করিয়া তুলিতেছিল, তাহা এখনো মনে হইলে বুকের ভিতরে দীর্ঘনিশ্বাস ভরিয়া উঠে।

তখন আমার মা ছিলেন না—আমাদের শূন্যসংসারের মধ্যে লক্ষ্মী-স্থাপন করিবার জন্য আমার পড়াশুনা শেষ হইবার অপেক্ষা না করিয়াই বাবা বারোবৎসরের বালিকা নির্ঝরিণীকে আমাদের ঘরে আনিলেন।

নির্ঝরিণী নামটি হঠাৎ পাঠকদের কাছে প্রচার করিতে সঙ্কোচবোধ করিতেছি। কারণ, তাঁহাদের অনেকেরই বয়স হইয়াছে—অনেকে

ইস্কুল-মাষ্টারী, মুন্সেফি এবং কেহ কেহ বা সম্পাদকীও করেন, তাঁহারা আমার শ্বশুরমহাশয়ের নামনির্ব্বাচনরুচির অতিমাত্র লালিত্য এবং নূতনত্বে হাসিবেন, এমন আশঙ্কা আছে। কিন্তু আমি তখন অর্ব্বাচীন ছিলাম, বিচারশক্তির কোন উপদ্রব ছিল না—তাই নামটি বিবাহের সম্বন্ধ হইবার সময়েই যেমনি শুনিলাম, অমনি—

"কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ!"

এখন বয়স হইয়াছে এবং ওকালতি ছাড়িয়া মুন্সেফিলাভের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছি, তবু হৃদয়ের মধ্যে ঐ নামটি পুরাতন বেহালার আওয়াজের মত আরো বেশি মোলায়েম হইয়া বাজিতেছে।

প্রথম বয়সের প্রথম প্রেম অনেকগুলি ছোটখাটো বাধার দ্বারা মধুর। লজ্জার বাধা, ঘরের লোকের বাধা, অনভিজ্ঞতার বাধা—এইগুলির অন্তরাল হইতে প্রথম পরিচয়ের যে আভাস দিতে থাকে, তাহা ভোরের আলোর মত রঙীন—তাহা মধ্যাহ্নের মত সুস্পষ্ট অনাবৃত এবং বর্ণচ্ছটাবিহীন নহে।

আমাদের সেই নবীন পরিচয়ের মাঝখানে বাবা বিন্ধ্যগিরির মত দাঁড়াইলেন। তিনি আমাকে হষ্টেলে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়া তাঁহার বউমাকে বাংলা লেখাপড়া শিখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। আমার এই গল্পের সুরু হইল সেইখানে।

শ্বশুরমশায় কেবল তাঁহার কন্যার নামকরণ করিয়াই নিশ্চেষ্ট ছিলেন না—তিনি তাহাকে শিক্ষাদানেরও প্রভূত আয়োজন করিয়াছিলেন। এমন কি, উপক্রমণিকা তাহার মুখস্থ শেষ হইয়াছিল। মেঘনাদবধকাব্য পড়িতে হেমবাবুর টীকা তাহার প্রয়োজন হইত না।

হষ্টেলে গিয়া তাহার পরিচয় পাইয়াছিলাম। আমি সেখানে

থাকিতে নানা উপায়ে বাবাকে লুকাইয়া নববিরহতাপে অত্যন্ত উত্তপ্ত দুইএকখানা চিঠি তাহাকে পাঠাইতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। তাহাতে কোটেশন্-মার্কা না দিয়া আমাদের নব্যকবিদের কাব্য ছাঁকিয়া অনেক কবিতা ঢালিয়াছিলাম, ভাবিয়াছিলাম—প্রণয়িনীর কেবল প্রেম আকর্ষণ করাই যথেষ্ট নহে—শ্রদ্ধাও চাই। শ্রদ্ধা পাইতে হইলে বাংলা-ভাষায় যেরূপ রচনাপ্রণালীর আশ্রয় লওয়া উচিত, সেটা আমার স্বভাবত আসিত না—সেইজন্য—

"মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ" .

অর্থাৎ অন্য জহরীরা যে-সকল মণি ছিদ্র করিয়া রাখিয়াছিলেন, আমার চিঠি তাহা সূত্রের মত গাঁথিয়া পাঠাইত। কিন্তু, ইহার মধ্যে মণিগুলি অন্যের, কেবলমাত্র সূত্রটুকুই আমার, এ বিনয়টুকু স্পষ্ট করিয়া প্রচার করা আমি ঠিক সঙ্গত মনে করি নাই—কালিদাসও করিতেন না,—যদি সত্যই তাঁহার মণিগুলি চোরাই-মাল হইত।

চিঠির উত্তর যখন পাইলাম, তাহার পর হইতে যথাস্থানে কোটেশন-মার্কা দিতে আর কার্পণ্য করি নাই। এটুকু বেশ বোঝা গেল, নববধূ বাংলাভাষাটি বেশ জানেন। তাঁহার চিঠিতে বানান ভুল ছিল কি না, তাহার উপযুক্ত বিচারক আমি নই—কিন্তু সাহিত্যবোধ ও ভাষাবোধ না থাকিলে এমন চিঠি লেখা যায় না, সেটুকু আন্দাজে বুঝিতে পারি।

স্ত্রীর বিদ্যা দেখিয়া সৎস্বামীর যতটুকু গর্ব্ব ও আনন্দ হওয়া উচিত, তাহা আমার হয় নাই এমন কথা বলিলে আমাকে অন্যায় অপবাদ দেওয়া হইবে, কিন্তু তারি সঙ্গে একটু অন্যভাবও ছিল। সে ভাবটুকু উচ্চদরের না হইতে পারে, কিন্তু স্বাভাবিক। মুস্কিল এই যে, যে উপায়ে আমার বিদ্যার পরিচয় দিতে পারিতাম, সেটা বালি-

কার পক্ষে দুর্গম। সে যেটুকু ইংরাজি জানে, তাহাতে বার্ক-মেকলের ছাঁদের চিঠি তাহার উপরে চালাইতে হইলে মশা মারিতে কামান দাগা হইত—মশার কিছুই হইত না, কেবল ধোঁয়া এবং আওয়াজই সার হইত।

আমার যে তিনটি প্রাণের বন্ধু ছিল, তাহাদিগকে আমার স্ত্রীর চিঠি না দেখাইয়া থাকিতে পারিলাম না। তাহারা আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "এমন স্ত্রী পাইয়াছ, ইহা তোমার ভাগ্য।" অর্থাৎ ভাষান্তরে বলিতে গেলে এমন স্ত্রীর উপযুক্ত স্বামী আমি নই।

নির্ঝরিণীর নিকট হইতে পত্রোত্তর পাইবার পূর্ব্বেই যে ক'খানি চিঠি লিখিয়া ফেলিয়াছিলাম, তাহাতে হৃদয়োচ্ছ্বাস যথেষ্ট ছিল, কিন্তু বানান-ভুলও নিতান্ত অল্প ছিল না। সতর্ক হইয়া লেখা যে দরকার, তাহা তখন মনেও করি নাই। সতর্ক হইয়া লিখিলে বানান-ভুল হয় ত কিছু কম পড়িত, কিন্তু হৃদয়োচ্ছ্বাসটাও মারা যাইত।

এমন অবস্থায় চিঠির মধ্যস্থতা ছাড়িয়া মোকাবিলায় প্রেমালাপই নিরাপদ্। সুতরাং বাবা আপিসে গেলেই আমাকে কালেজ পালাইতে হইত। ইহাতে আমাদের উভয় পক্ষেরই পাঠচর্চ্চায় যে ক্ষতি হইত, আলাপচর্চ্চায় তাহা সুদসুদ্ধ পোষণ করিয়া লইতাম। বিশ্বজগতে যে, কিছুই একেবারে নষ্ট হয় না; এক আকারে যাহা ক্ষতি, অন্য আকারে তাহা লাভ—বিজ্ঞানের এই তথ্য প্রেমের পরীক্ষাশালায় বারংবার যাচাই করিয়া লইয়া একেবারে নিঃসংশয় হইয়াছি।

এমন সময়ে আমার স্ত্রীর জাঠ্‌তুত বোনের বিবাহকাল উপস্থিত—আমরা ত যথানিয়মে আইবুড়ভাত দিয়া খালাস—কিন্তু আমার স্ত্রী স্নেহের আবেগে এক কবিতা রচনা করিয়া লাল কাগজে লাল কালী দিয়া লিখিয়া তাহার ভগিনীকে না পাঠাইয়া থাকিতে পারিল না।

সেই রচনাটি কেমন করিয়া বাবার হস্তগত হইল। বাবা তাঁহার বধূ-মাতার কবিতায় রচনানৈপুণ্য, সদ্ভাবসৌন্দর্য্য, প্রসাদগুণ, প্রাঞ্জলতা ইত্যাদি শাস্ত্রসম্মত নানা গুণের সমাবেশ দেখিয়া অভিভূত হইয়া গেলেন। তাঁহার বৃদ্ধ বন্ধুদিগকে দেখাইলেন, তাঁহারাও তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন—"খাসা হইয়াছে!" নববধূর যে রচনাশক্তি আছে, এ কথা কাহারও অগোচর রহিল না। হঠাৎ এইরূপ খ্যাতি-বিকাশে রচয়িত্রীর কর্ণমূল এবং কপোলদ্বয় অরুণবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল —অভ্যাসক্রমে তাহা বিলুপ্ত হইল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কোন জিনিষ একেবারে বিলুপ্ত হয় না—কি জানি, লজ্জার আভাটুকু তাহার কোমল কপোল ছাড়িয়া আমার কঠিন হৃদয়ের প্রচ্ছন্নকোণে হয় ত আশ্রয় লইয়া থাকিবে।

কিন্তু তাই বলিয়া স্বামীর কর্ত্তব্যে শৈথিল্য করি নাই। অপক্ষপাত সমালোচনার দ্বারা স্ত্রীর রচনার দোষ সংশোধনে আমি কখনই আলস্য করি নাই। বাবা তাহাকে নির্ব্বিচারে যতই উৎসাহ দিয়াছেন, আমি ততই সতর্কতার সহিত ত্রুটি নির্দ্দেশ করিয়া তাহাকে যথোচিত সংযত করিয়াছি। আমি ইংরাজি বড়-বড় লেখকের লেখা দেখাইয়া তাহাকে অভিভূত করিতে ছাড়ি নাই। সে কোকিলের উপর একটা-কি লিখিয়াছিল, আমি শেলির স্কাইলার্ক্‌ ও কীট্‌সের নাইটিঙ্গেল্‌ শুনাইয়া তাহাকে একপ্রকার নীরব করিয়া দিয়াছিলাম। তখন বিদ্যার জোরে আমিও যেন শেলি ও কীট্‌সের গৌরবের কতকটা ভাগী হইয়া পড়িতাম। আমার স্ত্রীও ইংরাজিসাহিত্য হইতে ভাল-ভাল জিনিষ তাহাকে তর্জ্জমা করিয়া শুনাইবার জন্য আমাকে পীড়াপীড়ি করিত, আমি গর্ব্বের সহিত তাহার অনুরোধ রক্ষা করিতাম। তখন ইংরাজিসাহিত্যের মহিমায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়া আমার স্ত্রীর প্রতিভাকে

কি ম্লান করি নাই? স্ত্রীলোকের কমনীয়তার পক্ষে এই একটু ছায়ার আচ্ছাদন দরকার, বাবা এবং বন্ধুবান্ধবেরা তাহা বুঝিতেন না—কাজেই আমাকে এই কঠোর কর্ত্তব্যের ভার লইতে হইয়াছিল। নিশীথের চন্দ্র মধ্যাহ্নের সূর্য্যের মত হইয়া উঠিলে দুইদণ্ড বাহবা দেওয়া চলে—কিন্তু তাহার পরে ভাবিতে হয়, ওটাকে ঢাকা দেওয়া যায় কি উপায়ে!

আমার স্ত্রীর লেখা বাবা এবং অন্যান্য অনেকে কাগজে ছাপাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন। নির্ঝরিণী তাহাতে লজ্জাপ্রকাশ করিত—আমি তাহার সে লজ্জা রক্ষা করিয়াছি। কাগজে ছাপিতে দিই নাই, কিন্তু বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে প্রচার বন্ধ করিতে পারা গেল না।

ইহার কুফল যে কতদূর হইতে পারে, কিছুকাল পরে তাহার পরিচয় পাইয়াছিলাম। তখন উকিল হইয়া আলিপুরে বাহির হই। একটা উইল্‌কেস্ লইয়া বিরুদ্ধপক্ষের সঙ্গে খুব জোরের সহিত লড়িতেছিলাম। উইল্‌টি বাংলায় লেখা। স্বপক্ষের অনুকূলে তাহার অর্থ যে কিরূপ স্পষ্ট, তাহা বিধিমতে প্রমাণ করিতেছিলাম, এমন-সময় বিরোধিপক্ষের উকিল উঠিয়া বলিলেন—"আমার বিদ্বান্ বন্ধু যদি তাঁহার বিদুষী স্ত্রীর কাছে এই উইল্‌টি বুঝাইয়া লইয়া আসিতেন, তবে এমন অদ্ভুত ব্যাখ্যা দ্বারা মাতৃভাষাকে ব্যথিত করিয়া তুলিতেন না।

চুলার আগুন ধরাইবার বেলা ফুঁ দিতে দিতে নাকের জলে চোখের জলে হইতে হয়, কিন্তু গৃহদাহের আগুন নেবানই দায়; লোকের ভাল কথা চাপা থাকে, আর অনিষ্টকর কথাগুলো মুখে মুখে হুহুঃশব্দে ব্যাপ্ত হইয়া যায়। এ গল্পটিও সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। ভয় হইয়াছিল, পাছে আমার স্ত্রীর কানে ওঠে। সৌভাগ্যক্রমে ওঠে নাই—অন্তত এ-সম্বন্ধে তাহার কাছ হইতে কোন আলোচনা কখনো শুনি নাই।

একদিন একটি অপরিচিত ভদ্রলোকের সহিত আমার পরিচয় হইতেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনিই কি শ্রীমতী নির্ঝরিণী দেবীর স্বামী?" আমি কহিলাম, "আমি তাঁহার স্বামী কি না, সে কথার জবাব দিতে চাহি না, তবে তিনিই আমার স্ত্রী বটেন।"—বাহিরের লোকের কাছে স্ত্রীর স্বামী বলিয়া খ্যাতিলাভ করা আমি গৌরবের বিষয় বলিয়া জ্ঞান করি না।

সেটা যে গৌরবের বিষয় নহে, সে কথা আমাকে আর-এক ব্যক্তি অনাবশ্যক স্পষ্টভাষায় স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল। পূর্ব্বেই পাঠকগণ সংবাদ পাইয়াছেন, আমার স্ত্রীর জাঠ্‌তুত বোনের বিবাহ হইয়াছে। তাহার স্বামীটা অত্যন্ত বর্ব্বর দুর্বৃত্ত। স্ত্রীর প্রতি তাহার অত্যাচার অসহ্য। আমি এই পাষণ্ডের নির্দ্দয়াচরণ লইয়া আত্মীয়সমাজে আলোচনা করিয়াছিলাম—সে কথা অনেক বড় হইয়া তাহার কানে উঠিয়াছিল। সে তাহার পর হইতে আমার প্রতি লক্ষ্য করিয়া সকলের কাছে বলিয়া বেড়াইতেছে যে, নিজের নামে হইতে আরম্ভ করিয়া শ্বশুরের নামে পর্য্যন্ত উত্তম-মধ্যম-অধম অনেকরকম খ্যাতির বিবরণ শাস্ত্রে লিখিয়াছে, কিন্তু নিজের স্ত্রীর খ্যাতিতে যশস্বী হওয়ার কল্পনা কবির মাথাতেও আসে নি।

এমন-সব কথা লোকের মুখে মুখে চলিতে আরম্ভ করিলে স্ত্রীর মনে ত দম্ভ জন্মিতেই পারে। বিশেষত বাবার একটা বদ্‌ অভ্যাস ছিল, নির্ঝরিণীর সাম্‌নেই তিনি আমাদের পরস্পরের বাংলাভাষাজ্ঞান লইয়া কৌতুক করিতেন। একদিন তিনি বলিলেন, "হরিশ যে বাংলা চিঠিগুলো লেখে, তাহার বানানটা তুমি দেখিয়া দাও না কেন বৌমা—আমাকে এক চিঠি লিখিয়াছে, তাহাতে সে জগদিন্দ্র লিখিতে দীর্ঘ ঈ বসাইয়াছে।" শুনিয়া বাবার বৌমা নীরবে একটুখানি স্মিতহাস্য

করিলেন। আমিও কথাটাকে ঠাট্টা বলিয়া হাসিলাম, কিন্তু এ-রকম ঠাট্টা ভাল নয়।

স্ত্রীর দম্ভের পরিচয় পাইতে আমার দেরি হইল না। পাড়ার ছেলেদের এক ক্লাব্ আছে—সেখানে একদিন তাহারা এক বিখ্যাত বাংলালেখককে বক্তৃতা দিতে রাজি করিয়াছিল। অপর একটি বিখ্যাত লোককে সভাপতিও ঠিক করা হয়—তিনি বক্তৃতার পূর্ব্বরাত্রে অস্বাস্থ্য জানাইয়া ছুটি লইলেন। ছেলেরা উপায়ান্তর না দেখিয়া আমাকে আসিয়া ধরিল। আমার প্রতি ছেলেদের এই অহেতুকী শ্রদ্ধা দেখিয়া আমি কিছু প্রফুল্ল হইয়া উঠিলাম—বলিলাম, "তা বেশ ত, বিষয়টা কি বল ত?" তাহারা কহিল, "প্রাচীন ও আধুনিক বঙ্গসাহিত্য।"—আমি কহিলাম—"বেশ হইবে, দুটোই আমি ঠিক সমান জানি!"

পরদিন সভায় যাইবার পূর্ব্বে জলখাবার এবং কাপড়চোপড়ের জন্য স্ত্রীকে কিছু তাড়া দিতে লাগিলাম। নির্ঝরিণী কহিল—"কেন গো, এত ব্যস্ত কেন—আবার কি পাত্রী দেখিতে যাইতেছ?" আমি কহিলাম; "একবার দেখিয়াই নাকে-কানে খৎ দিয়াছি—আর নয়!"
"তবে এত সাজসজ্জার তাড়া যে!"

স্ত্রীকে সগর্ব্বে সমস্ত ব্যাপারটা বলিলাম। শুনিয়া সে কিছুমাত্র উল্লাসপ্রকাশ না করিয়া ব্যাকুলভাবে আমার হাত চাপিয়া ধরিল। কহিল, "তুমি পাগল হইয়াছ? না না, সেখানে তুমি যাইতে পারিবে না!"

আমি কহিলাম, "রাজপুতনারী যুদ্ধসাজ পরাইয়া স্বামীকে রণক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিত—আর বাঙালীর মেয়ে কি বক্তৃতাসভাতেও পাঠাইতে পারে না?"

নির্ঝরিণী কহিল—"ইংরাজি বক্তৃতা হইলে আমি ভয় করিতাম না, কিন্তু—থাক্ না, অনেক লোক আসিবে, তোমার অভ্যাস নাই—শেষকালে—"

শেষকালের কথাটা আমিও কি মাঝে মাঝে ভাবি নাই! রামমোহন রায়ের গানটা মনে পড়িতেছিল—

"মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর
অন্যে বাক্য কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর!"

বক্তার বক্তৃতা-অন্তে উঠিয়া দাঁড়াইবার সময় সভাপতি যদি হঠাৎ "দৃষ্টিহীন নাড়ীক্ষীণ হিমকলেবর" অবস্থায় একেবারে নিরুত্তর হইয়া পড়েন, তবে কি গতি হইবে! এই সকল কথা চিন্তা করিয়া পূর্ব্বোক্ত পলাতক সভাপতিমহাশয়ের চেয়ে আমার স্বাস্থ্য যে কোন অংশে ভাল ছিল, এমন কথা আমি বলিতে পারি না।

বুক ফুলাইয়া স্ত্রীকে কহিলাম, "নিঝর, তুমি কি মনে কর—"

স্ত্রী কহিল—"আমি কিছুই মনে করি না—কিন্তু আমার আজ ভারি মাথা ধরিয়া আসিয়াছে—বোধ হয় জ্বর আসিবে—তুমি আজ আমাকে ফেলিয়া যাইতে পারিবে না!"

আমি কহিলাম, "সে আলাদা কথা। তোমার মুখটা একটু লাল দেখাইতেছে বটে।"

সেই লালটা সভাস্থলে আমার দুরবস্থা কল্পনা করিয়া লজ্জায়, অথবা আসন্ন জ্বরের আবেশে, সে কথা নিঃসংশয়ে পর্য্যালোচনা না করিয়াই আমি ক্লাবের সেক্রেটারিকে স্ত্রীর পীড়ার কথা জানাইয়া নিষ্কৃতিলাভ করিলাম।

বলা বাহুল্য, স্ত্রীর জ্বরভাব অতি সত্বর ছাড়িয়া গেল। আমার অন্তরাত্মা কহিতে লাগিল, "আর-সব ভাল হইল, কিন্তু তোমার বাংলা-

বিদ্যা-সম্বন্ধে তোমার স্ত্রীর মনে এই যে সংস্কার, এটা ভাল নয়। তিনি নিজেকে মস্ত বিদুষী বলিয়া ঠাওরাইয়াছেন—কোন্‌দিন বা মশারির মধ্যে নাইট্‌স্কুল্‌ খুলিয়া তিনি তোমাকে বাংলা পড়াইবার চেষ্টা করিবেন!”

আমি কহিলাম, “ঠিক কথা—এই বেলা দর্প চূর্ণ না করিলে ক্রমে আর তাহার নাগাল পাওয়া যাইবে না।”

সেই রাত্রেই তাহার সঙ্গে একটু খিটিমিটি বাধাইলাম। অল্পশিক্ষা যে কিরূপ ভয়ঙ্কর জিনিষ, পোপের কাব্য হইতে তাহার উদাহরণ উদ্ধার করিয়া তাহাকে শুনাইলাম। ইহাও বুঝাইলাম, কোনমতে বানান এবং ব্যাকরণ বাঁচাইয়া লিখিলেই যে লেখা হইল, তাহা নহে—আসল জিনিষটা হইতেছে আইডিয়া। কাশিয়া বলিলাম, “সেট উপক্রমণিকায় পাওয়া যায় না—সেটার জন্য মাথা চাই।” মাথা যে কোথায় আছে, সে কথা তাহাকে স্পষ্ট করিয়া বলি নাই, কিন্তু তবু বোধ হয় কথাটা অস্পষ্ট ছিল না। আমি কহিলাম—“লিখিবার যোগ্য কোন লেখা কোন দেশে কোন দিন কোন স্ত্রীলোক লেখে নাই।”

শুনিয়া নির্ঝরিণীর মেয়েলি তার্কিকতা চড়িয়া উঠিল। সে বলিল —“কেন মেয়েরা লিখিতে পারিবে না! মেয়েরা এতই কি হীন!”

আমি কহিলাম—“রাগ করিয়া কি করিবে! দৃষ্টান্ত দেখাও না!”

নির্ঝরিণী কহিল—“তোমার মত যদি আমার ইতিহাস পড়া থাকিত, তবে নিশ্চয়ই আমি ঢের দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারিতাম।”

এ কথাটা শুনিয়া আমার মন একটু নরম হইয়াছিল, কিন্তু তর্ক এইখানেই শেষ হয় নাই। ইহার শেষ যেখানে, সেটা পরে বর্ণনা করা যাইতেছে।

'উদ্দীপনা' বলিয়া মাসিকপত্রে ভাল গল্প লিখিবার জন্য পঞ্চাশ-টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিল। কথা এই স্থির হইল, আমরা দুই জনেই সেই কাগজে দুটা গল্প লিখিয়া পাঠাইব, দেখি কাহার ভাগ্যে পুরস্কার জোটে!

রাত্রের ঘটনা ত এই। পরদিন প্রভাতের আলোকে বুদ্ধি যখন নির্ম্মল হইয়া আসিল, তখন দ্বিধা জন্মিতে লাগিল। কিন্তু প্রতিজ্ঞা করিলাম, এ অবসর ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না—যেমন করিয়া হৌক্, জিতিতেই হইবে। হাতে তখনো দুইমাস সময় ছিল।

প্রকৃতিবাদ অভিধান কিনিলাম—বঙ্কিমের বইগুলাও সংগ্রহ করিলাম। কিন্তু বঙ্কিমের লেখা আমার চেয়ে আমার অন্তঃপুরে অধিক পরিচিত—তাই সে মহদাশ্রয় পরিত্যাগ করিতে হইল। ইংরাজি গল্পের বই দেদার পড়িতে লাগিলাম। অনেকগুলা গল্প ভাঙিয়া-চুরিয়া একটা প্লট্ দাঁড় করাইলাম। প্লট্টা খুবই চমৎকার হইয়াছিল, কিন্তু মুস্কিল এই হইল, বাংলাসমাজে সে সকল ঘটনা কোন অবস্থাতেই ঘটিতে পারে না। অতি প্রাচীনকালের পাঞ্জাবের সীমান্তদেশে গল্পের ভিত্তি ফাঁদিলাম—সেখানে সম্ভব-অসম্ভবের সমস্ত বিচার একেবারে নিরাকৃত হওয়াতে কলমের মুখে কোন বাধা রহিল না। উদ্দাম প্রণয়, অসম্ভব বীরত্ব, নিদারুণ পরিণাম সার্কাসের ঘোড়ার মত আমার গল্প ঘিরিয়া অদ্ভুতগতিতে ঘুরিতে লাগিল।

রাত্রে আমার ঘুম হইত না—দিনে আহারকালে ভাতের থালা ছাড়িয়া মাছের ঝোলের বাটিতে ডাল ঢালিয়া দিতাম। আমার অবস্থা দেখিয়া নির্ঝরিণী আমাকে অনুনয় করিয়া বলিল, "আমার মাথা খাও, তোমাকে আর গল্প লিখিতে হইবে না—আমি হার মানিতেছি।"

আমি উত্তেজিত হইয়া বলিলাম, "তুমি কি মনে করিতেছ, আমি

দিনরাত্রি কেবল গল্প ভাবিয়াই মরিতেছি! কিছুই না! আমাকে মক্কেলের কথা ভাবিতে হয়—তোমার মত গল্প এবং কবিতা চিন্তা করিবার অবসর পড়িয়া থাকিলে আমার ভাবনা কি ছিল!”

যাহা হউক্‌, ইংরাজি প্লট্‌ এবং সংস্কৃত অভিধানে মিলাইয়া একটা গল্প খাড়া করিলাম। মনের কোণে ধর্ম্মবুদ্ধিতে একটু পীড়াবোধ করিতে লাগিলাম—ভাবিলাম, বেচারা নিঝর ইংরাজিসাহিত্য পড়ে নাই, তাহার ভাবসংগ্রহ করিবার ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ—আমার সঙ্গে তাহার এই লড়াই নিতান্ত অসমকক্ষের লড়াই।

উপসংহার।

লেখা পাঠান হইয়াছে। বৈশাখের সংখ্যায় পুরস্কারযোগ্য গল্পটি বাহির হইবে। যদিও আমার মনে কোন আশঙ্কা ছিল না, তবু সময় যত নিকটবর্ত্তী হইল, মনটা তত চঞ্চল হইয়া উঠিল।

বৈশাখমাসও আসিল। একদিন আদালত হইতে সকাল-সকাল ফিরিয়া আসিয়া খবর পাইলাম, বৈশাখের উদ্দীপনা আসিয়াছে, আমার স্ত্রী তাহা পাইয়াছে।

ধীরে ধীরে নিঃশব্দপদে অন্তঃপুরে গেলাম। শয়নঘরে উঁকি মারিয়া দেখিলাম, আমার স্ত্রী কড়ায় আগুন করিয়া একটা বই পুড়াইতেছে। দেয়ালের আয়নায় নির্ঝরিণীর মুখের যে প্রতিবিম্ব দেখা যাইতেছে, তাহাতে স্পষ্ট বুঝা গেল, কিছু পূর্ব্বে সে অশ্রুবর্ষণ করিয়া লইয়াছে।

মনে আনন্দ হইল, কিন্তু সেই সঙ্গে একটু দয়াও হইল। আহা, বেচারার গল্পটি উদ্দীপনায় বাহির হয় নাই! কিন্তু এই সামান্য ব্যাপারে এত দুঃখ! স্ত্রীলোকের অহঙ্কারে এত অল্পেই ঘা পড়ে!

আবার আমি নিঃশব্দপদে ফিরিয়া গেলাম। উদ্দীপনা-আফিস হইতে নগদ দাম দিয়া একটা কাগজ কিনিয়া আনাইলাম। আমার লেখা বাহির হইয়াছে কি না, দেখিবার জন্য কাগজ খুলিলাম। সূচী-পত্রে দেখিলাম, পুরস্কারযোগ্য গল্পটির নাম "বিক্রমনারায়ণ" নহে, তাহার নাম "ননদিনী"—এবং তাহার রচয়িতার নাম—একি? এ যে নির্ঝরিণী দেবী!

বাংলাদেশে আমার স্ত্রী ছাড়া আর কাহারো নাম নির্ঝরিণী আছে কি? গল্পটি খুলিয়া পড়িলাম। দেখিলাম, নিঝরের সেই হতভাগিনী জাঠ্‌তুত বোনের বৃত্তান্তটিই ডালপালা দিয়া বর্ণিত। একেবারে ঘরের কথা—সাদা ভাষা—কিন্তু সমস্ত ছবির মত চোখে পড়ে এবং চক্ষু জলে ভরিয়া যায়। এ নির্ঝরিণী যে আমারই "নিঝর", তাহাতে সন্দেহ নাই।

তখন আমার শয়নঘরের সেই দাহদৃশ্য এবং ব্যথিত রমণীর সেই ম্লানমুখ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম।

রাত্রে শুইতে আসিয়া স্ত্রীকে বলিলাম, "নিঝর, যে খাতায় তোমার লেখাগুলি আছে, সেটা কোথায়?"

নির্ঝরিণী কহিল, "কেন, সে লইয়া তুমি কি করিবে?"

আমি কহিলাম—"আমি ছাপিতে দিব!'

নির্ঝরিণী। আহা, আর ঠাট্টা করিতে হইবে না!

আমি। না, ঠাট্টা করিতেছি না। সত্যই ছাপিতে দিব।

নির্ঝরিণী। সে কোথায় গেছে, আমি জানি না।

আমি কিছু জেদের সঙ্গেই বলিলাম—"না নিঝর, সে কিছুতেই হইবে না। বল, সেটা কোথায় আছে?"

নির্ঝরিণী কহিল—"সত্যই সেটা নাই।"

আমি। কেন, কি হইল?

নির্ঝরিণী। সে আমি পুড়াইয়া ফেলিয়াছি।

আমি চমকিয়া উঠিয়া কহিলাম, "অ্যাঁ! সে কি! কবে পুড়াইলে!"

নির্ঝরিণী। আজই পুড়াইয়াছি। আমি কি জানি না যে, আমার লেখা ছাই লেখা! স্ত্রীলোকের রচনা বলিয়া লোকে মিথ্যা করিয়া প্রশংসা করে!

ইহার পর হইতে এ পর্য্যন্ত নিঝরকে সাধ্যসাধনা করিয়াও এক-ছত্র লিখাইতে পারি নাই। ইতি।

শ্রীহরিশ্চন্দ্র হালদার।

উপরে যে গল্পটি লেখা হইয়াছে উহার পনেরো-আনাই গল্প। আমার স্বামি যে বাংলা কত অল্প জানেন, তাহা তাঁহার রচীত উপ-ন্যাসটি পড়িলেই কাহারো বুঝিতে বাকি থাকিবে না। ছিছি নিজের স্ত্রিকে লইয়া এম্‌নি করিয়া কি গল্প বানাইতে হয়? ইতি।

শ্রীনির্ঝরিনি দেবী।

স্ত্রীলোকের চাতুরীসম্বন্ধে দেশী-বিদেশী শাস্ত্রে-অশাস্ত্রে অনেক কথা আছে—তাহাই স্মরণ করিয়া পাঠকেরা ঠকিবেন না। আমার রচনাটুকুর ভাষা ও বানান কে সংশোধন করিয়া দিয়াছেন, সে কথা আমি বলিব না—না বলিলেও বিজ্ঞ পাঠক অনুমান করিতে পারিবেন। আমার স্ত্রী যে-কয়-লাইন লিখিয়াছেন, তাহার বানান-ভুলগুলি দেখি-লেই পাঠক বুঝিবেন, সেগুলি ইচ্ছাকৃত—তাঁহার স্বামী যে বাংলায় পরমপণ্ডিত এবং গল্পটা যে আষাঢ়ে, ইহাই প্রমাণ করিবার এই অতি সহজ উপায় তিনি বাহির করিয়াছেন—এইজন্যই কালিদাস লিখিয়া-ছেন—"স্ত্রীণামশিক্ষিতপটুত্বম্।" তিনি স্ত্রীচরিত্র বুঝিতেন। আমিও সম্প্রতি চোখফোটার পর হইতে বুঝিতে সুরু করিয়াছি। কালে হয় ত কালিদাস হইয়া উঠিতেও পারিব। কালিদাসের সঙ্গে আরো

একটু সাদৃশ্য দেখিতেছি। শুনিয়াছি, কবিবর নববিবাহের পর তাঁহার বিদুষী স্ত্রীকে যে শ্লোক রচনা করিয়া শোনান, তাহাতে উষ্ট্রশব্দ হইতে রফলাটা লোপ করিয়াছিলেন—শব্দপ্রয়োগসম্বন্ধে এরূপ দুর্ঘটনা বর্ত্তমান লেখকের দ্বারাও অনেক ঘটিয়াছে—অতএব, সমস্ত গভীরভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া আশা হইতেছে—কালিদাসের যেরূপ পরিণাম হইয়াছিল, আমার পক্ষেও তাহা অসম্ভব নহে। ইতি।

শ্রীহঃ—

এ গল্প যদি ছাপান হয়, আমি বাপের বাড়ি যাইব।

শ্রীমতী নিঃ—

আমিও তৎক্ষণাৎ শ্বশুরবাড়ী যাত্রা করিব।

শ্রীহঃ—

মাল্যদান।

সকালবেলায় শীত-শীত ছিল। দুপরবেলায় বাতাসটি অল্প-একটু তাতিয়া উঠিয়া দক্ষিণ দিক্ হইতে বহিতে আরম্ভ করিয়াছে।

যতীন যে বারান্দায় বসিয়া ছিল, সেখানহইতে বাগানের এক-কোণে একদিকে একটি কাঁঠাল ও আরএকদিকে একটি শিরীষগাছের মাঝখানের ফাঁক দিয়া বাহিরের মাঠ চোখে পড়ে। সেই শূন্যমাঠ ফাল্গুনের রৌদ্রে ধূধূ করিতেছিল। তাহারি একপ্রান্ত দিয়া কাঁচা পথ চলিয়া গেছে—সেই পথ বহিয়া বোঝাই-খালাস গোরুর গাড়ি মন্দগমনে গ্রামের দিকে ফিরিয়া চলিয়াছে—গাড়োয়ান মাথায় গাম্‌ছা ফেলিয়া অত্যন্ত বেকার-ভাবে গান গাহিতেছে।

এমন সময় পশ্চাতে একটি সহাস্য নারীকণ্ঠ বলিযা উঠিল, "কি যতীন, পূর্ব্বজন্মের কারো কথা ভাবিতেছ বুঝি!"

যতীন কহিল, "কেন পটল, আমি এম্‌নিই কি হতভাগা যে, ভাবিতে হইলেই পূর্ব্বজন্ম লইয়া টান পাড়িতে হয়!"

আত্মীয়সমাজে 'পটল' নামে খ্যাত এই মেয়েটি বলিয়া উঠিল—"আর মিথ্যা বড়াই করিতে হইবে না। তোমার ইহজন্মের সব খবরই ত রাখি মশায়! ছিছি, এত বয়স হইল, তবু একটা সামান্য বৌও ঘরে আনিতে পারিলে না! আমাদের ঐ যে ধনা মালীটা, ওরও একটা বৌ আছে—তার সঙ্গে দুই-বেলা ঝগড়া করিয়া সে পাড়াসুদ্ধ লোককে

জানাইয়া দেয় যে, বৌ আছে বটে। আর তুমি যে মাঠের দিকে তাকাইয়া ভাণ করিতেছ যেন কার চাঁদমুখ ধ্যান করিতে বসিয়াছ—এ সমস্ত চালাকি আমি কি বুঝি না—ও কেবল লোক দেখাইবার ভড়ং-মাত্র।✓ দেখ যতীন, চেনা বামুনের পৈতের দরকার হয় না—আমাদের ঐ ধনাটা ত কোনদিন বিরহের ছুতা করিয়া মাঠের দিকে অমন তাকাইয়া থাকে না; অতি-বড় বিচ্ছেদের দিনেও গাছের তলায় নিড়ানি-হাতে উহাকে দিন কাটাইতে দেখিয়াছি—কিন্তু উহার চোখে ত অমন ঘোর-ঘোর ভাব দেখি নাই। আর তুমি মশায় সাতজন্ম বৌয়ের মুখ দেখিলে না—কেবল হাঁস্‌পাতালে মড়া কাটিয়া ও পড়া মুখস্থ করিয়া বয়স পার করিয়া দিলে, তুমি অমনতর দুপুরবেলা আকাশের দিকে গদগদ হইয়া তাকাইয়া থাক কেন? না, এ সমস্ত বাজে চালাকি আমার ভাল লাগে না! আমার গা জ্বালা করে!"

যতীন হাতজোড় করিয়া কহিল—"থাক্ থাক্, আর নয়! আমাকে আর লজ্জা দিয়ো না! তোমাদের ধনাই ধন্য! উহারই আদর্শে আমি চলিতে চেষ্টা করিব! আর কথা নয়, কাল সকালে উঠিয়াই যে কাঠকুড়ানি মেয়ের মুখ দেখিব, তাহারই গলায় মালা দিব—ধিক্কার আমার আর সহ্য হইতেছে না!"

পটল। তবে এই কথা রহিল?

যতীন। হাঁ, রহিল!

পটল। তবে এস!

যতীন। কোথায় যাইব?

পটল। এসই না!

যতীন। না না, একটা কি দুষ্টমি তোমার মাথায় আসিয়াছে। আমি এখন নড়িতেছি না!

পটল। আচ্ছা; তবে এইখানেই বোস! বলিয়া সে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

পরিচয় দেওয়া যাক্। যতীন এবং পটলের বয়সের একদিনমাত্র তারতম্য। পটল যতীনের চেয়ে একদিনের বড় বলিয়া যতীন তাহার প্রতি কোনপ্রকার সামাজিক সম্মান দেখাইতে নারাজ। উভয়ে খুড়্তুত-জাঠ্তুত ভাইবোন। বরাবর একত্রে খেলা করিয়া আসিয়াছে। 'দিদি' বলে না বলিয়া পটল যতীনের নামে বাল্যকালে বাপ-খুড়ার কাছে অনেক নালিশ করিয়াছে, কিন্তু কোন শাসনবিধির দ্বারা কোন ফল পায় নাই—একটিমাত্র ছোট ভাইয়ের কাছেও তাহার পটল-নাম ঘুচিল না।

পটল দিব্য মোটাসোটা গোলগাল—প্রফুল্লতার রসে পরিপূর্ণ। তাহার কৌতুকহাস্য দমন করিয়া রাখে, সমাজে এমন কোনো শক্তি ছিল না। শাশুড়ির কাছেও সে কোনদিন গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিতে পারে নাই। প্রথম-প্রথম তা লইয়া অনেক কথা উঠিয়াছিল। কিন্তু শেষকালে সকলকেই হার মানিয়া বলিতে হইলে—ওর ঐ রকম! তার পরে এমন হইল যে, পটলের দুর্নিবার প্রফুল্লতার আঘাতে গুরুজনদের গাম্ভীর্য্য ধূলিসাৎ হইয়া গেল। পটল তাহার আশেপাশে কোনখানে মনভার, মুখভার, দুশ্চিন্তা সহিতে পারিত না—অজস্র গল্প-হাসিঠাট্টায় তাহার চারিদিকের হাওয়া যেন বিদ্যুৎশক্তিতে বোঝাই হইয়া থাকিত।

পটলের স্বামী হরকুমারবাবু ডেপুটিম্যাজিষ্ট্রেট্—বেহার-অঞ্চল হইতে বদ্‌লি হইয়া কলিকাতার আব্‌কারি-বিভাগে স্থান পাইয়াছেন। প্লেগের ভয়ে বালিতে একটি বাগানবাড়ী ভাড়া লইয়া থাকেন, সেখান হইতে কলিকাতায় যাতায়াত করেন। আব্‌কারি-পরিদর্শনে প্রায়ই তাঁহাকে মফস্বলে ফিরিতে হইবে বলিয়া দেশ হইতে মা এবং অন্য

দুই-একজন আত্মীয়কে আনিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন-সময় ডাক্তারিতে নূতন উত্তীর্ণ পসার-প্রতিপত্তিহীন যতীন বোনের নিমন্ত্রণে হপ্তাখানিকের জন্য এখানে আসিয়াছে।

কলিকাতার গলি হইতে প্রথমদিন গাছ-পালার মধ্যে আসিয়া যতীন ছায়াময় নির্জ্জন বারান্দায় ফাল্গুন-মধ্যাহ্নের রসালস্যে আবিষ্ট হইয়া বসিয়া ছিল, এমন সময়ে পূর্ব্বকথিত সেই উপদ্রব আরম্ভ হইল। পটল চলিয়া গেলে আবার খানিকক্ষণের জন্য সে নিশ্চিন্ত হইয়া একটু-খানি নড়িয়া-চড়িয়া বেশ আরাম করিয়া বসিল,—কাঠকুড়ানি মেয়ের প্রসঙ্গে ছেলেবেলাকার রূপকথার অলিগলির মধ্যে তাহার মন ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

এমন-সময় আবার পটলের হাসিমাখা কণ্ঠের কাকলীতে সে চমকিয়া উঠিল।

পটল আরএকটি মেয়ের হাত ধরিয়া সবেগে টানিয়া আনিয়া যতীনের সম্মুখে স্থাপন করিল—কহিল, "ও কুড়ানি!"

মেয়েটি কহিল—"কি দিদি।"

পটল। আমার এই ভাইটি কেমন দেখ্ দেখি।

মেয়েটি অসঙ্কোচে যতীনকে দেখিতে লাগিল। পটল কহিল—"কেমন, ভাল দেখিতে না?"

মেয়েটি গম্ভীরভাবে বিচার করিয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল—"হাঁ, ভাল!"

যতীন লাল হইয়া চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া কহিল—"আঃ, পটল, কি ছেলেমানুষি করিতেছ!"

পটল। আমি ছেলেমানুষি করি, না, তুমি বুড়োমানুষি কর! তোমার বুঝি বয়সের গাছপাথর নাই!

যতীন পলায়ন করিল। পটল তাহার পিছনে পিছনে ছুটিতে ছুটিতে কহিল—"ও যতীন, তোমার ভয় নাই, তোমার ভয় নাই। এখনি তোমার মালা দিতে হইবে না—ফাল্গুনচৈত্রে লগ্ন নাই—এখনো হাতে সময় আছে।"

পটল যাহাকে কুড়ানি বলিয়া ডাকে, সেই মেয়েটি অবাক্ হইয়া রহিল। তাহার বয়স ষোলো হইবে, শরীর ছিপ্‌ছিপে—মুখশ্রী-সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার নাই, কেবল মুখে এই একটি অসামান্যতা আছে যে, দেখিলে যেন বনের হরিণের ভাব মনে আসে। কঠিন ভাষায় তাহাকে নির্ব্বুদ্ধি বলা যাইতেও পারে—কিন্তু তাহা বোকামি নহে—তাহা বুদ্ধিবৃত্তির অপরিস্ফুরণমাত্র—তাহাতে কুড়ানির মুখের সৌন্দর্য্য নষ্ট না করিয়া বরঞ্চ একটি বিশিষ্টতা দিয়াছে।

সন্ধ্যাবেলায় হরকুমারবাবু কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিয়া যতীনকে দেখিয়া কহিলেন—"এই যে যতীন আসিয়াছ, ভালই হইয়াছে! তোমাকে একটু ডাক্তারি করিতে হইবে। পশ্চিমে থাকিতে দুর্ভিক্ষের সময় আমরা একটি মেয়েকে লইয়া মানুষ করিতেছি—পটল তাহাকে কুড়ানি বলিয়া ডাকে। উহার বাপ-মা এবং ঐ মেয়েটি আমাদের বাংলার কাছেই একটি গাছতলায় পড়িয়া ছিল। যখন খবর পাইয়া গেলাম, গিয়া দেখি উহার বাপ-মা মরিয়াছে, মেয়েটির প্রাণটুকু আছেমাত্র। পটল তাহাকে অনেক যত্নে বাঁচাইয়াছে। উহার জাতের কথা কেহ জানে না—তাহা লইয়া কেহ আপত্তি করিলেই পটল বলে, 'ও ত দ্বিজ—একবার মরিয়া এবার আমাদের ঘরে জন্মিয়াছে—উহার সাবেক জাত কোথায় ঘুচিয়া গেছে।' প্রথমে মেয়েটি পটলকে মা বলিয়া ডাকিতে সুরু করিয়াছিল—পটল তাহাকে ধমক দিয়া বলিল—'খবরদার, আমাকে মা বলিস্ নে—আমাকে দিদি

বলিস্ !' পটল বলে, 'অত-বড় মেয়ে মা বলিলে নিজেকে বুড়ি বলিয়া মনে হইবে যে !' বোধ করি, সেই দুর্ভিক্ষের উপবাসে বা আর কোন কারণে উহার থাকিয়া-থাকিয়া শূলবেদনার মত হয়। ব্যাপারখানা কি, তোমাকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। ওরে তুলসি, কুড়ানিকে ডাকিয়া আন্ ত।"

কুড়ানি চুল বাঁধিতে বাঁধিতে অসম্পূর্ণ বেণী পিঠের উপরে দুলাইয়া হরকুমারবাবুর ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার হরিণের মত চোখ-দুটি দুজনের উপর রাখিয়া সে চাহিয়া রহিল।

যতীন ইতস্তত করিতেছে দেখিয়া হরকুমার তাহাকে কহিলেন, "বৃথা সঙ্কোচ করিতেছ যতীন। উহাকে দেখিতে মস্ত ডাগর, কিন্তু কচি ডাবের মত উহার ভিতরে কেবল জল ছল্‌ছল্ করিতেছে—এখনো শাঁসের রেখামাত্র দেখা দেয় নাই। ও কিছুই বোঝে না—উহাকে তুমি নারী বলিয়া ভ্রম করিয়ো না—ও বনের হরিণী।"

যতীন তাহার ডাক্তারিকর্ত্তব্য সাধন করিতে লাগিল—কুড়ানি কিছুমাত্র কুণ্ঠা প্রকাশ করিল না। যতীন কহিল—"শরীরযন্ত্রের কোন বিকার ত বোঝা গেল না।"

পটল ফস্ করিয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "হৃদয়যন্ত্রেরও কোন বিকার ঘটে নাই। তার পরীক্ষা দেখিতে চাও?"—

বলিয়া কুড়ানির কাছে গিয়া তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া কহিল—"ও কুড়ানি, আমার এই ভাইটিকে তোর পছন্দ হইয়াছে?"

কুড়ানি মাথা হেলাইয়া কহিল—"হাঁ!"

পটল কহিল, "আমার ভাইকে তুই বিয়ে করিবি?"

সে আবার মাথা হেলাইয়া কহিল—"হাঁ।"

পটল এবং হরকুমারবাবু হাসিয়া উঠিলেন! কুড়ানি কৌতুকের

অর্থ না বুঝিয়া তাঁহাদের অনুকরণে মুখখানি হাসিতে ভরিয়া চাহিয়া রহিল।

যতীন লাল হইয়া উঠিয়া ব্যস্ত হইয়া কহিল -"আঃ, পটল, তুমি বাড়াবাড়ি করিতেছ—ভারি অন্যায়! হরকুমারবাবু, আপনি পটলকে বড় বেশি প্রশ্রয় দিয়া থাকেন!"

হরকুমার কহিলেন—"নহিলে আমিও যে উহার কাছে প্রশ্রয় প্রত্যাশা করিতে পারি না। কিন্তু যতীন, কুড়ানিকে তুমি জান না বলিয়াই অত ব্যস্ত হইতেছ! তুমি লজ্জাকরিয়া কুড়ানিকে সুদ্ধ লজ্জাকরিতে শিখাইবে দেখিতেছি। উহাকে জ্ঞানবৃক্ষের ফল তুমি খাওয়াইয়ো না। সকলে উহাকে লইয়া কৌতুক করিয়াছে—তুমি যদি মাঝের থেকে গাম্ভীর্য্য দেখাও, তবে সেটা উহার পক্ষে একটা অসঙ্গত ব্যাপার হইবে।"

পটল। ঐজন্যই ত যতীনের সঙ্গে আমার কোনকালেই বনিল না—ছেলেবেলা থেকে কেবলি ঝগ্ড়া চলিতেছে—ও বড় গম্ভীর।

হরকুমার। ঝগ্ড়া করাটা বুঝি এম্নি করিয়া একেবারে অভ্যাস হইয়া গেছে—ভাই সরিয়া পড়িয়াছেন, এখন—

পটল। ফের মিথ্যা কথা! তোমার সঙ্গে ঝগ্ড়া করিয়া সুখ নাই—আমি চেষ্টাও করি না।

হরকুমার। আমি গোড়াতেই হার মানিয়া যাই।

পটল। বড় কর্ম্মই কর! গোড়ায় হার না মানিয়া শেষে হার মানিলে কত খুসি হইতাম!

রাত্রে শোবার ঘরের জান্লা-দরজা খুলিয়া দিয়া যতীন অনেক কথা ভাবিল। যে মেয়ে আপনার বাপ-মাকে না খাইতে পাইয়া মরিতে দেখিয়াছে, তাহার জীবনের উপর কি ভীষণ ছায়া পড়ি-

য়াছে ! ঐই নিদারুণ ব্যাপারে সে কত-বড় হইয়া উঠিয়াছে—তাহাকে লইয়া কি কৌতুক করা যায় ? বিধাতা দয়া করিয়া তাহার বুদ্ধিবৃত্তির উপরে একটা আবরণ ফেলিয়া দিয়াছেন—এই আবরণ যদি উঠিয়া যায়, তবে অদৃষ্টের রুদ্রলীলার কি ভীষণ চিহ্ন প্রকাশ হইয়া পড়ে ! আজ মধ্যাহ্নে গাছের ফাঁক দিয়া যতীন যখন ফাল্গুনের আকাশ দেখিতেছিল, দূর হইতে কাঁঠালমুকুলের গন্ধ মৃদুতর হইয়া তাহার ঘ্রাণকে আবিষ্ট করিয়া ধরিতেছিল—তখন তাহার মনটা মাধুর্য্যের কুহেলিকায় সমস্ত জগৎটাকে আচ্ছন্ন করিয়া দেখিয়াছিল—ঐ বুদ্ধিহীন বালিকা তাহার হরিণের মত চোখ-দুটি লইয়া সেই সোনালি কুহেলিকা অপসারিত করিয়া দিয়াছে—ফাল্গুনের এই কূজন-গুঞ্জন-মর্ম্মরের পশ্চাতে সংসার যে ক্ষুধাতৃষ্ণাতুর দুঃখকঠিন দেহ লইয়া বিরাট্ মূর্ত্তিতে দাড়াইয়া আছে, উদ্‌ঘাটিত যবনিকার শিল্প-মাধুর্য্যের অন্তরালে সে দেখা দিল !

পরদিন সন্ধ্যার সময় কুড়ানির সেই বেদনা ধরিল। পটল তাড়াতাড়ি যতীনকে ডাকিয়া পাঠাইল। যতীন আসিয়া দেখিল, কষ্টে কুড়ানির হাতে-পায়ে খিল ধরিতেছে—শরীর আড়ষ্ট। যতীন ঔষধ আনিতে পাঠাইয়া বোতল করিয়া গরম জল আনিতে হুকুম করিল। পটল কহিল, "ভারি মস্ত ডাক্তার হইয়াছ, পায়ে একটু গরম তেল মালিশ করিয়া দাও না ! দেখিতেছ না, পায়ের তেলো হিম হইয়া গেছে।"

যতীন রোগিণীর পায়ের তলায় গরম তেল সবেগে ঘষিয়া দিতে লাগিল। চিকিৎসা-ব্যাপারে রাত্রি অনেক হইল। হরকুমার কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিয়া বারবার কুড়ানির খবর লইতে লাগিলেন। যতীন বুঝিল, সন্ধ্যাবেলায় কর্ম্ম হইতে ফিরিয়া আসিয়া পটল-

অভাবে হরকুমারের অচল হইয়া উঠিয়াছে—ঘনঘন কুড়ানির খবর লইবার তাৎপর্য্য তা-ই। যতীন কহিল—"হরকুমার-বাবু ছট্‌ফট্ করিতেছেন, তুমি যাও পটল !"

পটল কহিল—"পরের দোহাই দিবে বৈ কি ! ছট্‌ফট্ কে করিতেছে, তা বুঝিয়াছি। আমি গেলেই এখন তুমি বাঁচ ! এদিকে কথায় কথায় লজ্জায় মুখ-চোখ লাল হইয়া উঠে—তোমার পেটে যে এত ছিল, তা কে বুঝিবে !"

যতীন। আচ্ছা, দোহাই তোমার, তুমি এইখানেই থাক। রক্ষা কর—তোমার মুখ বন্ধ হইলে বাঁচি। আমি ভুল বুঝিয়াছিলাম—হরকুমারবাবু বোধ হয় শান্তিতে আছেন, এ-রকম সুযোগ তাঁর সর্ব্বদা ঘটে না !

কুড়ানি আরাম পাইয়া যখন চোখ খুলিল, পটল কহিল—"তোর চোখ খোলাইবার জন্য তোর বর যে আজ অনেকক্ষণ ধরিয়া তোকে পায়ে ধরিয়া সাধিয়াছে—আজ তাই বুঝি এত দেরি করিলি ! ছি ছি, ওঁর পায়ের ধূলা নে !"

কুড়ানি কর্ত্তব্যবোধে তৎক্ষণাৎ গম্ভীরভাবে যতীনের পায়ের ধূলা লইল। যতীন দ্রুতপদে ঘর হইতে চলিয়া গেল।

তাহার পরদিনহইতে যতীনের উপরে রীতিমত উপদ্রব আরম্ভ হইল। যতীন খাইতে বসিয়াছে, এমন-সময় কুড়ানি আসিয়া অম্লানবদনে পাখা দিয়া তাহার মাছি তাড়াইতে প্রবৃত্ত হইল। যতীন ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "থাক্ থাক্, কাজ নাই।" কুড়ানি এই নিষেধে বিস্মিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া পশ্চাদ্‌বর্ত্তী ঘরের দিকে একবার চাহিয়া দেখিল—তাহার পরে আবার পুনশ্চ পাখা দোলাইতে লাগিল। যতীন অন্তরালবর্ত্তিনীর উদ্দেশে বলিয়া উঠিল—"পটল, তুমি যদি এমন

করিয়া আমাকে জ্বালাও, তবে আমি খাইব না—আমি এই উঠিলাম!”

বলিয়া, উঠিবার উপক্রম করিতেই কুড়ানি পাখা ফেলিয়া দিল। যতীন বালিকার বুদ্ধিহীন মুখে তীব্র বেদনার রেখা দেখিতে পাইল; তৎক্ষণাৎ অনুতপ্ত হইয়া সে পুনর্ব্বার বসিয়া পড়িল। কুড়ানি যে কিছু বোঝে না, সে যে লজ্জা পায় না, বেদনাবোধ করে না, এ কথা যতীনও বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। আজ চকিতের মধ্যে দেখিল, সকল নিয়মেরই ব্যতিক্রম কখন্ হঠাৎ ঘটে, আগে হইতে তাহা কেহই বলিতে পারে না! কুড়ানি পাখা ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

পরদিন সকালে যতীন বারান্দায় বসিয়া আছে—গাছপালার মধ্যে কোকিল অত্যন্ত ডাকাডাকি আরম্ভ করিয়াছে—আমের বোলের গন্ধে বাতাস ভারাক্রান্ত—এমন-সময় সে দেখিল, কুড়ানি চায়ের পেয়ালা হাতে লইয়া যেন একটু ইতস্তত করিতেছে। তাহার হরিণের মত চক্ষে একটা সকরুণ ভয় ছিল—সে চা লইয়া গেলে যতীন বিরক্ত হইবে কি না, ইহা যেন সে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। যতীন ব্যথিত হইয়া উঠিয়া অগ্রসর হইয়া তাহার হাত হইতে পেয়ালা লইল। এই মানবজন্মের হরিণশিশুটিকে তুচ্ছ কারণে কি বেদনা দেওয়া যায়? যতীন যেম্‌নি পেয়ালা লইল, অম্‌নি দেখিল, বারান্দার অপর প্রান্তে পটল সহসা আবির্ভূত হইয়া নিঃশব্দহাস্যে যতীনকে কিল দেখাইল, ভাবটা এই যে, কেমন ধরা পড়িয়াছ!

সেইদিন সন্ধ্যার সময় যতীন একখানি ডাক্তারি কাগজ পড়িতেছিল, এমন-সময় ফুলের গন্ধে চকিত হইয়া উঠিয়া দেখিল, কুড়ানি বকুলের মালা হাতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। যতীন মনে মনে কহিল, “বড়ই বাড়াবাড়ি হইতেছে—পটলের এই নিষ্ঠুর আমোদে

আর প্রশ্রয় দেওয়া উচিত হয় না।" কুড়ানিকে বলিল "ছিছি কুড়ানি, তোমাকে লইয়া তোমার দিদি আমোদ করিতেছেন, তুমি বুঝিতে পার না।"

কথা শেষ করিতে না করিতেই কুড়ানি ত্রস্ত-সঙ্কুচিত-ভাবে প্রস্থানের উপক্রম করিল। যতীন তখন তাড়াতাড়ি তাহাকে ডাকিয়া কহিল—"কুড়ানি, দেখি তোমার মালা দেখি।" বলিয়া মালাটি তাহার হাত হইতে লইল। কুড়ানির মুখে একটি আনন্দের উজ্জ্বলতা ফুটিয়া উঠিল। অন্তরাল হইতে সেই মুহূর্ত্তে একটি উচ্চহাস্যের উচ্ছ্বাসধ্বনি শুনা গেল।

পরদিন সকালে উপদ্রব করিবার জন্য পটল যতীনের ঘরে গিয়া দেখিল, ঘর শূন্য। একখানি কাগজে কেবল লেখা আছে—"পালাইলাম। শ্রীযতীন।"

"ও কুড়ানি, তোর বর যে পালাইল! তাহাকে রাখিতে পারিলি নে!" বলিয়া কুড়ানির বেণী ধরিয়া নাড়া দিয়া পটল ঘরকন্নার কাজে চলিয়া গেল।

কথাটা বুঝিতে কুড়ানির একটু সময় গেল। সে ছবির মত দাঁড়াইয়া স্থিরদৃষ্টিতে সম্মুখে চাহিয়া রহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে যতীনের ঘরে আসিয়া দেখিল, তাহার ঘর খালি। তার পূর্ব্বসন্ধ্যার উপহারের মালাটা টেবিলের উপর পড়িয়া আছে।

বসন্তের প্রাতঃকালটি স্নিগ্ধসুন্দর—রৌদ্রটি কম্পিত কৃষ্ণচূড়ার শাখার ভিতর দিয়া ছায়ার সহিত মিশিয়া বারান্দার উপর আসিয়া পড়িয়াছে। কাঠবিড়ালি ল্যাজ পিঠে তুলিয়া ছুটাছুটি করিতেছে এবং সকল পাখী মিলিয়া নানাসুরে গান গাহিয়া তাহাদের বক্তব্য বিষয় কিছুতেই শেষ করিতে পারিতেছে না। পৃথিবীর এই কোণটুকুতে,

এই থানিকটা ঘনপল্লব, ছায়া এবং রৌদ্ররচিত জগৎখণ্ডের মধ্যে প্রাণের আনন্দ ফুটিয়া ফুটিয়া উঠিতেছিল, তাহারি মাঝখানে ঐ বুদ্ধি-হীন বালিকা তাহার জীবনের, তাহার চারিদিকের, সঙ্গত কোন অর্থ বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। সমস্তই কঠিন প্রহেলিকা! কি হইল, কেন এমন হইল, তার পরে এই প্রভাত, এই গৃহ, এই যাহাকিছু সমস্তই এমন একেবারে শূন্য হইয়া গেল কেন? যাহার বুঝিবার সামর্থ্য অল্প, তাহাকে হঠাৎ একদিন নিজ হৃদয়ের এই অতল বেদনার রহস্যগর্ভে কোন প্রদীপ হাতে না দিয়া কে নামাইয়া দিল? জগতের এই সহজ-উচ্ছ্বসিত প্রাণের রাজ্যে, এই গাছপালামৃগপক্ষীর আত্মবিস্মৃত কলরব মধ্যে কে তাহাকে আবার টানিয়া তুলিতে পারিবে?

পটল ঘরকন্নার কাজ সারিয়া কুড়ানির সন্ধান লইতে আসিয়া দেখিল, সে যতীনের পরিত্যক্ত ঘরে তাহার খাটের খুরা ধরিয়া মাটিতে পড়িয়া আছে—শূন্য শয্যাটাকে যেন পায়ে ধরিয়া সাধিতেছে। তাহার বুকের ভিতরে যে একটি সুধার পাত্র লুকান ছিল, সেইটে যেন শূন্যতার চরণে বৃথা আশ্বাসে উপুড় করিয়া ঢালিয়া দিতেছে—ভূমিতলে পুঞ্জীভূত সেই স্খলিতকেশা লুণ্ঠিতবসনা নারী যেন নীরব একাগ্রতার ভাষায় বলিতেছে,—'লও, লও, আমাকে লও! ওগো, আমাকে লও!'

পটল বিস্মিত হইয়া কহিল—"ও কি হইতেছে কুড়ানি!"

কুড়ানি উঠিল না,—সে যেমন পড়িয়াছিল, তেমনি পড়িয়া রহিল। পটল কাছে আসিয়া তাহাকে স্পর্শ করিতেই সে উচ্ছ্বসিত হইয়া ফুলিয়া-ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

পটল তখন চকিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "ও পোড়ারমুখি, সর্ব্বনাশ করিয়াছিস্! মরিয়াছিস্!"

হরকুমারকে পটল কুড়ানির অবস্থা জানাইয়া কহিল—"একি বিপদ্ ঘটিল! তুমি কি করিতেছিলে, তুমি আমাকে কেন বারণ করিলে না?"

হরকুমার কহিল—"তোমাকে বারণ করা যে আমার কোনকালে অভ্যাস নাই। বারণ করিলেই কি ফল পাওয়া যাইত?"

পটল। তুমি কেমন স্বামী? আমি যদি ভুল করি, তুমি আমাকে জোর করিয়া থামাইতে পার না? আমাকে তুমি এ খেলা খেলিতে দিলে কেন?

এই বলিয়া সে ছুটিয়া গিয়া ভূপতিতা বালিকার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল—"লক্ষ্মী বোন্ আমার তোর কি বলিবার আছে, আমাকে খুলিয়া বল্!

হায়, কুড়ানির এমন কি ভাষা আছে যে, আপনার হৃদয়ের অব্যক্ত রহস্য সে কথা দিয়া বলিতে পারে! সে একটি অনির্ব্বচনীয় বেদনার উপর তাহার সমস্ত বুক দিয়া চাপিয়া পড়িয়া আছে—সে বেদনাটা কি, জগতে এমন আর কাহারো হয় কি না, তাহাকে লোকে কি বলিয়া থাকে, কুড়ানি তাহার কিছুই জানে না। সে কেবল কান্না দিয়া বলিতে পারে; মনের কথা জানাইবার তাহার আর কোন উপায় নাই।

পটল কহিল, "কুড়ানি, তোর দিদি বড় দুষ্টু—কিন্তু তার কথা যে তুই এমন করিয়া বিশ্বাস করিবি, তা সে কখনো মনেও করে নি। তার কথা কেহ কখনো বিশ্বাস করে না—তুই এমন ভুল কেন করিলি? কুড়ানি, একবার মুখ তুলিয়া তোর দিদির মুখের দিকে চা'—তা'কে মাপ কর!"

কিন্তু কুড়ানির মন তখন বিমুখ হইয়া গিয়াছিল—সে কোন্মতেই

পটলের মুখের দিকে চাহিতে পারিল না—সে আরো জোর করিয়া হাতের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া রহিল। সে ভাল করিয়া সমস্ত কথা না বুঝিয়াও একপ্রকার মূঢ়ভাবে পটলের প্রতি রাগ করিয়াছিল। পটল তখন ধীরে ধীরে বাহুপাশ খুলিয়া লইয়া উঠিয়া গেল—এবং জানালার ধারে পাথরের মূর্ত্তির মত স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া ফাল্গুনের রৌদ্রচিক্কণ সুপারীগাছের পল্লবশ্রেণীর দিকে চাহিয়া পটলের দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

পরদিন কুড়ানির আর দেখা পাওয়া গেল না। পটল তাহাকে আদর করিয়া ভাল ভাল গহনা এবং কাপড় দিয়া সাজাইত। নিজে সে এলোমেলো ছিল—নিজের সাজসজ্জে তাহার কোন যত্ন ছিল না, কিন্তু সাজগোজের সমস্ত সখ কুড়ানির উপর দিয়াই সে মিটাইয়া লইত। বহুকালসঞ্চিত সেই সমস্ত বসনভূষণ কুড়ানির ঘরের মেজের উপর পড়িয়া আছে। তাহার হাতের বালাচুড়ি, নাসাগ্রের লবঙ্গফুলটি পর্য্যন্ত সে খুলিয়া ফেলিয়া গিয়াছে। তাহার পটলদিদির এতদিনের সমস্ত আদর সে যেন গা হইতে মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছে!

হরকুমারবাবু কুড়ানির সন্ধানে পুলিসে খবর দিলেন। সেবারে প্লেগদমনের বিভীষিকায় এত লোক এত দিকে পলায়ন করিতেছিল যে, সেই সকল পলাতকদলের মধ্য হইতে একটি বিশেষ লোককে বাছিয়া লওয়া পুলিসের পক্ষে শক্ত হইল। হরকুমারবাবু দুইচারিবার ভুল লোকের সন্ধানে অনেক দুঃখ এবং লজ্জা পাইয়া কুড়ানির আশা পরিত্যাগ করিলেন। অজ্ঞাতের কোল হইতে তাঁহারা যাহাকে পাইয়াছিলেন, অজ্ঞাতের কোলের মধ্যেই সে আবার লুকাইয়া পড়িল।

যতীন বিশেষ চেষ্টা করিয়া সেবার প্লেগহাঁসপাতালে ডাক্তারি-পদ গ্রহণ করিয়াছিল। একদিন দুপুরবেলায় বাসায় আহার সারিয়া

হাঁস্‌পাতালে আসিয়া সে শুনিল—হাঁস্‌পাতালের স্ত্রী-বিভাগে একটি নূতন রোগিণী আসিয়াছে। পুলিস তাহাকে পথ হইতে কুড়াইয়া আনিয়াছে।

যতীন তাহাকে দেখিতে গেল। মেয়েটির মুখের অধিকাংশ চাদরে ঢাকা ছিল। যতীন প্রথমেই তাহার হাত তুলিয়া লইয়া নাড়ি দেখিল। নাড়িতে জ্বর অধিক নাই, কিন্তু দুর্ব্বলতা অত্যন্ত। তখন পরীক্ষার জন্য মুখের চাদর সরাইয়া দেখিল, সেই কুড়ানি।

ইতিমধ্যে পটলের কাছ হইতে যতীন কুড়ানির সমস্ত বিবরণ জানিয়াছিল। অব্যক্ত হৃদয়ভাবের দ্বারা ছায়াচ্ছন্ন তাহার সেই হরিণ-চক্ষু-দুটি কাজের অবকাশে যতীনের ধ্যানদৃষ্টির উপরে কেবলি অশ্রুহীন কাতরতা বিকীর্ণ করিয়াছে। আজ সেই রোগনিমীলিত চক্ষুর সুদীর্ঘ পল্লব কুড়ানির শীর্ণ কপোলের উপরে কালিমার রেখা টানিয়াছে—দেখিবামাত্র যতীনের বুকের ভিতরটা হঠাৎ কে যেন চাপিয়া ধরিল। এই একটি মেয়েকে বিধাতা এত যত্নে ফুলের মত সুকুমার করিয়া গড়িয়া দুর্ভিক্ষ হইতে মারীর মধ্যে ভাসাইয়া দিলেন কেন? আজ এই যে পেলব প্রাণটি ক্লিষ্ট হইয়া বিছানার উপরে পড়িয়া আছে, ইহার এই অল্প কয়দিনের আয়ুর মধ্যে এত বিপদের আঘাত, এত বেদনার ভার সহিল কি করিয়া, ধরিল কোথায়? যতীনই বা ইহার জীবনের মাঝখানে তৃতীয় আর একটি সঙ্কটের মত কোথা হইতে আসিয়া জড়াইয়া পড়িল? রুদ্ধ দীর্ঘনিশ্বাস যতীনের রুদ্ধদ্বারে আঘাত করিতে লাগিল—কিন্তু সেই আঘাতের তাড়নায় তাহার হৃদয়ের তারে একটা সুখের মীড়ও বাজিয়া উঠিল। যে ভালবাসা জগতে দুর্লভ, যতীন তাহা না চাহিতেই ফাল্গুনের একটি মধ্যাহ্নে একটি পূর্ণবিকশিত মাধবীমঞ্জরীর মত অকস্মাৎ তার পায়ের কাছে আপনি আসিয়া খসিয়া

পড়িয়াছে। যে ভালবাসা এমন করিয়া মৃত্যুর দ্বার পর্য্যন্ত আসিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, পৃথিবীতে কোন্ লোক সেই দেবভোগ্য নৈবেদ্য-লাভের অধিকারী ?

যতীন কুড়ানির পাশে বসিয়া তাহাকে অল্প অল্প গরম দুধ খাওয়াইয়া দিতে লাগিল। খাইতে খাইতে অনেকক্ষণ পরে সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চোখ মেলিল। যতীনের মুখের দিকে চাহিয়া তাহাকে সুদূর স্বপ্নের মত যেন মনে করিয়া লইতে চেষ্টা করিল। যতীন যখন তাহার কপালে হাত রাখিয়া একটুখানি নাড়া দিয়া কহিল—"কুড়ানি"—তখন তাহার অজ্ঞানের শেষ ঘোরটুকু হঠাৎ ভাঙিয়া গেল—যতীনকে সে চিনিল এবং তখনি তাহার চোখের উপরে বাষ্পকোমল আর একটি মোহের আবরণ পড়িল। প্রথম মেঘসমাগমে সুগম্ভীর আষাঢ়ের আকাশের মত কুড়ানির কালোচোখদুটির উপর একটি যেন সুদূরব্যাপী সজলস্নিগ্ধতা ঘনাইয়া আসিল।

যতীন সকরুণ যত্নের সুরে কহিল, "কুড়ানি, এই দুধটুকু শেষ করিয়া ফেল!"

কুড়ানি একটু উঠিয়া বসিয়া পেয়ালার উপর হইতে যতীনের মুখে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া সেই দুধটুকু ধীরে ধীরে খাইয়া ফেলিল।

হাঁস্পাতালের ডাক্তার একটিমাত্র রোগীর পাশে সমস্তক্ষণ বসিয়া থাকিলে কাজও চলে না, দেখিতেও ভাল হয় না। অন্যত্র কর্ত্তব্য সারিবার জন্য যতীন যখন উঠিল, তখন ভয়ে ও নৈরাশ্যে কুড়ানির চোখ-দুটি ব্যাকুল হইয়া পড়িল। যতীন তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে আশ্বাস দিয়া কহিল, "আমি আবার এখনি আসিব কুড়ানি, তোমার কোন ভয় নাই!"

যতীন কর্তৃপক্ষদিগকে জানাইল যে, এই নূতন-আনীত রোগিণীর

প্লেগ্ হয় নাই—সে না খাইয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। এখানে অন্ত প্লেগ্‌রোগীর সঙ্গে থাকিলে তাহার পক্ষে বিপদ্ ঘটিতে পারে।

বিশেষ চেষ্টা করিয়া যতীন কুড়ানিকে অন্যত্র লইয়া যাইবার অনুমতি লাভ করিল এবং নিজের বাসায় লইয়া গেল। পটলকে সমস্ত খবর দিয়া একখানি চিঠিও লিখিয়া দিল।

সেইদিন সন্ধ্যার সময় রোগী এবং চিকিৎসক ছাড়া ঘরে আর কেহ ছিল না। শিয়রের কাছে রঙীন্ কাগজের আবরণে ঘেরা একটি কেরোসিন ল্যাম্প্ ছায়াচ্ছন্ন মৃদু আলোক বিকীর্ণ করিতেছিল—ব্র্যাকেটের উপরে একটা ঘড়ি নিস্তব্ধ-ঘরে টিক্‌টিক্-শব্দে দোলক দোলাইতেছিল।

যতীন কুড়ানির কপালে হাত দিয়া কহিল, "তুমি কেমন বোধ করিতেছ কুড়ানি ?"

কুড়ানি তাহার কোন উত্তর না করিয়া যতীনের হাতটি আপনার কপালেই চাপিয়া রাখিয়া দিল।

যতীন আবার জিজ্ঞাসা করিল—"ভাল বোধ হইতেছে ?"

কুড়ানি একটুখানি চোখ বুজিয়া কহিল—"হাঁ !"

যতীন জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার গলায় এটা কি কুড়ানি ?"

কুড়ানি তাড়াতাড়ি কাপড়টা টানিয়া তাহা ঢাকিবার চেষ্টা করিল। যতীন দেখিল, সে একগাছি শুক্‌নো বকুলের মালা। তখন তাহার মনে পড়িল, সে মালাটা কি! ঘড়ির টিক্‌টিক্ শব্দের মধ্যে যতীন চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। কুড়ানির এই প্রথম লুকাইবার চেষ্টা—নিজের হৃদয়ের ভাব গোপন করিবার এই তাহার প্রথম প্রয়াস। কুড়ানি মৃগশিশু ছিল, সে কখন্ হৃদয়ভারাতুরা যুবতী নারী হইয়া উঠিল! কোন্ রৌদ্রের আলোকে—কোন্ রৌদ্রের

উত্তাপে তাহার বুদ্ধির উপরকার সমস্ত কুয়াসা কাটিয়া গিয়া তাহার লজ্জা, তাহার শঙ্কা, তাহার বেদনা এমন হঠাৎ প্রকাশিত হইয়া পড়িল!

রাত্রি দুটা-আড়াইটার সময় যতীন চৌকিতে বসিয়াই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। হঠাৎ দ্বার-খোলার শব্দে চম্‌কিয়া উঠিয়া দেখিল, পটল এবং হরকুমারবাবু এক বড় ব্যাগ্ হাতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

হরকুমার কহিলেন—"তোমার চিঠি পাইয়া কাল সকালে আসিব বলিয়া বিছানায় শুইলাম। অর্দ্ধেক রাত্রে পটল কহিল, 'ওগো কাল সকালে গেলে কুড়ানিকে দেখিতে পাইব না—আমাকে এখনি যাইতে হইবে।' পটলকে কিছুতেই বুঝাইয়া রাখা গেল না—তখনি একটা গাড়ি করিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছি।"

পটল হরকুমারকে কহিল, "চল, তুমি যতীনের বিছানায় শোবে চল।"

হরকুমার ঈষৎ আপত্তির আড়ম্বর করিয়া যতীনের ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িলেন, তাঁহার নিদ্রা যাইতেও দেরী হইল না।

পটল ফিরিয়া আসিয়া যতীনকে ঘরের এক কোণে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আশা আছে?"

যতীন কুড়ানির কাছে আসিয়া তাহার নাড়ি দেখিয়া মাথা নাড়িয়া ইঙ্গিতে জানাইল যে, আশা নাই।

পটল কুড়ানির কাছে আপনাকে প্রকাশ না করিয়া যতীনকে আড়ালে লইয়া কহিল—"যতীন, সত্য বল, তুমি কি কুড়ানিকে ভাল বাস না?"

যতীন পটলকে কোন উত্তর না দিয়া কুড়ানির বিছানার পাশে আসিয়া বসিল। তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া নাড়া দিয়া কহিল—"কুড়ানি, কুড়ানি!"

কুড়ানি চোখ মেলিয়া মুখে একটি শান্তমধুর হাসির আভাসমাত্র আনিয়া কহিল—"কি দাদাবাবু?"

যতীন কহিল—"কুড়ানি, তোমার এই মালাটি আমার গলায় পরাইয়া দাও!"

কুড়ানি অনিমেষ অবুঝ চোখে যতীনের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

যতীন কহিল—"তোমার মালা আমাকে দিবে না?"

যতীনের এই আদরের প্রশ্রয়টুকু পাইয়া কুড়ানির মনে পূর্ব্বকৃত অনাদরের একটুখানি অভিমান জাগিয়া উঠিল। সে কহিল—"কি হবে দাদাবাবু!"

যতীন দুইহাতে তাহার হাত লইয়া কহিল, "আমি তোমাকে ভালবাসি কুড়ানি!"

শুনিয়া ক্ষণকালের জন্যে কুড়ানি স্তব্ধ রহিল—তাহার পরে তাহার দুই চক্ষু দিয়া অজস্র জল পড়িতে লাগিল। যতীন বিছানার পাশে নামিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিল, কুড়ানির হাতের কাছে মাথা নত করিয়া রাখিল। কুড়ানি গলা হইতে মালা খুলিয়া যতীনের গলায় পরাইয়া দিল।

তখন পটল তাহার কাছে আসিয়া ডাকিল, "কুড়ানি!"

কুড়ানি তাহার শীর্ণ মুখ উজ্জ্বল করিয়া কহিল—"কি দিদি!"

পটল তাহার কাছে আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া কহিল—"আমার উপর তোর আর কোন রাগ নাই বোন্?"

কুড়ানি স্নিগ্ধকোমলদৃষ্টিতে কহিল—"না দিদি!"

পটল কহিল, "যতীন একবার তুমি ও-ঘরে যাও!"

যতীন পাশের ঘরে গেলে পটল ব্যাগ্ খুলিয়া কুড়ানির সমস্ত

কাপড়-গহনা তাহার মধ্য হইতে বাহির করিল। রোগিণীকে অধিক নাড়াচাড়া না করিয়া একখানা বেনারসি শাড়ি সন্তর্পণে তাহার মলিন বস্ত্রের উপর জড়াইয়া দিল। পরে একে একে একএকগাছি চুড়ি তাহার হাতে দিয়া দুই হাতে দুই বালা পরাইয়া দিল। তার পরে ডাকিল—"যতীন!"

যতীন আসিতেই তাহাকে বিছানায় বসাইয়া পটল তাহার হাতে কুড়ানির একছড়া সোনার হার দিল। যতীন সেই হারছড়াটি লইয়া আস্তে আস্তে কুড়ানির মাথা তুলিয়া ধরিয়া তাহাকে পরাইয়া দিল।

ভোরের আলো যখন কুড়ানির মুখের উপরে আসিয়া পড়িল, তখন সে আলো সে আর দেখিল না! তাহার অম্লান মুখকান্তি দেখিয়া মনে হইল, মরে নাই—কিন্তু সে যেন একটি অতলস্পর্শ সুখস্বপ্নের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া গেছে।

যখন মৃতদেহ লইয়া যাইবার সময় হইল, তখন পটল কুড়ানির বুকের উপরে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল "বোন্, তোর ভাগ্য ভাল! জীবনের চেয়ে তোর মরণ সুখের!"

যতীন কুড়ানির সেই শান্তিস্নিগ্ধ মৃত্যুচ্ছবির দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল—"যাঁহার ধন তিনিই নিলেন, আমাকেও বঞ্চিত করিলেন না।"

সমাপ্ত